

বিদ্যালয়-বিভাগ

১৮২৭/৭

বিবিধ বিধান ।

১৮৫৬

বালকশিক্ষার

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার

সাহায্য

কারিগরি ও ব্যবসায়িক শ্রমের জন্যে কলিকাতা টোনিং ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ,

টোনিং ও ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক,

শিল্পের ন্যাশনাল স্কুলের ব্যবস্থাপক অধ্যাপক

প্রিন্স অফ ওয়েলসের অধিকারী

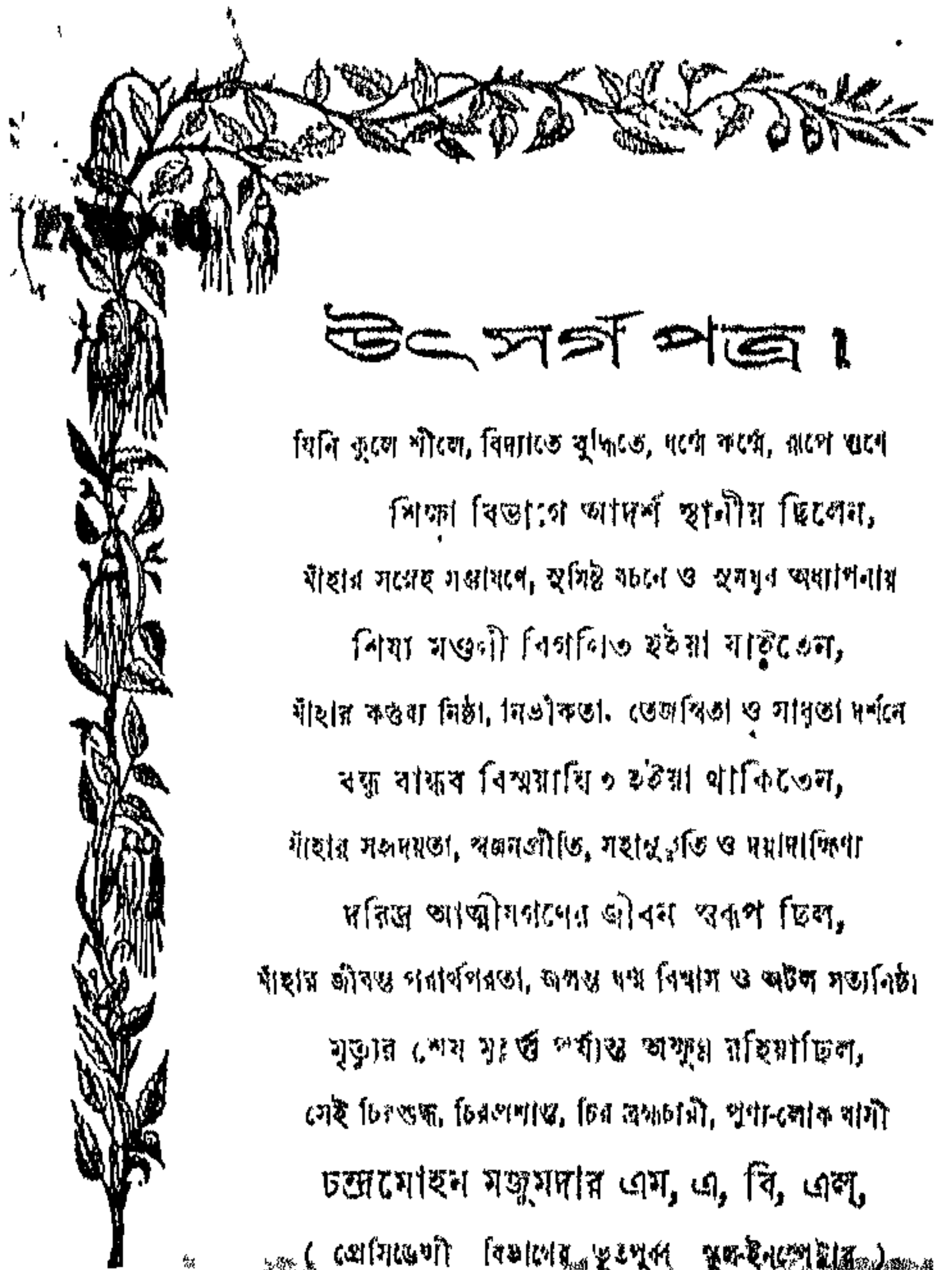
স্বাক্ষর

(প্রথম সংস্করণ — শ্রীমতী চন্দ্র দেবী)

কলিকাতা

২৫ নং বামবাগান স্ট্রীট অফিসের মধ্যে,





উৎসর্গ পত্র ।

যিনি কুণ্ডে শীল, বিদ্যাতে সুদীপ্ত, দগ্ধে কর্ণে, রাগে স্থল
 শিক্ষা বিভাগে আদর্শ স্থানীয় ছিলেন,
 যৌহার সঙ্গের গল্লাঘণে, সুসিষ্ট বচনে ও সুমধুর অধ্যাপনায়
 নিম্না মণ্ডলী বিগলিত হঠয়া যাত্তেতন,
 যৌহার কণ্ঠবা নিষ্ঠা, নিভীকতা, তেজস্বিতা ও সাধুতা দর্শনে
 বন্ধু বান্ধব বিশ্বাস্যি ৩ হঠয়া থাকিতেন,
 যৌহার মল্লদয়তা, অজ্ঞনজীতি, মহাপুষ্টি ও মমাদাফিণা
 দরিদ্র আত্মীয়গণের জীবন স্বরূপ ছিল,
 যৌহার জীবন্ত পরার্থপরতা, জগন্ত ধর্ম বিশ্বাস ও অটল সত্যনিষ্ঠা
 মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল,
 সেই চিরশুদ্ধ, চিরঅশাঙ্ক, চির অকামী, পুণা-লোক বাসী
 চন্দ্রমোহন মজুমদার এম, এ, বি, এল,

(প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডুপ্লুস পুঙ্খ-ইনস্পেক্টর)

মহাশয়ের পশিজন্যমে

এই পুস্তক গ্রন্থ, ভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি দর্শন

উৎসর্গ করত হইল ।



নিবেদন ।



শু প্রকাশের উদ্দেশ্য ।—কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সুরোগ্যা এসি-
ষ্ট্যান্ট হেডমাস্টার বাবু শশধর সেন একবার লিখিয়াছিলেন :- “* * *
পান্নালাল বলিল তুমি যদি একখান শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক লেখ তবে
বেশ হয় । কারসিয়ং ফেরত বহুবান্ধবদিগের মধ্যে আরও অনেকে তোমার
নামই করিয়াছেন । আমরাও সেই মত । তোমার নোটগুলি আমি দেখিয়াছি,
অন্ততঃ এই নোটগুলি ছাপাইলেও অনেক উপকার হইবে । তুমি নিজে না
ছাপ, আমাদের সমস্ত পাঠাইয়া দিও, আমি ছাপিতে চেষ্টা করিব । একখান বাঙ্গালা
পুস্তকের বড়ই অভাব বোধ হইতেছে । অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রগণকে সমস্ত শিখাইয়া
দেওয়াও যায় না আর লেখাইয়া দেওয়াও যায় না ।* * *” শশধর সাহিত্য ক্ষেত্রে
সুপরিচিত ছিল । আমার সমস্ত নোট শশধরকে দিয়াছিলাম । তাহার হাতে এই
কার্য্য নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইত । কিন্তু শশধরের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত কল্পনা বিনষ্ট হইয়া
গিয়াছে ।

পান্নালাল আজ কোর্টের একজন প্রাতভাষালী উকিল (পুস্তকের প্রমোশন উপলক্ষে) লিখিয়া-
ছিলেন “* * * তুমি বলিয়াছিলে যে কেবল একখান সাহিত্যপুস্তক কিনিয়া দিলেই চলিবে,
অসংখ্য বিষয় শিক্ষকগণ মুখে মুখে শিখাইয়া দিবেন । কিন্তু এখন দেখিতেছি একঝুড়ি
পুস্তকেও কুলায় না । এই আমার ছেলের পুস্তকের তালিকা :—সাহিত্য কুসুম, পদ্যমালা,
ব্যাকরণশিক্ষা, ভারতের সরল ইতিহাস, সরল ভূগোল, প্রাথমিক জ্যামিতি, শিশু পরিমিত্তি,
যাদবের পাঠ্যগণিত, অম্বকের ডুইং, ম্যাকমিলানের বিজ্ঞানপাঠ, দলিল লিখন, অসিদারী
মহাজনী, করিপ শিক্ষা, বাঙ্গালা কালিবুক, সাহিত্যকুসুমের অর্থ, পদ্যমালার অর্থ,
ইতিহাসের প্রমোক্তর, বিজ্ঞানপাঠের প্রমোক্তর, বস্তু উপলক্ষে পাঠ, আরও যেন তত্কারখানি

কি মনে নাই; সর্বদা মনে ছুই উজানের বেশী বই কম নহে। এই ফর্ম দেখিয়া বেশ বুঝিতেছি যে তোমাদিগের এই নুতন প্রণালীর গম্ভীর অনেক শিক্ষকও বুঝিতে পারেন নাই। তুমি আমাকে যে যে পুস্তক পড়িতে বলিয়াছিলে তাহার কিছু কিছু পড়িয়াছি কিন্তু পুস্তকগুলি খুব বড় বলিয়া শেষ করিতে পারি নাই। এমন একখানি পুস্তক পাওয়া যায় যাহাতে সকল কথাই অল্প স্বাক্ষর থাকে তাহা হইলে তোমাদিগের সুবিধা হয়। বিশেষ বাড়ীর মেয়েদের জন্য একখান বাফালা পুস্তক মুদ্রিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যিক। তোমার খাতাপত্রগুলি কি বস্তুবন্দী করিয়া রাখিবে না তাহার কোন গদ্যপদ্য করিবে? দলের উপকার হউক না হউক তোমার অনেক বঙ্গদেশের উপকার হইত। “* * *” পত্র লেখককে আমি H. Spenser's Education, Garlick's New Manual of Method, Garlick and Dexter's Psychology in the School Room, Murche's Object Lessons for Infants, Murche's Object Lessons in Science and Geography, Wiche's Psychology, Child's Psychology, Newham's School Organization পড়িতে বলিয়াছিলাম। ইংরাজী অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও অভিভাবকগণকেও আমি এই কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। [আমার অপর একটা বন্ধু এই ফর্মকে Allopathic prescription বলিয়া উপহাস করেন ও আমাকে একটা Homeopathic prescription করিতে বলেন। আমি তাহাকে Joyce's Hand Book of School Management ও Mrs. Brandel's Kindergarten Teaching in India (Mac Millan) পড়িতে বলিয়াছিলাম।]

বর্ধমান হইতে আমার সুপরিচিতা একজন মজলু মহিলা এইরূপ লিখিয়া ছিলেন :—
“* * * পুস্তককার শিক্ষা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। Private tutor নিযুক্ত করিয়াছি বটে কিন্তু তাহাতে কার্যের সুবিধা হইতেছে না কারণ ইহার art of teaching জানেন না। আমি নিজে ইংরাজী ভাল বুঝিতে পারি না বলিয়া ইংরাজী পুস্তক পড়িতে পারিতেছি না। * * * আপনারা বক্তৃতায় বলেন যে এদেশের মাতার মাতান শিক্ষায় অপর কিছু তোমাদিগের সাহায্যার্থ আপনারা কিছুই করিতেছেন না। * * * প্রতিবৎসর দামোদরের বন্যার ন্যায় দেশ নাটক মন্ডলে প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু শিক্ষাদানের প্রণালী শুধু এই লিখিতেছেন না। ইংরাজীতে নাকি এহ বিষয়ে দশ ফাঁদেব অনেক পুস্তক আছে। কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে দশখানাও চাইল না। শ্রীমতী—লিখিয়াছিল আপনি নাকি এতদূর পরে একখান পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনায় ইচ্ছা

কার্যে পরিণত হইলে আশাশ্রিত্যের অভাব দূর হইবে বলিয়া মনে হয়। * * *।” মনে করিয়াছিলাম যে এই অভাব দূর করিতে কোন মহারথী অগ্রসর হইবেন। কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া নিজেই অগ্রসর হইলাম। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে “যে কার্যে দেবতার প্রবেশ করিতে শঙ্কায়িত হন, বাতুলেরা সে কার্যে অনায়াসে প্রবেশ করে।”

ছাত্রগণ কার্যস্থলে গিয়া নানা বিষয়ের পদ্ধতির জন্য পত্র লিখিয়া থাকেন। এই সকল পত্রের উত্তরে এক একটা প্রবন্ধ লিখিতে হয়। শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেক (অবশ্য যাহারা পরিচিত) নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—তথাধো relief-map প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়ক প্রশ্নই অধিক। সময় সময় ভিন্ন প্রদেশ হইতেও পত্র পাইয়া থাকি :—No 787, From K. B. Williamson Esqr. M. A., Inspector of Schools, Jubblepur Division, To Mr. Aghornath Adhikari, Superintendent, Training School, Silchar, Dated Jubblepur, the 25th February 1907, Sir, I shall be much obliged if you will be good enough to write a short account (of about one page foolscap or as long as may be necessary) of your methods of preparing relief maps and globes (giving practical details and some idea of cost) which you kindly described to us at the Educational Conference at Jubblepur. I have &c.”—এই প্রস্তাবের দ্বারা আমার ছাত্রগণের উপকার হইবে বিশ্বাসে ইহার প্রচার। বঙ্গবান্ধবের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে কৃতার্থ হইব।

এই আমার কথা। এখন এই পুস্তক সাধারণের প্রীতিকর না হইলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইব না। কারণ আমি সাধারণের সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার রচনা করি নাই। সাধারণের সন্তুষ্টি করা আমার সাধ্যাতীত ও আশাতীত।

গ্রন্থপ্রচারে অধিকার—তবে কেহ অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন। প্রচারও নগ্নীর আছে। সর্বপ্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত “ধর্মনীতি” গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শিক্ষাদান বিষয়ে এই প্রথম লেখা। তারপর ভূদেব চন্দ্র মূধোপাধ্যায় “শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব” নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই প্রথম পুস্তক। তৎপর গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় “শিক্ষা প্রণালী” নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থ বহুকাল পর্যন্ত নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাদরে পাঠ করি

ইহার পর দীননাথ মেন "শিক্ষানান আশালী" নামে একখান পুস্তক প্রকাশ করেন। এ সকল ছাড়া আর যে ছু চারি খানি শিক্ষা বিদায়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যদুনাথ রায় লিখিত "শিক্ষা বিচার" গ্রন্থে (H. Spencer's Education নামক গ্রন্থ অবলম্বনে) সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, গোপালচন্দ্র ও দীননাথ এককালে নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমিও নর্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বেঙু চতুষ্পদ) স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ্ধতি বিময়ক গ্রন্থ প্রচারে আদারও অধিকার আছে। আর বিশেষ কথা এই যে যীহারী শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যে বাধিত আছেন, তাহারী ভিন্ন এ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিবেনই বা কে? তবে যোগাত্মক কথা—তা কি করিব?—যখন যোগাত্মক কেহই মনোযোগ করিলেন না, তখন নিজকেই অগম্য হইতে হইল। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি এ শ্রেণীর পুস্তকের বড়ই অভাব।

গ্রন্থের ভাষা—অনেকগুলি নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সে গুলি যে সমস্তই ভাষ্য হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র ও পণ্ডিত রামেন্দ্র চন্দ্র নৈজামিক পরিভাষা প্রণয়নের মে ব্যবহৃত করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইলে, এই পুস্তকের নৈজামিক শব্দাদির পরিবর্তন করা যাইবে। তবে আমি কি আশালী মনসখন করিয়াছি, তাহা বলা আবশ্যক। একটা দৃষ্টান্ত দিগেই চলিবে। 'তাপমান' কথা ব্যবহার করিয়াছি—'উষ্ণতামান' কথা ব্যবহার করি নাই। তবে অনেক স্থলেই 'থারমোমিটার' কথা লিখিয়াছি। বাড়ীর মেয়েরাও বলিয়া থাকেন "থারমোমিটার আন, ঘর কম ভিগি দেবি"। কাহাকেও "তাপমান (না উষ্ণতামান) আন, ঘর কত তাপাংশ দেবিন"—বলিতে শুনি না। ইংরাজ প্রস্তুত জবাগুলির ইংরাজী নাম রাখাই যুক্তি মঙ্গত—নবাবাটক শব্দের দাঙ্গালা প্রতিশব্দ চলিবেন। গেলগয়ে, টিমার, টেলিগ্রাফ, ফুল, বেগ, বোর্ড অভ্যুত্তি কথার দাঙ্গালা প্রতিশব্দ চলিল না। তারপর action song এর প্রতিশব্দে 'ভঙ্গী মঙ্গত' লিখিয়াছি, কারণ এখানে action অর্থ gesture। Notes of Lessons এর স্থানে 'পাঠবার মোট' লিখিয়াছি কারণ এখানে Lessons মানে 'পাঠ' নয় ও Note মানে 'টীকা' নয়। তবে Note কথার একটা প্রতিশব্দ করা যাইতে পারিত। কিন্তু চলিবেনা ভয়ে করি নাই। Object Lessons এর প্রতিশব্দ 'পদার্থ পরিচয়' করিয়াছি। রায় রাম রায় গাছান বাহাদুরও এই কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। দাঙ্গালায় অনেক রঙের নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন্ নামের দ্বারা কোন্ রঙ বুঝায় তাহার পরিচয় করাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই জন্য একটা রঙ পরিচায়ক চিত্রের (১৮০পৃঃ) রচনা করিয়াছি ইত্যাদি।

এই নোটগুলি ভাষণের জন্য লিখিত বলিয়া ইহাতে অনেক স্থলেই 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর এক কথা—শিক্ষকতা কার্যে অথবা যে সকল ক্রম থাকুক না কেন, একটা বিশেষ দোষ এই যে, ভাষাগত ভাষণকে উপদেশ দিতে দিতে আর ভাষাগত তাহা-নিগের ভুল দ্বিগুণে বৃদ্ধি, অস্বাভাবিকভাবে নিজকে কেমস দেন একটা দার্শনিকতার ভাবে অধিকার করিয়া বসে। যদি কেহ ভাষায় কি ভাবে সেরূপ কোন দোষ পান, 'তবে ব্যবস্থায়ের দোষ' বিনোদনায় প্রমাণ করিবেন। একে শিক্ষক জাতি মানেইত "মনজায়া", আমি আবার তাহার উপরও এক ডিগ্রি চলিয়া গিয়াছি—কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়াছি। ভগ্নী মঞ্জীতের দৃষ্টান্ত দিতে হইল—কি করিব ? তবে দৃষ্টান্ত কবিতার, কবিত্বের নয়।

মধ্যে মধ্যে সামান্য ছই একটা ভুলজাতি রহিয়া গিয়াছে—কোথাও বিয়মগত, কোথাও ভাষাগত, কোথাও মুদ্রাক্ষরগত। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আর যেরূপ আগ্রহমহকারে পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকের চোখে ভুলজাতি পড়িতে পারে এ গ্রন্থের অদৃষ্টে সেদিক পাঠক জুটবেনা—সুতরাং ভুল চোখে পড়িলে বলিয়া তেমন আশঙ্কা নাই।

গ্রন্থের ছাপা ও ছবি—এত দূরে বসিয়া কেমন পত্রের সাহায্যে কলিকাতায় বই ছাপান ও ছবি কাটান যে কি পরিমাণ কষ্টকর ব্যাপার তাহা, মাহারা একবার এই অপরাধ করিয়াছেন তাহারা ভিন্ন অথবা কেহ বৃদ্ধিতে পারিবেন না। কাজেই ছাপা ও ছবি মনোমত হয় নাই। তবে ছুটী চিত্রের মধ্যে কিছু বলিবার আছে। পাঠশালা গৃহের চিত্রখানি (২৮ পৃঃ) perspective হিসাবে কিছু ভুল হইয়াছে। ইহার design করিয়াছিলেন একজন শিক্ষক—বয়স ৪৫ বৎসর—১৮দিন মাত্র Model drawing অভ্যাস করিবার পর। আর "বালকগণের হাত বাড়ান" চিত্রখানিও (৬৭ পৃষ্ঠা) তেমন সুন্দর হয় নাই। ইহার design কর্তা অপর একজন ছাত্রশিক্ষক, বয়স ৪২বৎসর, চিত্রাঙ্কন শিক্ষার এই প্রথম আরম্ভ ; কেবল ৩ মাসের চেষ্টায় এই পর্য্যন্ত হইয়াছে। শিক্ষকতা কার্যে চিত্রাঙ্কন নিয়মের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এই দুইটী চিত্রের বৃদ্ধিতে পড়িয়া বোধ হয় আর কোন শিক্ষকই চিত্রাঙ্কন শিক্ষা অসাম্য বলিয়া মনে করিবেন না।

* কৃতজ্ঞতা—অনেক স্থলে ইংরাজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ছটার খানি বাঙ্গালী পুস্তকেরও সাহায্য লইয়াছি। এই নোটগুলি কোন দিন মুদ্রিত হইবে বলিয়া মনে করি নাই। সেই জন্য কোন স্থলে কোন্ পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহা লিখিয়া রাখি নাই। এখন ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

এই পুস্তক প্রকাশে আমার প্রিয় ছাত্রগণই বিশেষ উদ্যোগী। তাহারাষ্ট সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছে, তাহারাষ্ট সমস্ত নকল করিয়াছে আর তাহারাষ্ট সমস্ত ব্যয় দেনিয়াছে।

তারপর আমার মেহভাজন ছাত্র ও আশীষ, কলিকাতা মান্যাল কোম্পানীর অত্যন্ত অধ্যক্ষ শ্রীমান বিজয়কুমার মৈত্র এই পুস্তকের মুদ্রাক্ষর ভার গ্রহণ না করিলে ইহা চিরদিন বস্তাবন্দী হইয়াই থাকিত ইতি।

শিলচর নন্দীয়া স্কুল

২১ অক্টোবর ১৯৩৯

নিবেদক

শ্রী অঘোরনাথ অধিকারী।

অনুদ্বি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অনুদ্বি	শুদ্ধ
২	...	২১	...
২	...	৬	...
১৪	...	৯	...
১৪	...	২১	...
২৩	...	৪	...
২২	...	২৪	...
১১৯	...	২৪	...
১২০	...	১	...
১৪৭	...	২০	...
১৪৬	...	৮	...
১৬৮	...	২	...
২১৩	...	১৯	...
৩২৬	...	১০	...
৩৪৯	...	২১	...

এইরূপ আরও ২১৪টি ভুল থাকা সম্ভব।



প্রথম ভাগ ।—সাধারণ বিধান ।

উপক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উদ্বোধন ...	১	শিক্ষকের ধর্ম—নৈতিক... ..	৮
শিক্ষকতা কার্যে লাভালাভ ...	৩	" শারীরিক	৯
শিক্ষকের দায়িত্ব	৪	হিন্দু-খ্রীষ্টোক্ত-শূদ্রা লক্ষণ ...	১০
শিক্ষাদান বিষয়ক পুস্তক পাঠের		ব্যবস্থা	১১
আবশ্যিকতা	৬	শাসন	১২
শিক্ষকের ধর্ম—মানসিক ...	৭	শিক্ষা	১২

প্রথম অধ্যায় ।—স্বব্যবস্থা বিষয়ক ।

গৃহসং আদান	১৩	খাতাপত্র	২৭
আসবাব ও সরঞ্জাম ...	১৮	শ্রেণী বিভাগ	৩২
সিউজিয়াম	২৪	সময় নির্দেশক পত্র বা	
পুস্তকালয় বা লাইব্রারী ...	২৫	রুটীম	৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ।—সুশাসনবিষয়ক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সময়নিষ্ঠা	৪৪	শাস্তি বিধান বিষয়ে আদালতের নীতি	৬১
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা	৪৬	গোপন্য ও বিশ্বাস	৬৬
নকল করা	৪৭	আজ্ঞা ও অমনোযোগিতা ...	৬৯
সাধারণ ছুটী	৫০	কর্মচারী শাসন	৭৩
মানসিক ও দৈহিক অপূর্ণতা ...	৫০	মৃত্যুব্যবহার	৭৪
শাস্তির ব্যবস্থা	৫৪	পুরস্কার	৭৫

তৃতীয় অধ্যায় ।—সুশিক্ষাবিষয়ক ।

সুশিক্ষা কাকে বলে	৭৯	মনোবৃত্তি বিকাশে শিক্ষা	১১৬
শারীরিকবৃত্তির অকুশীলন ...	৮৬	শিশু শিক্ষার আভাবিক অংশ	১১৮
মানসিকবৃত্তির	৯১	মৌলিক শিক্ষাদানের দ্বারা ...	১১৮
ইন্দ্রিয়বোধ ও বস্তুজ্ঞান	৯৪	ভাষার শিক্ষণ	১২০
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধন	৯৬	ভাষার উদ্দেশ্য	১২২
মনোযোগ বা অকেন্দ্রবিশেষ ...	৯৭	উত্তরের শিক্ষণ	১২৭
স্মৃতি	১০০	ভুলনের দ্বারা	১৩০
কল্পনা	১০৭	জ্ঞানোপার্জনের জন্ম	১৩১
চিন্তা ও বিচার	১০৮	শিক্ষাদানের উপকরণাদির ব্যবহার ...	১৩৬
অসুস্থ বৃত্তি	১০৯	গৃহ-পাঠাভ্যাস	১৪০
ইচ্ছাশক্তি	১১২	উপসংহারে একটি গোপনীয় কথা	১৪৪



ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ—ବିଶେଷ ବିଧାନ

ପ୍ରଥମ ଅକରଣ ।—ଶରୀର ପାଳନ ବିଷୟକ ।

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
୧ । ବ୍ୟାୟାମ ।		ବ୍ୟାୟାମର ଫଳାଫଳ ...	୧୫୫
ଉପକାରିତା ...	୧୫୫	ବ୍ୟାୟାମର ଗୁଣ ...	୧୫୬
ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ...	୧୫୬	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ...	୧୫୮
ବ୍ୟାୟାମର ବୟସ ...	୧୫୮	୨ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ।	
„ ସମୟ ...	୧୫୯	ବିଦ୍ୟାଳୟେ ...	୧୫୯
ଅନ୍ୟ ସଂକଳନ ...	୧୬୧	ଛାତ୍ରାବାସେ ବା ହୋଷ୍ଟେଲେ ...	୧୬୦
ବ୍ୟାୟାମର ବିଭାଗ ...	୧୬୨	ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗେ ...	୧୬୧
ନିଶ୍ଵାସ ଓ ଶ୍ଵାସ ...	୧୬୪	ଆକସ୍ମିକ ବିପଦେ ...	୧୬୨

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅକରଣ ।—ଶିକ୍ଷାଶିକ୍ଷକ ବିଷୟକ ।

୧ । କିନ୍ତାର ଗାର୍ଟେନ ।		୨ୟ ଖେଳନା ...	୧୮୨
ନାମର ଅର୍ଥ ...	୧୬୫	୩ୟ ଖେଳନା ...	୧୮୫
‘ଖେଳାଳୀ’ ...	୧୬୬	ଗଣନା ଶିକ୍ଷା ...	୧୮୭
ଆପଣ ...	୧୬୭	୪ର୍ଥ ଖେଳନା ...	୧୮୯
କିନ୍ତାରଗାର୍ଟେନ ଓ ଖେଳାଳୀ କି ? ...	୧୬୮	୫ମ ହୁଏତେ ୮ମ ଖେଳନା ...	୧୯୦
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ...	୧୬୮	କାଳୀ ଗାୟନ ...	୧୯୧
ଆପଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ଵାଦଶ ବିଧାନ ...	୧୬୯	ଗଠନ ଶିକ୍ଷା ...	୧୯୩
ଜୀବନର ବ୍ୟବହାରର ଅନ୍ୟ ...	୧୭୧	ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ...	୧୯୫
ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପର୍କ ...	୧୭୫	ବୀଜ ଗାୟନ ...	୧୯୬
୧ମ ଖେଳନା ...	୧୭୫	୯ମ ଖେଳନା ...	୧୯୯
ନୂତନ ବିଧାନ ...	୧୭୬	୧୦ମ ଖେଳନା ...	୨୦୧
		୧୧ମ ହୁଏତେ ୧୫ମ ଖେଳନା ...	୨୦୫

কি
বুঝি
তুমি
পুস্ত
যাহ
বার্জ
পাত
উপ
লেখ
Me
Ma
Sci
han
ও জ
অপা
আম
Joy
Kin

"*

করি
জানি
পারি
শিক্ষা
প্রতি
প্রণা

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫শ খেলনা	২০৬
১৬শ হইতে ১৮শ খেলনা	২০৭
১৯শ খেলনা	২০৮
২০শ খেলনা	২০৯
ভঙ্গী-সঙ্গীত	২১০
ভঙ্গী-সঙ্গীতের আদর্শ	২১২
উপকথা	২১৭
অঙ্কন ও রঞ্জন	২২০
কাগজ কাটা	২২৩

২। বর্ণ পরিচয়।

বর্ণের ধারা	২২৫
ধ্বনিত	২২৬
শব্দের	২২৬
উচ্চারণ	২২৭
সংযুক্ত বর্ণ	২৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩। ধারাপাত।	
রোমান অঙ্ক	২১১
শতকিয়া শিক্ষা	২১২
স্ফুটগতা প্রভৃতি	২১৩
মৌখিক যোগ বিয়োগ	২১৪
৪। হস্তাক্ষর।	
শিক্ষাদানের নিয়ম	২১৫
অক্ষরের অংশ	২১৬
অঙ্ক লিখন	২১৭
৫। শ্রাব্যলিপি।	
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য	২১৮
শিক্ষাদানের নিয়ম	২১৯

তৃতীয় প্রকরণ।—ভাষাবিষয়ক।

১। সাহিত্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য	২৪৫
শিক্ষায় লক্ষ্য	২৪৬
পাঠ	২৪৭
শব্দার্থ	২৪৮
ব্যাখ্যা	২৪৯
সাহিত্যে ব্যাকরণ	২৫০
পাঠ্যের আদর্শ	২৫১

২। ব্যাকরণ।

আবশ্যিকতা	২৫২
শিক্ষাদানের কথা	২৫৩
বিশেষ্য ও ক্রিয়া	২৫৪
কর্মপদ	২৫৫
বিভাগ	২৫৬
সর্বনাম	২৫৭
কাল	২৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কারক	২৭৪	প্রাথমিক রচনা	২৮৭
স্বর ও বাজান	২৭৭	প্রাথমিক রচনার নিয়ম	২৮৮
মাকি	২৭৮	পত্ররচনা	২৯২
সমাস	২৮০	মলিমা রচনা	২৯৩
ভুল অলঙ্কার	২৮২	শিক্ষণীয় মলিমা	২৯৪
৩। রচনা।		মলিমা রচনা শিক্ষণীয়দের দ্বারা	২৯৪
বাক্যরচনা	২৮৩	কথোপকথন	২৯৬
গল্প রচনা	২৮৪		

চতুর্থ প্রকরণ।—গণিত বিষয়ক।

১। পাঠ্যগণিত।

শিক্ষার উপকারিতা	২৯৮	ঐকিক নিয়ম	৩২৭
শিক্ষাদানের কয়েকটি কথা	২৯৯	অমুপাত ও সমামুপাত	৩২৮
সংখ্যা লিখন ও পঠন	৩০১	তৈরানিক	৩২৯
প্রাথমিক সাহায্যের প্রণালী	৩০২	সুপকথা	৩৩১
কার্যের সাহায্যে যোগ বিয়োগ	৩০৫	ডিম্কাউট	৩৩২
বলকোষ	৩০৭	কোম্পানীর কাগজ	৩৩৩
যোগ বিয়োগের সাধারণ ধারা	৩০৮	বিবিধ প্রশ্ন	৩৩৬
উৎপন্ন	৩১০	২। জ্যামিতি।	
ভাগ	৩১১	শিক্ষায় লাভ	৩৩৭
মিশ্রনিসূচ	৩১৩	ব্যবহারিক জ্ঞান	৩৩৮
জ্ঞান পরচ	৩১৬	ব্যবহারিক জ্যামিতি	৩৩৯
ল. সা. ও, গ. সা. ও	৩১৭	৩। পরিমিতি।	
ভাগাংশ	৩১৮	শিক্ষার আবশ্যিকতা	৩৪৪
দশমিক ভাগাংশ	৩২৩	শিক্ষাদানের আদর্শ	৩৪৪
মাত্ৰিক	৩২৫	শিক্ষাদানের ধারা	৩৪৪

পঞ্চম প্রকরণ ।—ভূগোলোত্তিহাস বিষয়ক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূগোল ।		২। ইতিহাস ।	
শিক্ষার আবশ্যিকতা ...	৩৪৮	শিক্ষার উদ্দেশ্য ...	৩৮৩
শিক্ষার কথা ...	৩৪৯	নিয়ন্ত্রণীতে ইতিহাস ...	৩৮৪
শিক্ষাদানের ধারা ...	৩৫০	উচ্চ শ্রেণীতে ইতিহাস ...	৩৮৬
দিক্ শিক্ষা ...	৩৫৫	ইতিহাস শিক্ষাইবার নিয়ম ...	৩৮৭
নজা বা ধান ...	৩৫৭	সম তারিখ শিক্ষা ...	৩৮৯
শ্রেলার সাহায্য নয়া ...	৩৫৯	ইতিহাস পাঠনার আদর্শ ...	৩৯১
বন্ধুত্ব-মানচিত্র ...	৩৬১		
সূত্র শিক্ষা ...	৩৬১		
শিক্ষার ধারা ...	৩৬২		
পৃথিবীর আকার ও গোলক ...	৩৬৪		
অক্ষরেখা, জাদিমা ...	৩৬৫		

ষষ্ঠ প্রকরণ ।—বিজ্ঞান বিষয়ক ।

১। পদার্থ পরিচয় ।		২। বিজ্ঞান ।	
শিক্ষার উদ্দেশ্য ...	৩৯৫	শিক্ষার আবশ্যিকতা ...	৪০০
শিক্ষার বিষয় ...	৩৯৬	বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ...	৪০০
শিক্ষার দৃষ্টান্ত ...	৩৯৬	পরীক্ষণ বিষয়ে সাধারণ উপদেশ ...	৪০১
শিক্ষার ধারা ...	৩৯৮		

সপ্তম প্রকরণ ।—শিক্ষা বিষয়ক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। চিত্রাঙ্কন ।		৩। সংগীত ।	
আবশ্যকতা	৪৩৩	আবশ্যকতা	৪২০
বিভাগ	৪৩৪	শিক্ষার ধারা	৪২১
শিক্ষার আরম্ভ	৪৩৪	স্বর সাধনা	৪২৩
কাগজ পেন্সিল	৪৩৪	স্বরের কথা	৪২৪
চিত্রাঙ্কন	৪৩৫	৪। সূচী শিক্ষা ।	
জবামূল্য	৪৩৭	আবশ্যকতা	৪২৫
সম্পদ বা কিউব অঙ্কন	৪৩৯	অসম্ভাব	৪২৬
রেখা চিত্র	৪৩৮	শিক্ষার ধারা	৪২৬
ব্ল্যাক বোর্ড চিত্রাঙ্কন	৪৩৬	আবশ্যকীয় সেলাই	৪২৭
২। হস্তশিল্প গঠন ।		৫। উদ্যান রচনা ।	
আবশ্যকতা	৪৩৭	আবশ্যকতা	৪২৮
মাটি-প্রস্তুত	৪৩৭	শিক্ষাদানের প্রণালী	৪২৮
আরম্ভ	৪৩৭		
ফল গঠন	৪৩৮		

অষ্টম প্রকরণ ।—ধর্মনীতি বিষয়ক ।

১। নীতি ।		২। ধর্ম ।	
কে দায়ী ?	৪৩১	আবশ্যকতা	৪৩৭
শিক্ষার উপায়	৪৩২	শিক্ষার প্রণালী	৪৩৭

নবম প্রকরণ ।—নানা বিষয়ক ।

১। পাঠনার নোট ।

পাঠনার নোট কাহাকে বলে	...	৪৪৭
নোট লিখিবার নিয়ম	...	৪৪১
গদ্য সাহিত্য	...	৪৪২
পদ্য সাহিত্য	...	৪৪৮
পদার্থ পরিচয়	...	৪৪৩
পাঠীগণিত (নিম্ন)	...	৪৪৫
পাঠীগণিত (উচ্চ)	...	৪৪৮
ইতিহাস	...	৪৪৯
ভূগোল	...	৪৫০
বিজ্ঞান	...	৪৫৪
কথোপকথন (বিস্তৃত)...	...	৪৫৬
কথোপকথন (সংক্ষিপ্ত)...	...	৪৫৯

২। পাঠনা-সমালোচনা ।

শিক্ষক বিষয়ক	...	...	৪৭২
শ্রেণী-বিষয়ক	...	...	৪৭৩
অধ্যাপনা বিষয়ক	...	...	৪৭৬
প্রশ্ন-বিষয়ক	...	...	৪৭৮
বিষয়গত ভুল	...	...	৪৮০
উপসংহার	...	...	৪৮০

৩। পরীক্ষা ।

আবশ্যকতা	...	...	৪৮১
প্রকার	...	...	৪৮১
পরীক্ষার ভাব	...	...	৪৮২
প্রয়োজন	...	...	৪৮৩
কাগজ পরীক্ষা	...	...	৪৮৪
প্রয়োজনের মূল্য	...	...	৪৮৪
পরীক্ষার আধিক্য	...	...	৪৮৫

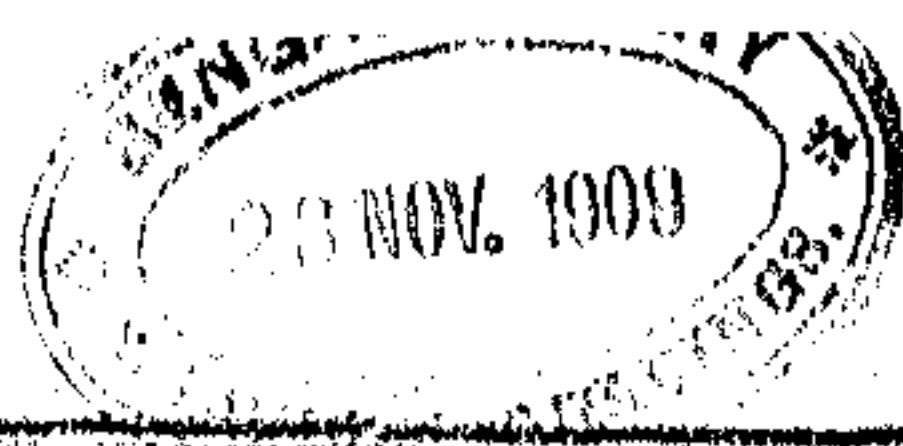
উপসংহার ।

অ.জ.শিক্ষার আবশ্যকতা—অ.জ.শিক্ষার উপায়—অ.জ.শিক্ষার মূলমন্ত্র ।

পরিশিষ্ট ।

পাঠনা—বাণীনা—সাক্ষ্যোক্ত্য—রঙ—পুটীনা—বকুর-সানচিত্র—গোলক—আত্ম-
আদর্শ—ইতিহাসের সময় বিবরণী মেলা—শিক্ষক-পদপ্রার্থীর পাঠ ।





বিদ্যালয়-বিধায়ক বিবিধ বিধান।

প্রথম ভাগ—সাধারণ বিধান।

"There is but one question in the world : How to make man better ?
And but one answer : Education."

উপক্রমণিকা।

"উত্তীর্ণত আগত আপ্য ব্রাহ্মণিবোধত।" কঠ।



উ

দ্বোধন।—এক ফকিরের একটি কুকুর ছিল।
এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে ; ঘটনা
সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না, তবে গল্পটি যে
বেশ জ্ঞানপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
কুকুরটি বড়ই রোগা। ফকির সেই কুকুরটিকে

সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদিন এক গ্রামের
মেয়েরা সেই শীর্ণকায় কুকুরটিকে লক্ষ্য করিয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা

করিল “ফকির সাহেব তোমার ঐ মরা কুকুরটী কি কাজে লাগে ?” ফকির গভীরস্বরে উত্তর করিলেন “কুস্তা আচ্ছাছাগ, শের মানগে-বি সেকতা ছায় ।” (‘শের’ মানে বাঘ) । তখন মেয়েরা ফকিরকে বলিল “ফকির সাহেব, একটা বাঘে আমাদের গাঁয়ের সব গরু, বাছুর মেরে ফেলেছে । তোমার কুকুরটীকে দিয়ে যদি বাঘটা মেরে দিতে পার, তবে তোমাকে খুব ধুসী করব ।” “আচ্ছা হোগা” বলেও ফকির বিদায় হইয়া গেলেন । কিন্তু দিনের মত দিন চলিয়া যায়, বাঘ মরা দূরে থাকুক, বাঘের উৎপাত দিন দিন বাড়িতেই লাগিল । এক দিন গ্রামের মেয়েরা খুব রাগ করিয়া ফকিরকে বলিল “যাও ফকির সাহেব, তোমার সব কথা মিথ্যা, তোমার ঐ কুড়ে কুকুর নড়তেই পারেনা, তাতে আবার বাঘ মারবে ।” ফকির তখন একটু কাষ্ঠ হাঁসি হাসিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, “মাই, কুস্তা মন করেও শের মারে, লেকিন্ মেরেবি মন না করে ।”

কথা ঠিক, মন করিলে অনেকেই বাঘ মারিতে পারে, কিন্তু কেহই যে তেমন মন করেনা ইহাইও দুঃখ । তাই বলি, একবার মন কর— মন করিলেই পারিবে, অসাম্য সাধন করিতে পারিবে । এই সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, পড়াইয়া অস্থান দেশের শিক্ষকগণ কেমন শতশত জীবন্ত কাম্ববীর ও প্রশান্ত ধর্মবীরের সৃষ্টি করিতেছেন ; আর আমরা সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া কি সৃষ্টি করিতেছি ? হয় কতকগুলি চেতনাশূন্য জড়ভরত, নাহয় কতকগুলি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য যত্মমার্ক । ইহার কারণ কি ? কারণ, আমরা কারো তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়াদিতে জানিনা, বা তেমন মন দিয়া কাজ করিনা । তাই বলি শিক্ষকগণ, আর অচেতনে থাকিওনা । দেশের একটু উন্নতির ভার তোমাদের হাতে ; দেশকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত করিতে হইবে, দেশকে ধর্মে ও চরিত্রে উন্নত করিতে হইবে ; একবার মন প্রাণ দিয়া

কার্যে প্রবৃত্ত হও । দেখ, সকল দেশেই বিদ্যাতে বুদ্ধিতে আগাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে লাগিল । একবার মন কর, মন করিলেই শিব গড়িতে পারিবে । এদেশের পবিত্র যুক্তিকা চিরদিনই শিব গড়িবার উপযোগী ।

শিক্ষকতা কার্যে লাভালাভ ।—সদি ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিওনা । যদি মানের প্রত্যাশা থাকে, তবেও এদিকে আসিও না । যদি যশের কামনা থাকে তাহা হইলেও শিক্ষকতা কার্যে গ্রহণ করিও না । সেকালের সেই নিকাম, নিম্পৃহ ভ্রাতাণ অধ্যাপকের মত যিনি “তিত্তিড়ি পত্রের অম্বলে” পরম ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ, তিনিই একাধার উপযোগী ।

যদি তুমি বহুপরিবার যুক্ত হও, আর যদি কেবল তোমার আয়ের উপর সংসারের সমস্ত ব্যয় ভার নির্ভর করে, তবে একাধার কখনই গ্রহণ করিবেনা । আর যদি শিক্ষকতা কার্যের প্রতি তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ না থাকে তবেও একাধার আসিও না । যে ব্যক্তির পরিবার প্রতিপালনের অল্পস্বল্প সংস্থান আছে, বা যে ব্যক্তি বহুপরিবারগ্রস্ত নহে, আর যে ব্যক্তির শিক্ষকতা কার্যে একটা আন্তরিক অনুরাগ আছে, কেবল তাহার পক্ষেই একাধার প্রশস্ত ।

ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন “যদি অর্থ প্রয়াসে, আসিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র এই কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান করুন । যে হেতু শিক্ষকের কর্মে যথাক্রমিক রূপেও ধনাগা পরিপূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই । যখন দেখিবেন যে, আপনাদিগের অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি, অল্পবিদ্যা, অল্পপরিজ্ঞানী এবং অল্পবয়স্ক লোকে, অশাস্ত রাজকায়ে বা ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাদিগের অপেক্ষা ধনশালী এবং সমসমাজে অধিক মাননীয় হইতেছেন, তখন আপনাদিগের নমোবেদনার পরিসীমা থাকিবেনা । তখন শীঘ্র ব্যবসায়ের প্রতি অগ্রাহ্য জন্মিবে ।” কোন সুসহৃৎ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি কহিয়াছেন “ইহলোকে সমুদায় উপকার করা এবং পরলোকে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া, শিক্ষকের প্রতি ইহাই বিধাতার নির্দেশ ।”

শিক্ষকতা কার্য অর্গ উপার্জনের প্রকৃষ্ট পথ নহে বটে, কিন্তু সর্ব
অর্গের শ্রেষ্ঠ পরমার্গরূপে ধনসাধনের যথেষ্ট গহায়ত্রী করে । বিদ্যালয়
প্রোগের রাজ্য, শিক্ষকতা প্রোগের কার্য । যদি ঈশ গম্ভীরেই বিমল
আনন্দ উপভোগ করিতে চাঁও, তবে এস এই নন্দন কাননে প্রবেশ
কর, নন্দন গণের কমনীয় কোমল কোরক সমূহ মৃণময় প্রগের
শোভা সন্দর্শন কর । ইহারা এই মাত্র স্বর্গরাজ্য হইতে নামিয়া
আসিয়াছে ; এখনও প্রগের সুবাসে ইহাদিগের অঙ্গ পরিহৃত । এত দেব-
নন্দনগণের সম্মুখ উপভোগ করিয়া জীবন পবিত্র কর । নিউয়ে প্রবেশ
কর, আবিলতায় এ কানন অপবিত্র হয়না, কলুষ কালিমায় এ কানন
কলঙ্কিত হয়না । চিরশাস্তি বিরাজিত এ প্রোগের রাজ্য শুদ্ধ শাস্তভাবে
রাজত্ব করিতে পারিলে, আর অল্প সাধনের আবশ্যক হয়না ।

অতএব যে বিভাগেই প্রবেশ করনা কেন, দেখিতে পাঠ্যবে, প্রলোভন
তোমার পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে । তুমি
দুর্বলচিত্ত মানুষ, অতি সহজেই ফাঁদে জড়িত হইয়া অশেষ ক্লেশে
পতিত হইবে । কিন্তু এখানে পাপ প্রলোভন নাই । উপরন্তু পূর্ণমাত্রায়
পুণ্য সঞ্চয়ের সুবিস্তীর্ণ পথ প্রশস্ত রহিয়াছে । যদি এত সমস্ত অপার্ণিব
পদার্থের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এ বিভাগে প্রবেশ কর,
তোমাকে সাধরে আবাহন করিতেছি । শিক্ষকতা কার্য অপেক্ষা সুখ-
শাস্তিময়, চিন্তা উদ্বেগ মুক্ত, চিরপবিত্র ব্যবসায় আর নাই । ধন, মান,
যশাদি উপার্জনে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা জ্ঞানাজ্ঞান জনিত
আনন্দের সহিত তুলনার অকিঞ্চিৎকর । শিক্ষকতা কার্যে এত চিরানন্দ-
দায়ক জ্ঞানোপার্জনের যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে ।

শিক্ষকতা কার্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, কি প্রকারে ছাত্রবর্গের সুশিক্ষা সম্পন্ন
করিবেন, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাদিগের শিক্ষা অধ্যয়ন
পাছে কোন কুসংস্কার সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া, আপনারা স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা

পাইবেন। যদি কোন জাতি শিক্ষাবশতঃ তাহাদিগের কদাপি কোন অমঙ্গল ঘটে এইজন্ত আপনার জন্ম সংশোধনের নিমিত্ত যত্ন করিবেন, শিশুগণের আগ্রহভাজন না হইলে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাসম্পন্ন করা যায় না, ইহা জানিয়া আপনাদিগের আমোদ আমোদও তাদৃশ বিস্তৃত করিবেন। এইরূপে স্বীয় কর্তব্যের প্রতি অগ্রগতি থাকিলেই, আপনাদিগের মন বিশদ, বুদ্ধি পরিপূর্ণ, বিদ্যা প্রসাদশূন্য এবং আমোদ অনিয়ন্ত্রিত হইবে। এই সকল গুণ উপস্থিত হইলে সুখেরই বা অভাব কি ? (ভূদেব বাবুর “শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব”)

শিক্ষকের দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ।—শিক্ষকতা অত্যন্ত দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য। সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধনপতি বণিক, সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারাজীব, ধনস্তুতি সদৃশ চিকিৎসক, স্থপতিবিদ্যা-পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার, স্থাননিষ্ঠ বিচারক প্রভৃতি যাবতীয় সম্প্রদায়ের লোক কেবল ইহকালের হিতসাধনে ব্যস্ত। আবার পরম ধান্মিক মজদাতা, আচারনিষ্ঠ পুরোহিত, উদারচিত্ত দান্যযাজক প্রভৃতি অন্তঃসম্প্রদায় কেবল পরকালের মঙ্গলের জন্যই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু জনসমাজ-উপেক্ষিত দীন, দরিদ্র, শিক্ষককে ইহকাল ও পরকাল, উভয়ের জন্যই সুব্যবস্থা করিতে হয়। শিল্প বিজ্ঞানাদির শিক্ষার দ্বারা যে মন সংসারযাত্রা নির্বাহের উপায় বিধান করিয়া দিতে হয়,— সেইরূপ নীতিশাস্ত্রাদির অনুশীলন দ্বারা আবার দিব্য চক্ষুও উন্মীলন করিয়া দিতে হয়।

যাঁহার প্রসাদে বলবীৰ্য্য বিহীন, কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা রহিত, অজ্ঞানান্ধ্রম মৃতপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীৰ্য্যবান জ্ঞানালোকসম্পন্ন দর্শনপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার প্রসাদে জগৎকালে সর্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও, মনুষ্য পরে আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য স্বকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি মানা শাস্ত্র চর্চা করিয়া পরম পবিত্র শ্রীতিপ্রমুখ্যায়করণে অক্ষুণ্ণ নিরতিশয় সুখমাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাত্ম

স্বকৌশলসম্পন্ন কাব্যকলায় পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার আচর্য শক্তি, অপারিসীম তাম, অনুপম কবিতা ও অগার সহস্রার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এককালে বিমোহিত হইতে থাকেন এবং যাহার প্রমাণে মনুষ্য মনোভুক্তকরণ সমর্থন পূরক একপট শব্দা ও ভক্তি সহকারে প্রশংসার আঁচনা করিয়া আয় অগার মার্গকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পবন পবিত্র জলও সুচন্দ্র শিখক অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, গুণাপার ও গেমাপন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ? অনেক সুবিদ্য মহাশয় ব্যক্তি একপ নিদেপ করিয়াছেন যে রাজাসমো শিখক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, দক্ষোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না। কারণ বয়োবৃদ্ধদিগকে দক্ষোপদেশ দান অপেক্ষা শিশুদিগকে সচুপদেশ দানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপমায়ক ।” (গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কৃত “শিক্ষাপ্রণালী”)

শিক্ষাদানবিষয়ক পুস্তক পাঠের আনন্দ্যকতা ।—শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ক গ্রন্থে সুশিক্ষকগণের বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের ভূয়োদর্শনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া নবীন চিকিৎসকগণ লাভবান হইয়া থাকেন, যেমন সুদক্ষ শিল্পীগণের শিল্প-কৌশলাদি সন্দর্শন করিয়া নবীন শিল্পী কার্য শিক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া নবীন শিক্ষকগণ শিক্ষা কার্যে দক্ষতালাভ করিয়া থাকেন।

শিক্ষকতা করিতে করিতে একটা অভিজ্ঞতা জন্মে বটে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বে কত লোকের যে মাথা খাইতে হয়, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। যদি প্রত্যেক চিকিৎসক, প্রত্যেক রোগীর উপর তাঁহার ঔষধানির পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বে কত ব্যক্তির যে অকালমৃত্যু সংঘটিত হইবে তাহা ভাবিলেও ভয় হয়। যদি প্রত্যেক শিল্পীকে কেবল নিজ কার্যের দ্বারাই শিল্পকৌশল শিক্ষা করিতে হইত, তবে স্বর্ণকার-পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে স্বর্ণের সর্বনাশ হইত, মরহুমদের পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে মাথা কাটা যাইত এবং দর্জির পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে কাপড় নষ্ট হইত তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। প্রত্যেক ব্যবসায়েরেই বিশেষ বিশেষ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নতুন লোকের পক্ষে এই সকল কৌশল শিক্ষা করা মিতান্ত্রই আবশ্যক। শিক্ষা বিষয়ক

পুস্তকে শিক্ষার নানাবিধ কৌশল বিবৃত হইয়া থাকে । ‘শিক্ষাশাস্ত্র’ আন্দোলনের প্রধান ফল এই যে, তদ্বিষয়ে স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালন হওয়াতে জনগণ আপন আপন উপযুক্ত পন্থা দেখিয়া লইতে পারেন ।

শিক্ষকের ধর্ম ।—মহুয্যের ধর্ম কি ? যাহা থাকিলে মাছুষ মাছুষ—যাহা না থাকিলে মাছুষ মাছুষ নয়, তাহাই মাছুষের ধর্ম । তাহার নাম কি ? ‘মহুয্যত্ব’ । (বক্ষিম)

শিক্ষকের ধর্ম কি ? যাহা থাকিলে শিক্ষক শিক্ষক—না থাকিলে শিক্ষক শিক্ষক নয়—তাহাই শিক্ষকের ধর্ম । তাহার নাম কি ? শিক্ষকত্ব । কি কি গুণের অমুশীলনে এই শিক্ষকত্ব লাভ করা যায় ?

(১) মানসিক গুণ—শিক্ষকের বিশেষ পাতিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় । অস্তুতঃ পক্ষে বিদ্যালয়ের অদীত বিষয় সমুদায়ে তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক । শিক্ষকতা কার্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে চিরজীবন নব নব জ্ঞান সঞ্চয়ের নিমিত্ত অধ্যয়নে রত থাকিতে হইবে । অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে সদ্ভাব রাখিতে যত্ন করিতে হইবে । ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা-লাভ হইবে ও নিজের বিদ্যাঅনিত দাঙ্কিত্যের ভাবগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে । নিজের বা অন্নের মনোগত ভাব বাক্যের দ্বারা অপরের মনের মধ্যে রোপণ করাই শিক্ষকের কার্য্য । সুতরাং তাঁহার বিষয় বর্ণনা-শক্তির সম্যকরূপ অমুশীলন হওয়া আবশ্যিক । উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারাই এই শক্তি বৃদ্ধি পায় । শিক্ষাদানের জন্ত তাঁহাকে বিশেষ রূপ প্রস্তুত হইতে হইবে । বালকগণকে যাহা বলিবেন বা শিক্ষা দিবেন তাহা যেন বিশুদ্ধ ও তাহাদের পক্ষে হিতকারী হয় । উদ্ভাবনী শক্তি (অর্থাৎ জটিল বিষয়াদি বালকগণকে সরল করিয়া বুঝাইবার জন্ত নব নব পন্থা নির্ধারণ), প্রতিভা (অর্থাৎ নব নব উদ্দেশ্য-কারিণী বুদ্ধি), কল্পনা-শক্তি (অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয়াদির বর্ণনা পাঠ করিয়া তাহাদের অবস্থার উপলব্ধি)

প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিশেষরূপ অঙ্গুশীলন আবশ্যক । শ্রুতি-শক্তির বৃদ্ধি করা কৰ্ত্তব্য, কারণ শিক্ষককে অনেক বিষয় মনে রাখিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইবে । কেবল অবিরাম আলোচনার উপরই এই সকল বৃত্তির উন্নয়ন নির্ভর করে ।

২। নৈতিক গুণ—শিক্ষকের চরিত্র পবিত্র হওয়া আবশ্যক । শিক্ষকের কার্যাদি সাধারণে যতদূর পর্যালোচনা করিয়া থাকে বোধ হয় অল্প কাহারও কার্য ততদূর করে না । সুতরাং শিক্ষকের চরিত্র এমন নির্মল হওয়া আবশ্যক যে, কেহ যেন কোনরূপ সন্দেহও না করিতে পারে । সত্যনিষ্ঠা একটা প্রধান গুণ । শিষ্য যদি বুঝিতে পারে যে শিক্ষকের কথার প্রকৃত্য খুবই কম, তবে যে সেই শিক্ষকের প্রতি তাহার কেবল শ্রদ্ধা করিয়া যাইবে তাহাই নহে, সেও অধিকতর শিষ্য কথা বলিতে অভ্যাগ করিবে । যে ধর্ম্মে হউক শিক্ষকের আস্থাবান হওয়া উচিত । ছাত্র, এ বিষয় প্রথমে গুরুর অনুরোধেই শিক্ষা করিবে । স্থায়-পরায়ণতার দিকে যেন শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকে । তাহার দ্বারা যেন কখনও কাহার অনিষ্ট সাধিত না হয় । সাধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অসাধুত্বের প্রতি ঘৃণা স্থায়পরায়ণতার লক্ষণ । শিক্ষককে সমদর্শী হইতে হইবে । সমস্ত শিষ্যবৃন্দকে তিনি সমান চক্ষে দেখিবেন । ধনী নিধন বিচার করিয়া তিনি স্নেহ মমতা বিতরণ করিবেন না । রাজপুত্র ও ভিক্ষুকসন্তান তাঁহার নিকট সমান আদরের পাত্র । তাঁহাকে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে । চন্দ্রলগতি বালকেরা কত উৎপাত করিবে, কত অপরাধ করিবে কিন্তু তিনি শাস্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া ও উদারচিত্তে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে যত্ন করিবেন । আত্মশাসন একটা মহাগুণ । জেঁধা-দিকে শাসনে রাখিতে হইবে । শিক্ষককে অগম্য হইতে হইবে । অগম্য শিক্ষকের ছাত্রেরাই পরিশ্রমী হইয়া থাকে, আর অগম্য শিক্ষ-

কের ছাত্রগণ আশ্রয়পরাগণ হয়। শিক্ষকের অন্তর সদা সন্তোষপূর্ণ ও বদন প্রফুল্ল না হইলে ছাত্র আকৃষ্ট হইবে না। জুকুটিতে সাময়িক ভয় উৎপাদন করে, প্রফুল্ল বদনে চির-স্নেহের সম্বন্ধ সংস্থাপন করে। বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি অগণ্যঋষিবৃন্দ স্নেহে যত দেশ অধিকার করিয়াছেন, হানিব, আলেকজেন্ডার, নেপোলিয়ান অস্ত্রের দ্বারা তাহার সহস্রাংশের এক অংশও জয় করিতে পারেন নাই। সে স্নেহলব্ধ রাজ্য এখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত, কিন্তু সে অঙ্গলব্ধ রাজ্য কোন দিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। শারীরিক গুণ—সুস্থ ও সবল ব্যক্তিই শিক্ষক পদের উপযুক্ত পাত্র। রুগ্ন ব্যক্তির মনও রুগ্ন হইয়া পড়ে; দৈর্ঘ্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি গুণ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি বিস্ত্রী হইলেও সুস্ত্রী, কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি সুস্ত্রী হইলেও বিস্ত্রী। উত্তম শ্রী চিন্তাকর্ষক মনেহ নাই। বালকের হৃদয় সৌন্দর্য্যে অতি সহজেই বিমোহিত হয়। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি শিক্ষকতাকার্য্যের উপযোগী নহে। অন্ততঃ পক্ষ, পঞ্চ, জ্ঞানে-জ্রিয়ের কোনটাব বিকলত্ব না থাকিলেও শিক্ষকতা কার্য্য চলিতে পারে। গলার গ্লর সুস্পষ্ট, সুললিত ও সুশ্রাব্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে, গ্লর প্রায়ই সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। শ্রবের সুশ্রাব্যতা উত্তম উচ্চারণের উপর নির্ভর করে; আবার উচ্চারণের উন্নতি কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যিনি সর্বদা সুস্পষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ (বাক্য কথনের) ভাষায় কথা বার্তা বলিতে অভ্যাস করেন, যিনি সুবক্তাদিগের উচ্চারণ অনুকরণ করেন, তিনি সহজেই এই গুণ লাভ করিয়া থাকেন। পরিচ্ছদাদির প্রতিও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পরিচ্ছদ সুরাচি-সম্পন্ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। জীকজমকযুক্ত পরিচ্ছদ বা অতি হীন পরিচ্ছদ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এই সমস্ত সাধারণ গুণ না থাকিলে শিক্ষকতা কার্য্য কৃতকার্য্যতা লাভ করা কঠিন।

হিন্দুশাস্ত্রোক্তা শুদ্ধাচারঃ । —হিন্দুশাস্ত্রোক্তা শুদ্ধাচারঃ লক্ষণং সমুচ্চৈরুপেক্ষ্য
আছে ।

মঙ্গলমুক্তাবলীম্—“অবদাতাশয়ঃ শুদ্ধঃ স্খোচিতা চারতৎপরঃ । আশমী কোষমহিতো
বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ । শাক্তাবাননসুহৃৎ জায়নাক্ জায়মর্শনঃ । জাতিঃ সুবেশস্তরণঃ সঙ্গ-
ভুতহিতৈ রতঃ । শীমানসুজ্ঞতমতিঃ পূর্ণোহস্থানবসম্ভবঃ ।

সমুপোচর্চায় কৃতঘ্নীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ, নিগ্ৰহানুগ্ৰহে শক্তো হোমসম্পন্নায়তনঃ ।
উহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাচার্যঃ কৃপালয়ঃ, ইত্যাদি লক্ষণমুজ্জ্বলং শুভং চানুগোষমাশ্রয়িঃ ॥”

মঙ্গলমুক্তাবলীগণে এইরূপ লিখিত আছে :—“যিনি মঙ্গলজাত, যিনি পবিত্র
স্বভাবসম্পন্ন, যিনি নিজের দক্ষীণদায়ী ভাটের পালনে তৎপর, যিনি বৃহৎসামী
অর্থীৎ যিনি উদাসীন নহেন, যিনি অস্ফোদী, যিনি যশস্বত্ব এবং সাক্ষিত্য, ন্যায়, দর্শন,
জ্যোতিষাদি সকল গ্রন্থেতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, যিনি অজ্ঞানান্, যোগরহিত, শিষ্যভাগী, পিষ্মদর্শন,
শুদ্ধচিত্ত, পবিত্রবেশধারী, তরুণবয়স্ক, সঙ্গপ্রাণিহিতৈ রত, সুশী, অসুজ্ঞতমভাব, সঙ্গকার্যো
তৎপর, অহিংসক, তদ্বিচারক্ষম, শুশ্রূষাশী, ভগবদচ্যুতাতৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্ৰহ ও
অসুগ্রহকার্যো সক্ষম, হোমপ্রপাদি কার্যো নিয়তচিত্ত, তদ্বিহীন-পারদর্শী, বিশুদ্ধাচার্য, ও
কৃপাশীল—এই সকল লক্ষণমুক্ত শুভাই সর্বশ্রেষ্ঠ শুভ ।

পুনশ্চ বিমচক্ষুভৌ—পনিচর্য্যামশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ শুভনাহি কৃপামকুঃ স্থবর পূর্নঃ
সর্বমস্বোপকারকঃ নিম্পৃহঃ সর্বভঃসিদ্ধঃ সঙ্গবিদ্যাশিষ্যবৎ । সঙ্গমংশয়কে প্রানলমো
শুভার্থীকৃতঃ ।

যিনি শিষ্যের নিকট পনিচর্য্য। অথবা মশোলাভে ইচ্ছুক নহেন, কৃপালুগ্রন্থাব, সঙ্গপ্রাণীর
উপকারে রত, ধনাদিলাভে নিম্পৃহ, সর্বমস্বোপকারিতে সিদ্ধ, সঙ্গবিদ্যায় পারদর্শী, সঙ্গপ্রাণীর
মংশয়চ্ছেদনে সক্ষম, আশ্রয়বিহীন—এইরূপ ব্যক্তি শুভপদবাচ্য ।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা কেবল শুভায় এই সকল প্রশংসনীয় লক্ষণাদি নির্ণয় করিয়া গিয়া
হয়েন নাই, তাঁহারা নিম্না শুভার লক্ষণও বিবৃত করিয়াছেন :—

ক্রিয়ামারমগুচমে ।—খিজী টৈব প্রজৎকৃষ্ণী নেত্ররোগী চ বামনঃ । কুনপঃ প্রাবদন্ত
জীজিতোহধিকাজকঃ । হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বদ্রাশী বহুজকঃ । এতৈর্দেবৈর্নির্মুক্তো
যঃ স শুভঃ শিষ্যসম্মতঃ ।

ক্রিয়ামারমগুচমে লিখিত আছে, খিজরোগীমুক্ত, গলিতকৃষ্ণমুক্ত, নেত্ররোগমুক্ত ব্যক্তি ও
অতি বর্ধাকৃতি, কুনখী, কুনখী, জীপপ্রায়ণ, নিকলাঙ্গ, কপটচরী, চিররোগগ্রস্ত, বহুজোক্তা,

বক্তৃত্বা, ব্যক্তিগত জ্ঞান হইবার অনুপায়। এই সমস্ত দোষবিহীন ব্যক্তিই শিষ্যসম্মত জ্ঞান ।

এইরূপ যামতে, সম্ভাব্যবিহীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত জ্ঞানপদের অনুপায় বলা যায় । কথিত হইয়াছে । কারণ সম্ভাব্যবিহীন ব্যক্তির ভদ্রে মেহ, মমতা ভ্রুতি কোমল বৃত্তি সমূহের আধরণ হয় না । তৎসম্মতগণের অগ্ৰাণ্য কুলক্ষণের সঙ্গে, "দুর্গন্ধাশাসনাদিকঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রাণে দুর্গন্ধ অনুভূত হয় একজন ব্যক্তিকেও জ্ঞান পদের অযোগ্য বলা যায় উল্লেখ করা হইয়াছে । বাস্তবিক কথায়, একজন অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির পাত শিষ্যগণের কিছুতেই প্রাক্ষা জন্মাইতে পারে না । আপত্তি, বিদ্যাসংহিতা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থে জ্ঞানলক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায় । বাহ্যিক ভাবে সে সমস্ত উদ্ধৃত করা হইল না ।

শিষ্যদের গুণ মুমুক্ষু, সুবিখ্যাত অধ্যাপক আরনল্ড সাহেবেব কথা-গুলি বিশেষ জ্ঞানপ্রদ । তিনি বলেন "ধন্যপরায়ণতা, কার্যাত্মকতা, শারীরিক ও মানসিক বল, বাগ্গিকের চার মারগ, তথা গাভীয়া, মমতা, বিদ্যা এবং দীক্ষণা, এই সকল গুণ না থাকিলে কোন ব্যক্তি প্রশিক্ষক হইতে পারেন না । কিন্তু এই সমুদায় সদ্বৃত্তিলাভ পুরুষ প্রায় পাওয়া যায় না । এমনতরো এক অত্যন্ত দুঃখাপ্য বটে, তথাপি যাহারা শিষ্যদের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদিগের অবশ্য কর্তব্য যে আপনারা এই সমুদায় গুণসম্পন্ন হইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ।"

সে সমস্ত সাধারণ কথা উল্লিখিত হইল তাহা সকল শ্রেণীর শিষ্যদের পক্ষেই প্রযুক্ত । টোলের পণ্ডিত, রাজাসার সৌন্দর্য, শিষ্টশিক্ষক, মর্জীতাচার্য, মজদাতা, মধ্য-উপদেষ্টা, সাধারণ বক্তা, সকলকেই এই সমস্ত গুণে গুণী হইতে হইবে । কিন্তু বর্তমান শিক্ষাবিত্তাগের অসুভূক্ত সাধারণ বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকতা করিতে হইলে এই সকল গুণের সঙ্গে আরও জীবিত গুণ বা শক্তির আৱশ্যক :—(১) ব্যবস্থা বিষয়ক (২) শাসন বিষয়ক (৩) শিক্ষা বিষয়ক ।

(১) ব্যবস্থা—বিদ্যালয়ের জন্ত প্রাণ্যকর স্থান নিরূপণ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু ও আলো প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া গৃহ

নিয়োগ, আবশ্যকমত বিদ্যালয়ে আসবার সংগ্রহ করিয়া অনুজ্ঞাপত্র প্রণীত করিয়া, সময় নিরূপণ পত্র (রটীন) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অধ্যাপনার উপযুক্ত সময় নির্দেশ, বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বালকদিগের খেলবার স্থানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের শোভাবৃদ্ধি ও ছাত্রশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উদ্যান প্রস্তুত, মলমূত্র ত্যাগের স্থান নিরূপণ, উত্তম পানীয় জলের সংস্থান প্রভৃতি কার্য্যে বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে পারিলে শিক্ষক সুব্যবস্থার পরিচয় দিতে পারেন ।

(২) শাসন—বালকগণ যাহাতে নিয়মিত্বে সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, যাহাতে তাহারা মনোযোগেব সহিত পাঠাভ্যাস করে, যাহাতে অবাধ্য ও অসভ্য না হয়, শিক্ষক ও ছাত্র যাহাতে সময় নিরূপণ পত্রের নির্দেশমত কার্য্য করে, যাহাতে বালকগণের চরিত্র উন্নত হয়, বিদ্যালয়ের ভৃত্যগণ যাহাতে নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করে, দিনের কার্য্য যাহাতে দিনেই শেষ হয়, যাহাতে কোনরূপ গোলামাল না হয়, ইত্যাদি কার্য্যের ব্যবস্থার নাম সুশাসন ।

(৩) শিক্ষা—বালকগণ যাহাতে শিক্ষায় আগ্রহ উপভোগ করে, যাহাতে তাহারা প্রত্যহ কিছু কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের উপার্জিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের সমুদায় বুদ্ধির সম্যক অনুশীলন হয়, যাহাতে তাহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য । ইহাই সুশিক্ষার ব্যবস্থা ।

পরবর্তী তিন অধ্যায়ে এই তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ।



প্রথম অধ্যায় ।—সুব্যবস্থাবিষয়ক ।



হ ও প্রাঙ্গণ ।—বড় বড় বিদ্যালয়ের গৃহাদি
নির্মাণ বিষয়ে শিক্ষককে বড় একটা বেগ পাঠিতে
হয় না, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার গণই সমস্ত ব্যবস্থা
করিয়া থাকেন। কিন্তু ছোট ছোট বিদ্যালয় গ্রাম্য
পাঠশালা প্রভৃতি অনেক সময় শিক্ষকগণের তত্ত্বাব-
ধানেই নির্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষকেব এ

সময়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয় নির্মাণের স্থান গ্রামের
সংলগ্ন অথচ বাহিরে হঠলেই ভাল হয়। নদী কি বড় পুকুরদ্বারা ধার, ছোট
টিলা কি পাখাড়ের দ্বারা বা বিস্তীর্ণ মাঠই এ কার্যের জন্য প্রশস্ত। যেখানে
সরসতা নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয়, চতুর্দিকের দৃশ্য যেখানে মনোহর, অথচ
গ্রাম হইতে বহুদূর নয়, এইরূপ স্থান দেখিয়াই গৃহ নির্মাণ করিতে
হইবে। গৃহের চারিদিকে যেন অনেক গাছ বা জঙ্গল না থাকে।
একখানি গছ, একটা ক্ষুদ্র উদ্যান ও বাগকদিগের খেলবার স্থানের
সাহায্যে সংকুলান হয়, বিদ্যালয়ের জন্য অল্পঃ এপরিমাণ জমি আবশ্যক।
ছোট বিদ্যা জমির মধ্যে এ সমস্তের ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। অর্ধবিঘা জমিতে
বিদ্যালয়ের গৃহ, অর্ধবিঘায় উদ্যান ও এক বিঘায় খেলবার স্থান, ইহাই

অতি সংক্ষেপ । সহরে এ পরিমাণ স্থানের যথেষ্ট মূল্য বটে কিন্তু পল্লিগ্রামে এখনও এ পরিমাণ জমি বিনা বায়ে পাওয়া যাইতে পারে । বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় গৃহ ছোট বড় করিতে চলে ।

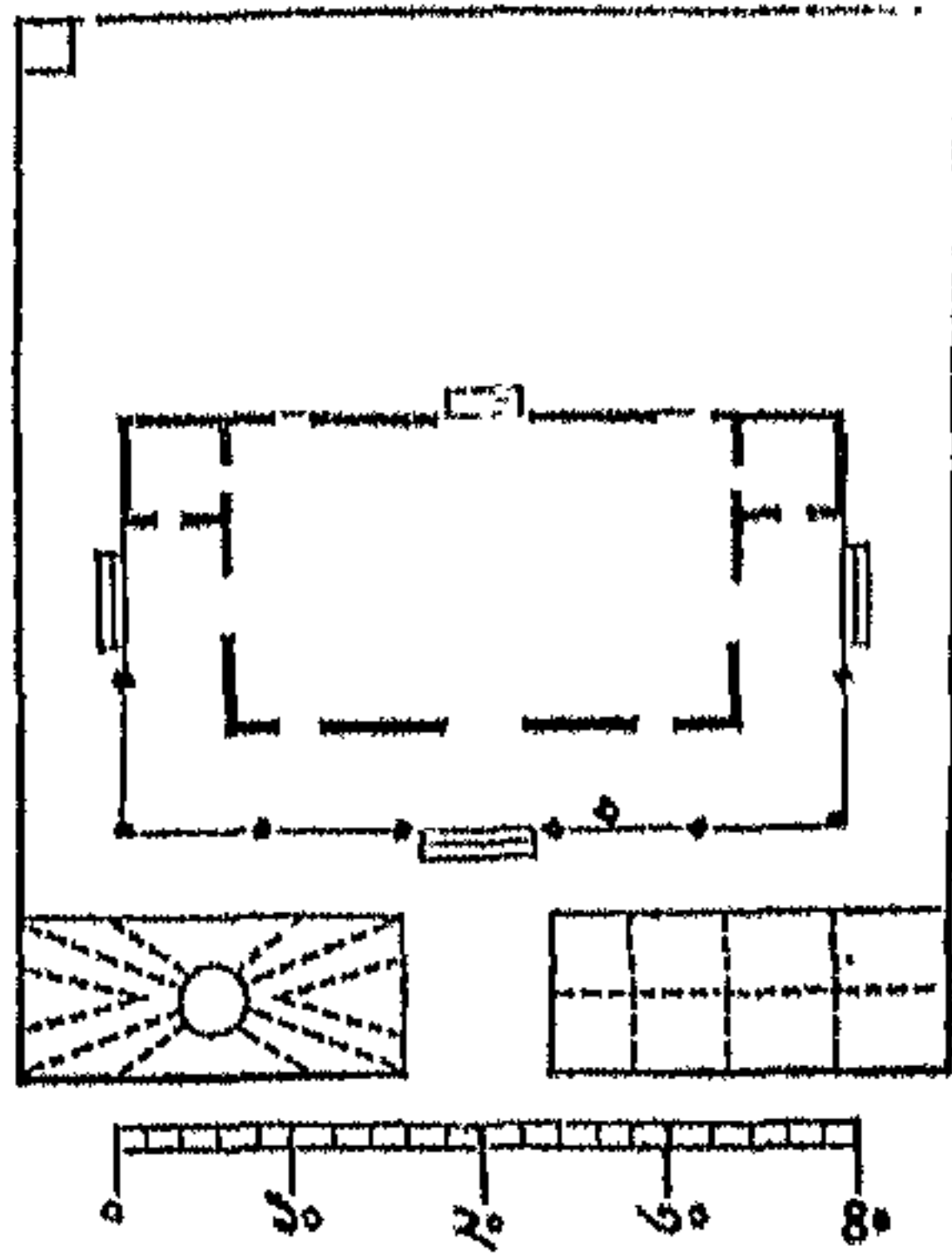
প্রত্যেক বালকের জন্য ভূপরিমাণ ১০ বর্গফিট আবশ্যক । আমেরিকায় ১৬ বর্গফিট ভূমি ও ২৫০ ঘনফিট বায়ুর ব্যবস্থা আছে । শ্রীলঙ্কায় ক্ষুদ্রতম পরিমাণ ১৮' X ১৫' । ৩০' দূর পর্যন্ত গানারণ লেখা পড়া যাইতে পারে, সূত্রাং ব্ল্যাকবোর্ড বা ম্যাপ ইহার অপেক্ষা দূরে রাখিলে চলিবে না । জানালা ২৪'এব দূরে হইলে কোনরূপ কদোদয় হয় না । এ সমস্ত বিবেচনা করিয়াও কক্ষের দীর্ঘ প্রস্থ নির্ণয় করা যাইতে পারে । দরজা জানালাগুলি বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকাই আবশ্যক । অগ্নিভয় ও ভূমিকম্পের সময় সহজে বাহির হইতে পারা যায় ।

গৃহের সম্মুখে একটা ছোট বারান্দা থাকা আবশ্যক । বাহিরের কোন লোক, শিক্ষক কি কোন ছাত্রের সহিত দেখা করিতে আগিলে তাহাকে এইখানে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে, আর যে সকল বালক নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় (বিদ্যালয়ের গৃহ বন্ধ থাকিলে) তাহারা রোজ ও বুড়ি হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য এই বারান্দায় আশ্রয় লইতে পারে । বাসগৃহ হইতে বিদ্যালয়ের গৃহ অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া আবশ্যক, কারণ এখানে এক সঙ্গে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে । প্রাণাসের সহিত যে অস্বাভাব্য বায়ু নির্গত হয়, তাহা দ্রাহ্যের পক্ষে অতি অনিষ্টজনক । সাধারণতঃ শতভাগ বায়ুতে ১ ভাগ অস্বাভাব্য বায়ু থাকে । যদি বসগৃহে প্রাণাস নির্গমের পথের অভাবে ১ ভাগ অস্বাভাব্য বায়ু সঞ্চিত হয়, তবে বালকদিগের মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিবে, ২ ভাগ হইলে তাহারা বসি করিতে আরম্ভ করিবে, ৩ ভাগ হইলে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, আর ৪ ভাগ মারাত্মক । সূত্রাং যাহাতে গৃহাভ্যন্তরে

নিম্নলিখিত বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে দরাজা জানালা রাখা আবশ্যিক । পাঠশালা গঠন প্রায়ই একটী বা দুইটী শিফট-কেন দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন এইরূপ পাঠশালা গৃহের মধ্যে কক্ষ বিভাগ করিয়া কোনরূপ বেড়া বা দেওয়াল দেওয়া অবিধাজনক নহে । যে বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা উচিত । ছোট বালকেরা প্রায়ই মেজেতে বসিয়া কাজ করিতে ভালবাসে ; এজন্য গৃহের মেজে পাকা হইলে ভাল হয় । যদি গৃহের ভিতা উচ্চ করিয়া আটাল মাটিতে বানান হয়, তবে মাটির হইলেও চলিতে পারে । কিন্তু মাসে মাসে অন্ততঃ ২ বার গোবর মাটির দ্বারা উত্তম করিয়া লেপাইতে হইবে । উচ্চ ভিতা প্রায়ই স্যাণ্ড-সেতে হয় না । আর যদি মেজের উপর গোবরমাটির একটা পুরু স্তর পড়িয়া যায়, তবে নীচের জল, গোবর ভেদ করিয়া উঠিতে পারিবে না । স্যাণ্ডসেতে গৃহে বাস করিলে অর, কানি, মর্দি, বাত প্রভৃতি নানারূপ পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । এজন্য ঘরের মেজে যাহাতে শুষ্ক হয়, শিক্ষককে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।

মধ্য প্রদেশের প্রাথমিক পাঠশালার নক্সা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । ইহাই গ্রাম্য পাঠশালার উত্তম আদর্শ :—

প্রত্যেক বালকের জন্য অন্ততঃ ৬ বর্গ ফুট ও ৬০ ঘন ফুট স্থান আবশ্যিক, ইহাও মধ্যপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগীয় আইনে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু কার্যতঃ ইহা অপেক্ষা বেশী স্থানেরই ব্যবস্থা হইয়া থাকে । ৫০ জন ছাত্রের উপযোগী একটা বিদ্যালয়ের মাত্র সাধারণতঃ এইরূপ :—মধ্যের কক্ষমাত্রা ২০ ফুট $\times$ ১২ ফুট, দেওয়াল ১০ ফুট উচ্চ । ঘন ফুট হিসাবে গৃহের অভ্যন্তর ৩৬০ (ছাদ ঢালু ধরিয়া) । আইন অনুসারে এই গৃহে ৪০ জনের বেশী স্থান হয় । কিন্তু কক্ষমাত্রা ২০৩০ জনের বেশী ছাত্র বসে না । অত্যাশ্চর্য্য সকলে সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া কাজ করে । বারান্দা



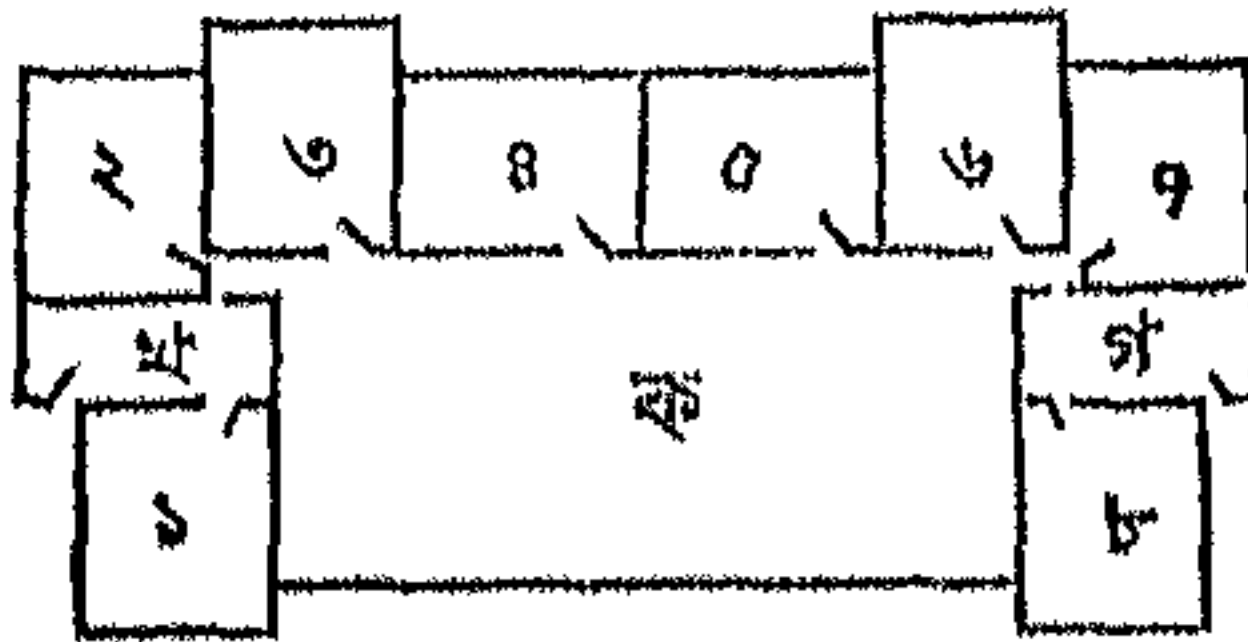
১ম চিত্র।—মধ্যপ্রদেশ পাঠশালার নকশা ।

(সার্প সাহেব কৃত মধ্যপ্রদেশের রিপোর্ট হইতে)

৩২ ফুট X ৬ ফুট । ঘরের মেজে ও দেয়াল পাঁকা, ছাদ টালীর । ছোট ছোট বাগবেরা চটের উপর বসে, বড় ছেলেরা বেঞ্চে বসে । কোন কোন পাঠশালার উচ্চ শ্রেণীতে ডেস্কের ব্যবস্থাও আছে । বাগানের চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে । বিদ্যালয়ের চারিপাশে প্রায়ই বেড়া থাকে না । প্রায় শিক্ষককেই ডাকের কাজ করিতে হয় ; এঁরা তখন প্রায় বিদ্যালয়ের সঙ্গেই একটা ডাকঘরের কাজ থাকে । ছুট পক্ষে যে ছোট ছুটী কামরার নকশা আছে, তাহার একটা ডাকঘর, অপরটিকে লাইব্রেরী, অফিস, ভাণ্ডার ইত্যাদি । বিদ্যালয়ের কাজ, ডাকঘরের কাজ ও পাউণ্ড অর্থাৎ পশু গোয়ালের কাজ করিয়া শিক্ষকেরা মাসে বেশ ২০২৫ টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন । ছোট ছোট বিদ্যালয়ে প্রায়ই একজন শিক্ষক ও একজন গণিটার (শিক্ষানবিশ শিক্ষক) থাকে ।

মাহারা বড় খুল করিতে হইল। কয়েক, নিম্নে তাহাদের জন্তও একটা উৎকৃষ্ট নকশা প্রদত্ত হইল। ক চিহ্নিত ঘর গৃহ কক্ষ বা হল। ইহাতে সভা সমিতি ও পরীক্ষার কাগজ নির্যাসিত হইয়া থাকে। ব গ চিহ্নিত গৃহ দুইটি, দুই দিকের দরজা বরাবর। এই ঘর দ্বিধা হলে প্রবেশ করিলেই সকল শোণাতে যাওয়া যাইবে। আর ১, ২ ওড়াত চিহ্নিত ঘরগুলি যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি শোণা।

মাহারামিগের সুলে ছাটেরা সবপ্রাণে হলে একত্রিত হয় এবং শিক্ষকের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিয়া নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করে। এইরূপ গৃহের আর একটা বিশেষ অঙ্গ হল যে যেখানে শিক্ষক ইচ্ছা করিলেই অতি অল্প সময়ে ও স্বল্পস্থলার সহিত সমস্ত ছাত্রকে হলে একত্র করিতে পারেন। আর এই হলে বাসিয়া সমস্ত শোণার কার্যও পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। লাইব্রেরী ও লেবরেটরী (বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রাগার) এই হলে এখানে বাসিয়া বাজকেরা অন্যের কাগজ ও পুস্তকাদি পাঠ করে। বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষা দেখিতে হইলে এই হলে একত্র হয়। কেরাণীও এই হলের এক কোণে বাসিয়া কাজ করেন। বাজকেরা কলের পুতুলের মত গৃহে প্রবেশ করে, আবার ভূগীর সময় কলের পুতুলের মত বাহির হইয়া যায়—একটুও গোলমাল হয় না। তবে গৃহের বাহিরে যিচ্ছ তাহারা স্বাধীনভাবে লালসালাকী বা গোলমাল করিয়া থাকে। বাজকেরা শোণাতে প্রবেশ করিলে, শিক্ষক হলের দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দেন। অপর দিকের জানালার দ্বারা দেখা থাকে। কাজেই নানা শোণার গোলমাল হলে প্রবেশ করে না। দরজা জানালা কাচের

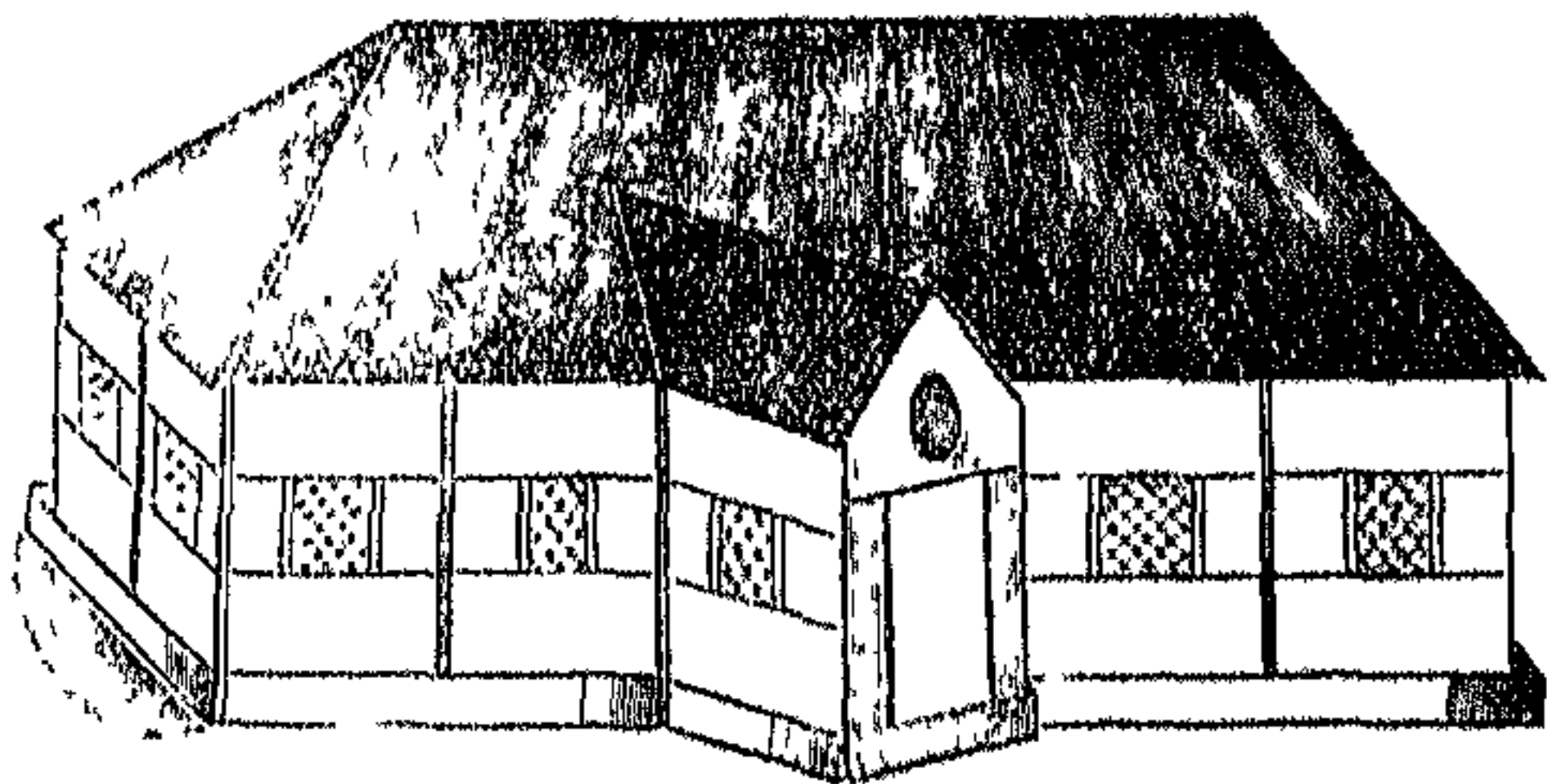


২য় চিত্র—মাহারামিগের নকশা।

(কাউন্সিল কক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি হইতে)

নিম্নে আঙ্গান প্রদেশস্থ পাঠশালা গৃহের চিত্র প্রদত্ত হইল। সকল গৃহের বড় বাসনা নাই। সম্মুখে একখানি পর'চালা বা পোর্টিকো

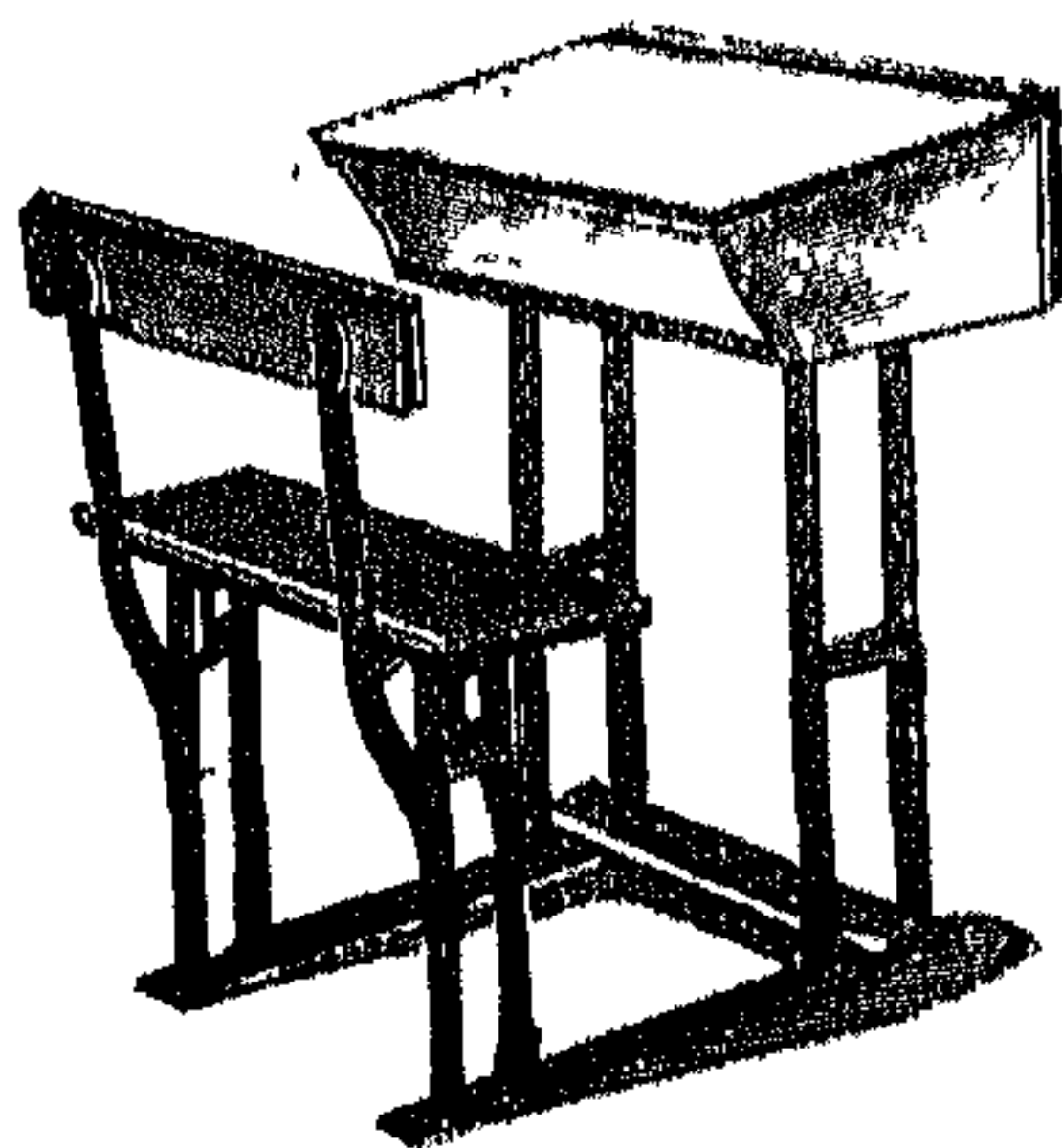
বারান্দা আছে । এষ্ট গোটটেকোর সমুণের দরজা খোলা । বালকগণ সমুণের পূর্বে বিদ্যাধায়ে আসিয়া, রৌদ্র বৃষ্টিতে এষ্ট চাণায় আশ্রয় লইয়া থাকে । একটা লম্বা বারান্দার অপেক্ষা ইহাতে খরচ কম আন দেখায়ও সুন্দর ।



৩য় চিত্র ।—আসাম প্রদেশস্থ পাঠশালাগৃহ ।

আসবাব ও সরঞ্জাম ।—ছোট ছোট ছেলেদের বসিবার জন্য বেঞ্চ অপেক্ষা চট, চাটাই, মাদুর প্রভৃতি অধিক সুবিধাজনক । ছোট ছোট চাটাই কি মাদুর হইলে, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন আসন হইতে পারে । তাহা না জুটিলে একটা লম্বা চট কিনা মাদুরে, অনেক ছেলে একত্রে বসিতে পারে । একপ চট কি মাদুর সংলগ্ন করিয়া লইতে হইবে । মধ্য প্রদেশের পাঠশালা সমূহে চট ব্যবহার করে । একথানা বড় চট কিনিয়া (২০ ইঞ্চি প্রস্থ রাখিয়া) লম্বালম্বি কাটিয়া লম ও চটের পাশ শক্ত জিন কাপড় মুড়িয়া সেলাই করিয়া দেয় । নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের জন্য এই চটেব দ্বারাই শ্রেণী বিভাজন করে । সহরের বিদ্যালয় সমূহে নিম্ন শ্রেণীতেও বেঞ্চ ব্যবহৃত হয় । কিন্তু গ্রাম্য স্কুল শ্রেণীর বেঞ্চ সমান-রূপ উচ্চ হওয়াতে, নিম্নশ্রেণীর বালকগণের বসিবার অসুবিধা হয় ।

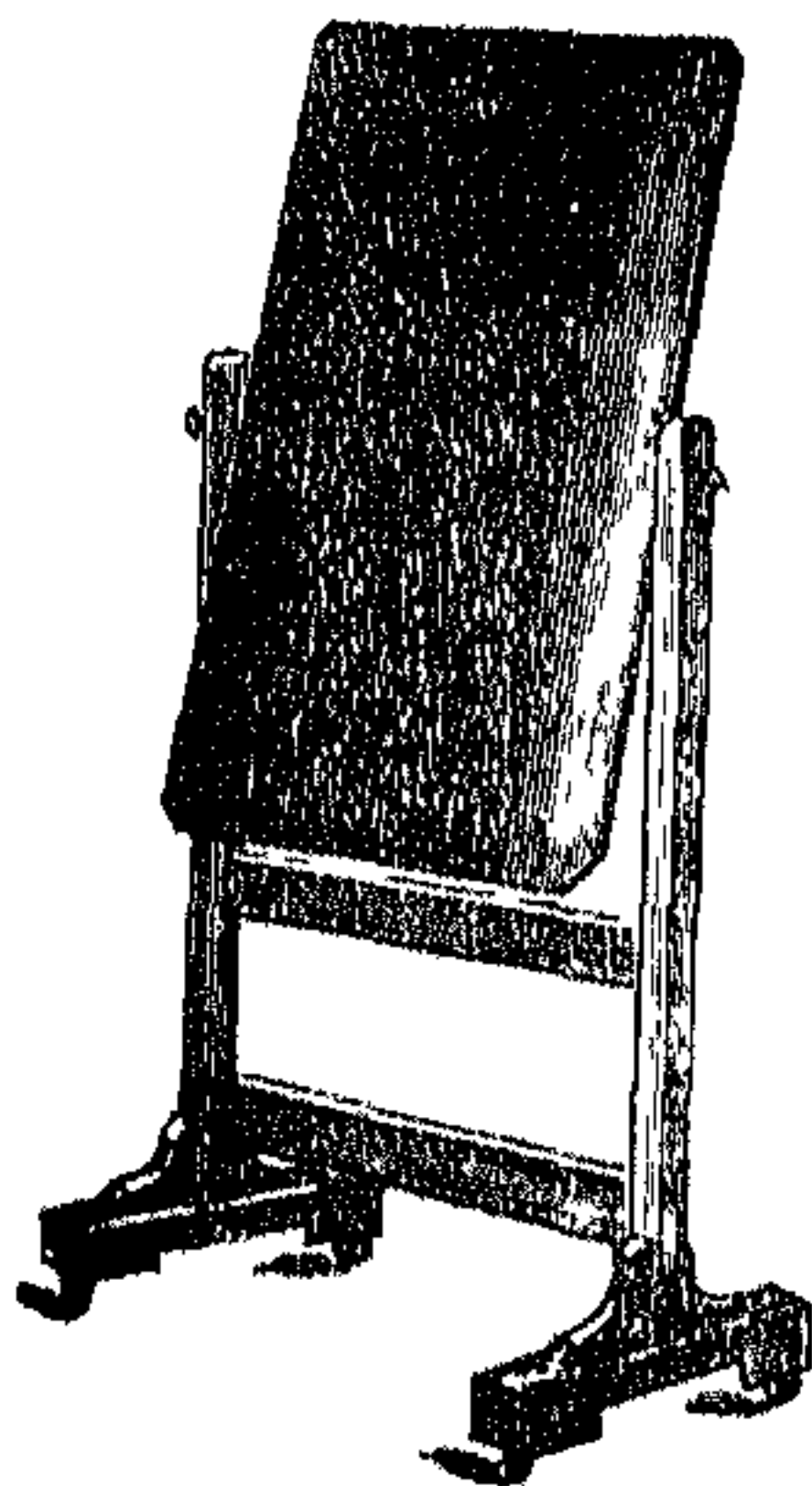
বেধে বসিলে পা বুলিয়া থাকে । অনিয়মিত এক্ষেপে পা বুলাইয়া রাখিলে পায় ব্যথা জন্মে । এই নিমিত্ত ছোট ছোট ছেলেদের পা রাখিবান জন্ত, উচ্চ বেধের সঙ্গে তক্তা আঁটিয়া দেওয়া কর্তব্য । নিম্ন শ্রেণীর বেধগুলি নোচু করিয়া প্রস্তুত করাষ্টলে আর একপ তক্তা আঁটিবার প্রয়োজন হয় না । অবস্থা ভাল হইলে ডেবের ব্যবস্থা করা উচিত । নিম্ন শ্রেণীর ডেবগুলি ছোট ছোট টেবিলের মত হইবে অর্থাৎ ডেবের উপরিভাগ ঢালু না হইয়া সমতল হইবে । কারণ নিম্ন শ্রেণীতে বাগব-গণকে কিওয়ারগার্টেন প্রথালুয়ারী অনেক কার্য সম্পাদন করিতে হইবে । টেবিল ঢালু হইলে তাহাদের গঠিত জব্যাদি গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে । এক একটা লম্বা লম্বা ডেব অপেক্ষা, ছোট ছোট ডেব (ছোট ছেলের জন্ত ১৮ ইঞ্চ প্রস্থ ও বড় ছেলের জন্ত ২০।২২।২৪ ইঞ্চ) উত্তম । বেধগুলির পিঠ থাকা আবশ্যক । অনেকক্ষণ নিরবলম্বভাবে বসিয়া থাকিলে মেরুদণ্ডে বেদনা উপস্থিত হয় । মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্কুলে বালকদিগের হাতাবিহীন ছোট ছোট চেয়ারের ব্যবস্থা আছে । কারণিয়াং ভিক্টোরিয়া স্কুলে, বালকদিগের জন্ত সকল শ্রেণীতেই পৃথক পৃথক চেয়ার ও ডেবের বন্দোবস্ত । এ ডেবগুলিতে বালকদিগের পুস্তক, খাতা, দোয়াত, কলম প্রভৃতি থাকে । ডেবগুলি বালকের বয়সানুসারে (সম্মুখের দিকে) ২০ ইঞ্চ হইতে ৩৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে । ও বেধ কি চেয়ারগুলি ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চ উচ্চ হইবে । বেধে সোজা হইয়া বসিলে যদি ডেবের সম্মুখ ভাগ হাতের কণ্ঠের ঠিক নীচে থাকে, তবেই ডেবের মাপ ঠিক হইল ; আর বেধ কি চেয়ারে বসিলে যদি পা মাটিতে বেশ আরামের সহিত রাখা যায়, বেধের মাপও ঠিক হইল । নিম্নে উত্তম আসনের চিত্র প্রদত্ত হইল—বেধ ও ডেব একসঙ্গে যুক্ত, ও একজনের (বা দুইজনের একসঙ্গে) বসিবার উপযোগী ।



৪র্থ চিত্র ।—যুক্ত আসন ।

নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণের নিমিত্ত একখানা টেবিল, একখানা হাতাযুক্ত চেয়ার ও একখানি হাতাবিহীন চেয়ার নিত্য পক্ষেট আবশ্যক । হাতাযুক্ত চেয়ার প্রাধান শিক্ষকের জন্য ও হাতাবিহীন চেয়ার মনিটারের জন্য । পুস্তক, খাতাপত্র, কাগজ, মোয়াত, কলম প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটা বাক্স বা আলমারী । নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও অন্ততঃ ২ খানা ব্ল্যাকবোর্ড রাখা আবশ্যক । একখানি কার্টিফলকে লোহার কড়া লাগাইয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলেও কাজ চলিতে পারে । আর ফ্রেমের উপর লাগাইয়া লইলেও হইতে পারে । ব্ল্যাকবোর্ডের ধার দিয়া বিট বা কাণিস তুলিয়া উচ্চ করিবে না । তাহাতে টিকোয়ার চালাইবার অন্ত্রবিধা হয় । নিম্নে ব্ল্যাকবোর্ডের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

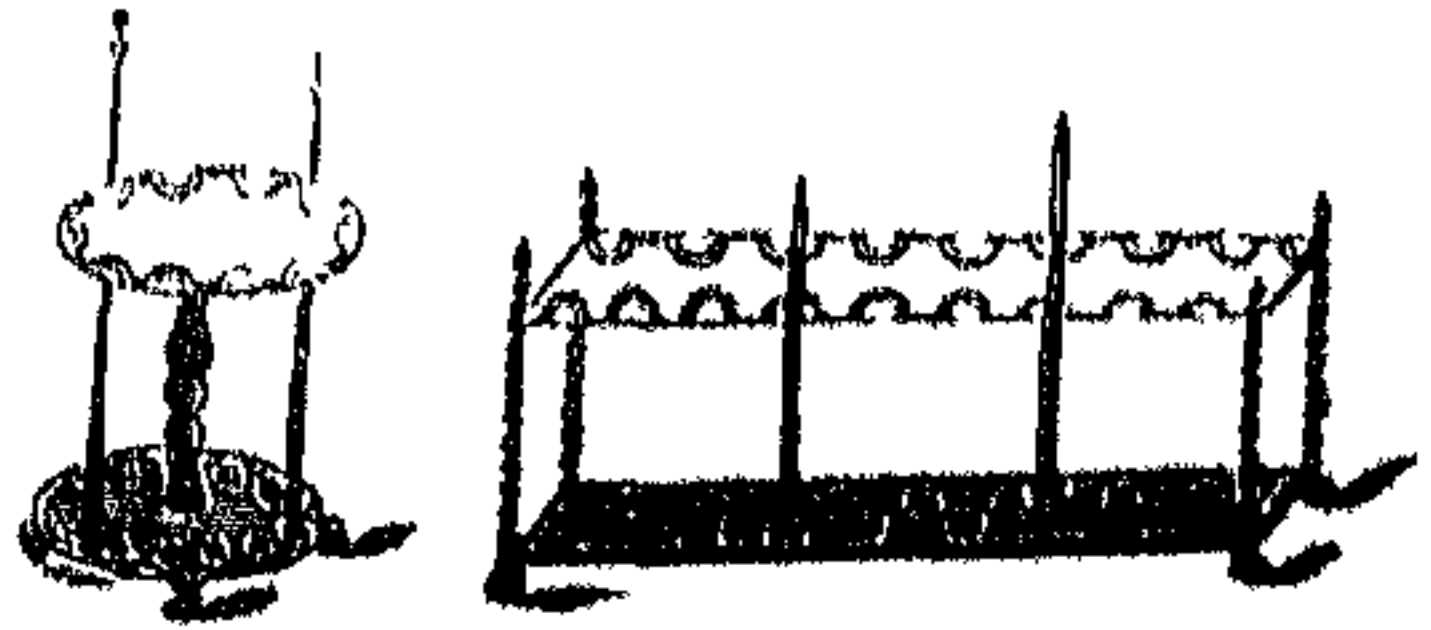




৫ম চিত্র ।—ব্ল্যাকবোর্ডের আদর্শ ।

এ সকল গরীব পাঠশালার ব্যবস্থার কথা বলিতেছি । অবস্থা ভাল হইলে এই সকল আসবাব আবশ্যক মত বৃদ্ধি করিতে হইবে । দেশী মিঞ্জিরা ব্ল্যাকবোর্ড প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু অনেকট উপযুক্তরূপে রঙ করিতে জানে না । কেহ আলকাতরা, কেহ বা ব্ল্যাকজাপান নামক রঙ দিয়া কাল করিয়া দেয় । ঠোঁটে চক্ দিয়া লিখিলে রঙের সঙ্গে চক্ লাগিয়া যায় । বোর্ড পুঁছিয়া ফেলিলেও চকের দাগ ভাল করিয়া যায় না । ব্ল্যাকবোর্ড রঙ করিবার প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত হইল । মাগ রাখিবার জন্ত আলনার মত র্যাক প্রস্তুত না করিয়া, নিম্নের চিত্রাঙ্কনানুযায়ী আসন প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সুবিধা ।—

ইহাতে কয় স্থান লাগে আর তাহাতে রাখকের মত এক সঙ্গে অনেকগুলি মানচিত্র একত্র রাখিতে হয় না । সকলগুলিই পৃথক পৃথক রাখা যায় ।



৬ষ্ঠ চিত্র । —মানচিত্রাদি রাখিবার আসন ।

১ম চিত্রের উপরের কাঠফলকে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহা কাঠের কতক কাটিয়া লওয়া হইয়াছে । আর কাঠের চতুর্দিকে একগাছি শক্ত দড়ি প্রোক্ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই দড়ি ও কাঠের ছিদ্র মিলিয়া একটা অর্ধ বৃত্তাকার ছিদ্র হইয়াছে । ইহার মতোই মাপ থাকে ।

প্রথম চিত্রের অনুরূপ আসন করিতে হইলে মিজার সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে । কিন্তু ২য় চিত্রের মত আসন শিক্ষকেরা নিজেই করিয়া লইতে পারেন । বাঁশ ও বেতের দ্বারা কি কেবল বাঁশের দ্বারাও ঐরূপ আসন করিতে পারা যায় । শিক্ষক একটু পরিশ্রম স্বীকার ও একটু যুক্তি খরচ করিলেই অতি সহজে কৃতকার্য হইবেন ।

বিদ্যালয় ও তাহার প্রাঙ্গণের নকশা, লোমের নকশা, জেলার নকশা, প্রদেশের মাপ, দেশের (ভারতবর্ষের) মাপ ও মেই মহাদেশের (এশিয়ার মাপ) মাপ ও পৃথিবীর মাপ রাখা আবশ্যক । বড় বড় স্কুলে ইহা ছাড়া অষ্ট্রা মহাদেশ ও ব্রিটন দ্বীপের মানচিত্রও রাখা আবশ্যক । ইহার সঙ্গে তিন চারিখানি নামবিহীন মানচিত্র রাখা কষ্টব্য । এ সকল মানচিত্রে নগরাদির নাম লেখা থাকে না । ইহার

দ্বারা বাণকদিগের উত্তমবাপ ভূগোল পরিচয় হইয়া থাকে। ইংরাজী সংস্কৃষ্ট বিদ্যালয় হইলে, প্রাকৃতিক ভূগোল পরিচায়ক ও জীবজন্তু এবং উদ্ভিদজা সংস্থান পরিচায়ক মানচিত্র বাখাও আবশ্যক ।

প্রদেশের ও জেলার বন্ধুর-মানচিত্র (Raisé map) এবং একটি গোলকও আবশ্যক । পয়সা খরচ করিয়া এ সমস্ত কিনিতে পারিলে ভাল, আর না পারিলে প্রস্তুত করিয়া লইলেও চাণিতে পারে ।

গোলকের দামও আজকাল বড় বেশী নহে । বাছালা গোলাক একটা ছুই টাকা ও ইংরেজী গোলক একটা ৫৬ টাকা হইলেও পাওয়া যায় । তবে এগুলি বড়ই ছোট । বন্ধুর-মানচিত্রও ৪৫ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া থাকে । পরিশিষ্টে বন্ধুর-মানচিত্র ও গোলক প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইল ।

কতকগুলি ছবির দরকার । যে সকল জীবজন্তু বা অজ্ঞাত পদার্থ আমাদিগের সংগ্রহ করা অসম্ভব বা কষ্টকর নয়, সে সমস্ত পদার্থের প্রতিকৃতির আবশ্যক করে না । যাহা মচরাচর আমরা দেখিতে পাই না বা সংগ্রহ করিতে পারি না, সেই গুলির ছবি বা পুস্তলিকা সংগ্রহই বিশেষ আবশ্যক । যথা, পুস্তকে বালকেরা ঈগল পাখীর বিষয় পাঠ করে কিন্তু কোন দিন দেখে নাই বা সহজে দেখিবারও কোন সম্ভাবনা নাই । ঈগলের একখানা ছবি এই জন্ত বিশেষ আবশ্যক । নিয়ে এইরূপ আবশ্যকীয় অল্প কয়েক খানি ছবির নাম লেখা গেল :—

নমসাহু, সেন্টবার্ভার্ড কুকুর, জিরাফ, বাজ, ডে, সিগুয়াটক, কাকার, সিংহ, খেত ভল্লুক, হরি, তিসি, বন্যাহরিণ, জেব্রা, ঈগলপাখী, উটপাখী, ময়ূর, পিরামিড, ভাস্কর্য, বেলুন (বোম্বান), বাতিঘর ।

বিদ্যালয়ের জন্ত এ সকল ব্যতীত কলকষড়ি বা টাইমপিস্, পেটাঘড়ি, পিতলের ঘটি, গেলাস, দোয়াত, কলম প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জিনিষের আবশ্যক হইয়া থাকে ।

মিউজিয়াম ।—সদাৰ্গ পৰিচয় বা তদুপ দেশীয় বিষয় শিক্ষাদিবার
কল্পে বিদ্যালয়ে কতকগুলি জীবের সংগ্রহ রাখা আবশ্যিক । ছান ও
শিককেরাই এ সমস্ত জিনিষ বিনান্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন । তবে
বস্তুগুলি কখনো নিমিত্ত একটি আদম্যারী আর মূল বড় মাছাবর্ণের (কুঁঠনা-
ঠেন নিশির মত) কতকগুলি শিশি আবশ্যিক । কি কি জিনিষ সংগ্রহ করা
করব্য, নিয়ে তাহার নাম প্রদত্ত হইল । ঘান, চান, কলাই প্রভৃতি
শিশিতে রাখিয়া তাহার গায়ে জীবের নাম, প্রাণীর জ্ঞান ও তাহার অত
কোন বিশেষ গুণ থাকিলে তাহা, একখানা কাগজে রাখিয়া, আঁটিয়া
দিতে হইবে ।

কৃষিজাত ।—সকল প্রকারের ধান, চান, কলাই, দাইল, মর্গল, তিল, তিগি, মোরগোজা,
ধব, ধম, ভুট্টা প্রভৃতি ; ফুলা, পাট, শন, দেশম, পল্লভোম, সুরঙ্গম জবা ইত্যাদি ।

শিল্পজাত ।—সূতা, বড়ি, কাগড়, মতঙ্গ, কদল, দাছর, পাট, কুশামন, কাগজ, মাটির
বাসন, পিতল কাগার বাসন, বোতাম, চিরুণী, মাঝন, আঁতর, গোয়াল, কাম্বল, মির,
পেন্সিল, ইত্যাদি ।

বনজাত—নানাপ্রকারের কাঠ, বাশ, মেত, লতা ।

খনিজাত—নানাপ্রকারের প্রস্তর, প্রস্তরীভূত হাড়, গাছ, পাথুরে কয়লা, ও নান্য
রকমের মাটি, চিন, সিমা, মোহা, জল ।

সমুদ্রজাত—খিসুক, শমুক, শক, কড়ি, প্রবাল ।

এই প্রকারের নানাজব্য সংগ্রহ করিতে হইবে । যে জামের বিদ্যালয়,
সেই জামে, তাহার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে ও সেই জেলায় যে সমস্ত
জিনিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেখানে সেই গুলিই সংগ্রহ করিতে হইবে ।
পরে অত্যাচ্ছ জবা জ্বিধা মত সংগ্রহ হইলে ভাল, না হইলে ক্ষতি নাই ।
এ সকল জব্য সংগ্রহের বিশেষ আবশ্যিকতা আছে । দেশে কি কি জব্য
পাওয়া যায় ও উৎপন্ন হয় তাহার জ্ঞান লাভ হয় ।

বস্তুগুলি বাণকেরা নিজে সংগ্রহ করিলে, সেই বস্তুবিশয়ক জ্ঞান
আরও উত্তম হয় । শিক্ষকেরাও অনেক সময় এই সকল বস্তু সাহায্যে

পাঠ সরলীকৃত করিতে পারেন । মনে করুন আপনি পাথুরিয়া কয়লা বিষয়ে পাঠ দিতেছেন । কাঠ কয়লা, কোঁককয়লা, ও পাথুরিয়া কয়লায়, অর্থাৎ কি ভাষা বুঝিতে হইলে, জবাব সাহায্য ব্যতিরেকে কি বুঝান সম্ভব ? তিন রকমের কয়লা বালকদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিলে, তাহারা চক্ষু ও হস্তের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কয়লা বিষয়ে এক জ্ঞান লাভ করিবে, তাহা শিক্ষক পাঁচদিনে বক্তৃতা করিয়াও দিতে পারিবেন না । সকল জিনিষ সংগ্রহ করা অবশ্য সম্ভবপর নহে, কিন্তু তাঁই বলিয়া কোন জিনিষই সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই, একথাও যুক্তিযুক্ত নয় ।

পুস্তকালয় বা লাইব্রেরী ।—বিদ্যালয় দরিদ্র হইলেও অতি আবশ্যকীয় দশ বার খানি পুস্তক ক্রয় করা আবশ্যক । নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রাখা নিতাস্তই আবশ্যক (১) অভিধান (স্ববল) (২) শুভদ্রশী (৩) শিশুরজন পাটীগণিত (কাণীপদ) (৪) পাটীগণিত (মাদন) ভূগোল (শশীভূষণ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (মাকমিলান) উচ্চ-প্রাইমারী বিজ্ঞান বীজর (গিরীশ) বায়না বা আমাদেবের ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ) ভূচিলাবলী (শশীভূষণ) ব্যাকরণ (ভারতী) এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি, পদার্থ পরিচয় কিংবদন্তীগাঠেণ বিষয়ক পুস্তক । অবস্থা ভাল হইলে, যোগীন্দ্র সরকার, আশুতোষ কৃত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিও রাখা আবশ্যক । বালকদিগকে বিদ্যালয় পাঠ্য ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক পড়িতে দিলে তাহারা যথেষ্ট উৎসাহ পাইবে ও আনন্দ উপভোগ করিবে । বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল হইলে যে সকল পুস্তক রাখা আবশ্যক তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল ।

পুস্তকগুলি আলমারীতে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে । প্রত্যেক পুস্তকে বিদ্যালয়ের নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিতে হইবে । একখানি বাঁদা খাতায় পুস্তকের তালিকা রাখা আবশ্যক । পুস্তকগুলি (অনেক পুস্তক হইলে) বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়া খাতার ভিত্ত

ভিন্ন স্থানে লিখিতে হইবে । সাধারণতঃ এইরূপ বিভাগ কার্যেই
চলিবে :—

অভিধান—সাধারণ অভিধান, বিশ্বকোষ, বাজালা ভাষার লেখক, আনন্দকোষ পদ্ধতি
এই শ্রেণীভুক্ত ।

সাহিত্য—প্রবন্ধ, উপাখ্যান, নাটক, উপন্যাস, কাব্য পদ্ধতি ।

গণিত—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিত, জমিদারী মহাজনী, অরিপ
ইত্যাদি ।

ভূগোল ইতিহাস—এ শ্রেণীর মধ্যে ইচ্ছা করিলে জীবনচরিত ও নগরবৃত্তান্ত দিতে পারা
যায় (বা এ সকল সাহিত্যশ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে) ।

বিজ্ঞান—পদার্থ বিজ্ঞান, রাসায়ন, ভূবিদ্যা, চিকিৎসা, বায়ুশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি ।

শিক্ষা পদ্ধতি—শিক্ষক সহচর, শিক্ষাপ্রণালী, কিডারগার্টেন, পদার্থ পরিচয় ইত্যাদি ।

বিদ্যালয় পাঠ্য—শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বা তদাপ ছোট ছোট পুস্তক ।

বিবিধ—বাজালা আইন, পঞ্জিকা, সামিক পত্রিকা ইত্যাদি ।

শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থের পৃথক তালিকা না করিলে অসুবিধা হইয়া থাকে ।
এক অসুবিধা এই হয় যে আলমারীতে সাহিত্যের বিভাগে ‘ভারতবর্ষীয়
উপাসক সম্প্রদায়ের’ পাশ্বেই হয় ও “শিশুশিক্ষা”কে স্থান দিতে হয়,
কারণ “শিশুশিক্ষা”ও সাহিত্যগ্রন্থ । আর এক অসুবিধা এই হয়
যে নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য প্রত্যহই হয়তঃ অল্পাংশ পুস্তক
বিশৃঙ্খল করিতে হয় । এই জন্য বিদ্যালয়ের বাইরেও-পুস্তক
তালিকায় ‘বিদ্যালয় পাঠ্য’ একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী থাকিবে আবশ্যক ।

একটা সিকি আকারের কতকগুলি সামান্যকাগজের গোলা টিকিট
কাটিয়া তাহার উপর ^{সা} ৫, ^{ভূ} ১০, ^{বি} ৩ ইত্যাদি রূপ নম্বর লিখিয়া পুস্তকের
পাশ্বে, নিম্ন হইতে এক ইঞ্চি স্থান বাদ দিয়া উত্তম আটার দ্বারা আঁটিয়া
দিতে হইবে । পুস্তক আলমারীতে সাজাহলে টিকিট গুলি যেন এক
লাইনে পড়ে । ইহাতে যদি কোন পুস্তকের পাশ্বেদেশ লিখিত লেখা
চাকিয়া যায় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই । টিকিটগুলি এক লাইনে না

হঠাৎে বিক্রী দেথায় । পুস্তক কে কবে পড়িতে যায় ও কবে ফেরত দেয় তাহার হিসাব রাখিবার জন্য পুস্তক খাতা রাখা আবশ্যক । বালকগণকে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য ভাষা ভাষা পুস্তক ও পত্রিকা পড়িতে সর্বদা উৎসাহিত করিতে হইবে ।

খাতাপত্র — বালকগণের ভর্তির রেজিষ্ট্রী ও দৈনিক উপস্থিতির রেজিষ্ট্রী; এই দুই খানিই সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় । ভর্তি রেজিষ্ট্রীতে এইরূপ ঘর করিয়া রুগ কাটিয়া যাইবে । (১) ক্রমিক নম্বর (২) প্রথম ভর্তির তারিখ (৩) পুনর্ব্বার ভর্তির তারিখ (Re-admission তাহাদের নাম কাটা যায় তাহাদের জন্য) (৪) বালকের পূর্ণ নাম (৫) জাতি (হিন্দু-ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, পাটনী ; মুসলমান-সিয়া, জুয়ি ইত্যাদি) (৬) বাসস্থান (গ্রাম ও জেলা) (৭) পিতার নাম (৮) অভিভাবকের নাম (৯) অভিভাবকের ঠিকানা (গ্রাম ডাক-ঘর, জেলা) (১০) বালকের বর্তমান বাসস্থান (হোটেল, গেস, আশ্রমের বাসা বা নিজ বাড়ী) (১১) বালকের ওয়ার তারিখ (সন ও মাস) (১২) বালকের অন্য তারিখ কি প্রকারে নিশ্চিত জানা গেল (কুষ্ঠী, অভিভাবকের এফিডেবিট, গ্রামের লোকের মাফা বা পিতা মাতার বর্ণনা) (১৩) পূর্বে কোন বিদ্যালয়ে পড়িয়াছে কিনা (সেই বিদ্যালয়ের নাম) (১৪) পূর্বে বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে পড়িয়াছে তাহার নাম । (১৫) পূর্বে বিদ্যালয়ের প্রদত্ত সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ (১৬) বিদ্যালয় পরিত্যাগের তারিখ (১৭) বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ । (১৮) মন্তব্য । (বালক যখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে সেই সময়েই ১৫।১৬ সংখ্যক ঘর পূরণ করিতে হইবে)

ডবল ফোল্ডার আড়ার কাগজে একটা বড় খাতা করিয়া, উভয় পৃষ্ঠায় না লিখিলে এতগুলি ঘর ধরিবেনা । ভর্তিপুস্তকের কাগজ ও বাইন্ডিং উত্তম হওয়া আবশ্যক । কারণ এ পুস্তক জাতি যত্নে রক্ষা করিতে হইবে । পর পৃষ্ঠায় দৈনিক-উপস্থিতি-রেজিষ্ট্রীর একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল

দৈনিক উপস্থিত একটী কর্ন রেখার দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে । অনুপস্থিত একটা বড় আকারের শুল্ক । কাজিরা ডাকিবার পরে কেহ দেহীতে আসিলে সেই বড় শুল্কের সম্য দিয়া উপস্থিতের রেখা টানিয়া শুল্কের পোট কাটিয়া দিবে । কেহ কোন কার্যোপযোগ্য বিদায় লইলে শুল্কের সম্য 'বি,' পীড়িত হইলে শুল্কের সম্য 'পা' রাখিবে । 'খাইয়া আসি নাই, নিমজ্ঞ আচে, বাড়ীতে কার্য আচে, পোট বাথা করিতেছে' ইত্যাদি আপত্তিতে যাহারা সময়ের পূর্বেই চানিয়া যায়, তাহাদিগের উপস্থিত চিহ্নের উপর বিপরীত দিকে আর এক দাগ কাটিয়া দিবে । কোন ছেলে কতদিন এইরূপ আপত্তি দেখাইয়া বাড়ী চানিয়া যায়, ইহাতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । মধ্য বা শেষ ঘণ্টায় রেজিষ্টারী করিতে যদি ছুটি এক জনকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে কর্ন রেখার দুই দিকে পেনসিল দিয়া দুইটা বিন্দু দিয়া রাখিবে । পরে অনুসন্ধান করিয়া তাহার অপরাধের বিচার করিবে ।

আবশ্যক হইলে বেতন আদায়ের অংশে আরও ২।৪টী ঘর বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে । জরিমানার এক ঘর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন (অনুপস্থিত, বেতন দানে বিলম্ব, অস্থায়ী আচরণ) ঘর করা যাইতে পারে । যে শুল্কের ছাত্র সংখ্যা কম সেখানে 'ভর্তিরেজিষ্টার নম্বর' না লিখিলেও চলে । কিন্তু ছাত্র সংখ্যা অধিক হইলে এই ঘর নিশ্চয় আবশ্যক । গার্টিকেকেট দিবার সময়, পরীক্ষার পাঠাইবার সময়, ভর্তি রেজিষ্টারের সহিত মিল করিয়া ছাত্রগণের বয়স লিখিতে হয় । এরূপ নম্বর থাকিলে ভর্তি রেজিষ্টার হইতে নাম বাহির করিতে বিলম্ব হয় না । ভর্তি রেজিষ্টারে ক্রমিক নম্বর বৎসর বৎসর বদলান নিষেধ । বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতেই একাদিক্রমে নম্বর ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । বিদ্যালয়ে কত ছাত্র পড়িল, ইহাতে তাহার সংখ্যা হইবে । যে ছাত্রের নাম কাটা যায়, যে পুনঃ ভর্তি হইলে, তাহার নামে তাহার সেই সাবেক নম্বরই লিখিয়া রাখিতে হইবে ।

এই ছুট পুস্তক ব্যতীত, শিক্ষকসমিতির হাজিরা পুস্তক, আয় ব্যয়ের হিসাব, বিলের নকল বহি, চিঠির নকল বহি, চিঠি পত্রাদি আটগুনা রাখিবার ফাইল, বিজ্ঞাপন পুস্তক, পরীক্ষার নথির খাতা, বাজে খরচের খাতা, পরিদর্শন পুস্তক প্রভৃতি আরও কতকগুলি খাতা নথিপত্রাদি। এ সকল খাতা প্রাপ্ত ও প্রাপ্য বিভাগের কতৃপক্ষগণ সময় সময় নিদেশ করিয়া থাকেন। ভর্তির রেজিষ্টার বা প্রজ্ঞাপন প্রাপ্ত কোন খাতা বা নথি সমস্ত খাতাই যেন এক আকারের হয়। সুগম্যাপের আকারেই মর্যাদা প্রচলিত।

এ সকল ছাড়া বিখ্যাত ক্রমে “লগবুক” (বিবরণী) নামক একখানা অতিরিক্ত পুস্তক ব্যবহৃত হয়। এষ্ট লগবুকে প্রতি শনিবারে বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন বিষয় সম্বন্ধে ভাল মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিবার সীতি নাই। নিম্নে এষ্ট লগবুক লিখিত বিবরণের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :-

১২/৭/০৮ শুক্রবার—রথযাত্রা উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিল।

১৩/৭/০৮ শনিবার—তৃতীয় শ্রেণীর প্রাপ্য চন্দ্র চন্দ্রবর্মা কলেবায় সারাদেশ।

১৪/৭/০৮ সোমবার বাবু চন্দ্র নাথ যোগ হয় শিক্ষক মাতৃশিক্ষ উপলক্ষে ১ মাসের বিদায় লইলেন। বাবু রাসনাথ রায় ডিহান গ্রামে ৩০ টাকা বেতনে ১ একমাসের জন্য নিযুক্ত হইলেন।

১৮/৭/০৮ বৃহস্পতিবার—অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য দৈনিক উপস্থিত সংখ্যা মথুরে কম হইয়াছে।

১৯/৭/০৮ শুক্রবার ইন্সপেক্টর সাহেব অধ্যাপকের খাজানা পরীক্ষা করিলেন।

২০/৭/০৮ শনিবার—ইন্সপেক্টর সাহেব প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থ পরীক্ষা করিলেন ও ভূগোল শিক্ষা দিবার প্রণালী দেখাইয়া দিলেন।

২৩/৭/০৮ মঙ্গলবার—বাজারে আশ্রম লাগার মর্যাদা ১টার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হইল। প্রথম শ্রেণীর জীনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর লাল মোহন মুন্সাজি আশ্রম দিবাংসে অন্য খুব পরিচয় করিয়াছিল।

১৮৮৭ বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যার সময় পুরস্কার বিতরণের সভা হয়। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত উদ্ভ্. সাহেব সভাপতি। রাধাচরণ রায় (উকিল) মহোদয় দে (ডেঃ মাঃ) ও নগেন্দ্র নাথ (শিক্ষক) বক্তৃতা করেন। মাজিষ্ট্রেট 'সুন্দর আবৃত্তির' জন্য ৩য় শ্রেণীর বিপিনচন্দ্র দাসকে ১০১ টাকা দিলেন। ঐ সাহায্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বোত্তম মুসলমান বালককে প্রতি বৎসর ৮১ টাকা দানের পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি হইলেন।

১৮৮৭ বুধবার—সাঁট সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলেন। ডিল দেবিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীতে শ্যামা চরণ দত্ত ও রাজচন্দ্র বসু পড়া শুনিলেন।

১৮৮৭ শুক্রবার—৭ম শ্রেণীতে ব্যাকরণের পুস্তক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শিক্ষককে মৌখিক শিক্ষা দিতে উপদেশ দেওয়া গেল।

১৮৮৭ শনিবার—বায়ামের পরীক্ষা গৃহীত হইল। প্রথম মুনসেফ বাবু কিশোরী মোহন সেন, উকীল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

১৮৮৭ সোমবার—মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

১৮৮৭ মঙ্গলবার—পুস্তক দেবিয়া নকল করার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর নবদীপ চন্দ্র দাসকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ইত্যাদি।

ভর্তি রেজিষ্টার, দৈনিক রেজিষ্টার, শিক্ষকদিগের হাজিরা পুস্তক, বিদ্যে নকল বহি, হিসাব পুস্তক প্রভৃতি খাতা লিখিবার সময় খুব সাবধানে লিখিত হইবে। কোনকপ ভুল হইলে তাহা একটা ল্যাঠনের দ্বারা কাটিয়া দিয়া পুনরায় লিখিবে; কিন্তু কখন ফুরি কিম্বা টেরজারের দ্বারা কাটিলে না। কোন খাতার কোন পাতা নষ্ট হইয়া গেলে তাহাও লম্বালম্বি টান দিয়া কাটিয়া রাখিবে, কিন্তু কখন খাতা ছিঁড়িবে না, কি খাতায় নুতন পাতা লাগাইবে না। বালকদের দৈনিক উপস্থিতির রেজিস্ট্রী অস্ত্রতঃ পনর বৎসর রক্ষা করিতে হইবে। ভর্তির রেজিষ্টার, শিক্ষকের হাজিরা বহি, চিঠির নকল বহি, লগ্নুক, চিঠিপত্রাদির ফাইল, যাহাতে কখনই নষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে।

এ সমস্ত নিয়ম বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিভাগের লোকালয় আঁটন হইতে গ্রহীত হইল । তবে আমাদিগের অবস্থা বিবেচনায় ছাত্র একটানে মনো-
কিঞ্চিৎ মাত্র পরিবর্তন করা হইয়াছে ।

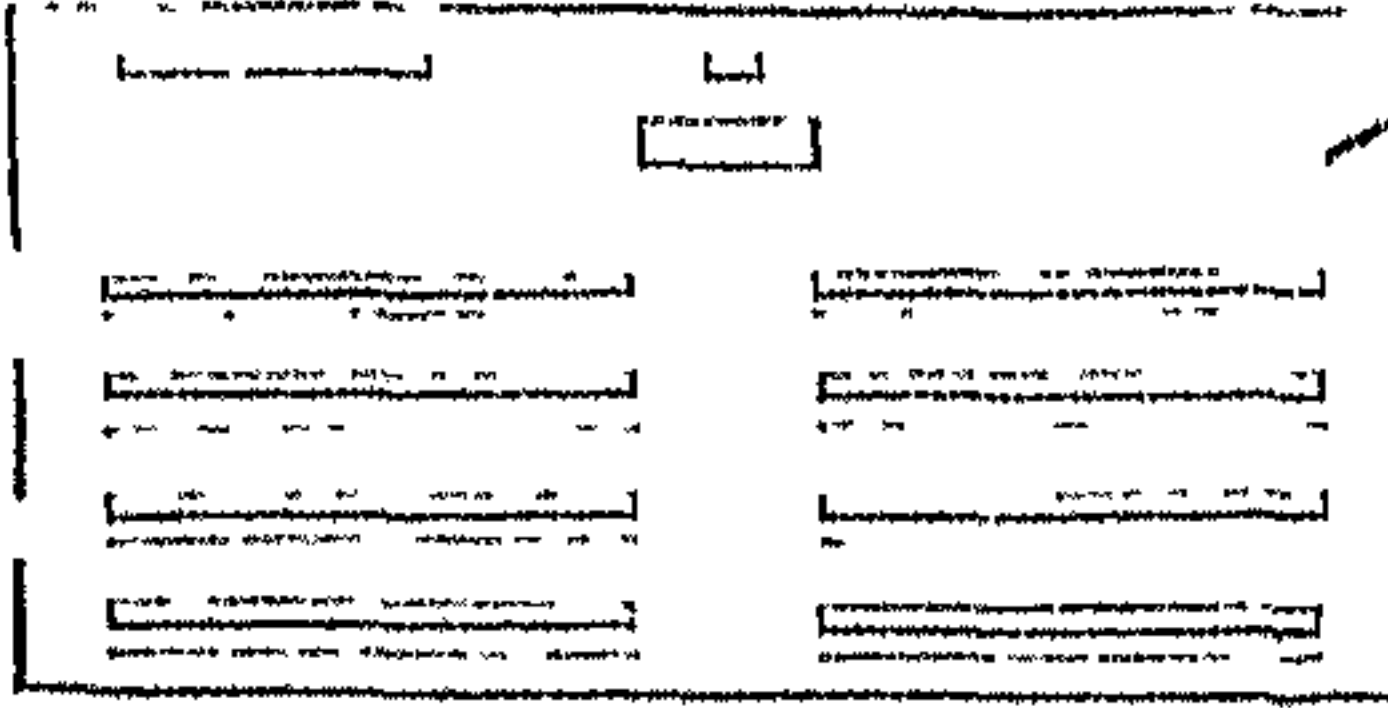
শ্রেণী বিভাগ ।—মান সংখ্যা, শ্রেণী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও
বিদ্যালয় স্থানের পরিমাণ দৃষ্টে শ্রেণী বিভাগ করিতে হয় । যে বিদ্যা-
লয়ে শ্রেণী সংখ্যা পরিমাণমত শিক্ষকসংখ্যা পাড়ে সেখানে বড় বিশেষ
বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না । কেবল নিয়ন্ত্রাণন নিয়মাই মনন করিলেই
চলিতে পারে :—

(১) যে দেওয়ানে জানাযা কি দরজা নাট মের দেওয়ানের দিকে
মুখ করিয়া বসিলে বসিবে । মানচিত্র, বোর্ড, ছাঁচ পত্রা ও মের দেও-
য়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে ।

(২) যে দিক হইতে কক্ষ আলোক প্রবেশ করে, সে দিক বাঁকেব
বাঁমে থাকিবে । কিন্তু যদি মকুব কি মাজাগা বিদ্যালয় হয়, তবে
আলোক বাঁকেব দক্ষিণে থাকিবে । ইংল্যান্ড, নাংলা নাম হইতে দক্ষিণে
লেখা হয় সুতরাং আলোক বাম হইতে আসিলে কাগজে হাতেব ছায়া
পড়েনা ; কিন্তু আরবী, পারসী দক্ষিণ হইতে বাঁমে লেখা হয়, সেই জন্য
এক্ষেত্রে আলোক দক্ষিণ হইতে আসিলেই হাতের ছায়া কাগজে পড়িবে
না । পশ্চাৎ হইতে আলোক আসিলে নিজের শরীরের ছায়ায় পুস্তকাদি
ছায়াযুক্ত হয় । তবে গৃহের মধ্যে যদি একপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না
হয়, তাহা হইলে সুবিধা মত যে কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ।
কিন্তু আলো প্রবেশের পথ কিছুতেই মেন সমুখে না পড়ে । হাতের
চক্ষুর যত্ননা উপস্থিত হইতে পারে ।

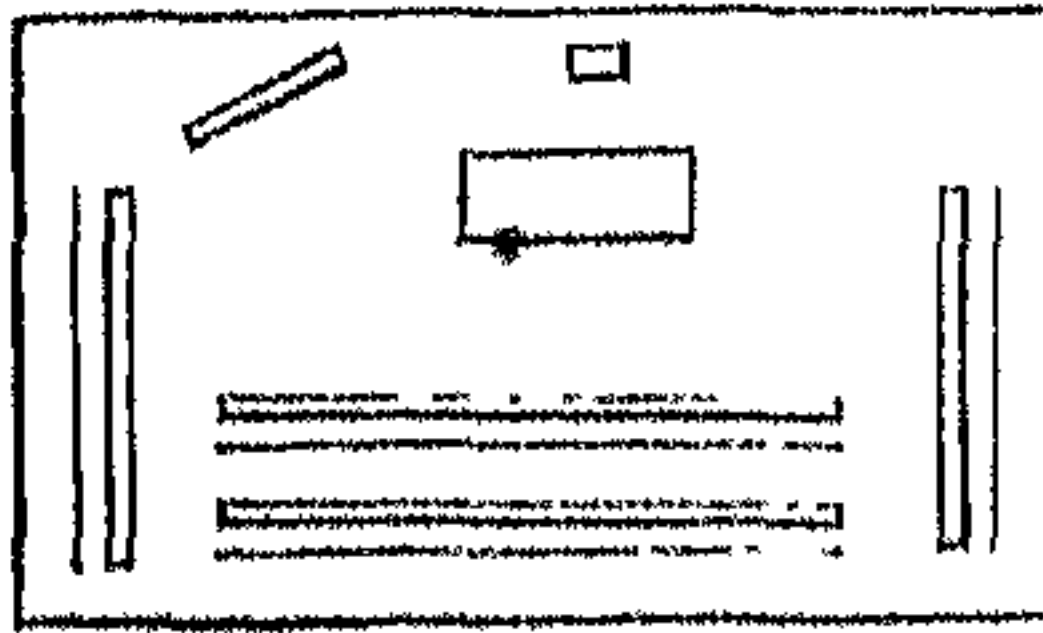
(২) বেঞ্চ ও ডেস্কগুলি পর পর—অর্থাৎ একখানের পশ্চাতে আর
একখান সাজাইতে পারিলে ভাল হয় । যদি শ্রেণীর বালক ৩০ এর
অধিক হয়, তবে শিক্ষকের বসিবার আসন ও টেবিল, একখানা তক্ত-

পোষের উপর বাখিয়া উচ্চ করিয়া দিতে হইবে । তাহা না হইলে পশ্চা-
তের ছাত্রগণ শিক্ষকের সমস্ত দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িবে । এক দাইনে
ছইখানি বেঞ্চ ও ডেস্ক দিগেই ভাল হয় । যথা—



৭ম চিত্র।—শ্রেণী বিভাগ (উত্তম ব্যবস্থা)।

যদি ছোট হইলে কি একপাশে বেঞ্চ সাজান অসুবিধা হইলে
বাগকেরা শিক্ষকের তিন দিকেও বসিতে পারে যথা :—



৮ম চিত্র —শ্রেণী বিভাগ (মধ্যম ব্যবস্থা)।

(৪) বাগকেরা একপাশে ফাঁকে ফাঁকে বসিলে যে তাহারা যেন বেশ
স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করিতে পারে । লিখিবার সময় যেন তাহাদের
হাত নাড়িতে অসুবিধা না হয় । দাঁড়াইলে যেন ডেস্কে বাধা না পায় ।

(৫) ছইখানি বেঞ্চের মধ্যে একপাশে স্থান থাকা আবশ্যক যে শিক্ষক
খুঁসিয়া খুঁসিয়া সকল বাগকের কার্য দেখিতে পানেন ।

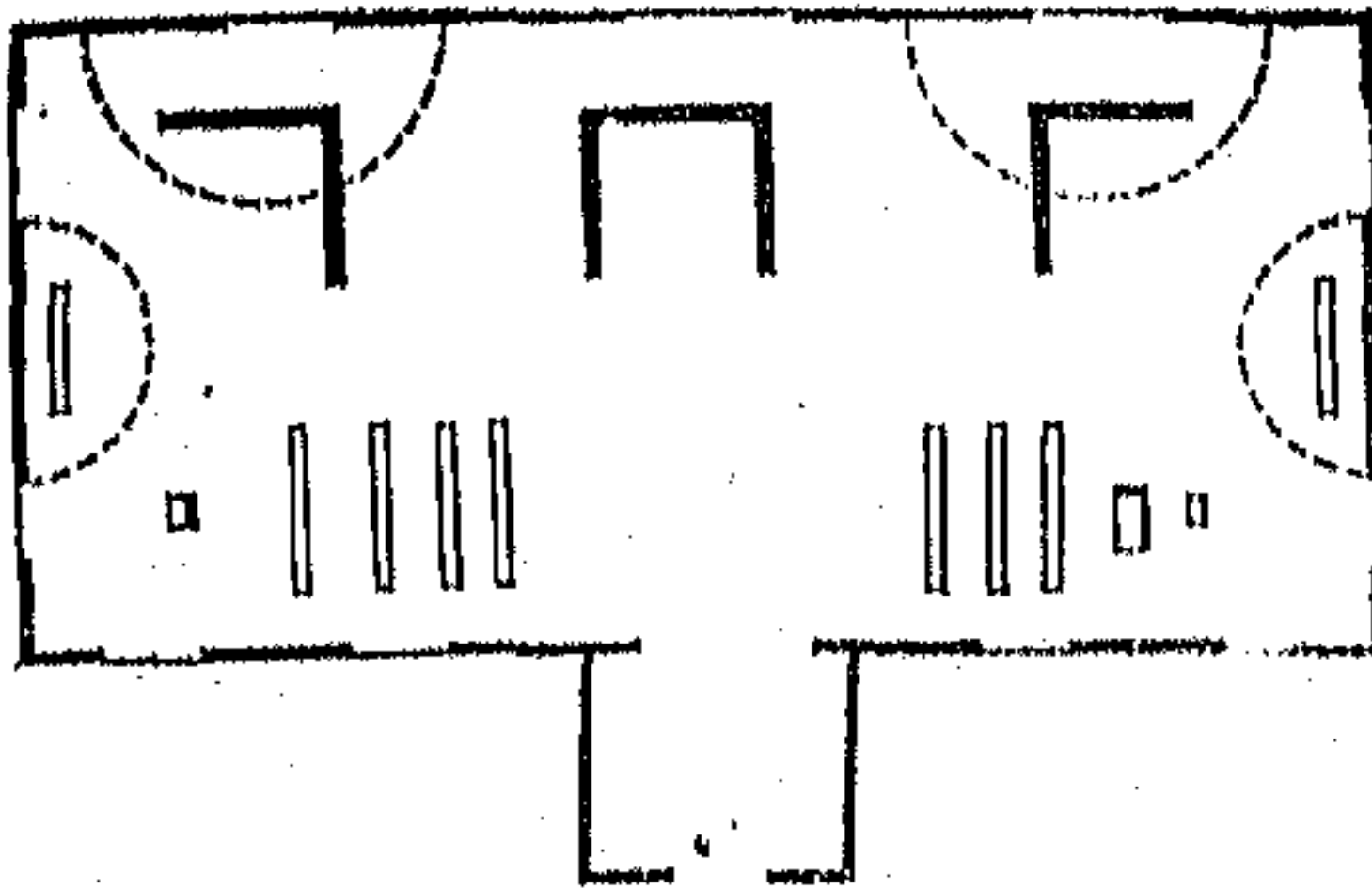
(৬) ব্ল্যাক বোর্ড শিক্ষকের পশ্চাতের দেওয়ালের, দক্ষিণে কি বামে, একধারে (ঠিক মধ্য ভাগে নয়) ঝুলান থাকিবে । শিক্ষকের দক্ষিণ হইলেই উত্তম । বোর্ডগুলি ক্রমে বাঁদা বা হইলে রক্ষিত হইলে, সেগুলিও এইরূপ স্থানেই রাখিতে হইবে । ঘর ছোট হইলে ঠিক পশ্চাতের দেওয়ালের সহিত সমান্তর না রাখিয়া একটু কাঁচা ভাবে রাখিলে সুবিধা হইবে (৮ টি বোর্ডের বোর্ডের অনুরূপ) । শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়াই তাহার বাম পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইবেন ও সেই স্থান হইতে হাত কিংবা দর্শনী কাঠির দ্বারা বোর্ড লিখিত বিষয় ছাত্রগণকে বুঝাইবেন । শিক্ষাদানে বোর্ডের মত আবশ্যকীয় আমবাধ খুব কমই আছে । সুতরাং এই বোর্ড অস্তুতঃ বৎসরে একবার রঙ করিবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য (পরিশিষ্টে রঙ করিবার প্রণালী লিখিত হইল) ।

(৭) যে স্থান হইতে শ্রেণীর সকল ছাত্র সহজে শ্রমণ করা যাইতে পারে শিক্ষক একপ স্থানে বসিবে ।

এইরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করিলেই শ্রেণী বিভাগ সুবিধা জনক হইতে পারে । কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণীর সংখ্যানুযায়ী শিক্ষক নাই সে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিভাগে বিশেষ বুদ্ধি খরচ করা আবশ্যক । একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এ বিষয়ের কিছু তথ্য বুঝান যাইবে । এ কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র, অবস্থা ভেদে ইহার পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে :—

মনে কর একটা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, অবস্থা সমান, ছাত্রজন শিক্ষক—একজন প্রধান ও একজন সহকারী বা একজন মনিটর, পাঁচটা শ্রেণী—১ম শ্রেণী (নিম্ন প্রাথমিক পাঠ্য), ২য় শ্রেণী (বোধোদয়), ৩য় শ্রেণী (শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ), ৪র্থ শ্রেণী (২য় ভাগ), ৫ম শ্রেণী (১ম ভাগ), এক ঘর । প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা বেঞ্চে বসে, অষ্ট তিন শ্রেণী মাটিতে চটে বা মাছরে বসে । এক শিক্ষককে এক

এসময়ে অষ্টতঃ দুইটা শ্রেণীর ভার লইতে হয় । একপ স্থলে নিম্নের চিত্রানু-
যায়ী শ্রেণী বিভাগ সম্ভবতঃ অনেক স্থলেই সুবিধা জনক হইবে :—



৯ম চিত্র ।—নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার শ্রেণী বিভাগ ।

(স্থল-কালরেখা-চিহ্নিত তিন শ্রেণীতে চট বা মাহুরের আসন; এই তিন শ্রেণীতে, তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থের ক খ শাখা বসে । অপর দুইটা শ্রেণীতে বেদা—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জায়) ।

এইরূপ শ্রেণী বিভাগ হইলে শিক্ষক এক স্থানে বসিয়াই ২ কি ৩ শ্রেণীর বালকগণকে সহজে কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন ।

যখন উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা কোন লেখার কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন তখন শিক্ষক নিম্নশ্রেণীতে সাহিত্যাদি পড়াইবেন আবার নিম্ন শ্রেণী যখন লিখিবেন কিম্বা কিওয়ারগাটেন খেলায় বাগ্‌নুত থাকিবেন, তখন শিক্ষক উপরের শ্রেণী পড়াইবেন । (এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা পর অঙ্কচ্ছেদে জষ্টব্য) বালকদিগকে কেবল সকল সময় বসাইয়া না রাখিয়া কোন কোন পাঠের সময় দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিলে ভাল হয় । অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিলে বালকেরা বিরক্তি বোধ করে ।

কোন কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সময় কি নিয়ম কি উচ্চ, সকল শ্রেণীর বালককেই বিন্দু ঘারা (৯৯৯ চিত্রে) চিহ্নিত স্থানে বৃত্তাক্ষের মত লাইনে দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। অক্ষ, জ্যামিতি, ভূগোল, সহজ ভূইয়, পদার্থ পরিচয় প্রভৃতি বিষয়গুলি দেওয়ালে মাপ কি ছবি বুলাইয়া বা বোর্ডের নিকট দাঁড়া করাইয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। ডাক নামতা, শতকিয়া, কড়াকিয়া প্রভৃতি গৃহের বাহিরে, বা বৃষ্টির সময় ভিতরে, এক লাইনে দাঁড়াইয়া পড়িবে। উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা এইরূপ দাঁড়াইয়া কোন কার্য্য করিবার সময় নিম্ন শ্রেণীর বালকেরা বেঞ্চে বসিয়াও কোন কোন কার্য্য করিতে পারে। এরূপ স্থান পরিবর্তনে বালকগণের বেশ ক্ষুদ্রি হয়।

সময় নির্দেশক পাত্র বা রুটীন। শিক্ষকের সুব্যবস্থা বিষয়ক কৃতিত্ব তাঁহার রুটীনে প্রকাশ। রুটীন প্রস্তুত করিতে বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়। শিক্ষকের সংখ্যা, তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষে পারদর্শিতা, শ্রেণীর সংখ্যা, শ্রেণীস্থ বালকদিগের চরিত্র, পাঠ দানের সময়, পাঠ্য বিষয়ের আধিক্য ও কাঠিগু, দৈনিক কার্য্যের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় উত্তমরূপ বিচার করিয়া রুটীন প্রস্তুত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ফলাফল এই রুটীনের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। রুটীন প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ কোনরূপ বাধাবাদি নিয়ম নাই, সমস্তই অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে পারিলে ভাল হয় :—

(১) রুটীন সাধারণতঃ তিন প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে :—প্রথম শিক্ষকগণের জন্ত রুটীন অর্থাৎ কোন্ শিক্ষককে, কোন্ ঘণ্টায়, কোন্ শ্রেণীতে কি বিষয় পড়াইতে হইবে। (এই রুটীনের মন্তব্যের ধরে প্রত্যেক শিক্ষক সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করেন তাহাও লিখিত থাকিবে) ২য়, কোন শ্রেণীতে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ শিক্ষক কি পড়াইবেন। (এই

কর্তীনের সমস্তব্যয় ঘরে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে কত খণ্টা করিয়া পড়ান হয় তাহা লিখিত হইবে) ও, ছাত্রদিগের অন্তঃকরণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কটীন । এই কটীনে সোন মঙ্গল প্রভৃতি বারক্রমে কোন খণ্টায় কোন শিক্ষক কি বিষয় পড়াইবেন তাহা লিখিত থাকিবে । ১ম ও ২য় প্রকারের কটীন আফিস ঘরে থাকিবে, ওয় প্রকারের কটীন শ্রেণীতে শ্রেণীতে বুলাইয়া দিতে হইবে ।

(২) প্রথমেই একটা স্থায়ী কটীন না করিয়া একটা অস্থায়ী (থসড়া) রকমের কটীন প্রস্তুত করিয়া লইবে । সেই কটীন অনুসারে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কার্য্য করিয়া যদি বুঝিতে পারা যে কটীন উপযোগী হইয়াছে তখন স্থায়ী কটীন প্রস্তুত করিয়া লইবে, ও সেই কটীন দৃষ্টে ২য়, ওয় প্রকারের কটীন প্রস্তুত করিবে । কটীন এরূপ সরল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখিতে হইবে যে পরিদর্শকগণ কটীন দেখিলেই যেন বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্য বুঝিতে পারেন ।

(৩) বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত কটীনের নিয়মের অত্যাধিকারিত নাই । বৎসরের প্রথমে যে শিক্ষক যে শ্রেণীতে যে বিষয় শিক্ষাদান আরম্ভ করেন, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যই করিবেন । বৎসরের মধ্যভাগে কোন শিক্ষকের পরিবর্তন হইলে তাঁহার স্থানীয় নূতন শিক্ষককে পূর্ব্ব শিক্ষকের কার্য্যই করিতে দিতে হইবে । ইহাতে এক আদর্শকে অনুবিদ্যা হইলেও তত ক্ষতি হইবে না । কিন্তু যাহারা বৎসরের প্রথম হইতে এক কার্য্য করিয়া আদিতেছেন তাঁহাদিগের বিষয় বা কার্য্যের পরিবর্তন হইলে, শ্রেণীর ক্ষতি হইবে, ও তাঁহাদের দায়িত্ব কমিয়া যাইবে ।

(৪) যে শিক্ষক যে বিষয় ভাল পড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে সেই বিষয়ই পড়াইতে দেওয়া উচিত । কিন্তু এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্রদিগের পর্য্যন্ত এরূপ ব্যক্তি হওয়া উচিত যাহারা নিজ নিজ শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ই পড়াইতে পারা—ডিল ড্রইং সমেত । কার্য্যসিদ্ধি (দারজিলিঙ্গের

নিকট) অবস্থিতি কালে দেখিয়াছি অধিকাংশ শৈশব সম্পূর্ণ ভিন্ন এক একজন শিক্ষকের হাতে । আমাদিগের স্কুলেও গুলে একাধিক নিয়ম ছিল এবং এক নিয়ম হইত যে ছেলেদের, মেয়েদের, খাড়াইয়া দিয়া ও গাঙ্গি নামকরণ হইয়াছিল । এখন আমাদের স্কুলেও একইরকম করিয়াছে । হঠাৎ কামের জীবন হঠাৎ বদলাইয়া আমাদিগের বোধ হয় না । আমরা সেই সাবেকী প্রথাকেই এখনও ভাঙি নাই । উপরোক্ত লেখক এক অনিষ্টকর না হইলেও, এক অসঙ্গত নীতি নিম্নলিখিত পক্ষে যে অনিষ্টকর তাহাও আর সন্দেহ নাই ।

(৫) যে সকল বিষয় পাঠে অত্যধিক মানাসক কাঁচিৎ হওয়া সে সমুদয় প্রথম ও তৃতীয় ঘণ্টায় পড়ানো হইবে । শেষ ঘণ্টায় মালকেরা ফ্রান্স ও পবিত্রমে কীর্ত্তন হইয়া পড়ে, সেই ওয়া শেষের দিকে সহজ ও সুপকর বিষয় দিতে হইবে । কোন বিষয় কি পরিমাণ কাকতালিক ভাষা নিয়ম ভাষিকা দৃষ্টে মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে । গণিত (পাঠ্যগণিত ব্যতীত অল্পাংশ বিষয়) শাস্ত্রকে সঙ্গোপন করিয়া বিষয় ধরিয়া, যদি ভাষার কাঠিন্যকে এক শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে অল্পাংশ বিষয়ের কাঠিন্য নিম্নলিখিতরূপে কমিয়া আসিবে :—

গণিত	১০০	পাঠ্যগণিত	৮২
সংস্কৃত	৯২	উর্দু বা হিন্দি	৮২
আরবী		মাতৃভাষা	৮০
ইংরেজী	৮০	পদার্থবিজ্ঞান	৮০
ঐতিহাস	৮২	চিকিৎসা	৭৭
ভূগোল	৮৫	নীতি	৭৭

(জ্ঞান পণ্ডিত বা ডক্টর ওয়াগনারের মতাবলম্বনে)

কিন্তু এ মত সর্ববাদী-সম্মত নহে । সংসারে কোন মত বা সর্ববাদী-সম্মত হয় । আমাদের কর্তৃপক্ষেরা নিম্নলিখিত প্রথমে পাঠ্যগণিত পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তৎপরে ভূগোল ও তৎপরে সাহিত্য ।

অগ্রাণু বিষয় সর্বশেষে । যাহা হউক এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা অনেকটা শিক্ষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে ।

(৬) প্রথম ঘণ্টায় বা অবকাশের অব্যবহিত পরঘণ্টায়, যেথা কি চিত্তাকর্ষণের কার্য্য করাইবে না । অনেক দূর হঠাৎ হাঁটিয়া আসিলে বা কিছুক্ষণ কোন পরিশ্রমের কাজ করিলে, শরীরে যে চাপড় লাগিলে তাহা শীঘ্র নিবানিত হয় না । সুতরাং এষ্টরূপ পরিশ্রমের পর কলম কি পেনসিল ধরিলে, হাতের চাপড়ায় বশতঃ যেথা বা রেখা মনোমত হইবে না । বিদ্যালয়ের প্রথম ঘণ্টাতেও ব্যায়ামাদি করান বাঞ্ছনীয় নহে । বালকেরা আহান করিয়াই বিদ্যালয়ে আইসে, এমত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া ভ্রিল করিলে পেটে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা ।

(৭) ছোট ছোট বালকেরা কোন বিষয়ে এক সঙ্গে অধিকক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে না । এই নিমিত্ত নিম্ন গ্রাইমারী বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণীতে কোন বিষয় এক সঙ্গে ২০মিনিটের অধিককাল শিক্ষা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ; উচ্চশ্রেণীতে ৩০ মিনিট । উচ্চপ্রাইমারীতে ৪০ মিনিট ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৪৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এক বিষয় চর্চিতে পারে । তবে বিষয়ের কাঠিন্য ভেদে সময়ের ভারতম্যও হইয়া থাকে ।

যদি শ্রেণীর সংখ্যার অনুযায়ী শিক্ষকসংখ্যা না থাকে বা যদি এক শ্রেণীর সমস্ত ভার এক জনের উপর না থাকে বা যদি শিক্ষককে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্রেণী বদলাইতে হয়, তাহা হইলে এক বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সময়বিভাগ অস্ববিধাজনক হইয়া উঠে । যে নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ২ জন মাত্র শিক্ষক কিন্তু শ্রেণী ৫টা, সে স্কুলের কিরূপ রুটীন করিলে চলিতে পারে অপর পৃষ্ঠায় তাহার একখানা আদর্শ দেওয়া গেল । কিন্তু যে বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক সে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনায় উচ্চ শ্রেণীর বালকগণের অনেকটা সাহায্য লওয়া দরকার হয় । এ কার্য্যের রুটীন করা সম্ভব । শিক্ষকের শক্তি সামর্থ্য

ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর । যাহাকে “পড়ান” বোলে একজন শিক্ষকের দ্বারা পাঠশ্রাবণীতে সে কার্য চলে না । তবে বাড়ী হইতে বাসকেরা যাহা শিখিয়া আনিবে, তাহার পরীক্ষা লওয়ায় কার্য চলিতে পারে । অভিনিয়ম সংখ্যায়, ছাত্রবৃদ্ধি ধূনে ৩ জন শিক্ষক, এক জন মনিটর ; উচ্চপ্রাথমিক ধূনে ২ জন শিক্ষক, একজন মনিটর ; ও নিম্ন প্রাথমিক ধূনে একজন শিক্ষক ও একজন মনিটর থাকা আবশ্যক ।

(৮) কোন পুস্তকের কতদূর এক বৎসরে পড়াইতে হইবে, প্রথমে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে । প্রত্যহ কোন বিষয়ে কি পরিমাণ আলোচনা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া রুটীনে প্রস্তুত করিতে হইবে ।

(৯) একটা নির্ধারিত সময়ের অন্তরে, প্রত্যেক বিষয়ই যাহাতে রুটীনে নিবিষ্ট হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে অর্থাৎ ক্রমাগত ও সার্বভৌম পড়ান হইতেছে বা অঙ্কই কষাণ হইতেছে সেরূপ ব্যবস্থা করা সুবিধা জনক নয় । বিষয়ের পরিবর্তনে কার্যে আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয় । এইজন্য রুটীনে এক বিষয়ই প্রত্যহ বা সমস্ত ঘণ্টায় না পড়াইয়া একটা নির্ধারিত সময়ের অন্তর, প্রতি সপ্তাহে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ।

রাধানগর নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা ।

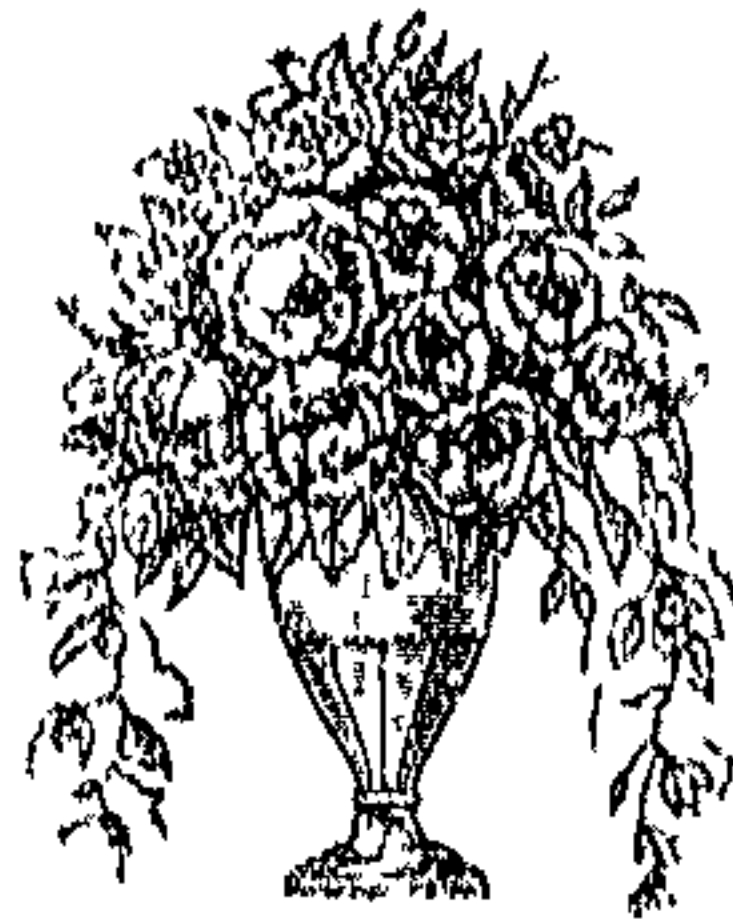
১৯০৭ সনের সময় নির্দেশ পত্র ।

সময়	প্রথম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী (ক)	৪র্থ শ্রেণী (খ)
১১—১১৩	সাহিত্য (প্রথম শিক্ষক)	দলিল বা চিঠি লেখা	সাহিত্য (দ্বিতীয় শিক্ষক)	পুস্তক সেবিয়া লেখা	বীজ জ্ঞান
১১৩—১২	পূর্বঘণ্টায় সাহিত্য পাঠের সারাংশ লেখা বা দলিল ও চিঠি লেখা	সাহিত্য (প্রথম শিক্ষক)	পুস্তক সেবিয়া লেখা	বর্ণপরিচয় (২য় শিক্ষক)	বাঁঠী জ্ঞান ।

সময়	প্রথম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী (ক)	৪র্থ শ্রেণী (খ)
২—১২	পাঠীগণিত (১ম)	প্রাতলিপি (ছাত্রের সাহায্যে)	বীজ বা কাঠী সাজান ।	বীজ বা কাঠী সাজান ।	বর্ণপরিচয় (২য়)
৩—১	অঙ্কন ।	অঙ্কন ।	পাঠীগণিত (১ম)	পাঠীগণিত (১ম)	লেখা (২য়)
১—১৩	প্রাতলিপি (ছাত্রের সাহায্যে)	পাঠীগণিত । (২য়)	অঙ্কন ।	অঙ্কন । (১ম)	অঙ্কন । (১ম)
১৩—২	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (১ম)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (১ম)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (২য়)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১০ মিনিট (২য়)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১০ মিনিট (২য়)
২—২৩	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা
২৩—৩	ডাকনামতা সও- য়াইয়া দেড়িয়া ম. ও বু. মানসাক্ষ মো. বু. শু. (১ম)	ডাকনামতা সও- য়াইয়া দেড়িয়া ম. ও বু. মানসাক্ষ মো. বু. শু.	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া বুড়ি পন চোক সের কাঠা ইত্যাদি (২য়)	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া গণ্ডা বুড়ি পন চোক ইত্যাদি	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া গণ্ডা বুড়ি পন ইত্যাদি ।
৩—৩৩	পরিমিতি ম. বু. জমিদারী মহাজনী মো. বু. শু. (১ম)	পরিমিতি ম. বু. জমিদারী মহাজনী মো. বু. শু.	প্রাতলিপি (২য়)	০	০
৩৩—৪	ভূগোল (মো. বু. শু. পদার্থপরিচয় ম. বু. (১ম)	ভূগোল ম. বু. পদার্থপরিচয় মো. বু. শু. (২য়)	০	০	০
৪—৪৩	কৃষি মো. বু. শু. ঐতিহাসিক গল্প ম. বু. (১ম শিক্ষক)	০	০	০	০

প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ নিরূপিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে আসিতে হইবে । ৫ মিনিট পূর্বে শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া রেজেষ্ট্রী

କରିଦେଉ ହୁଏନେ ଓ ହାଜିରୀ ଲେଉଟେ ହୁଏନେ । ବାଲକେରୀଓ ୧ମ ଧାଂଟା ବାଜିବାର ୫ ମିନିଟ ପୂର୍ବେହି (ଓୟାନିଂ ବା ମତକ କରିବାର ଉପରେ ସେ ଧାଂଟା ଦେଉଆ ହେଉ ମେହି ମଞ୍ଜେ) ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଗମନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଲିକ ୧୨ଟାମ ଗଭୀର ଚଢ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନେ । (ଉପରେର କଟାରେ ସେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଉନା ମେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହୁଏନେ ସେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡାହାଣ ଓଡ଼ାବନ୍ଧନ କରିବେନ)





দ্বিতীয় অধ্যায়—শুশাসনবিষয়ক ।



শাসন বলিলে প্রধানতঃ ছাত্র শাসনই বুঝিতে হইবে । তবে বিদ্যালয়ের চাকর চাকরাণী ও সময়ে সময়ে কোন কোন সহকারী শিক্ষককেও শাসন করা আবশ্যিক হইয়া থাকে । কিন্তু সকল শাসন অপেক্ষা বড় শাসন ‘আত্মশাসন’ । যিনি নিজকে শাসন করিতে জানেন না তিনি অত্মকে

শাসন করিবেন কিরূপে ? অত্মকে যাহা করিতে উপদেশ দিবে বলিয়া মনে কর, সর্বপ্রকারে তাহা নিজে প্রাণপণ যত্নে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে । কার্য্য ও মুখে এক না হইলে ভোগার শিক্ষায় বা শাসনে কোন ফলোদয় হইবে না । বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে সর্বপ্রধান গুণ ‘সময়-নিষ্ঠা’ । সময়নিষ্ঠ শিক্ষক অতি মূর্থ হইলেও বালকদিগের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারেন, সময়াপহারী বিদ্বান শিক্ষক তাহার শতংশের এক অংশ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ । “নিরূপিত সময়ে নিরূপিত কাজ করিতেই হইবে” বিদ্যালয়ের কার্য্যে অক্ষম লাভ করিবার ইহাই মূলমন্ত্র । যে শিক্ষক প্রত্যহ নিরূপিত সময়ের কিছু পূর্বেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া থাকেন, ‘শিক্ষকের হাজিরা’

পুস্তকে যীশুর নাম কোন মনে ব্যবহার করা যাবে না। 'কম' * টিহু ঘাবা কল্যাক্ত হম না, যিনি খুচা বাবিনানান্নেই লেশী.৩। পরা উপস্থিত হন—বিশ্রামগঃ নামগা বুঝায়েন বা লাইতবেয়াই.৩ নামগা বয়া গলে কাবতায় কবেন না, যিনি লেশীই.৩। পরা কাগা আনন্ত কাবয়া থাকেন—বালকদিগের সঙ্গে বা.৩। গল বা কোতুক কাগা সময়সহবণ করেন না—তিনিই, তাঁরই বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কম হইবে। 'ডবল শিক্ষক' পদবাচ্য। যদি বাঞ্ছনা তাঁরই শিক্ষকগণের সঙ্গে একমুখে প্রকাশের উপযোগী কোন কথা থাকে, তবে সে কথা "সময়নিষ্ঠ"।

(১) সময়নিষ্ঠা।—প্রশাসনের দ্বারা প্রকৃত নাও করিতে হইবে সমস্তপ্রথমে নিচে সময়নিষ্ঠ হইবে ও বালকদিগকে, মতকারী শিক্ষকগণকে এবং ভূতাবগণকে সময়নিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিবে। মতদেব বালকগণ আত্মকাল কিছু পরিমাণ সময়নিষ্ঠ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয় পরীক্ষার অবস্থা এখনও অপরিণীত থাকিয়াছে। তাঁদের তাহ পূর্বে যদিও কিছু উন্নতি বুঝিতে পারা যায় কিন্তু সম্যবাসনা, উচ্চ জাহ্নমারী ও নিম্ন জাহ্নমারী স্কুলের অবস্থা লোচনীয়। বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ২টা পর্যন্ত ছাত্র আগিতেই থাকে। শিক্ষকগণের অবস্থাও ভয়ঙ্কর। প্রধান আপত্তি "সারা হইয়াছিল না"। এ অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শিক্ষকগণকে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবে, আর ছাত্রের জন্ত অপেক্ষা না করিয়া যথাসময়ে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। যদি বালকগণের বিষয় থাকে যে শিক্ষকগণও দেরী করিয়া স্কুলে যাইয়া থাকেন, আর তাহাদিগের স্কুলে উপস্থিত না হওয়া

* শিক্ষক যে সময় বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকেন তাহা 'শিক্ষকগণের জাজিয়া' পুস্তকে লিখিতে হয়। যদি কেহ বিলম্বে আসেন তবে তাঁহার আগমনের সময় প্রধান শিক্ষক লাল কালির দ্বারা (x) চিহ্নিত করিয়া রাখেন। পরিদর্শকগণের সহজেই গেই দিকে দৃষ্টি পড়ে।

পর্যন্ত অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ করেন না, তখন তাহারা কেন দেরী করিবেনা ? যদি ছুই তিন দিন এরূপ বুদ্ধিতে পারে যে শিক্ষক তাহাদের অল্প অপেক্ষা করেন না, তখন তাহারাও যথাসময়ে উপস্থিত হইতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে । কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটা কথা আছে, বালকেরা যে বিদ্যালয়ে আসিবে তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ চাই । অধ্যাপনায় যদি বালকেরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, যদি তাহারা বুদ্ধিযা থাকে যে বিদ্যালয়ে গেলেই নূতন নূতন আনন্দদায়ক জ্ঞানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কত নূতন জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়, কত রকমের নূতন খেলা খেলিতে পারা যায়, শিক্ষকদিগের নিকট কত আশোদেব গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, কত আদর, কত যত্ন, ভালবাসা পাওয়া যায়, তবে তাহারা সমস্ত ফেলিয়া, এমন কি না খাইয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে চলিয়া আসিবে । বালকের আগ্রহ ও সময়নিষ্ঠা দেখিলে পিতামাতাও তাহাব অল্প উপযুক্ত সময়ে আগারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন । অনেক সময় অভিভাবকেরা শিক্ষকদিগের বিশৃঙ্খল কার্য প্রণালী দেখিয়া তাঁহাদিগের বালকগণের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হন না । শিক্ষক গ্রামের আদর্শ—জ্ঞান রাজ্যের রাজা । যদি শিক্ষক নিজের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা কেবল যে ছাত্রগণের কল্যাণ হইবে এমন নহে, ছাত্রগণের পিতামাতার, এমন কি সমস্ত গ্রামেরই প্রভুত উপকার হইবে ।

বালক দেরী করিয়া বিদ্যালয়ে আসিলে তাহার বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করিবে, সে কারণ প্রকৃত কিনা তাহা নির্ধারণ করিবে ; ৩ দিনের অধিক এই অপরাধ করিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেনা । সময় নাই, অসময় নাই, যখন ইচ্ছা তখন যদি বালকেরা শ্রেণীতে প্রবেশ করে, তবে অল্প বালকগণেরও মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায় । বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া বালকগণের এই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে হইবে ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা ।—শিক্ষক নিজে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে বিদ্যালয়ে আগিবেন । বিদ্যালয়ের অথবা এক পোষাক পৃথক রাখা উচিত । গবাবও ঠোঁট পরিষ্কার—একখানা পরিষ্কার ধুতি, একটা পরিষ্কার জামা ও একখানা পরিষ্কার চাদর । বিদ্যালয়ের দ্বা-
 গুলি যথাস্থানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তাহাও তাহান অঙ্গসম্মান
 করিবেন । ঘরের দরজা, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক, ঘরের মেঝে উৎসুক রূপ
 পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না তাহা দেখিয়া লইবেন । রেজিস্ট্রারী পুস্তক,
 দোয়াত, কলম, চক, ঝাড়ন, প্রভৃতি শ্রেণীতে শ্রেণীতে দেওয়া হইতেছে
 কি না তাহাও দেখিবেন । তারপর বালকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা
 তাহার তত্ত্ব দিইবেন । ছেলেদের দাঁত, হাত, হাতের নখ, পা পরিষ্কার কি
 না ; ধুতি, জামা, চাদর, প্রভৃতি পরিষ্কার কি না ; পুস্তক, খাপত্র, শেট
 পরিষ্কার কি না, এই সকল পরীক্ষা করিবেন ও তাহান প্রতিবিধানের
 উপায় বলিয়া দিবেন । বালকেরা এসমস্ত বিষয়ে অনোর বিনা সাহায্যে,
 সামান্য বা বিনা ব্যয়ে, নিজেরাই মনোযোগী হইতে পারে ও এ সমস্ত
 মলিনত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে । বালকদিগের মাথার চুল পূর্ব ছোট
 করিয়া কাটা উচিত । যে সকল বালকের মাথায় বড় বড় চুল, তাহারা
 চুলগুলি হাত দিয়াই হউক কি চিরণী দিয়াই হউক, পরিপাটী করিয়া
 রাখে কিনা ; তাহাদের জামার বোতাম আছে কি না, আর মেজলি আঁটে
 কিনা তাহাও দেখিবেন ।

কারসিং ডিক্টোরিয়া পুন্ডে সাহেবের ছেলেরা পড়ে । পুন্ডের সঙ্গে ছাত্রনিবাস
 আছে, বালকেরা সেইখানে থাকে । তাহাদের মাথার চুল পূর্ব ছোট করিয়া কাটা ; পোষাক
 পরিচ্ছন্ন এক রকমের সামান্য থাকী কাপড়ের । ইহাই ব্রহ্মচর্য, আমাদিগেরও মেনা
 ইহাই ছিল । আর এখন আমাদিগের কি হইয়াছে ? আমাদের পুন্ডের ছাত্রগণ সিঁধির
 উপর এলবার্ট কাটিয়া, ডবল শেট মাটির উপর হাই কলার আঁটিয়া, চাদরখানি নানা
 রকমের চুমট করিয়া, বাশবেড়ের কার্তিক মাজিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত । আবার কেহ
 হয়ত দুই পায়ে দুই রকমের জুতা পরিয়া, লজ্জা নিবারণ হওয়া স্বকঠিন—এরূপ ছিল

বস্ত্র পরিধান করিয়া, ধোয়া জামার উপর ময়লা চাদর গায় দিয়া, বড় বড় চুল গুলি পাগলের মত এলো মেলো করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় । ছইই দোষের, কিন্তু বিলাসিতায় বালকগণ মত অধঃপাতে যায়, নোংরাগীতে তত নয় । বিলাসিতার অন্তরালে কত যে কুৎসিত ভাব প্রকাশিত থাকে, তাহা বলা বাহুল্য । অতএব সর্বপ্রথমে এই বিলাসিতার ভাব বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে । ছাত্রগণের জন্ত একটা বিশেষ পোষাকের ব্যবস্থা করিলে কেমন হয় ?

তার পর বিদ্যালয়ে আসিয়া পুস্তকগুলি গুছাইয়া রাখে কি না; ছাতা গুলি ঠিক স্থানে রাখে কি না; গায়ে চাদর দিয়া বেশ ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চে বসিয়া থাকে কি না; পা নাচান, মাথা চুলকান, পান কি কাপড় চিবান, পেনসিল কাগড়ান, প্রভৃতি কুঅভ্যাসে আসক্ত কি না ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে । ছুরি দিয়া বেঞ্চ, ডেস্ক কাটা, দেয়ালে পেনসিল দিয়া লেখা, ঘরে খুঁখু ফেলা, কলম ঝাড়িয়া কালি ফেলা প্রভৃতি আরও অনেক রোগ আছে । শিক্ষক খুব সতর্ক না থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্য চালাইতে পারিবেন না । যখন যে কোন জটী চোখে পড়িবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে হইবে । যদি ছাত্রেরা একবার বুঝিতে পারে যে শিক্ষকের চক্ষু খুব তীক্ষ্ণ, তাহা হইলে তাহারা আর নিজ নিজ বদ অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে সাহস করিবে না ।

(৪) নকল করা ।—রোগের প্রতিকার অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । নকল করিলে বালককে শাস্তি দিতে হইবে ইহার ব্যবস্থা না করিয়া যাহাতে নকল করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সম্ভব । পরীক্ষার সময় বালকগণকে যতদূর ফাঁকে ফাঁকে বসান যাইতে পারে তাহার বিধান করা কর্তব্য । সম্মুখে পুস্তক, খাতা বা কোনরূপ কাগজ থাকিলে, তাহা অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতে হইবে । আর যাহারা তত্ত্বাবধান করিবেন, তাহারা খবরের কাগজ না পড়িয়া, যাহাতে বালকগণের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখেন মেরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেও নকল করিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হয়। নীচের শ্রেণীর অর্থাৎ ১০।১২ বৎসর বয়সের বালকের পকেটে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ ইহাতে একটু অপমানিত মনে করে। পরীক্ষায় তত্ত্বাবধান ভাল হইলে, পকেটে কাগজ থাকিলেও বাহির করিতে সাহস পাইবে না। বালকদিগের শয়তানী নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়, পায়ের নীচে জুতার মধ্যে কাগজ রাখে, কাছার সঙ্গে পুস্তকের পাতা বাঁধিয়া রাখে, কোটের আন্তর বা শার্টের কাফের নীচের পিঠে ইতিহাসের তারিখ লিখিয়া আনে, হাতে অতি সূক্ষ্মভাবে পেনসিল দিয়া কত কথা লিখিয়া রাখে। যদি চোরের মত সমস্ত বালকের সমস্ত কাপড়চোপড় ও হাত পা পরীক্ষা করিতে হয়, তবে সে এক বিরাট বাপার হইয়া পড়ে। আবার ততদূর করিলেও অনেক সময় মরিতে পারা যায় না। আর ভদ্র সন্তানদিগকে একটা সাধারণ পরীক্ষা গৃহে এরূপ ভাবে খানাতলাগীর অধীন করা উদ্ভোচিতও নহে। একটু মতর্ক দৃষ্টি থাকিলেই পরীক্ষা স্থলে কেহ কোনরূপ অছায় কার্য করিতে সাহস করিবে না। নিতান্তই যে বালক এইরূপ অছায় উপায়ে পরীক্ষা পাশ করিতে কৃতসম্মম, তাহাকে পরীক্ষা দানে বঞ্চিত করিবে। অল্প শ্রেণীতে উঠিবার জন্য সে যে অছায় উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহার ফল, সে এইরূপে হাতে হাতেই ভোগ করিবে।

শ্রেণীতেও একজনের অঙ্ক দেখিয়া অল্প নকল করিতে চেষ্টা করে। ইহা নিবারণের জন্য কেহ কেহ, একটি অঙ্ক না দিয়া এক সময়ে এক রকমের ছুটী অঙ্ক কসিতে দিয়া থাকেন। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যক বালকেরা একটা অঙ্ক কসে; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি জোড়সংখ্যক বালকেরা অল্প অঙ্ক কসে। কাজেই কেহ কাহারও নকল করিতে সুবিধা পায় না। কেহ কেহ আবার বেঞ্চের এদিক ওদিক

করাইয়া অর্থাৎ প্রথম বাগক উত্তর মুখে, দ্বিতীয় বাগক দক্ষিণ, তৃতীয় উত্তর, এরূপ ভাবে বসাইয়া দেন। ইহাতেও নকল করার অসুবিধা হয়।

আবার শ্রেণীতেও পরীক্ষা হলে এক বাগক অল্পকে ফুস্ ফুস্ করিয়া নানা কথা বলিয়া সাহায্য করিতে বা গাইতে চেষ্টা কবে। শ্রেণীতে ছুই এক দিন খুব কড়া শাসন করিলে ও পরীক্ষা স্থান হইতে একবার ২।১ জনকে বাহির করিয়া দিলে আর কেহ এরূপ করিতে সাহস করিবে না। ফল কথা শিক্ষককে সর্বদাই চক্ষু কর্ণ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

এ সমস্ত ৩ প্রতিকারের কথা। কিন্তু এ রোগের মূল কোথায়? প্রায়ই দেখা যায় যে বাগক নিজের অজ্ঞতা লুকাইবাব জন্মই এরূপ করিয়া থাকে। এরূপ অজ্ঞতা লুকাইবাবই বা কারণ কি? শিক্ষকের কঠোর শাসন বা পিতামাতার ভীষণতার ভয় বা অন্যের জ্ঞানের সহিত নিজের জ্ঞান যোগ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুরী লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। এই সমস্ত অসুগুণ কবিয়া তাহার প্রতিকার করা সুশিক্ষকের কর্তব্য। সে না জানে তাহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। শাসনের আধিক্যে বাগককে ভীত করিয়া না তুলিলেই, সে সরল ভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিবে। বাগক যদি বুঝিতে পারে যে শিক্ষক তাহাকে সময়েই সর্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তবে সে নিজের অজ্ঞতা গোপন করিবে না।

বাগকদের মনে এই সকল অজ্ঞান কার্যের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা উপস্থাপন করা দিতে পারিলে, সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয়। উচ্চশ্রেণীতে এইরূপে অনেক সময় বাগকদিগের সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণী পরিচালনা করিয়া গিয়া দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিক কেহ নকল করে নাই। যদি প্রত্যেক শ্রেণীতে অন্ততঃ একটি ছাত্র এরূপ ভাবে গঠিত করা যায় যে, সে এ সকল কার্য সর্বাস্থঃকরণে ঘৃণা করে, তবে তাহার সম্মুখে কোন বাগক কোনরূপ অন্যান্য কার্য করিতে সাহস করিবে না।

(৫) সাধারণ ছুটোগী :-—বালকেরা মিথ্যা কথাও অনেক সময় ভয় বশতঃ বলিয়া থাকে । কোন একটি অন্যায় কার্য করিয়াছে, কিন্তু পাছে শ্রীকার করিলে শাস্তি পাইতে হয়, এই ভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলে । আমরা অবশ্য বালককে ভাল করিবার জন্যই কঠোর শাসন করিয়া থাকি ; কিন্তু কঠোর শাসনে সকল সময়ে স্ফুল্প পাইয়া যায় না । যদি কঠোর শাস্তির ভয় না থাকিত তবে বালক তাহার অন্যায় কার্য গোপন করিতে চেষ্টা করিত না । আবার অন্য পক্ষে কঠোর শাসনের ভয় না থাকিলেও বালক অন্যায় কার্য করিতে ভয় করিবে না । কি প্রণালী অবলম্বন করিলে যে ছকুণ রক্ষা হয় তাহা নির্দেশ করা শক্ত । সত্যানুরাগ অনেক পরিমাণে পিতা মাতার দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে । যদি বালক আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও শিক্ষককে সত্যনিষ্ঠ দেখে তবে সেও সত্যনিষ্ঠ হইতে যত্ন করিবে ।

কোন কোন বিষয়ে শিক্ষক একটু সাবধান হইলে, মিথ্যা কথনের প্রবৃত্তি কিছু কমাইতে পারেন । বালক পড়া অভ্যাস করে নাই, কি বাড়ী হইতে অঙ্ক কসিয়া আনে নাই, কি বিদ্যালয়ে বৃথা কারণে অনুপস্থিত হইয়াছে, এ সমস্ত বিষয় কোনরূপ শাস্তির বাবস্থা না করিয়া, প্রথম প্রথম কার্য্যে অবহেলার কারণ অনুসন্ধান করাই কর্তব্য । শাস্তির ভয় না থাকিলে বালক সরল মনে কারণ বলিয়া ফেলিবে । সত্যকথনের অভ্যাস হইয়া গেলে আর মিথ্যা বলার নিকট সহসা তাহাদের প্রবৃত্তি যাইবে না । সত্য বলায় যে পরকালে সদগতি হইয়া থাকে বা মিথ্যা বলায় যে নরকগামী হইতে হয়, ইহা বালকেরা বুঝিবে না । মাহাতে তাহাদের সত্য কথনের অভ্যাস হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে । অভ্যাসেই মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয় ।

বালকদিগের মধ্যে কখন কখন একে অন্যের জিনিস চুরি করিয়া থাকে । কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দণ্ডবিধি আইনের যে “চুরি” বুঝিয়া

যাকি এ 'চুরি' সেরূপ চুরি নহে । অন্যের কোন জিনিষ নিজের পছন্দ হইল, সে সেটি সরাইয়া ফেলিল । এইরূপ সরল ভাবেই অনেক চুরি হইয়া থাকে । ইহাতে যে একটা ভীষণ স্বার্থের ভাব আছে কি অপরের মনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা আছে তাহা ভুত নহে । বাল্যকালে সামান্য সামান্য চুরি বোধ হয় আগাদিগের মধ্যে ৯৯ জনে করিয়া থাকিবেন । কিন্তু তাহাতে কি তাঁহারা জীবনে অধঃপাতে গিয়াছেন ? আম চুরি, ফুল চুরি, পেয়ারা চুরি, ফুল চুরি—অর্থাৎ না বলিয়া লইলেই যদি চুরি করা হয় তবে ৯৯ কেন ১০০ জন এই অপরাধে অপরাধী । অবশ্য আমি এই কথা বলিতেছি না যে এই সমস্ত উপেক্ষা করিতে হইবে । আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ 'না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়া'কে ভীষণ 'চুরি' নামে অভিহিত করিয়া ও সেই বালককে 'চোর' নামে অভিহিত করিয়া তাহাকে যে পরিমাণ নির্যাতন করা হইয়া থাকে, তাহা সকল সময়ে সঙ্গত হয় না । অপরাধকে ঘৃণা করা কর্তব্য কিন্তু অপরাধীকে ঘৃণা করিলে তাহার অপরাধের সংশোধন হয় না । "তুমি চোর, তুমি কাহারও সহিত মিশিও না, তোমার সহিত কেহ কথা কহিবে না, তোমাকে জেলে দিব" ইত্যাদি তিরস্কারে বালক মানসিক কষ্ট পায়, আর শিক্ষকের প্রতি বিরক্ত হয় । সম্মুখে তাহার দোষ বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর বাহ্যতে সে সেরূপ না করে সে বিষয়েও সাবধান করিয়া দিতে হইবে । বালক যে কার্য্যই করুক না কেন মিথ্যা কথাই হউক, চুরিই হউক বা অন্য কোন অপরাধই হউক, তাহার মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিচার করিতে হইবে । তবে যেখানে এরূপ দেখা যায় যে, বালক নিষেধসম্মত্রেও আবার চুরি করিতেছে, অপরের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চুরট কিনিয়া থাইতেছে বা অন্য কোন অপকর্ম্ম করিতেছে, সেখানে বেতের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহাতে না সারিলে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে । তবে কথা এই যে বালক—বালক, এই

বিবেচনায় তাহার সকল অপরাধই ৩৩ গুরুতর বদিয়া মনে করা উচিত নহে ।

বাধকেরা মারামারি করিতে ভালবাসে । অন্যের উল্লংঘন আনিপাত্য করিবার একটা চচ্ছা যেন প্রাভাবিক বদিয়া মনে হয় । একে অন্যের সহিত মারামারি করিয়া তাহাদের মনোকে বড়, তাহা নিকারণ করিতেছে—এরূপ ব্যাপারে বাধা না দেওয়াই মুক্তি । ইহাতে বাধকেরা নিজের শক্তির পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে, অনেকে মগন করিয়া নিজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা করে । এরূপ শিক্ষা ও চেষ্টা সংসারমার্গে নিষ্বাহ পক্ষে বিশেষ উপকারী । তবে দেখিতে হইবে যে একটী বড় ছেলে একটী ছোট ছেলের উপর অত্যাচার না করে ; আর এরূপ মারামারিতে একে অন্যের বিশেষরূপ শারীরিক অনিষ্ট করিতে চেষ্টা না করে । প্রতিযোগিতা লইয়াই সংসার । সুতরাং বাল্যে মানসিকজ্ঞানে ও শারীরিক বলে যাহাতে বালকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে সে বিষয়ে বরং উৎসাহই দিতে হইবে । অন্যায় আচরণ দেখিলে অবশ্য তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করা উচিত । পিছন হইতে আগিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়া, পশ্চাৎ হইতে লাঠী মারিয়া পলায়ন কন, অদ্ভুতরূপে চিল মারা প্রভৃতি কাপুরুষের কাজ ;—এরূপ ব্যবহার কঠোর শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে ।

চিমটী কাটা, চুলা ধরিয়া টানা, এক জনের কাপড়ের সহিত অপরের কাপড় অজ্ঞাতসারে বাধিয়া দেওয়া, বসিবার আসনের উপর কাদা বা কালি দিয়া রাখা, দেওয়ালে নাম বা কুকথা লেখা প্রভৃতি ছুই বালকের লক্ষণ । এ সকল প্রথমে মিষ্ট বাক্য দ্বারা চাড়াইতে চেষ্টা করিবে । না পারিলে বেত । অনেক বালক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়া থাকে । প্রায়ই নীচ পরিবারের ছেলে অথবা ‘সক-দোষে-নষ্ট’ ভাল পরিবারের ছেলেকে এই দোষে দোষী হইতে দেখা যায় । নীচ

পরিবারের ভেগেদেব এই অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করা বাধ্যকান হইতেই স্বভাবগত হইয়া পড়ে । সুতরাং তাহাদিগের এই অভ্যাস অল্প চেষ্টায় ছাড়টিতে পারা যাইবে না । তবে প্রথম হইতেই শাসন করিতে হইবে । সে সকল যে ভজোচিত ভাষা নয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে । এ সকল দোষে বেত মারা অনায়াস ; কিন্তু যদি অনেক দিনের চেষ্টাতেও না পারে তবে অন্যান্য বালকের কন্যাণের জন্য এইকপ বাগ-কের নাম কাটিয়া দিতে হইবে । অশিক্ষিত বা অভদ্র পরিবারের ছেলে-দিগকে লইয়া নানানরূপ বিপদে পড়িতে হয় । একটা কুকুরের লেজ কাটিয়া দিল, না হয়ত, একটা কাক ধরিয়া তাহার ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিল, না হয়ত, একটা গরুর লেজে খেজুরের ডাল বাধিয়া দিল, কি একটা বিড়াল জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিল । এই সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য বালকদিগেরও মতিগতি মন্দ হইয়া উঠে । নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবিধান, বালকের প্রতিও কিঞ্চিৎ তজ্জপ আচরণ না করিলে, সে বুঝিতে পারিবে না । গায় কাঁটা ফুটিলে কেমন ব্যথা লাগে, তাহা প্রকৃত কার্য্যে দ্বারা কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে গরুর লেজে কাঁটা বাধার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে ।

যদি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারে একটা বালককে সর্ব বিষয়ে সচ্চরিত্র করিয়া তুলিতে পারা যায় তবে তাহার দৃষ্টান্তে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্পূর্ণ না হউক, অনেক পরিমাণে যে সংশোধিত হইয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । সং দৃষ্টান্তের নিস্তর শাসন সর্ব প্রকার আড়ম্বর মুক্ত শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ ।

(৬) মানসিক বা দৈহিক অপূর্ণতা ।—যে বালক স্বভাবতঃ একটু নিরুজ্জ্বল, তাহাকে একটু বেশী যত্ন করিতে হইবে, তাহার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে হইবে । সে বালকের চক্ষুর দৃষ্টি দূরে যায় না, তাহাকে বোর্ডের নিকটে বসাইতে হইবে । যাহার শ্রবণশক্তি কিছু

কম, তাহাকে শিক্ষকের নিকট বসাইতে হইবে । এতরূপ সাহায্যে যেরূপ সাহায্য করা যাউতে পারে, তাহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে হইবে । শিক্ষক এক বৃহৎ পরিবারের পিতা স্বরূপ । পিতা মাতা যেমন তাঁহাদিগের বিকলাঙ্গ সন্তানের প্রতি অধিকতর স্নেহশীল হইয়া থাকেন, শিক্ষককেও সেইরূপ বিকলাঙ্গ ছাত্রদিগের প্রতি ক্রিষ্ট অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে হইবে ।

(৭) শাস্তির ব্যবস্থা ।—বিদ্যালয়ের দণ্ড বিধিতে এখন শাস্তি দানেরনিয়মলিখিত ধারা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় :—(১) চক্ষু ঢালনা বা জুকুটী (২) তিরস্কার (৩) ঠাট্টা বা বিজ্ঞপ (৪) ভিন্ন স্থানে বসান (৫) মাটিতে বসান (৬) বিদ্যালয়ের ছুটির পর আবদ্ধ করা (৭) পরিমাণের অধিক কার্য করিতে দেওয়া (৮) খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া (৯) অন্য বালকের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া (১০) দুগ্ধ দিয়া টানা (১১) কাণ মলিয়া দেওয়া (১২) কিনা মারা (১৩) খুঁসি মারা (১৪) চপেটাঘাত করা (১৫) মাটিতে বা বেঞ্চে দাঁড়া করান (৬) হাঁটু গাড়িয়া (নীল ডাউন) বসান (১৭) চেয়ারে বসার মত করিয়া বসান (১৮) বেঞ্চ বা টেবিলের নীচে মাথা রাখিয়া দাঁড়া করিয়া রাখা (১৯) এক ঠেঙ্গে হয়ে দাঁড়ান (২০) গাধার টুপি মাথায় দেওয়ান (২১) চৌদ্দ পোয়া (ছই পা সম্পূর্ণরূপ ফাঁক করিয়া) হইয়া দাঁড়ান (২২) ছই হাতে ছই কাণ দিয়া দাঁড়ান (২৩) ডন করার মত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকা (২৪) বেত মারা (২৫) জরিমানা করা (২৬) কিছু দিনের জন্য বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া (২৭) বিদ্যালয় হইতে একেবারে বিতাড়িত করা । কোন দেশের দণ্ডবিধি আইনেও বোধ হয় শাস্তির এত ধারা নাই । গল্প শুনিয়াছি যে পূর্বে নাকি এ সকল অপেক্ষা আরও অনেক ভয়ানক ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল । গায় বিছুটী (ছুতরা) নামক লতার পাতা ঘসিয়া দেওয়া হইত, কাণে

তোতা (চিগটে) লাগান হইত ।—চৌদ পোয়া, হইয়া ছই হাতে ছই ইট ধরিয়া, সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত । পা দড়ি দিয়া বাধিয়া ঘরের আড়ার সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হইত ! মাথা নীচের দিকে ঝুগিত, এই অবস্থায়, পাছার কাপড় তুলিয়া বেত মাঝা হইত !! পাঠশালায় ভাগ্যক থাইবার জন্য আঙনের হাঁড়ি থাকিত ; তাহাতে চিগটা পোড়াইয়া, বা উত্তপ্ত কদিকা দ্বারা, পাছায় পিঠে বা গায়ে দাগ দিয়া দেওয়া হইত ।।।

এরূপ একদল লোক আছেন যাহারা প্রত্যেক নূতন বিধির বিপক্ষ । তাঁহারা সমস্ত পুরাতন বিধিকেই সর্ব্বকালে উত্তম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে সেই পুরাতন বিধিও এক সময় নূতন ছিল, আবার এই নূতন বিধিও সময়ে পুরাতন হইবে । নূতন পুরাতনের কথা নহে, কার্য্য দেখিয়া ফলাফল বিচার করিতে হইবে । বেত মারা প্রথার যাহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, বেত বন্ধ করিলেই ছেলের লেখাপড়াও বন্ধ হইবে । কিন্তু ফলে কি হইয়াছে, তাহাই দেখা যাউক । দিন দিন ত শাস্তি দানের ধারা কমিয়াই যাইতেছে, কিন্তু ইহাতে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে ? অবশ্য কেবল যে শাস্তিদানের ধারা কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহা আমি বলি না । তবে শাস্তির প্রথা অনেক পরিমাণে উঠাইয়া দিয়াও যে কোন ক্ষতি হয় নাই, ইহাটি আমার বলার উদ্দেশ্য ।

ভাল ভাল স্কুল হইতে শাস্তি দানের প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে । যে সমস্ত শাস্তির প্রথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল কতকগুলি গোমূর্থ পণ্ডিত কর্তৃক পরিচালিত পল্লী গ্রামের পাঠশালাতেই দেখিতে পাওয়া যায় । ‘চক্ষু পরিচালনার’ দ্বারা যে শাসন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট । বালকের দিকে এক বার তেজ প্রকাশক দৃষ্টিতে চাহিলেই সে মাটি

হঠাৎ যাঁচবে । কিন্তু শিশুদের নিঃশব্দে এতটা লক্ষ্য চাই । এ লক্ষ্য লাভ করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যিক — বিনা আন চরিত্র ।

সময় সময় তিরস্কার করার আবশ্যিক হয় বটে কিন্তু যে শিশুক সকল সময় ও সকল বিষয়েই তিরস্কার করেন, তাহার তিরস্কারে কোন ফল হয় না । একটু কথা বলিলেই তিরস্কার, একটু নড়িলেই তিরস্কার, তাঁহ তুলিলেই তিরস্কার, গুলুস্ক লইতে পেরি হঠাৎই তিরস্কার, এতদ্বারা সামান্য সামান্য বিষয়ে তিরস্কার করিলে তাঁহাষ্ট বাসকগণের বিষম অগ্নে যে শিশুদের স্বভাবই চীৎকার করা । তিরস্কার কেন, সকল শাস্তিদানেরই এই নিয়ম, পূর্ব হিসাব করিয়া ক্রমবশত মন বায় করিতে হইবে । যে সকল রোগ স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে আপনিত্ত সারিরা যায়, তাহার জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে নাহি । কেবল একটু সাবধান থাকিতে হয় । কঠিন রোগে ঔষধের ব্যবস্থা আবশ্যিক বটে ।

ঠাট্টা বিজ্ঞপের দ্বারা অনিষ্ট হিংস্র হইতে মানিত হয় না । বালকের মনে একরূপ আঘাত লাগে, আর সে একরূপ অপমানিত মনে করে যে শিশুদের প্রতি তাহার একটা ঘৃণা জাগিয়া যায় । ভিন্ন স্থানে বা মাটিতে বসানও অপমানজনক । তবে ঠাট্টা বিজ্ঞপের মতে তৎ অনিষ্টজনক নহে । আর এক কথা, ছোট ছোট বালকদিগকে একরূপ শাস্তি দেওয়ায় কোন ফল নাই । কারণ তাহাদের মান অপমানের কোনরূপ জ্ঞান নাহি । বড় বড় বালকেরা অপমান বুঝিতে পারে । এ শাস্তি তাহাদের জন্যই প্রযোজ্য । কিন্তু পূর্ব সাবধান — অপমানে বালকেরা সময় সময় এতদূর মানসিক কষ্ট পায় যে, তাহাতে তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে । অন্যের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ও খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে, ছোট ছোট বালকগণের উপকার হয় । যখন পূর্ব দুইটা করে বা অন্যায় রূপে মারামারি করে বা কাহার কোন অনিষ্ট করে তখন এই শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । গাধার টুপী মাথায় পরান

সর্বাপেক্ষা অপমানজনক । ছোট ছেলেদের ইহাতে বড় অপমান বোধ হয় না, কিন্তু বড় ছেলেরা বড়ই অপমানিত মনে করে ।

গাঠী অবহেলা করিলে বা বাড়ী হইতে নিদ্রিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিয়া না আসিলে বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পর কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার দ্বারা সেই কাজ করাইয়া দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা । কিন্তু একজন শিক্ষককে সেট বাসকের সঙ্গে আবদ্ধ করিয়া থাকা দরকার । শ্রুতির দাববানের উপর ভার দিয়া চলিয়া গেলে কোনই ফল হয় না । বাড়ী হইতে অতিরিক্ত পাঠাভ্যাস করিয়া আনিতে দেওয়ার প্রথাও উত্তম । কিন্তু সেট অতিরিক্তের পরিমাণ যেন আবার অতিরিক্ত না হয় অর্থাৎ বাদ্যক যাহা সম্ভবতঃ পারিবে সেই পরিমাণ পাঠই দিতে হইবে । “কাল বাড়ী হইতে ৪৯টী অঙ্ক কসিয়া আনিবে” এইরূপ আদেশের কোন ফল নাই । বালক ৩৯ অঙ্ক কসিতেও চেষ্টা করিবে না, কারণ সে জানে যে সে ৪৯ অঙ্ক কিছুতেই কসিতে পারিবে না । সকল বিষয়েই খুব হিসাবী হওয়া কর্তব্য ।

অনেকক্ষণ দাঁড়া করিয়া রাখা, হাঁটু গাড়িয়া বমান, চৌদ্দ পোয়া করান প্রভৃতি শাস্তি, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর । বিচক্ষণ শিক্ষকেরা এ সকল প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন । চুল ধরিয়া টানা, কাণ মদিয়া দেওয়া, চপেটাঘাত প্রভৃতি শাস্তিও উঠিয়া গিয়াছে । কারণ ইহাতে তেমন বিশেষ শাস্তি হয় না । একটু চুল ধরিয়া টানিলে কি একটা ছোট করিয়া চড় মারিলে বালকদের কিছুই হইল না । যদি অপমান করার উদ্দেশ্যে এই সকলের ব্যবস্থা হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না । কারণ পূর্বেই বলিয়াছি ছোট ছোট বালকদের মান অপমান বোধ নাই । আর বড় বড় বালকদিগকেও কিছু কাণ মলা, চপেটাঘাত করা সঙ্গত হয় না । শারীরিক শাস্তি দিবার উদ্দেশ্য বেদনা দেওয়া বটে, কিন্তু একটু চুল ধরিয়া টানিলে বা ছোট করিয়া কিল মারিলে কিছুই ব্যথা পায় না । আবার যদি জোরে চপেটাঘাত কি কিল মারা যায় তবে বালকের মৃত্যু পর্য্যন্তও

ঘটিতে পারে । আর একপা ঘটিতেও অন্য গিয়াছে । সুতরাং একপা নাশ্তি বর্জনীয় । শারীরিক দণ্ড বিধানের উত্তম পন্থা বেত মারা । হাতে ভিন্ন অঙ্গ স্থানে বেত মারিলেও নাই ।

যখন বেত মারিবে, তখন বেশ ঘোরে ছুধা লাগাইয়া দিবে । যাহাকে মারিবে সে বালক যেন বুঝিতে পারে যে তাহার নাম শাস্তি, আর অন্য বালকেরাও যেন বুঝিতে পারে যে এই কাহারও এত নয় । কিন্তু এইরূপ বেত মারিবার আবশ্যিকতা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । যেথা পড়ায় অমনোযোগিতা বা অপাবগতার জন্য বেত মারা কষ্টব্য নহে । বিশেষরূপ চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত বেতের ব্যবহার আবশ্যিক । এইরূপ বেতমারা প্রকাশ্যে কি গোপনে হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতভেদ আছে । আমাদের মতে প্রকাশ্যে ও গোপনে দুইটই আবশ্যিক । দৃষ্টান্ত—শিক্ষককে বা কোন সম্মান্য ব্যক্তিকে অপমান করিলে তাহাকে প্রকাশ্যে বেত মারা উচিত, কিন্তু অশ্লীল ব্যবহার করিলে তাহাকে গোপনে বেত মারা উচিত, কারণ সে অশ্লীল ব্যাপার প্রচার হইলে এই কুফল হয় যে, সে সকল বালক সেই সমস্ত অশ্লীল ব্যবহার জানিত না তাহারাও কৌতুহল পরবশ হইয়া গোপনে সে সকল শিখিতে চেষ্টা করিবে ।

জরিমানা করার উদ্দেশ্য অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া বা বিষয় বিশেষে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা । বালক দেরিতে আসিলে, অমুপস্থিত হইলে, বেতন দিতে দেরি করিলে বা সময় মত পাঠ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ না করিলে জরিমানা করা যাইতে পারে । কারণ এ সকল বালকের অভিভাবকের ক্রটি । কোন বালক কুমর্জে গিয়াছে, কি কুকাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ অবস্থায়, আবশ্যিক হইলে জরিমানা করিয়া অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে । কিন্তু যেখানে অভিভাবকের সহিত শিক্ষকের প্রায়ই দেখা সাঙ্গা হয়

সেখানে জরিমানা করিবার আবশ্যক নাই বরং সমস্ত কথা অভিভাবকের গোচর করিতে পারিলেই অধিকতর উপকার হইবে ।

মদ খাওয়া, গাঁজা খাওয়া, বেশ্যাসঙ্গ হওয়া, পরস্পরকে অপমান করা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তি । তবে যদি বুঝা যায় যে কুসঙ্গ পরিত্যাগ করাইলে ভাল হইতে পারে, তবে ছুই একবার চেষ্টা করা উচিত । কথা এই যে বাগকে ভাল করিবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন কোন ফল হইবে না তখন অন্যান্য বাগকের উপকারার্থে, ছুই একটা বাগকের সমতা পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

শাস্তি বিধানে শিক্ষককে নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে । সম্পাদকের পুত্র কি নিজের শ্যালকের জন্য যেন শাস্তির ভিন্ন বিধান না হয় । তবে এক বকমের অপরাধের জন্য, সকল সময়ে এক রকম শাস্তির বিধান যুক্তিসঙ্গত নয় । বাগকের বয়স ও শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে । যাহারা সাধারণতঃ ভাল ছেলে, তাহারা কোন অপরাধ করিলে, অল্প শাস্তিতেই কাজ হইবে । কিন্তু সেই অপরাধে, অতি দুষ্ট বাগকে একটু বেশী শাস্তি দিতে হইবে । বাগকের নৈতিক অবস্থা, মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য, আর যে প্রলোভনের দশবর্তী হইয়া সে সেই কার্য্য করিয়াছে সেই প্রলোভনের বিষয়ও, শাস্তি বিধানে বিশেষ রূপ বিবেচনা করা কর্তব্য । প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল হইলে বাগকেরা নিজকে সংযত করিতে পারে না । শাস্তি বিধানে বাগকের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা মনে করিতে হইবে । মন্দ কার্য্যের প্রলোভন হইতে বাগকগণকে যতই দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল ।

মন্দ কার্য্য না করিবার জন্যই শাস্তি দিতে হইবে, কিন্তু 'ভাল কার্য্য কেন করে না' বলিয়া শাস্তি দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ । শাস্তির ভয়ে ভাল কার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু যেই শাস্তির ভয় যাইবে, সেও ভাল

কার্য হইতে বিরত হইবে। মন্দকার্য করিয়া বালক যদি প্রকৃতই অনুতপ্ত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি না দিলে বা অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ কম দিলেও চানিবে। যে বালক কোন মত্রে গোপন না করিয়া সমস্ত অপরাধ সরল মনে স্বীকার করে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেই ভাল হয়। হাসিয়া হাসিয়া কি খুব রাগ করিয়া শাস্তি দিলে কোন ফল হয় না। শাস্তি বিধানে, শাস্তিদাতাকে খুব ধীর, স্থির ও গভীর হইতে হইবে। শাস্তি দানের যে মুখ্য দুইটি উদ্দেশ্য—অপরাধীকে সংশোধন করা ও এই দৃষ্টান্তে অন্য বালককে সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা—তাহাই যাহাতে সাধিত হয়, শাস্তি দানে সেই কথাই মনে রাখিতে হইবে। বেশী শাস্তি দিলে বালকেরা ঘ্যাচ্ড়া হইয়া যায়, আর শাস্তিকে বড় ভয় করে না। অতরাং যত কম শাস্তি দেওয়া যায় ততই ভাল। এক সঙ্গে শ্রেণীর সমস্ত বালককে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতে তাহারা আশ্রয় মনে করে। খুব রাগের সময় শাস্তি দিতে নাহি, আর বালক যে মুহূর্ত্তে কোন অন্যায় কার্য করিয়াছে, ঠিক সেই মতেই তাহাকে শাস্তি দিতে নাই। শিক্ষকের নিজের মন খুব শাস্ত হওয়া আবশ্যক আর বালকের মনও খুব শাস্ত হওয়া আবশ্যক। মন শাস্ত না হইলে কিরূপ অপরাধে কিরূপ শাস্তি বিধান আবশ্যক শিক্ষক তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন না। আর বালকের মন শাস্ত না হইলে সেও তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিবে না। শাস্তি বিধানের কিছু পরে বালককে ডাকিয়া স্নেহের সহিত তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিতে হইবে ও তাহাকে শাস্তি দিতে হইয়াছে বলিয়া যে শিক্ষকও দুঃখিত, এ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ভাল ভাল কতকগুলি বালককে সমস্ত বালকের চরিত্র সংশোধনের ভার দিলে, অনেক সময় ফল পাওয়া যায়।

বালকদিগের সঙ্গে যদি বেশ আত্মীয়তা হইয়া যায়, যদি তাহারা

শিক্ষকের নিজের পিতা মাতার মত ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, তবে শিক্ষকের অতি সামান্য অভিমানেই তাহার মর্মান্তিক হইয়া পড়িবে । অন্য কোনই শাস্তির আবশ্যক হইবে না ।

শাস্তি বিধান বিষয়ে আদালতের নজর ।—গাজ কাচ বাজকগণের শাস্তি বিধান লইয়া সময় সময় ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে । কাজেই সে বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বিবেচনায় কয়েকটি মোকদ্দমার মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

পিতা মাতার ও শিক্ষকের অধিকার—সন্তানের শাসনার্থ, তাহারিগকে শাস্তি দানে পিতা মাতার অধিকার আছে । পুরাতন রোমক শাসনে, এই অধিকারের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না । পিতা মাতা পুত্রকচার জীবন বিনাশ পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী ছিলেন । কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজের আইনে, এই সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । বিলাতের জজ ফিসড্ সাহেব এক মোকদ্দমায় (হাট্ সাহেব বঃ হেইলীবার্গ কলেজ অধ্যক্ষগণ) এইরূপ রায় দিয়াছেন “পিতা মাতা সন্তানের দোষ সংশোধনের নিমিত্ত যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত বাপে প্রহার করিতে পারেন ও আবশ্যক হইলে তাহারিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়াও রাখিতে পারেন ।” শিক্ষকের অধিকার সম্বন্ধে অত্র আর এক মোকদ্দমায় (ক্রিস্চারী বঃ বুণ) এইরূপ রায় প্রকাশিত হয় “পিতা মাতার যে সন্তানকে শাস্তি অধিকার আছে, সে বিষয়ে আইনে অস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে আর বহুকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ বিষয়ও নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, পিতা মাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় স্পষ্টত ভাবেই হউক বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, শিক্ষকের হস্তে শাস্তি দানের ভারও প্রদান করিয়া থাকেন ।” তবে যদি শিক্ষকের সহিত লিখিত কোনরূপ চুক্তি থাকে (অর্থাৎ শাস্তি দিতে পারিবে কি পারিবে না) তবে সে কথা ভিন্ন ।

১৮৯৯ সনে “বালকগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ বিষয়ক আইন” প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার একটি ধারায় এইরূপ লিখিত আছে “পিতা মাতা শিক্ষক বা অভিভাবকের শাস্তিদানের যে চাওয়া অধিকার আছে, এই আইন সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছে না ।” শাস্তি সঙ্গত ও পরিমিত হওয়া আবশ্যক । পরিমিত শাস্তির একটা সূত্র নির্ধারণ করা কঠিন । অবস্থা বিশেষে পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে । এক মোকদ্দমায় (রাণী বঃ হপ্লী) জজ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—“ইংলণ্ডের আইন অনুসারে

পিতা মাতা অভিভাবক ও শিক্ষক, সম্মত ও পারিষদ শাস্তি দান করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোনরূপ জোরের তৃত্ব সাধনার্থ শাস্তি দান করা হয়, অথবা শাস্তি বাজকের সহন শক্তির বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে মেরাপ শাস্তি আইন বিরুদ্ধ। আর যদি এই শাস্তি দ্বারা বাজকের কোন অঙ্গের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সেই শাস্তিদাতা আইন অঙ্গুসারে দোষী। আর যদি বাজকের মৃত্যু ঘটে, তবে শাস্তি দাতা দরহতার জন্ত অভিযুক্ত হইবেন।” আমেরিকার স্টেট রিপোর্টে, শাস্তি বিধান বিধায়ক জস্যানের এক অংশে এইরূপ লিখিত আছে :—“শাস্তি সম্মত কি অসম্মত ও পারিষদ কি অপারিষদ তাহা বিশেষ বিশেষ ঘটনা দৃষ্টে বিচার করিতে হইবে। শাস্তিদান যে অসম্মত হইয়াছে তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে, কারণ শিক্ষক তাহার কঠিনতা বোধে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন, ইহাই বিশ্বাস করা বিচারকের পক্ষে যুক্তি সম্মত। বাজক বেদনা বোধ করিয়াছে বা তাহার চর্মে প্রহারের দাগ বসিয়াছে বলিয়াই যে সেই শাস্তিকে নিষ্ঠুর মনে করা হইবে, তাহা ঠিক নয়।”

শাস্তি দানের স্থান ও কাল।—এক বাজক ছুটির পর বিদ্যালয়ের বাহিরে পথের উপর সেই স্কুলেরই অন্য বাজককে ধরিয়া প্রহার করে। শেষোক্ত বাজক পরদিন শিক্ষকের নিকট জাগিল করায়, শিক্ষক প্রথমোক্ত বাজককে শাস্তি প্রদান করেন। এই শাস্তি যাত্র বাজকের মাতা শিক্ষকের বিনা ক্ষে ছাউনগাম-টনের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জাগিল করেন। বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ রায় দেন—“বিদ্যালয়ের বহিঃপথে পথের উপরে যে ঘটনা ঘটয়াছে, আর যে ঘটনার সহিত বিদ্যালয়ের কাগোজ কোন সংশয় নাই, এরূপ ঘটনার বিচার ও তাহা উপলক্ষ করিয়া শাস্তিদান করিবার অধিকার শিক্ষকের নাই।” শিক্ষক এই বিচারের বিরুদ্ধে জাগিল করেন। জজ জনেরন্স শিক্ষকের মাপক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া এইরূপ রায় দেন :—“শিক্ষকের অধিকারের একটা সীমা নির্ধারণ করা বঞ্চিত। তবে আমার মতে বিদ্যালয়ের বহিঃভাগেও শিক্ষকের অধিকার আছে; অতঃপক্ষে বিদ্যালয় হইতে বাড়ী বাইবার সময় বা বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে আগিবার সময় যে তাহার অধিকার আছে তাহা নিশ্চয় বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ যখন এই ক্ষেত্রে এক বিদ্যালয়েরই দুই বাজক সংশ্লিষ্ট তখন শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা নিম্ন আদালতের ঠিক হয় নাই।” এই মোকদ্দমায় অপর জজ কলিন্স সাহেব আবার এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ করেন :—“আমারও সেইরূপ.....। একথা সম্মত বলিয়া মনে হয় যে যে বাজক বিদ্যালয়ের সীমা পার হইলেই সে শিক্ষকের শাসন হইতে মুক্ত হইল। যতক্ষণ বাজক

বিদ্যালয়ে থাকে, ততক্ষণ সে পড়া শুনায় ব্যাপৃত থাকে। তাহার নৈতিক চরিত্রের জিয়া প্রকাশ পায় না। চরিত্রের জিয়া খেলার মাঠে বা পথে ঘাটেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি শিক্ষকের অধিকার কেবল বিদ্যালয় গৃহের চার প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে শিক্ষকের উপর বালকের চরিত্র সংগঠনের কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু যখন শিক্ষাবিভাগের আইনে, শিক্ষককে বালকের চরিত্র বিষয়েও দায়ী করা হইয়াছে তখন শিক্ষকের অধিকার, প্রাচীরের বহির্ভাগে বহুদূর পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই দৈপ্তিতে হইবে যে শিক্ষক যেন শিক্ষাবিভাগ নির্দিষ্ট শাস্তি বিধানের নিয়মাদিগ্ন উল্লঙ্ঘন না করেন।” এই সমস্ত বিচার দৃষ্টে ইহাই নির্ধারিত হইতেছে যে, বালক যে সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত, সে সকল সময়েই শিক্ষকের শাসনাধীন।

কে শাস্তিদান করিতে পারে?—বাসিংষ্টোক নগরে “কুইন্স্ গ্রামার স্কুল” নামক বিদ্যালয়ের এক বালক খেলার মাঠে অবাধাতা (বিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ) প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের মনিটর (সর্দার ছাত্র) তাহাকে শাস্তি প্রদান করে। শাস্তি প্রাপ্ত বালকের পিতা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। তখন উক্ত বাস্তি হাইকোর্টে মোসন করে। হাইকোর্টের অজেরা ম্যাজিস্ট্রেটের কৈফিয়ত তলব করায় ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত কৈফিয়ত দেন :—“কুইন্স্ গ্রামার স্কুলে “সর্দার ছাত্র” নিযুক্ত করা ও তাহাকে শাসন বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়ম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্কুলের হেড মাস্টার যে প্রতিবাদীকে সর্দার ছাত্র নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে শাসনের কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হেড মাস্টারের সাফো প্রকাশ। এই মোকদ্দমার ঘটনা হেড মাস্টার অসুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহার ধারণা এই যে, সর্দার ছাত্র সায়মসজতনাপেই বাদীকে শাস্তি দিয়াছে। তারপর প্রহারের পরিমাণ বিষয়ে ডাক্তার যে সাফ্য দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে প্রহার যদিও পুনঃ কঠিন রকমের হইয়াছিল, কিন্তু সত্যায় অধিক হয় নাই। উক্ত পক্ষের সাক্ষীর বিবরণ শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি (১) বাদী বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ দোষে দোষী (২) বাদীকে যে উক্ত নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদীও সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিল (৩) প্রতিবাদী যে হেড মাস্টার কর্তৃক নিযুক্ত সর্দার ছাত্ররূপে ও বিদ্যালয়ের নিয়মসমুহে শাস্তি প্রদান করিয়াছে তাহাও বাদী অবগত ছিল (৪) বাদীর ও ডাক্তারের সাফ্য হইতে আমরা ইহাও বেশ বুঝিতে পারিমাছি যে শাস্তি পরিমাণের অতিরিক্ত হয় নাই। সুতরাং আমরা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছি।

হাই কোর্টের অজেরা ম্যাজিস্ট্রেটের তৈক্ষণাত্ত অনুমোদন আশ্রয় করেন ও বাশ নানক একজন জজ উক্ত বিচারে এতৎপন্থবা প্রকাশ করেন । —“আবহমান কাজ হইতে মনোএই শিক্ষকগণ বালকদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া আমিতেছেন । তবে এস্থলে সেই শাস্তি এক জন সর্দার চাজ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই কি ইহাকে বেআইনী মনে করিতে হইবে ?” অপর জজ মেজর সাহেবের মন্তব্য এইরূপ । —“তাহা হইলে একপ এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গৃহে পিতা মাতা ভিন্ন বালককে শাস্তি দিবার আধিকার আর কাহারও নাই । জ্যেষ্ঠ ভাতাও শাস্তি দিতে পারেন না । বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজ বিন্নাজমান থাকিতে পারে না, বা নিজ হস্তেও তাহার সমস্ত কায্য করা সম্ভব নয় । সুতরাং এস্থলে সর্দার চাজ কর্তৃক পরিমিত শাস্তি প্রদান অবৈধ হয় নাই ।”

শাস্তি দানের ধারা —রাসেল কৃত “ক্রাইমস্” (অপরাধ) নামক পুস্তকে এইরূপ বিধিত আছে :—“যদি পিতা মাতা বা শিক্ষক, দোষ শোধনার্থ বালককে শাস্তি দান করেন, তবে একপ পদার্থের দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন যে, যেন তাহার দ্বারা দোষ সংশোধন সম্ভব পর হয় । গল্পাদির আঘাতে বালককে বিকলিত করা না হয় । আর শাস্তি দিবার সময় বালকের বয়স ও শক্তিও যেন বিশেষ রূপ বিবেচনা করা হয় ।” বিদ্যালয়ের শাস্তি দানে যত প্রকার গল্প ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে যেতই উত্তম । শরীরের সকল স্থান অপেক্ষা হস্ত তলই বেজাঘাতের নিরাপদ স্থান । মস্তক, কর্ণ, বক্ষ, উদর প্রভৃতি স্থানে নেক্র প্রহাণ কখন কর্তব্য নহে । ইহাতে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে । এক মোকদ্দমায় হস্তে বেজাঘাতের নিমিত্ত, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এক ফুলের হেড্, মাষ্টারকে দোযী সাবাস্ত করেন (গার্ডেনার বঃ বাইগ্রেড) । ঐ মোকদ্দমার আপিল হয় । আপিলে জজ ন্যাথু সাহেব এইরূপ রায় দেন :—“হেডমাষ্টার দোযী নহেন । ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিনোদিতেন ।” “হস্তে বেজাঘাত করিলেও বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেকাপ কোন বিপদ ঘটে নাই ।” হস্তে বেজাঘাত করাতে বিপদ ঘটিতে পারিত ইহাই মনে করিয়া হেডমাষ্টারকে দোযী সাবাস্ত করা সম্ভব হয় নাই ।” তবে এই সমস্ত বিচারে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আবশ্যক হইলে বালকের বয়স ও শক্তি বুঝিয়া তাহার হস্তেই পরিমিত রূপ বেজাঘাত করা যাইতে পারে । কিন্তু ইহাতেও যদি কোন বিশেষ অর্নিষ্ট ঘটে, তবে সে ক্ষয় শিক্ষক দায়ী ।

বিদ্যালয় হইতে বহিস্কৃত করা —এই শাস্তিই সর্বাপেক্ষা গুরুতর । বালকের ভবিষ্যৎ একবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় । সুতরাং এই শাস্তি বিধানের সময় বিশেষ বিবেচনার

আবশ্যক । যদি বিভাগের কৰ্ত্তৃপক্ষ কোন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়াই দেন, তবে বাচ্চকের অভিভাবক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন । উক্ত বাচ্চককে বহিষ্কৃত না করিলে যে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রের অসম্মানের আশঙ্কা ছিল, তাহা প্রতিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে । পূর্বে যে (হাট বঃ হেইলোবার্ট কলেজের অধ্যক্ষগণ) মোকদ্দমার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে হাট্ নামক এক বাচ্চককে, কলেজের অধ্যক্ষগণ বহিষ্কৃত করিয়া দেন । হাটের পিতা অধ্যক্ষগণের নামে, হাটের প্রতি অত্যাচার, অবমাননা ও কলঙ্কারোপণ পদ্ধতির অভিযোগ করিয়া ডায়েক্টরের দাবীতে নালিশ করেন । আর ঐ নালিশের আর একটা হেতু এই যেথা হইয়াছিল যে, হাটের পিতার সঙ্গে (হাটের শিক্ষাবাবত) বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের যে ঘর্ষভঃ চুক্তি ছিল, সে চুক্তিও ভঙ্গ হইয়াছে । কারণ অধ্যক্ষগণ বাচ্চকের শিক্ষার ভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন । জজ ফিন্ড সাহেব সে মোকদ্দমায় যে রায় দেন তাহাতে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে, নিম্ন লিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—“অধ্যক্ষগণ যে মর্মে জবাব দিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজ বিবেচনা পরিচালনা সম্ভব হয় না । একজন শিক্ষক—তিনি যত বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমত্তা হউন না কেন—কোন বাচ্চককে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক মনে করিয়াই যদি তদ্রূপ কার্য করিতে অনিচ্ছা করেন—তবে সেব্য ক্ষমতা বিশেষ বিপদজনক মনেহ নাই । একটা বাচ্চকের ভবিষ্যৎ একবারে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া ভয়ানক কথা । এরূপ ক্ষমতা পরিচালনের অধুনা কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না । অবশ্য সময় সময় সাধারণের মঙ্গল কল্পে একপ কার্যের আবশ্যক হইতে পারে মনেহ নাই কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার কোনই আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না ।” ‘ফিটস জর্জ বার্ণড বঃ নর্থ কোট’ মোকদ্দমায় এই বিষয় লইয়া তর্ক হয় । জজ সাহেব তাহাতে এই রূপ মত প্রকাশ করেন :—“যদি কোন বাচ্চকের চরিত্র এরূপ মন্দ হইয়া পড়ে যে তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখিলে অস্বাস্থ্য বাচ্চকের অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতে পারে, তবে হেড্ মাস্টার বিশেষ বিবেচনা পূর্বক তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন ।—এক্ষমতা তাঁহার একরূপ আছে । কিন্তু এই ক্ষমতা পরিচালনায় কেবল নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা সম্ভব নহে । এই ক্ষমতার অপব্যবহার প্রমাণিত হইলে, প্রতিবাদীর পক্ষ দুর্বল স্বীকার করিতে হইবে ।”

অবস্থা করিয়া রাখা ।—এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোন বাচ্চককে বাটীতে পাঠ প্রাপ্ত করিবার জন্য আদেশ করেন । কিন্তু উক্ত বাচ্চকের মাতা বাচ্চককে গৃহকার্যে নিযুক্ত করায় সে পড়িতে সময় পায় না । বাচ্চক উক্ত পাঠ দিতে না পারায়, শিক্ষক

তাহাকে বিদ্যালয়ের ছুটির পর আবদ্ধ করিয়া রাখেন । মাতা শিক্ষকের বিনোদন দেখাইয়া কয়েকের অভিযোগ করিয়া নাজিশ করেন । এই মোকদ্দমায় (হানটার বঃ জনমন) নিম্ন আদালত পতিবাদীর সাপক্ষে বিচার করেন । মাতা উক্ত বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করায় জজ মাথু এইরূপ রায় দেন :—“আগি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে এই মোকদ্দমা বিদ্যালয়ের সাধারণ শাসন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বিচার করা চাইবে । আর বিশেষ বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করাও বিদ্যালয়ের বালকদের সঙ্গে অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা অল্পরূপ হইয়া পড়িয়াছে । শিক্ষাবিভাগের নিয়মানুযায়ীতে আছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালকেরা বাড়ীতে কোনরূপ পাঠাভ্যাস করিবে না । এরূপ অবস্থায় বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়াই শিক্ষকের সঙ্গে অবৈধ হইয়াছে সুতরাং মোকদ্দমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুনর্বিচারের জন্য পাঠান হইল ।”

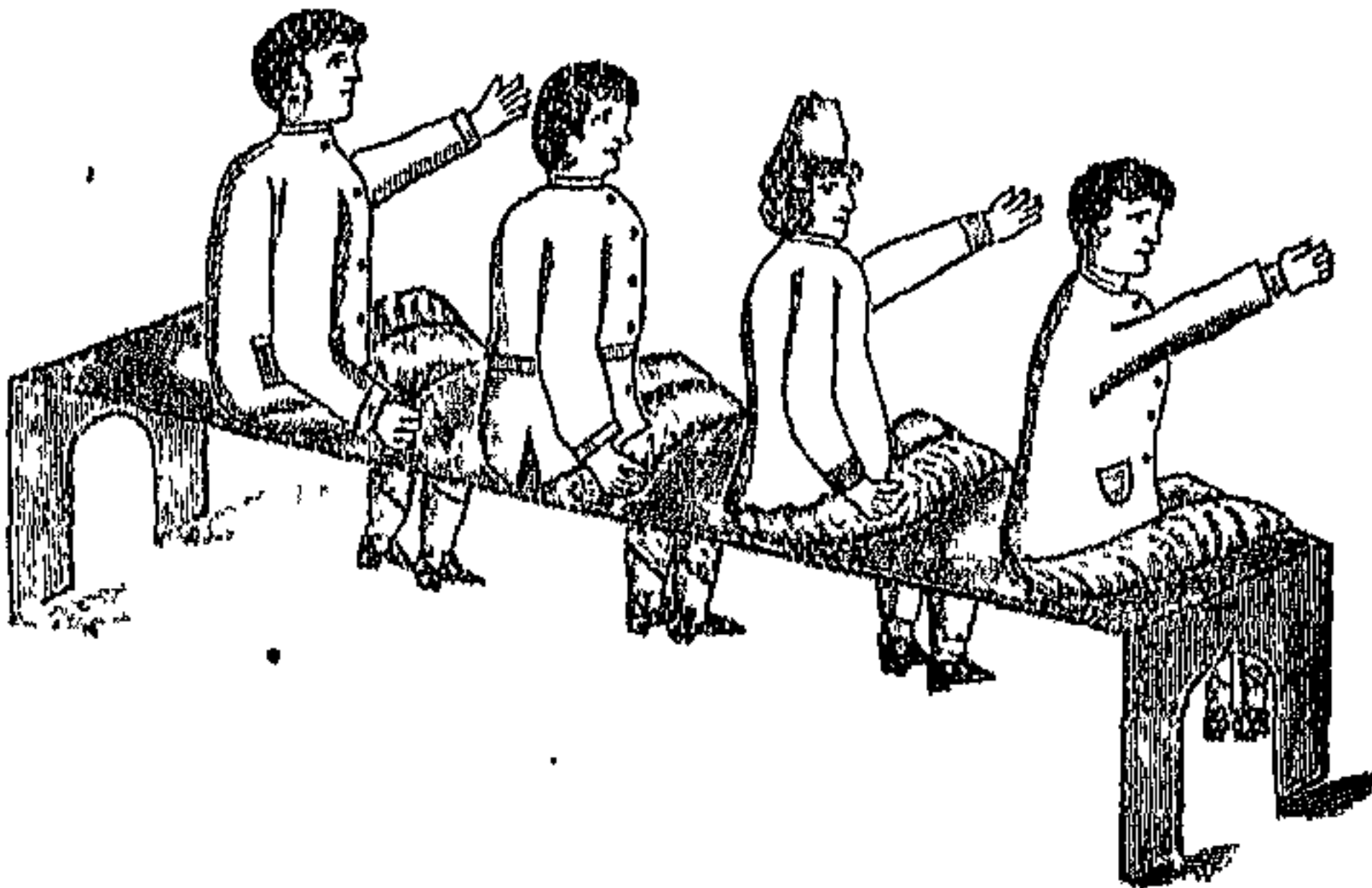
ছুটির পর আবদ্ধ করিয়া রাখা যে আইন বিরুদ্ধ, তাহা কিন্তু এ মোকদ্দমায় স্থিরীকৃত হইল না । কেবল মাত্র ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া অবৈধ ।

গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা ।—শিক্ষক নিজে কখনও চীৎকার করিবেন না বা খুব বড় করিয়া কথা কহিবেন না । বিনা আবশ্যক্যেও বেশী কথা বলিবেন না । অতি শান্ত ভাবে সাধারণ কথনের স্ববে মিশ্র করিয়া কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন । তাহা হইলে বালকদিগের গোলাযোগ নিবারণে কৃতকার্য হইবেন । বালকেরা স্বভাব চাই গোলা করিতে ভালবাসে । অবসর পাইলেই গোলা করিবে । তাহার সাহায্যে এই অবসর না পায় সেক্ষেপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । বালকেরা যদি কোন না কোন কার্যে ব্যাপ্ত থাকে, তবে আর তাহারা গোলা করিতে পারিবে না । গোলা নিবারণ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় । বালকদিগের চঞ্চল প্রকৃতি—সর্বদা কোন না কোন কার্যে ব্যস্ত থাকাই তাহাদের স্বভাব । শিক্ষক কোন কার্যে নিযুক্ত না রাখিলে, কাজেই তাহারা গোলমালরূপ কার্যে ব্যাপ্ত হইবে । “যাহারা গোলা করিবে তাহাদের নাম প্লেটে লিখিয়া রাখিবে” এই শাসনে গোল থামান যায় না ; বরং সমস্ত সময় ব্যক্তি পায় ।

নিজ শ্রেণী পরিচালনা করিয়া অন্য শ্রেণীতে যাওয়া, ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া, শ্রেণীর মধ্যেও ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করা প্রভৃতি কার্যোও গোলমাল উপস্থিত হয় । এ সমস্ত অভ্যাস শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে । অনেকে এক সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর করাতো বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে ব্যতীত অন্য কেহ অনাহুত উত্তর দিতে গিয়াও অনেক সময় গোলমালের সৃষ্টি করে । এইরূপ গোল নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) শিক্ষক যখন পড়াইবেন, তখন বামকোণে মনোযোগ পূর্বক তাহার কথা শুনিবে । নিজেরা কোন কথা বলিবেনা ।

(খ) শিক্ষক সাধারণতঃ কোন বিশেষ বালককে উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না । প্রশ্ন সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন ; কে তাহার উত্তর দিবে, প্রথমে তাহার নির্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই । যে সকল বালক সেই প্রশ্নের উত্তর জানে তাহারা হাত বাড়াইয়া দিবে ।
(চিত্রের অঙ্কন) যাহারা জানেনা তাহারা হাত উঠাইবে না ।



১০ম চিত্র—প্রশ্নের উত্তরে হাত বাড়ান ।

শিক্ষক এঁঠে সকল ছাত্রের মধ্য ভঁহঁতে, যাহাঁকে ইচ্ছা, সেসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাসিবেন । এঁঠে শেগো'ক বানাক প্রশ্নের উত্তর দিতে দাঁড়াইবোই অল্প সকল বালক হাঁক সবাঁইয়া নঁহঁবে । কিন্তু যদি সে বালক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল করে, তবে অন্ত্যান্ত বানাকে ঐ পুনরায় শাঁক বাহির করিবে । শিক্ষক আবার তাহাদিগের মনো যাহাঁকে ইচ্ছা শিক্ষায়া করিবেন । একপ করাত্তে আন এক উপকার এহঁ হব্বে যে, কল বালক উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানে, তাহাঁর একটা পাবিত্র্য হঁহঁবে । তবে কোন কোন ছুঁষ্ট বালক না জানিয়াও হাঁক বাহির করিবে পাঁবে, আন কোন কোন নির্কোঁধ বালক একটা ভুল উত্তরকে শুদ্ধ মনে করিয়াও হাঁক বাহির করিতে পারে । কিন্তু বিচক্ষণ শিক্ষক একপ ছুঁষ্ট ও নির্কোঁধ বালকগণকে সহজ্জেঁট চিনিতে পারিবেন ।

(গ) আর এক কথা--প্রায় সমস্ত দার্শনিক ডি'লে'র মত করিয়া করাইতে পারিলে উত্তম হয় । গোদামানোর সম্ভাবনা অবশ্য কম হয় । পড়াইবার সময় বিনাতি স্কুল সমূহে এইরূপ আদেশ হঁহঁয়া থাকে :— “পুস্তক লও, (বালকেরা পুস্তক হাঁতে করিয়া) জমুক পৃষ্ঠা খোল (বালকেরা সেই পৃষ্ঠা খুলিল), অগুকে দাঁড়াইয়া পড় (সে পড়িতে আরম্ভ করিল), পুস্তক বন্ধ কর (সকলে এক সঙ্গে বন্ধ করিল), পুস্তক তথাস্থানে রাখিয়া দাও (তাহাঁনা রাখিয়া দিল) ” এইরূপ গোট লও, লেখ, খাতা লও, একে একে বাড়ী যাও প্রভৃতি সমস্ত কায্যত ডি'লে'র প্রণালীতে নির্ধারিত হঁইয়া থাকে । নিজের ইচ্ছামত, গোদামান করিয়া পুস্তক কি স্লেট লইয়া টানাটানি করেনা ও এইরূপ একটা গোদামানে বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি করিতে পারেনা ।

বাঙ্গালা দেশের যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা এঁহঁ প্রথা প্রচলন করিয়াছেন, তাহাদিগের অনেকেই ইঁহঁর সাপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন । কাহারও কাহারও বিরুদ্ধ মত আছে বটে, কিন্তু

তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প । আমাদিগের বিষাস, হঠাৎ বালাকগণের আত্ম-প্রতিপালন-ব্যাপার অল্পশ্রম হইবে, তাহারা শৃঙ্খলা শিথিতে পারিবে, আর গোলমালও যথেষ্ট কমিয়া যাইবে । অনেক শিক্ষক গোল খামাতে গিয়া নিজের অনিকতর গোল কারিয়া বসেন । টেবিলের উপর ঘন ঘন বেতের আঘাত বা কল, চাপড় প্রভৃতির দ্বারা গোলমালের একটু আশু নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন ফল হয় না । চোখের শাসনই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসন । যে দিকে একটু গোল হইতেছে, শিক্ষক কেবল মাত্র একবার সেই দিকে চাহিবেন, আর সব গোল থামিয়া যাইবে । কিন্তু সকল শিক্ষকের দ্বারা একাধা চাহিবে না । যাহারা নিজে গভীর প্রকৃতি, বেশী বাজে কথা বলেন না, শ্রেনীতে বসিয়াই কার্য আরম্ভ করেন, বাজে গল্প করেন না সেইরূপ শিক্ষকই চোখের শাসনের উপযুক্ত ।

অলিঙ্গ ও অমনোযোগিতা ।—উপদেশের দ্বারা বালাকগণের কর্তব্য প্রাপালনের হচ্ছাকে বলবত্তা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কার্য আদায় করিবার চেষ্টা করা বৃথা । আমরা অনেক উপদেশ বাক্য শুনিয়াছি, আর অনেক উপদেশ দিয়াও থাকি, কিন্তু আমরা কয়জনে কর্তব্যনিষ্ঠ ? এইরূপ ভবিষ্যতের ছবি দেখাহয়ও তাহাদিগকে কার্য বিশেষে ভ্রমরক্ত বা কোন কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা । “তোমার পিতা মরিয়া গেলে কি করিয়া থাকিবে ? অতএব লেখা পড়া কর । উপর শ্রেনীতে উঠিতে পারিবেনা, অতএব মনোযোগ দিয়া পড় ; লেখা পড়া না শিখিলে ঘোড়ার ঘাস কাটিতে হইবে” ইত্যাদি বাক্যেরও কোন ফল নাই । আমাদিগের কয়জনের এরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে ? আমরা ভবিষ্যতের ফলাফল জানিয়া শুনিয়া কত সময়ই না বৃথা কাদক্ষেপণ করিয়া থাকি । সরলমতি বালক, সে ভবিষ্যতের বুঝে কি ? সে উপস্থিত সুখ লইয়া ব্যস্ত । তাহার জ্ঞান

তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধ্যাপনাকে তাহার মনোমত কারিয়া গড়িয়া গঠিতে হইবে। অধ্যাপনায় সাহায্যে সে সুখ পায় তাহাটুকু কাবতে হইবে। তাহা হইলে সে আপন আপনিত সেহ সুখের দিকে দাঁড়িত হইবে। সময় সময় একটি কড়া শাসন আবশ্যক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মিষ্টি কথা ও মেহপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা সে পানমাগে ফলোদয় হয়, কড়া শাসনে তাহা হয় না।

আনন্দ, অমনোযোগিতা ও অধ্যাত্ম পরিভ্রাণ করাইতে পানিবে বালকদিগকে কর্তব্যপথে পরিচালিত করা যাউতে পারে। আনন্দ দুই রকমে উৎপন্ন হইয়া থাকে—এক শারীরিক দুঃখনাশ বশতঃ, আর এক অভ্যাস বশতঃ। শারীরিক দুঃখনাশের কারণ অল্পমাত্রায় কনিয়া তাহার চিকিৎসা করা কি উত্তম তাহাদের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের কার্য। কিন্তু যদি অভ্যাস বশতঃ আনন্দ প্রাপ্তি থাকে তবে তাহার প্রতিকারের ভার অনেক পরিমাণে শিক্ষকের হাতে। অন্য বালককে একদিনে অল্প বালকের মত পরিভ্রাণ করিতে চেষ্টা করিতে নাই। অল্প বালককে যখন চারিটি অঙ্ক কথিয়া আনিতে বলিবে, অল্প বালককে তখন একটি অঙ্ক কথিতে দিবে। এইরূপ একটি একটি কারিয়া মাত্রা বাড়াইতে হইবে। মনো মনো আবশ্যক হইলে একটি কঠোর শাসন করাও মন্দ নহে। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক সে বালকের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর দীর্ঘ দীর্ঘ তাহাকে পরিভ্রাণ করিয়া তুলিতে হইবে। অমনোযোগিতার প্রমাণ কারণ পাঠ্য বিষয়ে অস্বাভাবিক করিতে না পারা। জ্যামিতির ৩৪টি প্রতিজ্ঞা পড়া হইয়া গিয়াছে এমন সময় এক বালক ভর্তি হইল। সে জ্যামিতির সামান্য সংজ্ঞা মাত্র শিখিয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পঞ্চম প্রতিজ্ঞা পড়াইতে গেলে, অল্প বালকেরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে, নূতন বালকটি তাহা করিবে না। এক বিষয়ে এরূপ অমনোযোগী হইলে, সে দীর্ঘ

ধীরে অন্যান্য বিষয়েও তজ্ঞাপ হইয়া পড়িবে । এরূপ অবস্থায় হয় নুগ্ন ছেলে ভর্তি কবা উচিত নয়, না হয় তাহার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা উচিত । শিক্ষক নিজের বিশ্রাম ঘণ্টায় বা বিদ্যালয়ের পরে ১৫২০ মিনিট তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া তাহাকে শ্রেণীর সমান করিয়া লইতে পারেন । শরীর দুর্বল হইলেও অমনোযোগী হইয়া থাকে—তাহার প্রতিকার অভিভাবকের হাতে । যে বালক খেলায় কি অন্য কোন কাজে অনুরক্ত, তাহাকেও আমরা অমনোযোগী বলিয়া থাকি । কিন্তু সেটা ভুল । যে অমনোযোগী সে সব কার্যেই অমনোযোগী । যে খেলায় খুব মনোযোগ দেয়, তাহার যে মনোযোগের শক্তি আছে, তাহা নিশ্চয় । খেলায় সে সুখ পায়—পড়ায় পায় না । পড়ার কার্য খেলার মত সুখকর করিতে পারিলে সে আপনিই সে দিকে মনোনিবেশ করিবে । অবাধ্যতা নানাকারণে উৎপন্ন হয় । অন্যদ্যে শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার প্রধান । একটু স্নেহ কি সহানুভূতির ভাব না দেখাইয়া, যদি দিন রাত কেবল কঠোর শাসনের অধীন রাখিতে চেষ্টা করা যায়, তবে বালকেরা অবাধ্য হইয়া পড়ে । বালকদিগকে পরিমিত স্বাধীনতা দিতে হইবে—আর সেই স্বাধীনতা বিপথে না যায় ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।

গুণভঙ্গি করিয়া ঠাট্টা করা, কঠোর ভাষায় ভৎসনা করা, সামান্য ত্রুটি-তেই শাস্তি দেওয়া, অপরিমিত পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া প্রভৃতি কারণে বালকেরা অবাধ্য হইয়া উঠে । এ সমস্তের প্রতিকার শিক্ষকের হাতে । তবে এক রকমের বালক আছে, তাহার স্বভাবতই বদমেজাজের । যে বালক ইতর সমাজে বাস করে বা যে নীচ পরিবারে পালিত সে বালক সেই সমাজ বা পরিবারের দোষে বিকৃত চরিত্র হইয়া থাকে । এ সকল বালক শিক্ষককে উপেক্ষা করিতেই ভালবাসে ও তাহাতে গৌরব মনে করে । ইহাদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালকেরাও শিক্ষকের আজ্ঞা অমান্য

করিতে শিক্ষা করে । চহাদের শামনে, অল্পে বেত পণে অক্ষয় প্রায়
 অন্য কোন ব্যবস্থা নাই । যেম্নে অবশ্য অল্পাংশ উপায়ে চহাদের
 চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে । বেত ও অক্ষয় শেষ উপায় ।
 অনেক বালক বাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া রওনা হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে
 না আসিয়া কোন খেলার আড্ডায় প্রবেশ করে ও চানিটা বাগানে
 বাড়ী ফিরিয়া যায় । কেহ কেহ বিদ্যালয় হইতে পলায়নও করিয়া
 থাকে । এরূপ উপস্থিত হইবার বা পলায়ন করবার কারণ দুইটি
 (১) পাঠ অভ্যাস না করা (২) কোনরূপ খেলায় বা খেলায় 'অনুরক্ত'
 হওয়া । বালকের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে ।
 অভিভাবককে জানাইতে হইবে । তারপর প্রাণি বিধানের ব্যবস্থা
 করিতে হইবে । অনুপস্থিতির জরিমানা করিয়াও এ বিষয়ে অভি-
 ভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে । যদি পাঠাভ্যাস
 না করাই কারণ হয়, তবে পাঠাভ্যাস করিতে তাহার কি কি অগ্রা-
 য় অভিযোগ আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে । পাঠ
 লব্ধিক হইলে কমাইয়া দিতে হইবে, পুস্তকের অভাব থাকিলে
 পূরণ করিতে হইবে, পাঠ কঠিন হইলে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে ।
 যদি কোন খেলায় মত্ত হইয়া থাকে তবে সে খেলা (উত্তম
 হইলে) বিদ্যালয়ে প্রচলন করিতে হইবে । কিন্তু যদি কোন বদ্
 খেলা বা খেলায় আসক্ত হইয়া থাকে তবে অভিভাবকের সাহায্যে
 তাহা ছাড়াইতে হইবে । অনেক বালক তাদের আড্ডায়, তাদের
 আড্ডায়, এমন কি ইহা অপেক্ষা বড় বড় বদ্ খেলায় আড্ডায়
 মিশিয়া মাটি হইয়া যায় । অভিভাবকের অমনোযোগিতাই ইহার
 প্রধান কারণ । তবে শিক্ষকেরও যে কিছু দোষ নাই তাহা বলি না ।
 শিক্ষকেরও সর্বদা অনুসন্ধান করিতে হইবে, কে কি করে না করে ।
 বদ্ খেলায় মিশিলে, তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা সময় সময় বড়ই

কঠিন হইয়া পড়ে । এ সকল ক্ষেত্রে উত্তমরূপ বেতের ব্যবস্থা (অভি-
ভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া) করা হই সম্ভব । বাচনিক উপদেশে
বিশেষ ফল পাওয়া যায় না ।

কর্মচারী শাসন ।—সহকারী শিক্ষক ও চাকর চাকরাণীদিগকেও
সময় সময় শাসন করিতে হয় । সহকারী শিক্ষকদিগের সহিত কখনও
অভদ্র ব্যবহার করিবেনা । তুমি তাঁহাদের মান রক্ষা না করিলে তাঁহারা
তোমার সম্মান রক্ষা করিতে যত্ন করবেন না । বাহিরে কোন শিক্ষকের
নিন্দা কি অপারগতার বিষয় গল্প করিবেনা । বিশেষ, তুমি তাঁহাদিগের
যতই সম্মান করিবে, তাঁহাদের প্রতি ততই বালকদের ভক্তি বৃদ্ধি পা-
ইবে । যদি তুমি নিজে সময় নির্দিষ্ট হও, পরিশ্রমী হও, তাঁহারাও সময় নির্দিষ্ট
হইতে চেষ্টা করিবেন । যে সকল শিক্ষকের বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরে
আসা অথবা শ্রেণীতে বসিয়া নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, প্রধান শিক্ষক তাঁহা-
দের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিবেন । যে শিক্ষক সাধারণতঃ বিলম্বে আসিয়া
থাকেন ঘণ্টা বাজিয়া মাত্র তাহার শ্রেণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে
হইবে আর তিনি আসিলেই গম্ভীরভাবে এই কথা বলিলেই চলিবে যে,
আজ আপনার “এত মিনিট বিলম্ব হইয়াছে ।” এইরূপ শ্রেণীর বালক-
দিগের সম্মুখে ২৩ দিন তাঁহাকে একটু দণ্ড দিলেই সম্ভবতঃ তাঁহার
দোষ সংশোধিত হইবে । যিনি শ্রেণীতে নিদ্রা যান, তাঁহার শ্রেণীতে ঘন
ঘন যাওয়া উচিত । যদি তাঁহার মনে থাকে যে প্রধান শিক্ষক যে কোন
সময় আসিয়া পড়িতে পারেন, তবে বোধ হয় তিনি আর ঘুমাইতে সাহস
করিবেন না । কিন্তু যে সকল শিক্ষক নিতান্তই নির্লজ্জ ও কর্তব্য জ্ঞান
রহিত, তাঁহাদিগকে গোপনে ডাকিয়া একটু সাবধান করিয়া দিতে হইবে ।
শিক্ষকেরা প্রত্যহ নোট লিখিয়া আনেন কি না, পড়াইবার জন্ত সকল
প্রকারে প্রস্তুত হইয়া আসেন কিনা, বালকদিগের লিখিত উত্তর সমূহ
উত্তমরূপ শুদ্ধ করিয়া সময় মত ফিরাইয়া দেন কিনা, শিক্ষার জন্ত উপযুক্ত

রূপ পরিগ্রহ করেন কি না, প্রদত্ত শিক্ষক প্রতিদিনই এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিবেন।

বাহার যাচা কর্তব্য তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত পূর্ণ মাতায় আদায় করিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ অসম্মত হন, তবে তাহার আর উপায় নাই। চাকর চাকরানী তাহাদিগের কর্তব্য গৌরব করি কিনা তাহাও দেখিতে হইবে। প্রত্যেক প্রত্যেক কার্যের সমান করা সম্ভব পর নয় কিন্তু যদি প্রতিদিন একটা করিয়া কার্যেরও তদারকান করা যায় তবে সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ কার্য সম্বন্ধে মানমান হইবে।

সভ্যব্যবহার।—শিক্ষক শ্রেণীতে আসিলে সকল বাগক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। যত বার তিনি শ্রেণীতে আসিবেন তত বারই এরূপ করিতে হইবে না। কেবল মঙ্গলস্বপ্ন সাধন হইত এরূপ করা নিয়ম। পাঠের সময় বাগকদিগকে বাহিরে যাওঁতে দিবে না; প্রত্যেক পাঠের শেষে ছোট ছোট বাগকদিগকে এড মিনিটের জন্য ছুটি দেওয়া মন্দ নহে। বড় ছেলেদিগের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। এই বিশ্রাম ঘণ্টার সময় প্রথম তিন ঘণ্টা ও শেষ দুই ঘণ্টার মধ্য সময়। ত্রিভঙ্গি হইয়া বসি, বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া বসি, ডেবের উপর মাথা নোয়াইয়া থাকা, এক জনের গায়ের উপরে আর এক জন তেলিয়া থাকা প্রভৃতি অসম্মত আচরণ নিবারণ করিতে যত্ন করিবে। যে সমস্ত আঙ্গা প্রতিপালন বালকের পক্ষে অসাধ্য, এরূপ আঙ্গা দিবে না। বাগকদিগকে খুব বিশ্রাম করিবে; অবিশ্রাস করিলে অধিকতর অবিশ্রাসী হইতে চেষ্টা করিবে। বাগকদিগের নিকট আশোদপ্রদ গল্প করিতে পার কিন্তু তাহাদের সহিত কোনরূপ রহস্য করিবে না বা অশ্লীল বাক্যালাপ করিবে না। কাহারও প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা অপরিমিত অহুসার দেখাইবে না। সকলকে সমানভাবে স্নেহ করিবে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যদি

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হয় তবে তাহার ভাষা সরল, ভাব বিশদ ও সংখ্যা স্ফুট হওয়া উচিত । নিয়মগুলি উত্তমরূপে প্রতিপালিত হয় কি না সে বিষয় অনুসন্ধান করিবে । কেহ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করিলে তখনই তাহার প্রতিবিধান করিবে । অনেক শিক্ষকের অভ্যাস আছে প্রত্যহ নূতন নিয়ম প্রচার করা বা নূতন আদেশ প্রচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া । আদেশের সংখ্যা অধিক হইয়া গেলে বালকদিগেরও সমস্ত পালন করিতে মনে থাকেনা, আর শিক্ষকও তাহার সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয় কি না দেখিতে অবসর পাননা । এরূপ আদেশে সফল না হইয়া বরং কুফলই হয় । বালকেরা মনে করে যে প্রত্যহ নূতন আদেশ অবগত করিতে হয়, কিন্তু তাহা পালন না করিলেও চলে । কারণ পালন না করার দরুন যে শাস্তি, তাহাত তাহাদিগের ভোগ করিতে হয় না ।

পুরস্কার ।—শিক্ষকের মুখ নিঃসৃত সামান্য ছই একটা উৎসাহ সূচক বাধ্য বালকের সে পরিমাণ উপকার করিতে পারে, শত ভরসনায় তাহা করিতে পারে না । নিরুৎসাহের কথা কখনই বলা উচিত নয় । “তুমি মূর্থ, তোমার কিছুই হবেনা তোমার মাথা নাট, তুমি ঘাস কাট গিয়া, কেন মিছে চেষ্টা কর” ইত্যাদি বাক্যে অনেক বালকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে । বালককে সর্বদাই উৎসাহিত করিতে হইবে । অঙ্ক কষিতে পারিতেছেন—শিখাইয়া দাও ; তার পর এমন সহজ অঙ্ক দাও যে সে বেশ কষিতে পারে । সমস্ত শুদ্ধ না হইলেও যে সামান্য অংশ শুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া বল “এ পর্যন্ত বেশ হইয়াছে, এইখানে অল্প ভুল হইয়াছে ; তা আর একবার চেষ্টা করিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে ।” ছবি আঁকিতে দিয়াছ, হয়তঃ কিছুই হইতেছেন, কিন্তু নিরুৎসাহ করিও না, “হঁ। এই রকম করিয়াই করিতে হয়, তোমার বুদ্ধি আছে, আর ২৩ বার চেষ্টা করিলেই চমৎকার হইবে” এইরূপে উৎসাহিত করিবে । তবে ‘এইটা এইরকমে করিতে হয়, এইটা এই

বকমে কবিত্তে হয়' এত বখা বণিয়া শুদ্ধ কারয়া দিবে । রচনা কবিত্তে দিয়াছ, অনেক ভুল করিয়াছে, গানি দিওনা । যে সমস্ত অংশ উন্নয়ন হইয়াছে, তাহার সুখ্যাতি করিয়া অল্প অংশের ভুল দেখাওয়া দাও । কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেছে (প্রায়ঃ দুখন বানক দিগকেও অধিক উৎসাহিত করিতে হয়) যে টুকু ঠিক হইতেছে, তাহাকে "বা বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে," এই সকল বাক্যে, তাহাকে উৎসাহিত করিয়া ভুল অংশ সংশোধন করিয়া দিবে । প্রত্যাশিক পাঠের সময় উপর নোট করাইবার প্রথা আছে । এ প্রথার দোষ গুণ উভয়ই আছে । তাহাতে বানকগণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় । কিন্তু দোষ এই যে, বানকগণ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া কেবল উপরে যাহা বার কৌশলই চিন্তা করে । বাহা হউক নিম্নশ্রেণীতে এ প্রথার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । উপরের শ্রেণীতে অল্প প্রথার আচরণ করা যাইতে পারে ।

শ্রদ্ধাম্পদ বাবু গৌর মোহন বসাক যখন চট্টগ্রাম কনোজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন তিনি এনট্রেন্স ক্লাসে প্রায়ঃ তাহার খাতায় নিম্ন লিখিতরূপে বালকদিগের গুণাগুণের (মার্কশীট) চিহ্ন দিয়া রাখিতেন ;—

নম্বর	নাম	৩৪৮২ সাহিত্য	৩৪৮২ জ্যামিত্য	৩৪৮২ পাটীগণিত	৩৪৮২ বাকরণ
১	উপেন্দ্রলাল মজুমদার	উ		ম	ম
২	অতুলচন্দ্র দত্ত	উ	অ	ম	
৩	অন্নদাচরণ চৌধুরী		ম	উ	

উ = উত্তম, ম = মধ্যম, অ = অধম ।

শ্রদ্ধাশ্রী) অনেক বাঁচক হইলে প্রাপ্ত সকল বিষয়ে সকলকে প্রশংসা করা সম্ভবপর নহে । কোন প্রশংসা করা হয় নাই বসিয়া, কাঁচারও ঘর মনো মনো খাবি আছে । মাসের শেষে কে কয়টি উজ্জম পাঠ্যেতে চর্চাব হিমাংক হইত । সকল বাঁচকেই বাহাতে অধিক সংখ্যক টি পাগ মে জমা চেষ্টা করিত । গৌরমোহন বাবু এই প্রশংসা বিশেষ গম্যপানী ছিলেন । তাহার হাতে অনেক রত্ন ছাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরস্কার দিয়াও অনেক সময়ে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করা যায় । প্রতিযোগিতায় একটি পেন্সিল কি একখানা খাতা পাইলেই বাঁচকেরা তাহাকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে । পরীক্ষার ফল দৃষ্টেও পুরস্কার দিবার রীতি আছে । কিন্তু প্রায় সুলেই ছাত্রসংখ্যা অনুসারে পুরস্কারের সংখ্যা অতি কম হইয়া থাকে । পুস্তকের দামের বেশি লক্ষ্য না করিয়া, তাহার সংখ্যাব্যতিরিক্ত দৃষ্টি রাখাই কর্তব্য । পুরস্কারের সংখ্যা অতি অল্প হইলে, অনেক বাঁচকেরই তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে প্ররূপ হয় না ; কিন্তু সংখ্যা বেশী হইলে অনেকেই আশাবিত হইয়া চেষ্টা করিতে থাকে । কোন স্বাভাবিক গুণের জন্ত কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া উচিত নহে । একজনের গলায় স্বর স্বভাবতই মিষ্ট । সে সেইজন্য গানের পুরস্কার পাইতে পারে না । চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া বাঁচকেরা যাহা শিক্ষা করে তাহার জন্যই তাহারা পুরস্কার পাইবে । যে সঙ্গীতপেশা অধিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গান অভ্যাস করিয়াছে, তাহার গলায় স্বর অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলেও সেই পুরস্কারের পাত্র । পাবনা জিলা স্কুলের একজন শিক্ষক (এখন তিনি মোক্তার) ২৪টি গোলাপ ফুল, আত্র, ঝাড়মো কি কমলা লেবু দিয়া বাঁচকগণকে এত উৎসাহিত করিতেন যে তাহার শিক্ষা কৌশল দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতেন ।

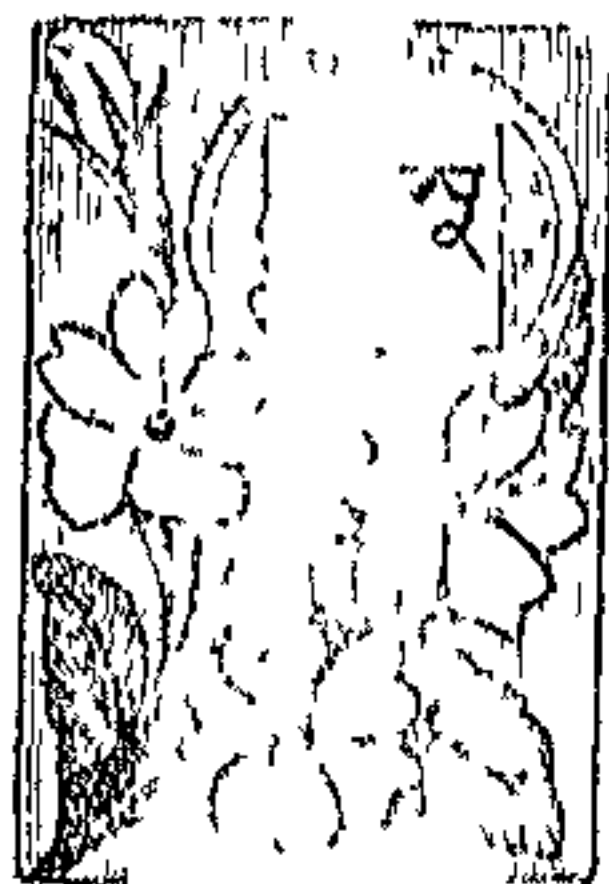
এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরস্কারের দ্বারা অভিভাবকেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে । তিরস্কার অপেক্ষা পুরস্কার অধিকতর ফলপ্রসূ ।

ত্রিবেদীতে কষ্ট, পূর্বকাঁবে আনন্দ । 'আমরা যে কার্য্য' করি না কেন
 তাঁহান মুখ্য উদ্দেশ্যে আনন্দ লাভ । সুতরাং সেই আনন্দ সম্মুখে
 ধাবণ করিলে বাণকগণ কার্য্যে আগমন হইবে যত্নে ১৬২ নীতি
 ও প্রয়োজিত হইবে, শাস্তির ভয়ে তাঁহাব কিনিও প নমান্তে ১৬৩ বে কিনা
 মনেহ । একথাও আবাব মনে রাখা কড়িয়া যে অমিক সুখাতি বা
 পূর্বকাঁবে অনেক বাদক আঞ্জোদে ও গনিহ হইয়া অমঙ্গলোৎপাদক যায় ।

যে রূপে শাসনে বাণকগণ কর্তব্যনিষ্ঠ, কাঁষাকুণ্ঠ, মনোমোহা ও
 সচ্চরিত্র হয় সেইরূপ শাসনকেই সুশাসন বলে । শিক্ষাকার্য্য পরিচালনার
 পক্ষে একপ সুশাসন অপ্রাণ্যকীয় । শিক্ষকের শক্তি ও গুণ
 সুশাসনের ফলাফল নির্ভর করে । শিক্ষক নিজে সুপণ্ডিত ও সচ্চরিত্র
 না হইলে শাসনে কোনরূপ ফলোদয় হইবে না । বিশেষঃ সমুদ্রস্রোতের
 নির্ধারক শাসন যে রূপে কার্য্যকরী, শত্রু সহস্র গগন ভেদো বক্র বা গাহার
 তুলনায় কিছুই নয় । আব একটা কথা বলিয়াও আমরা যে পরিচ্ছেদ
 শেষ করিব । বিলাতেব বগবী বিদ্যালয়েব ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক
 স্নানগদন্য আনন্ড সাহেব একবার তাঁহান বিদ্যালয় হইতে বহু
 সংখ্যক ছাত্রকে বহিস্কৃত করিয়া দেন । ছাত্রেরা তাঁহান আদেশ
 অমান্য করিয়াছিল ও মতান অপমান করিয়াছিল । বিদ্যালয় কালে
 তিনি ছাত্রগণকে ঠাট্টা বিনা দিলেন যে “আমি ছাত্রগণের
 সংখ্যা চাইনা, চরিত্র চাই । ঠাট্টা আমান খুল মুখ হইলেও আমি
 গাহা গ্রাহ্য করিব না ।” বিদ্যালয়গর মহাশয়ও একবার তাঁহান মেট্রোপ-
 লিটান কলেজ হইতে অনেক বাণককে অবদ্যাতন অপরাধে বহিস্কৃত
 করিয়া দিয়াছিলেন । উচ্চ গম্য স্থির রাখিয়া সেই দিকে আগমন হইতে
 ইবে । ছাত্রসংখ্যা সংশ্লিষ্ট অর্থেব দিকে দৃষ্টি রাখিলে, সুশাসন
 লা অসম্ভব । সুশাসনে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায় বলিয়া কোন কোন
 শিক্ষকেব ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ।



তৃতীয় অধ্যায় ।—সুশিক্ষাবিষয়ক ।



সুশিক্ষা কাকে বলে ? এষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহার আন্দোচনা করা আবশ্যিক । যে শিক্ষাসেত উদ্দেশ্য সাধন হয়, সেটুকুপ শিক্ষাই যে সুশিক্ষা, তাহা স্বীকার করিতে আগাদের আ। আপত্তা থাকিবেনা ।

যেব্যপ শিক্ষা বাড়ে আমরা মর্কতোভাবে স্বথসম্ভোগে সমর্থ হই তাহা সুশিক্ষা । কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক শান্তি সম্ভোগ করিতে পারি, কি উপায়ে সাংসারিক দুখে কষ্টাদি ও অভাবের হাত হঠতে পরিদ্রাণ পাউতে পারি, কি উপায়ে পরিবার পরিজন বর্গ পালন করিতে পারি ইত্যাদি বিষয়ক কার্য্যকরী প্রশ্নাদি শিক্ষা করাই সুশিক্ষা ।

তবে শিক্ষা দ্বারা ঐ সকল স্বথ সম্ভোগের বিধান কত দূর অসাধিত হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্তব্য । এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমে আগাদিগের অবশ্যকরীয় সাংসারিক কর্তব্য কর্ম্মগুলি

নিৰ্ণয় কৰা আবশ্যক । এতে কাম্যানিচয়কে স্নানানিক পৰ্যায় একে
এইৰূপে বিভাগ কৰা গঠিত থাকে (১) আত্ম সংৰক্ষণ (২) দানিকা পূৰ্ণ
(৩) সন্তান প্ৰতিপালন (৪) বাক্যশাসন ও সমাজেৰে শাসিতবদ্ধন
(৫) চিত্তবৃত্তি ।

১। আত্মরক্ষার সূচনায় সকল প্রকারে মানব মনে সমাদৃত হইয়া থাকে । নানক ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রকৃতিত নাশান মনে আত্মরক্ষার জ্ঞান দান কৰিয়া থাকেন । কোন অদৃষ্টপুৰুষ কোন কি বস্তু দেখিলে, বিপদেৰে আশঙ্কায় শিশু মাতৃ-কোণে লুকাগিত হইয়া থাকে । কিছু বড় হইলে, তাহারা বস্তুর গুণাগুণ জানিবান জন্ম পোৱাক বস্তুত মুখে দিয়া থাকে । অথবা বস্তুটী কঠিন কি কোমল তাহা হাতের দ্বারা পরীক্ষা কৰিয়া থাকে । জব্যাদির গুণাগুণ বিষয়ক এইকপ জ্ঞান বৰ্দ্ধন কৰিয়া আত্ম রক্ষার উপায় শিক্ষা কৰে ।

যখন দাঁড়াইতে বা একটু হাঁটিতে শিখে তখন ছুটাইটি কৰিয়া পেনো সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন কৰে । কিন্তু কেবল প্রকৃতিৰ এইকপ শিক্ষাৰ দ্বারা আত্মদিগেৰে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়না । বোগ হইতে শরীরকে দূৰ রাখা অথবা বোগ হইলে তাহাৰ প্ৰতীকান কৰা, শরীরকে ব্যাধায়াদিৰ দ্বারা দৃঢ়তৰ কৰাও আত্মদিগেৰে কৰ্ত্তব্য । এত নিমিত্তে আত্মরক্ষার নিয়মাদির প্ৰতিপালন ও ব্যাধায়াদিৰ অক্লেশজন আবশ্যক । আত্ম রক্ষা বিষয়ক নিয়মাদি ও কিলুপ ব্যাধায়েৰে দ্বারা কোন পেনো কি পৰিমাণে সবল হইয়া থাকে তাহাৰ বিষয়ে উপদেশ প্ৰাপ্ত না হইলে আমরা নিজেৰ শরীর রক্ষা কৰিতে সমৰ্থ হইব না । আৰু নিজেৰ শরীর রক্ষা না হইলে কেই বা অৰ্ণোপাৰ্জন কৰিবে, কেই বা সন্তান পালন কৰিবে, কেইবা আশোদ প্ৰমোদ ভোগ কৰিবে ? এই জন্মই হিন্দু শাস্ত্ৰকাৰেৰা “শরীর মাদ্যং খলু ধৰ্ম্ম সাধনম্” বলিয়াছেন । আজকাল বিদ্যাদায়ে নানাবিধ ব্যাধায়েৰে বিধান হওয়াতে শাৰীৰিক উন্নতিৰ কথঞ্চিৎ সন্ধ্যাবস্থা হইয়াছে ।

২। আত্মরক্ষার পবেষ্ঠ, জীবন রক্ষার্থ জীবিকা নির্বাহের উপায় শিক্ষা করা আবশ্যিক। কেবল পিণ্ডিতে পড়িতে বা ছই চারিটি অঙ্ক কসিতে শিখিবেই জীবিকা উপার্জন করিতে পারা যায় না। কৃষি, শিল্প বিজ্ঞানের চর্চাষ্ট অর্থোপার্জনের প্রধান উপায়। সেই জন্ত বালাকালেই বালাকগণকে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কার্যে উৎসাহিত করা হইয়া থাকে। কাগজ কাটা, মাটির পুতুল প্রস্তুত করা, কাঠি মাজান, বোজ মাজান প্রভৃতির দ্বারা কোনও বিশেষ শিল্পের অনুশীলন হয় না বটে কিন্তু শিল্পের অনুশীলন, যে লবু হস্ততা ও সহজ অঙ্গুলী-সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে, কাগজ কাটা প্রভৃতির শিক্ষার দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যানে কার্য্য করাতে কৃষি বিষয়ে অনুরাগ জন্মে। স্বহস্ত বোপিত বৃক্ষটী বড় হইয়া, ফলপুষ্পে শোভিত হইতে দেখিলে বালাকের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। আর বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র সকলকেই এই সমস্ত কাজ করিতে দেখিলে, শারীরিক পরিশ্রম যে লজ্জা বা অপমান জনক কার্য্য নহে ইহাও তাহারা বুঝিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে আজকাল বিজ্ঞানাদির অনুশীলন হইয়া থাকে। কৃষি শিল্পের উন্নতি বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনা সাংক্ষেপ।

চাকরীর দ্বারা যে অর্থোপার্জন হইতে পারে তাহা সত্য। বড় বড় চাকরী ভিন্ন সামান্ত চাকরী দ্বারা যে অর্থোপার্জন হইয়া থাকে, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন। আর সামান্য সংখ্যা তুলনায়, চাকরীর সংখ্যাইবা কমটী। তারপর সে চাকরীর অবস্থাও দিন দিন যেরূপ হইয়া পড়িতেছে তাহার কিম্বৎ বর্ণনা পুনরায় রায় যত্ন নাথ রায় বাহাদুরের "শিক্ষা, বিচার" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল :—এতদেশীয় ধর্মবান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব সম্ভ্রাম বিগকে সুলে, কালেজে দিয়া থাকেন, তদর্শনে সেই প্রকার অধুর্ভর্তী হইয়া মধ্যবিত্ত ও সামান্য লোকেও স্বীয় তনয়গণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। এই সকল স্কুল কালেজে বাদুশ বিদ্যাউপার্জন হয় তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মের আর যৎসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। হাইকোর্টের অধুনাতন যুজ্জ উকীলদিগের কৃষাবর্ণ সামলা ও

চিরবান্ধিত মোসব্বিহত চাপকান তাঁহাদিগের উপার্জনের যেকোন পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মোকদ্দমানাজ বাঙ্গালী দেশ "ব্যবহারজীবী মহাশয়দিগের আর আহার দিতে পারিবে না বলিয়া" যে শয়ন করিবান চেষ্টা করিতেছে, বিবেচনা করিলে ইহা কে না বুঝিতে পারিবে। দেশে মাদেগিয়া আর ও ওগাউঠার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও ডাক্তার বাবুদিগের যে ছুর্দশা, তাহাতে তাঁহাদিগের বিদ্যার অর্থোপার্জনী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। কেবল ইঞ্জিনিয়ার বাবুদের উদর এতাবৎ কাল পর্যন্ত অবাধে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেকে এক বিষয়ের প্রত্যাশী হইলে, যেকোন ছন্নবস্থা হয়, অচিরে এ ব্যবসায়ের সেই দশা ঘটিবে। এতদ্ভিন্ন মূল মাষ্টার ও কেনাণীদিগেরও ছুর্দশার কথাই নাই। তাঁহারা উপায়ান্তর রহিত বলিয়াই, মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগীর স্থায় নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া আছেন। ঐদৃশ ছন্নবস্থা দর্শন করিয়াও যে আমরা ঐকম বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি ও ত্রুটিত প্রথা ছাড়িতে চাহিনা, ইহা অপেক্ষা অবিবেচনার কর্তব্য কি হইতে পারে। যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্বপ্নসেবা দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়, যদ্বারা স্থখে কালাতিপাত হয় এবং যাহার অভাবে দেশের কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই, একমুহূর্ত্ত হিতকরী শিক্ষা পরিত্যাগ পুঙ্খক, নব্যমতপ্রদায়ীরা অবিবেচকের স্থায়, একটু ইংরেজী শিখিয়া এককূল ওকূল দুকূল হারাইয়া বসেন।

৩। পরিবার পরিজন প্রতিপালন করিতে হইবে ও সম্ভানকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। সাংসারিক সুখের ইহা প্রধান উপকরণ। কিন্তু যে সম্ভান সম্ভতির সুশিক্ষার উপর আমাদের পারিবারিক মঙ্গল-মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, যে সম্ভানগণ ভবিষ্যৎ আশার স্বদা, তাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত আমরা কি ব্যবস্থা করিয়া থাকি। যেকোন আহার দিলে বালকের শরীর সুস্থ ও সবল হইতে পারে, যেকোন নীতিশিক্ষায় তাঁহাদিগের মানসিক বুদ্ধিগুলি বিকশিত হইতে পারে, তাহা আমরা কয়জনে জানি? শারীরবিধান ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার না জন্মাইলে, বালকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের কৃতকার্য হইতে পারা যায় না। কি পিতা, কি মাতা, কি শিক্ষক সকলেই, এ বিষয়ে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। বাঙ্গালী দেশে বালিকা বয়স শেষ না হইতেই রুমগিগণ মাতা হইয়া বসেন। যিনি নিজেই বয়সে ও জ্ঞানে বালিকা মাত্র,

যিনি সংসারে ভালমন্দ বিষয়ক জ্ঞানশূন্য, তিনি অপবকে শিখাইবেন কি ? এই জন্য যে মাতৃশিক্ষার গুণে অন্যান্য দেশে মহৎলোকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এদেশে হইবাব নয় । কেবল বঙ্গ জননীরা এক গুণ আছে—প্রতিনিয়ত ভীষণ তর্জন গর্জন কবিতা পুত্র কন্যাগুলিকে সহজেই জড়ভরত করিয়া রাখিতে পারেন ।

বালকেবা প্রকৃতি হইতে যে জ্ঞান ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার প্রতিবন্ধকতা না করাই উচিত । ভয়প্রদর্শন, উৎকোচ বা প্রশংসা দ্বারা সন্তানকে বশীভূত করিয়া মাতা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাইয়া থাকেন । তাঁহারা মনে করেন, ছেলের মনে যাহা হউক আর না হউক, কোন মতে কার্য্য উদ্ধার হইলেই হইল । কিন্তু ইহা চিন্তা করেন না যে, এ ব্যবহারে অকারণ শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং জুয়াচুরি ও স্বার্থ-পন্থা অভ্যাস পাইয়া যায় । “সর্ব্বদা সত্য কহিবে, মিথ্যা কহিবে না, কহিলে মার থাকিবে” এই বলিয়া শিক্ষা দেন । কিন্তু শিক্ষানুস্তর মিথ্যা কথা কহিতে দেখিয়াও দণ্ডনা করিলে প্রকারান্তরে যে মিথ্যাকথনের উপদেশ দেওয়া হয়, বোধ হয় ইহা তাঁহাদের মনে উদ্ভিত হয় না । মনুষ্য জাতিব স্বাভাবিক যে জ্ঞান তৃষ্ণা আছে তাহা উত্তেজিত করিতে পারিলেই, শিশুরা অনায়াসে জ্ঞানোপার্জন করিতে থাকে । পুরোবর্তী জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান না জন্মিতেই, দূরস্থ বস্তু জানাইবার চেষ্টা বৃথা । বালকেরা ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে, তাহা সমাপ্ত না হইতেই পুস্তক হাতে দেওয়া বফল । পঞ্চমবর্ষ গত না হইতেই, পিতা ছেলেকে কাপড় পরাইয়া, একখানি বর্ণপরিচয় হাতে দিয়া, স্কুলে প্রেরণ করেন । এ দিকে ছেলে অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় সকল কিছুই শিখে নাই, সে পথে যাইয়া যাহা কিছু দেখে তাহাই নূতন ভাবিয়া তাহার পিছু পিছু দৌড়িতে থাকে, অথবা তাহার অনুসন্ধিৎসায় একাগ্রচিত্তে হা করিয়া থাকে । কেহ বা পাঠশালায় গমনপূর্ব্বক বহি

খানি খুঁটিয়া বাণিয়া, এদিকে ওদিকে চাতিতে থাকে । ওদিকে বিজ্ঞান, গুরু মহাশয়, “পড় পড়” বলিয়া চোৎকার পুস্তক ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন । ছেদোও ভয়ে ভয়ে, রাস্তায় মন ও পুস্তকে দৃষ্টি রাখিয়া চমৎকার চাতুলী শিথিতে থাকে । ক্রমে এইরূপ কোশল অভ্যস্ত হওয়াতে, অবশ্যজ্ঞেয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া উঠে । সুতরাং বয়োবৃদ্ধ হইয়াও, নিতান্ত অজ্ঞ থাকিয়া যায় এবং স্বাভাবিক জ্ঞানোপার্জনে পক্ষ ভ্রান্ত হইয়া চিরকালের মত অমনোযোগী হইয়া পড়ে । উর্বরতা সম্পাদন না করিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন অভিলষিত শস্যোৎপত্তি হয় না, তেমনি অসময়ে বিদ্যারম্ভ করিলেও ফলোদয় হয় না । “কিণিয়া কাঁটায়া পাকান আর বর্তমান শিক্ষা প্রণালী উভয়ই তুল্য” (শিক্ষাবিচার) ।

তবে এখন পূর্ক পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । আর যাহাতে বালকগণ স্রুতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে সেরূপ বিধান করিবার চেষ্টা করা হইতেছে । আর এই উৎকৃষ্ট প্রণালীতে যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্য সর্বত্রই শিক্ষাবিদগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ।

৪ । রাজ্যশাসন ও সমাজ সংস্কার, আশাদিগের অবশ্য করণীয় বিষয় । যে রাজ্য বা সমাজে আশরা বসবাস করি, সে রাজ্য বা সমাজ উন্নত না হইলে আশাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে । সুতরাং যে সকল বিষয় আশাদের সাংসারিক সুখের অন্তরায়, তাহার উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক ।

রাজ্যশাসন ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ইতিহাস পাঠের দ্বারা লাভ করা যায় । পূর্কের বেক্রপ ভাবে ইতিহাস লিখিত হইত তাহাতে কেবল রাজার নাম, যুদ্ধের বিবরণ, কতকগুলি মন তারিখ মাত্র থাকিত । কিন্তু বর্তমান প্রণালীতে রচিত গ্রন্থে “কিরূপে একজাতি অন্য

জাতি অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, কদৃশগুণ প্রভাবে সেই জাতি সর্বাপেক্ষা মান্যগণ্য ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন, তদেশ-বাসীদিগের তৎকালীন আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, প্রধান ও নিকৃষ্টদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্য কার্য কিরূপ প্রণালীতে সম্পন্ন হইত, পণ্যদ্রব্য সমূহ একদেশ হইতে অন্যদেশে কি প্রকারে প্রেরিত হইত, কৃষি কার্যের প্রথা কিরূপ ছিল, দেশের শাসন কার্য কি প্রণালীতে সম্পন্ন হইত, কি কি উপায়ে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইত ও প্রচলিত হইয়াছিল, মনুষ্য কি অবস্থায় উপস্থিত হইলে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম নিবারণের জন্ত কি কি রাজ্য নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই নিয়ম গুলিইবা কি পরিমাণে ফল প্রদ হইয়াছিল,” ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে আগাদিগের সমাজ ও রাজ্য শাসন বিষয়ক সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে শিক্ষাপ্রণালীতে এখনও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই । তবে পণ্ডিতগণ যখন আগাদিগের অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সে অভাব দূর করিবার যে উপায় আবিষ্কার করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

৫ । আমোদে স্পৃহা মানব মনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি । তবে সাংসারিক নানাপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা না থাকিলে আমোদে মন ধাবিত হয় না । সেই জন্ত প্রথমে শারীরিক, আর্থিক প্রভৃতি বিষয়ক সুখের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা ও ভাস্করীয় বিদ্যা চিত্তরঞ্জনের প্রধান উপকরণ ।

নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্ত গুণ গুণ করিয়া গান না করিয়া থাকেন এরূপ ব্যক্তি বোধ হয় খুব কমই আছেন । কিন্তু আমরা এত দিন পর্যন্ত এই প্রকৃতিগত একটা স্পৃহাকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না । বিলাতী স্কুলে সঙ্গীতের আলোচনা, পাঠ্য তালিকা ভুক্ত । কিন্তু আমরা অনেকেই সঙ্গীতকে দুষণীয়

বিদ্যা মনে করিয়া থাকি। পুত্র পিতার মাফাতে, কি ছাত্র শিক্ষকে মাফাতে, গান করিতে বাজা বোদ করিয়া থাকে। বাড়ীতেও সঙ্গীতে চর্চা অনেক নীতি বিগহিত মনে করেন। এহ সকল কারণে সঙ্গী শাস্ত্র গণিকা গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। স্বাভাবিক বৃত্তির বশীভূত হইলে যে সকল সঙ্গীতাভিনায়ী ব্যক্তিগণ এ বিদ্যার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনন্তোপায় চেষ্টা বারিষনাদ্বয়ে গমন করিয়া জীবনে সর্বনাশ সাধন করেন। চিত্র বিদ্যাকেও আমরা এতদিন যথেষ্ট হতাদ করিয়া আসিয়াছি। চিত্রাঙ্কনও একটা স্বাভাবিক প্ৰাণ। ছোট ছোট ছেলেরা বিনা শিক্ষায় নানারূপ অঙ্কন ও গঠন করিতে পাবে চিত্ররঞ্জন ছাড়া, অঙ্কন বিদ্যা বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান সহায় স্তরাং এরূপ আবশ্যকীয় বিদ্যাকে অনাদর করিয়া বিশেষ অছায় করিয়াছি। আজ কাল পাঠশালায় নিম্নশ্রেণী হইতে মেট্রিকিউলেশন শ্রেণী পর্যন্ত এহ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে।

সুশিক্ষা কথাকে বলে, এখন আমরা এ প্রণের উত্তর দিতে সক্ষম যে শিক্ষা দ্বারা উক্ত পঞ্চ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতঃ সেই জ্ঞানে ব্যবহার দ্বারা আগাদিগের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রচুর পরিমাণে সুখী করিতে পারা তাহাকেই সুশিক্ষা কহে। কিন্তু এই পঞ্চ বিষয়ের অনুশীলন, প্রকারান্তরে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ফলমাত্র। স্তরাং সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সমবায় ও সম্যক অনুশীলনই সুশিক্ষা। এখন এই বৃত্তি সমূহের কিরূপে উন্নয়ন হইতে পারে নিম্ন সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে :—

১। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন।—“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্য সাধনম্” ধর্ম্য সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রণ শরীর রক্ষা করা কর্তব্য—ইহা হিন্দু শাস্ত্রকার গণের উপদেশ। গৃহ ধর্ম্য, সন্তান পালন ধর্ম্য, অহিংসা ধর্ম্য,

অর্থোপার্জন ধর্ম, ইত্যাদি হইতে মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত মনুষ্যের অবশ্য করণীয় কর্তব্যাবলী সমুদায়ই তাহার 'ধর্ম'। যদি শরীর সুস্থ ও সবল না হইল, তবে সংসারের এই নানারূপ কর্তব্য কর্ম কে সম্পন্ন করিবে? এইজন্য সর্বপ্রথমে শরীর রক্ষা করিতে হইবে। শরীর কেবল রোগমুক্ত করিলে হইবে না, ভবিষ্যতে যাহাতেবোগ স্পর্শ করিতে না পারে তাহাবও বিধান করিতে হইবে। ঋণ মুক্ত হইলে চলিবে না, ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় ঋণজালে জড়িত না হইতে হয়, তাহার প্রতি বিধানার্থ শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ব্যায়ামাদির আবশ্যিকতা। ব্যায়ামে শরীরের অস্থি, শিরা ও মাংসপেশী সমূহকে দৃঢ় ও উন্নত করিয়া, দেহ সবল করে। যেমন মূর্খের চিত্ত বিভ্রান্ত হইলেও সে জ্ঞানের স্মৃতি বুঝিতে পারে না, সেইরূপ অসুস্থব্যক্তির দেহ রোগশূন্য হইলেও, সে শক্তি সঞ্চয়ের স্মৃতি উপলব্ধি করিতে পারে না। যেমন মনের পক্ষে জ্ঞানার্জন, সেইরূপ দেহের পক্ষে শক্তি সঞ্চয়। দুইই আবশ্যিক।

মনুষ্য দেহে ছোট বড় প্রায় ৪০০।৫০০ শত ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশী আছে। এই সমস্তগুলি পেশীরই বিশেষ অনুশীলন আবশ্যিক হয় না। প্রধান প্রধান কতকগুলি পেশীর অনুশীলন হইলেই অপর গুলি তাহাদের সাহায্যে উন্নত হইয়া থাকে। পেশীগুলি সূত্রাকার মাংসের গুচ্ছ মাত্র। এক অস্থির সহিত অন্য অস্থি সংযুক্ত করিয়া রাখে। অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে পেশী গুলি আবশ্যিক মত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। হাত মুখের নিকট আনিলে বাহ্য উপরিভাগের (প্রাগণ্ডের) এক অংশ ফুলিয়া উঠে। এই অংশের পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হওয়াতে এইরূপ ঘটে। এই পেশীকে দ্বিশির পেশী কহে, কারণ ইহা দুইটি শিরে বিভক্ত। এই পেশী দ্বিশির প্রান্ত উর্দ্ধে স্বল্প দেশের অস্থির সহিত ও অপর প্রান্ত বাহ্য নিম্নার্দ্ধের (প্রেকোষ্ঠের) অস্থির সহিত (কনুইএর নিকট) সংযুক্ত। হস্ত ঝুলিয়া থাকিলে এই পেশী বার ইঞ্চি মত লম্বা

হয় ও সঙ্কুচিত হইলে ও উৎস হইয়া ফুলিয়া উঠে । সাধারণতঃ এইগুলি কপের দড়ির মত মোটা । কার্য্যেও ইহারা দড়ির মত কার্য্য করে । বাহ্যর উৎকর্ষের মর্ফিত নিম্নার্কে মংযোগ করিয়া রাখাই দ্বিগির পেশীর কার্য্য । বাহ্যর উৎকর্ষের নোচে, ঠিক দ্বিগুচ্ছের বিপরীত দিকে দ্বিগির পেশীর দ্বারাও বাহ্যর ছুই অংশ আবদ্ধ আছে । দ্বিগির সঙ্কুচিত হইলে দ্বিগির প্রসারিত হয়, আর দ্বিগির প্রসারিত হইলে, দ্বিগির সঙ্কুচিত হইয়া কিস্কিৎ ফুলিয়া উঠে । এইরূপ পাদ দ্বয়ের অংশ সমূহও নানারূপ পেশী দ্বারা আবদ্ধ । তন্মধ্যে যে পেশী গুল্ম ও জড়াকে আবদ্ধ করিয়া, জাহুর পশ্চাডাগে অবস্থিত, সেই পেশীই শরীরস্থ সমস্ত পেশীর মধ্যে বৃহৎ ও সর্বাঙ্গা অধিক কার্য্যকারী ও বলশালী । এই পেশীর নাম বৃহৎ যবোদর পেশী । বুকেপীঠেও নানারূপ পেশী আছে । এই সমস্ত পেশীর বিধিমত সঞ্চালন দ্বারা আমরা তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারি । যখন পেশীর বলের উপরেই আমাদের অঙ্গ সঞ্চালনের বল নির্ভর করে, তখন সেই পেশীগুলির উন্নতি সাধনে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্তব্য । শরীরে পেশীগুলি যেক্রপ ভাবে বিচ্ছিন্ন আছে, তাহা দৃষ্টেই আমরা পেশীর উন্নতি সম্বন্ধে, তাহাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারি :—

(ক) প্রত্যেক পেশীর রীতিমত সঞ্চালন আবশ্যক । যে পেশীর কোনরূপ সঞ্চালন হয় না, সে পেশী শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । অনেক মূলকায় অঙ্গম ব্যক্তিকে দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় । যাহারা বদন সঞ্চালনে প্রায়োগিক সঞ্চালন ভিন্ন বাহ্যর অঙ্গ ব্যবহার করেন না, তাহাদের পেশী এক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় যে হস্ত সঙ্কুচিত করিলে, দ্বিগির যার ফুলিয়া উঠে না । ইহারা হাতের দ্বারা কোনরূপ ভারি পদার্থ গুলিতে সক্ষম হয় না । বাহ্যর রীতিমত সঞ্চালনে পেশী ফুলিয়া উঠে । সবল হয় । যথা কর্ম্মকারের বাহ্যস্থ পেশী । যে সকল ব্যক্তি পাহাড়

পৰ্বতে যাতায়াত করে তাহাদিগের বৃহৎ, যবোদর পেশী সমধিক শুল ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে । পেশী সঙ্কুচিত হইলে তথায় অনেক পরিমাণে রক্ত সঞ্চাৰিত হয় ; আর পেশীর সঞ্চালনে ও প্রসারণে ইহার যে শক্তি ব্যয়িত হয়, বিশ্রামকালে ইহাতে তদপেক্ষা অধিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে । ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ।

(খ) বয়স, স্বাস্থ্য ও অভ্যাস বিবেচনায় অল্প সঞ্চালনাদি করিতে হইবে । অতিরিক্ত সঞ্চালন হইলে, পেশী সমূহ অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের স্বাভাবিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের শক্তি পর্য্যন্ত ক্ষণিকের জন্য নষ্ট হইয়া যায় । একরূপ সঞ্চালন বাঞ্ছনীয় নহে ।

(গ) পেশী সঙ্কোচনে আমরা রক্তস্থিত অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া তাহাতে অঙ্গার-অক্সিজেন-বায়ু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ পরিত্যাগ করি । এই জন্য সঙ্কুচিত পেশী হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, তাহা অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় পেশী সমূহের রক্ত অনেক পরিমাণে নিষ্ফল । এইরূপ পেশী সঞ্চালনে অঙ্গারাক্স বায়ুর বৃদ্ধি পায় । এই বায়ু আমরা সঞ্চালন কালে, ও তৎপরে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া বহির্গত করিয়া থাকি । ইহা দ্বারা আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে—পেশী সমূহের ক্রিয়া কলাপের সহিত সঞ্জীবনী-রক্ত সঞ্চালনাদি ক্রিয়ার ও জীবন-বায়ু-প্রবাহী শ্বাস প্রশ্বাসের যজ্ঞাদির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে । ব্যায়ামের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । প্রথমতঃ, শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । স্থির ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় একজন সুস্থকায় যুবক প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে, দ্রুত ভ্রমণে ২৫ বার আর দৌড়াইলে ৩৬।৩৭ বার পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ শ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি পায় । শয়ন অবস্থায় একজন সুস্থকায় ব্যক্তি নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করেন, তাঁহাকে যদি আমরা ১ দ্বারা নির্দেশ করি, তবে দণ্ডায়মান অবস্থায়, যে বায়ু

গৃহীত হয় তাহার পরিমাণ ১৩, আর ঘণ্টায় ৪ গ্রাহণ করিয়া হাটবার সময় যে বায়ু শ্বাসের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহার পরিমাণ ৫ কি ৬ দ্বারা সৃষ্টিও হইতে পারে । এইরূপ শ্বাসের সহিত আনেক বায়ু গ্রহণের সঙ্গে, আমরা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকি আর প্রাণসেব সহিতও অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পরিণাম করিয়া থাকি । সুতরাং শরীরে দহন কার্য্য বৃদ্ধি পায় । পেশীসমূহের কাৰ্য্য শক্তিও বৃদ্ধি করিয়া দেয় । রক্তাধার হৃৎপিণ্ডের কাৰ্য্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়— হৃৎপিণ্ডের বিট (ধুক্‌ধুকি) ১০ হইতে ৩০ বার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সুতরাং রক্ত সঞ্চালন কার্য্যও অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে । হৃৎপিণ্ড হইতে বিগত রক্ত অধিকতর দ্রুতবেগে চতুর্দিকে প্রেরিত হয় ও অশুদ্ধ রক্ত অধিকতর বেগে হৃৎপিণ্ডে পুনঃ প্রাণ্যবর্তন করিয়া শুদ্ধ প্রাপ্ত হয় ।

(ঘ) বৃহৎ পেশী সমূহ দেহে তুল্যদণ্ডের কাৰ্য্য করিয়া থাকে ; জব্য উত্তোষন, ভার-বহন শক্তির প্রতিপোষ প্রভৃতি কার্য্য এই সকল পেশীর সাহায্যেই সম্পাদিত হয় । কিন্তু এই সকল তুল্যদণ্ড, বিজ্ঞান বিভক্ত তুল্যদণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ “বলমধ্য” । এইরূপ ‘বলমধ্য’ হওয়াতে আমাদের বায়াম চর্চ্চার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । হস্ত পদাদি পেশীর অনুশীলনে আমরা কোনও লঘুজব্য (ভার) হাতে থিয়া বা পায়ের দ্বারা আঘাত করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক রস সৃষ্টি করিতে পারি । মেহ জল সামান্য এক থানা কাঠ বা লাঠি পাওয়া ডায়েনের সাহায্যে আমরা যে সকল ব্যায়ামাদি সম্পাদন করি, তাহার অনুশীলন প্রযুক্ত আমাদের গুরুতর ভারবস্ত্র বহন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

বড় বড় পৌছ বা প্রস্তর থণ্ড বা ভাবি ডায়েল কি মুদগরের সাহায্যে ব্যায়াম করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই । পাতলা ফুটবল

লইয়া খেলা করায় পায়ের বৃহৎ যবোদর পেশী বিশেষ শক্ত হইয়া উঠে ।

(ঙ) নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বক্ষঃস্থলের পেশী সঞ্চালিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক পাশ্বের দুই দুই খানি পঞ্জরাস্থির মধ্যে দুই প্রস্ত করিয়া পেশী আছে । এই পেশীকে পঞ্জরপেশী কহে । যখন ইহার এক প্রস্ত পেশী প্রসারিত হয়, তখন বক্ষঃস্থল ফু দিয়া উঠে, আবার অল্প প্রস্তের প্রসারণে বক্ষঃস্থল নামিয়া পড়ে । উপযুক্তরূপ পরিচালনা দ্বারা এই সকল পেশী শুল ও সবল হইয়া থাকে । বলবান ব্যক্তির বক্ষঃস্থল কেমন সুন্দর ও উন্নত, আব দুর্বল ব্যক্তির বক্ষঃস্থল কেমন বিস্তী ও অনুরত ।

(চ) কেবল একটী বা এক শ্রেণীর পেশী সঞ্চালন করিলে অল্প যে সকল পেশী কার্য্যতঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যায়ামের চর্চ্চা করা আবশ্যক ।

(ছ) মাংস পেশীর সঞ্চালনে মাংস, শিরা, ধমনি, অস্থি সকল ক্রমে সবল হইয়া উঠে ।

(জ) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিব উপযুক্ত রূপ ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক উভয় বৃত্তিরই অনুশীলন হইয়া থাকে ।

২। মানসিক বৃত্তির অনুশীলন ।—বালকগণের কতকগুলি মানসিক বৃত্তি বিকাশের সহায়তা না করিতে পারিলে শিক্ষাদানের চেষ্টা বৃথা । বিষয়াদির ধারণা করিতে হইলে, স্মৃতি, কল্পনা, মনোনিবেশ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সাচায্য আবশ্যক । সুতরাং কিরূপে এই সমস্ত বৃত্তির উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই কিঞ্চিৎ জানা উচিত ।

মানব মনের তিনটী প্রধান বৃত্তি । (১) বুদ্ধি—যাহার সাহায্যে আমাদের পদার্থের জ্ঞান জন্মে । (২) অনুভব—যাহার শক্তিতে

আমাদিগের দয়া, সমতা, ভাণবাসা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতির বোন জন্মে।

(৩) ইচ্ছা—যাহা দ্বারা প্ররোচিত হওয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই।

বালকের মনে এত সমস্ত এবং ইচ্ছাদেব আনুমানিক বৃত্তিসমূহ অপরিণত অবস্থায় থাকে। এই সমস্ত বৃত্তির সম্যক বিকাশ করাই শিক্ষাদানের প্রধান কার্য। এই সমস্ত বৃত্তির কার্যের মধ্যে অন্য বৃত্তির কার্য প্রায়ই সংশ্লিষ্ট। যথা—বালক পাখী পরিবার জন্ত ফাঁদ পাতিতেছে—এইটো তাহার ‘বুদ্ধিবৃত্তির’ কার্য; কিন্তু এই কার্য করিবার পূর্বে তাহার ঐ কাজ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সুতরাং ‘ইচ্ছাবৃত্তি’ তাহাকে একাধারে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আবার পাখী ধরিতে পানিয়া বা না পানিয়া তাহার যে স্থখ বা দুঃখানুভব হয়, তাহা ‘অনুভব’ বৃত্তির কার্য। কিন্তু যেমন কোন একটা অব্যাহিত কৃষ্ণত্ব, লবুত্ব, কঠিনত্ব প্রভৃতি গুণ আমবা ভিন্ন ভিন্ন করিয়াও বিচার করিতে পারি, তেমনি মানব মনের বৃত্তিগুলির কার্য অনেক সময় পরস্পর সাপেক্ষ হইলেও আমবা পৃথকরূপে তাহাদিগের আলোচনা করিতে পারি। অনুশীলনের দ্বারা যেমন সাংমণেশীসমূহকে যথেষ্টরূপে সবল করিতে পারা যায়, অনুশীলনের দ্বারা সেষ্টরূপ মনের বৃত্তি সমূহকেও যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করা যায়। কিন্তু এই উভয় অনুশীলনেই এক কথা মনে রাখিতে হইবে, বালকের বয়স ও সামর্থ্য বুঝিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের পরিমাণ নির্ণয় করিবে। যে ব্যক্তি আশ মণ বোঝা বহিতে পারে না, তাহার খাড়ে দুই মণ বোঝা চাপাইয়া দিলে, যেমন তাহার খাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে; সেহরূপে যে বালক বালচাপল্য প্রযুক্ত কোন বিষয়ে অর্ধ ঘণ্টার অধিক মনোনিবেশ করিতে পারে না, তাহাকে কোন বিষয়ে দুই ঘণ্টা মনোনিবেশ করিতে হইলে, তাহার অভিনিবেশের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটু একটু করিয়া সব কার্য সম্বন্ধ করাইয়া লইতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সব নষ্ট হইবে।

মনের দুইটা গুণ প্রধান—একটা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, অপবটা প্রদান করিবার ক্ষমতা । মন প্রথম ক্ষমতা দ্বারা বাহিরের জ্ঞান, সুখদুঃখ প্রভৃতি গ্রহণ করে, দ্বিতীয় ক্ষমতা দ্বারা সেই উপার্জিত জ্ঞান অল্পকে প্রদান করে । জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমবা এই বাহিরের জ্ঞান লাভ করি, কশ্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অল্পকে প্রদান করি । যথা—শিক্ষক চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণের দ্বারা শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহা তিনি মুখ বা হস্তের দ্বারা অল্পকে দান করিয়া থাকেন । এখন কি কি পর্যায় অনুসারে আমরা এই বাহিরের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । প্রথম ‘ইন্দ্রিয়বোধ’—শিশু তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি দ্বারা প্রথমে দ্রব্যের পরীক্ষা আরম্ভ করে । দ্বিতীয় ‘বস্তুজ্ঞান’—নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর নানাবিধ গুণ বুঝিতে চেষ্টা করে । কোন ছেলের হাতে একটা সন্দেশ দিলে, সে সেই সন্দেশটিকে হাতের দ্বারা, চক্ষু দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করিতে থাকে । এইরূপে যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি একত্রিত হইয়া ঐ বস্তুতে নিহিত হয়, তখন তাহার ‘বস্তুজ্ঞান’ জন্মে । এইরূপে সে একটা একটা করিয়া সকল জিনিস চিনিতে আরম্ভ করে । তারপর ‘স্মৃতি’—ছোট শিশু যতই বড় হইতে থাকে ততই সে নানা কথা মনে রাখিয়া তাহার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে । চতুর্থ ‘কল্পনা’—বালক যাহা দেখে নাই, সেরূপ বস্তুর বিষয়ও সে পরিচিত পদার্থের সাহায্যে কল্পনা করিতে শিক্ষা করে । পঞ্চম ‘চিন্তা’ অর্থাৎ কল্পনা বৃত্তির সাহায্যে সে যে সকল বিষয় ভাবিয়াছে সে সমস্ত প্রকৃত কি অপ্রকৃত ইহাই চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে শেখে । প্রধানতঃ এই পাঁচটা উপায়ের দ্বারাই আমাদের স্বভাবদত্ত জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে । আবার ঐ সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নতি অল্প কয়েকটা মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে । (১) মনোযোগ বা অভিনিবেশ (২) বিচারশক্তি (৩) কার্যকারণানুসরণী বুদ্ধি । বালক-মননিহিত এই

সকল অক্ষুটবৃত্তির বিকাশসাধন কিরূপে করা যাইতে পারে, একে একে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছেঃ—

ইন্দ্রিয়বোধ ও বস্তুজ্ঞান (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) । আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করি, সেই জগত ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ বলা হইয়া থাকে । চক্ষু ইন্দ্রিয়গণের রাজা । চক্ষুর সাহায্যে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করি । চক্ষুর পরে কর্ণ, তারপর ত্বক, তারপর নাসিকা ও জিহ্বা । চক্ষু কর্ণাদির সহিত স্নায়ু স্নায়ু স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্ক সংযুক্ত । মস্তিষ্কই জ্ঞান উৎপত্তিব কেন্দ্র স্থান । আমরা যখন কোন দ্রব্য দেখি তখন আঙ্গাদিগের চক্ষুর সম্মুখস্থ পদার্থ হইতে আদ্যোক্ত তবৎ উদ্ভিত হইয়া আঙ্গাদিগের চক্ষুর পশ্চাত্তাগের অবস্থিত ও মস্তিষ্কের সহিত সংলগ্ন স্নায়ু সমূহকে সঞ্চালিত করে । এই সঞ্চালনেই আমাদের ইন্দ্রিয় বোধ হয় অর্থাৎ সেই বস্তু কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারি । মস্তিষ্কের বিকার হইলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সঙ্কোচে, দর্শনে কোনই জ্ঞানলাভ হয় না । এইরূপ কর্ণের মধ্যস্থিত পটহে যখন বাহিরের শব্দ শ্রবণ প্রতিঘাৎ করে, তখন সেই আঘাতে কর্ণ ও মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্নায়ুসমূহ সঞ্চালিত হইয়া, কিরূপ বা কোন বস্তু হইতে উদ্ভিত শব্দ তাহার জ্ঞান জগাইয়া দেয় । কিন্তু যদি আমরা তৎতৎ পদার্থের প্রতি মনোনিবেশ না করি, তবে চক্ষুর সম্মুখে বস্তু ধরিলেও আঙ্গাদিগের তাহার জ্ঞান জন্মে না বা কর্ণের নিকট শব্দ করিলেও আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না । বালকের চক্ষুর সম্মুখে ঘরের দেওয়াল, দেওয়াল সংলগ্ন চিত্রাদি ও বোর্ড রহিয়াছে । কিন্তু যখন বালক বোর্ডস্থিত কোন জ্যাগিতিক চিত্রের প্রতি অভিনিবেশ করে, তখন বোর্ডেরও সসমস্ত অংশ তাহার জ্ঞানের সীমায় আইসে না, দেওয়াল ও চিত্রাদির কথা দূরে থাকুক । এইরূপ নানা পাখীর গান, গছষা কলরব, বৃক্ষাদির শ্রবণ প্রতিনিয়ত কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া কর্ণের পটহে আঘাত

করিতেছে, কিন্তু বানাকেও যখন অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের কথা শ্রবণ করিতে থাকে, তখন অল্প শব্দ তাহাদিগের কাণে প্রবেশ করিলেও কোন জ্ঞানের উদয় করিতে পাবে না । সুতরাং জ্ঞানলাভ অভিনিবেশ সাপেক্ষ । যখন আমরা মনকে পদার্থবিশেষে অভিনিবেশ করি তখনই আমরা চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পাই ; ইহাই ইন্দ্রিয় বোধ । আবার যখন, সেই পদার্থ কোন বস্তু ইহা বুঝিতে পারি, তখনই আমাদের সেই পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে । কোন কোন জ্ঞানাত্মক ব্যক্তি অল্প চিকিৎসায় দর্শন শক্তি লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পাবে না । কোনটী তাহার পিতা, কোনটী বা মাতা, ও কোনটী বা বৃক্ষ—দর্শন শক্তি দ্বারা ইহার কিছুই ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পাবে না, যদিও সে সব জিনিসই দেখিতে পায় । তাহার ইন্দ্রিয়বোধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না । শিশুদিগের ঠিক এই অবস্থা । তাহারা সকলই দেখিতে পায় কিন্তু তাহাতে বস্তুর জ্ঞান হয় না । ক্রমে দেখিতে দেখিতে ও অল্পাংশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিতে করিতে একটু একটু করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় ।

বাল্যকালে প্রাকৃতিক প্রণালী অনুসারে ইন্দ্রিয় বোধ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিকশিত হইতে আরম্ভ করে । বালকগণ নিজের বাগজনমূলত উৎসুক্য ও চেষ্টায় অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে । কিন্তু যখন সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন শিক্ষকের কর্তব্য, এ জ্ঞান উপার্জনে তাহাকে যথাবিধি সাহায্য করা । কিংবারগার্টেন প্রণালীর ইহাই উদ্দেশ্য—এই প্রণালীমত কার্য করিলে ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক বিকাশ হইয়া থাকে । আবার ইঞ্জিয়াদির সাহায্যেই যখন আমরা জ্ঞান উপার্জন করি, তখন ইহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করা আমাদের প্রধান কর্তব্য ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুষ্টি সাধন ।—বিদ্যাদায়ে লিখন, শ্রবণ, বোধ বা কাটি সাধন, ব্যবহারিক জ্যামিতি প্রভৃতির সাহায্যে দশেন্দ্রিয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় । পূর্বপর নিয়মিত পথ অবলম্বন কবিনাও এই সমস্ত প্রধান ইন্দ্রিয়ের শক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভবতঃ পারে :—

(ক) ভিন্ন ভিন্ন রঙ শিলা দিবে চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি হওয়া থাকে ।

(খ) কোন বৃক্ষ পত্র দেখিয়া একটী পত্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে দাও, পরে না দেখিয়া তদ্রূপ পত্র অঙ্কিত করিতে পারে কিনা, পরীক্ষা কর । স্মৃতি ও শ্রুতির পরিচালনা না কবিনাও অঙ্কন করিতে পারিবে না ।

(গ) মানচিত্রের বিশেষ কোন অংশ লক্ষ্য করিতে বল । মানচিত্রের সেই অংশস্থিত যে যে বিষয় বালককে না দেখিয়াই নিজ মানচিত্রে চিত্রিত করিতে হইবে তাহা নির্দেশ কর । পরে মানচিত্র জড়াইয়া বাধিয়া রাখ ও বালককে চিত্র অঙ্কিত করিতে বল ও সেই সকল বিষয় চিত্রিত করিতে বল ।

(ঘ) বোর্ডের উপর ১২০, ৫৭৬৩৯ এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা বড় কি ছোট সংখ্যা লিখিয়া দেও । বালকগণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করুক । পুঁছিয়া দেও । বালকগণকে আবার লিখিতে বল ।

(ঙ) ৩৫, ৪৮, ১৭, ২৯, ৮৭ এইরূপ কতকগুলি সংখ্যা পরপর লিখিয়া দাও । পরে পুঁছিয়া দিয়া বালকগণকে ত্রুটি লিখিতে বল । এইরূপ ১৮, ২৯, ৩৭ কে মনে মনে যোগ করিতেও বলিতে পার ।

এ সমস্ত অভ্যাসে কেবল যে দশন শক্তিরই অনুশীলন হইবে তাহা নহে, ইহাতে শ্রুতি ও অভিনিবেশের ও যথেষ্ট অনুশীলন হইবে । কারণ বালককে এই সমস্ত চিত্র বা সংখ্যা চক্ষুদ্বারা মনোযোগপূর্বক দেখিয়া মনে করিয়া রাখিতে হইবে ।

প্রথমে শব্দাদির উচ্চারণ শিক্ষা করিতেই কর্ণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকে । কথাবার্তা বা উত্তম আবৃত্তি শিক্ষা করিতে অন্যের অনুকরণ

আবশ্যক । এই কার্য্য কর্ণের সাহায্যেই সম্পাদিত হয় । সঙ্গীত শিক্ষায় শ্রবণশক্তির যে পরিমাণ অনুশীলন হয়, এত আর কিছুতে হয় না । আমাদিগের বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার পদ্ধতি নাট, কিন্তু বিদ্যাতী বিদ্যালয়ে সঙ্গীতও একটা বিদ্যালয় পাঠ্য বিষয় । তবে সূত্রে বিষয় এই যে আজকাল আমাদিগের বালিকা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ক্রমঃ প্রচলন হইতেছে ।

লিখনে, চিত্রাঙ্কনে, মূর্ত্তিকার দ্বারা জবাাদি গঠনে, স্পর্শশক্তির অনুশীলন হয় । কোন বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা দিতে হইলে, সেই বস্তু (যতদূর সম্ভব) সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক বালকের হাতে দেওয়া উচিত । স্পর্শ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের যথেষ্ট সহায়তা করে । কঠিন, কোমল, মৃদু, বন্ধুর প্রভৃতি দ্রব্যগুণ শিক্ষায় স্পর্শশক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দ্বারা নাসিকার, ও কটু তিক্তাদি দ্বারা জিহ্বার বোধ শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে । (কিঞ্জারগার্টেন প্রণালী বর্ণনায় এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে) । কিন্তু যখন মনোযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে, তখন মনোযোগ বৃদ্ধি করাও বিশেষ আবশ্যক ।

মনোযোগ বা অভিনিবেশ ।—কোন বস্তু বা ভাবের প্রতি একাগ্রচিত্তে মন নিবিষ্ট করাকে মনোযোগ বা অভিনিবেশ বলে । শিক্ষায় মনোযোগ অতি আবশ্যকীয় । বালকগণকে অভিনিবিষ্ট হইতে শিক্ষা দিতে হইবে । অভিনিবেশই কার্য্য সম্পাদনের বিশেষ সহায় । বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে, সেই জ্ঞান স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যায় ।

মনোযোগ দ্বিবিধ—স্বতঃ উৎপন্ন ও পরতঃ উৎপন্ন । আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করি তাহা স্বতঃ উৎপন্ন

মনোযোগ । বালকে না খেলাতে নিজ ইচ্ছায় মনোনিবেশ করে, কিন্তু পড়াতে সে নিজ ইচ্ছায় মনোনিবেশ করিতে চাহে না । তাহাকে পড়াতে মনোনিবেশ করাইবার জন্য আমরা নানা উপায় অবলম্বন করি—যথা পুস্তকে নানাক্রম মনোহর ছবির ব্যবস্থা করি, বিজ্ঞানের পরীক্ষা প্রদর্শন করি, মানচিত্র বা উত্তম পুস্তলিকা প্রদর্শন করি ইত্যাদি । খেলাতে তাহার মনোযোগ স্বতঃ প্রবর্তিত, কিন্তু পাঠে পরতঃ প্রবর্তিত—অর্থাৎ পাঠে অন্য বস্তুর সাহায্যে তাহার মন আকর্ষণ করিতে হইতেছে । উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ স্বতঃ উৎপন্ন মনোযোগ সহকায়েই পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট বালকগণের পাঠে স্বতঃ উৎপন্ন প্রবৃত্তি জন্মে না বলিয়া নানাক্রম বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিতে হয় ।

যুবকই হউক বা শিশুই হউক, বালককে তাহার কার্যে মনোনিবেশ করাইতেই হইবে । মনোযোগ ভিন্ন কোন কার্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না । বালকগণের মনোযোগ বৃদ্ধির অনুশীলনে নিম্নলিখিত রূপ প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

- (ক) চিত্র, পুস্তলিকা বা দ্রব্য প্রদর্শন ।
- (খ) বোর্ডে মানচিত্র বা অল্পবিধ চিত্রাঙ্কন ।
- (গ) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন ।

এই সমস্ত পরতঃ উপায়ের দ্বারা বালকের মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে । পাঠের অন্তর্গত বিষয় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে হইবে । বোর্ডে উত্তম চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে । অনেক শিক্ষক বোর্ডের চিত্রাদি (সাধারণ কি জ্যামিতিক) বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী নহেন । তাহারা যেমন ভেমন একটা ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করেন । কিন্তু এমত করা সম্ভব নহে । বেশ সুস্পষ্ট ও সুন্দর চিত্রের দ্বারা মন যেরূপ আকৃষ্ট হয়, নিকৃষ্ট চিত্রাদিতে তাহা হয় না—বরং বিপরীত ফল হওয়া আশ্চর্য্য নহে ।

(ঘ) এমন অনেক গুপ্ত বিষয় আছে, যাহাতে এইরূপ চিত্রাদি বা অন্য কোন বাহ্যিক উপায়ে মন আকর্ষণ করা যায় না । উপসর্গের ফর্দ, ও য ব্যবহারের নিয়ম, উপক্রমণিকার শব্দকণ, ধাতুকণ, ইংরাজী ব্যাকরণের লিঙ্গ প্রকরণের তালিকা প্রভৃতি মনোনিবেশ সহকারে মুখস্থ করিতে হইবে—এ সমস্ত সুখপ্রদ করা দুঃসাধ্য । এইরূপ বিষয়ে বালকগণকে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করিতে হইবে । সময় সময় একটু শাসনেরও আবশ্যক । শাস্তির ভয়ে মনোনিবেশ করিতে করিতে, শেষে অভ্যাগম হইয়া পড়িবে । উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের স্বতোৎপন্ন অভিনিবেশ বৃত্তি প্রবল করিয়া দিতে হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাদানে যে সকল পবতোৎপন্ন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা কখনই পরিত্যজ্য নহে ।

(ঙ) কোন প্রগ একবারের অধিক জিজ্ঞাসা করিবে না । শ্রুত-লিপির বাক্যাংশ একবারের অধিক আবৃত্তি করিবে না । বাধ্য হইয়া বালকগণ মনোযোগী হইতে চেষ্টা করিবে । (শ্রুতলিপির অধ্যায় দেখ) ।

(চ) কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিবে ও হাত মুখের ভঙ্গী দ্বারা বিষয় বিশদ করিতে যত্ন করিবে । বালকগণ নিস্তব্ধ হইয়া তোমার কথা শ্রবণ করিবে ও ভঙ্গী দর্শন করিবে । দর্শন, অভিনিবেশের বিশেষ সহায় । বালকেরা থিয়েটার বা যাত্রা গুলিতে গিয়া বিষয়টী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসে । কেন ? অভিনেতৃবর্গের উত্তম বক্তৃতা ও সমস্ত ভঙ্গীর দ্বারা তাহাদিগের মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া ।

(ছ) যাহাতে বালকেরা শিক্ষায় আগ্রহ পায় সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । বালকই হউক আর যুবকই হউক যে কার্যে আগ্রহে পাইবে না বা যে কার্যে কোন লাভের প্রত্যাশা দেখিবে না, যে কার্যে মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না ।

(জ) এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ অসম্ভব । এক বিষয়ে

অনেকক্ষণ পাঠ দিবে তাহাদিগের ঠৈর্য্য চুতি হইবে । ইহাই বিবেচনা করিয়া বিষয় পরিবর্তন ও সময় নিৰূপণ করিতে হইবে । কোন কোন শিক্ষক “এক বিষয়ের কথা গঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বালকদিগের সমক্ষে কহিতে থাকেন এবং শিশুরা তচ্ছবনে অমনোযোগী হইলেই জোঁধাবিষ্ট হইয়া থাকেন । তাহারা বিবেচনা করেন না যে এককথ একশত বার শুনিতে শিশুগণেরও বিরক্তি জন্মে । * * * যেমন মধুমক্ষিকাগণ একনানে একটি পুষ্পের সমুদায় মধু শোষণ করিয়া লয় না, কখন এ ফুলে, কখন ও ফুলে বসিয়া মধুপান করে, স্কুলগার যতি শিশুগণও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ বিদ্যার রসাস্বাদন করিতে চায় । অতি বৃহদাকার মৎশুরাই অগাধজলে নিবাস করে, গফুরী অগভীর অদূপারি আনন্দ সহকারে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় ।” (ভূদেব)

“বিষয় বিশেষে ও স্থান বিশেষে অভিনিবেশের নাম ভেদ হয় । এক সময়ে চাক্ষু প্রত্যক্ষ ও অভিনিবেশের কার্য্য হইলে সেই অভিনিবেশকে ‘পর্য্যবেক্ষণ’ কহে । কোন বিষয়ের তৎনির্ণয়ার্থ এককক্ষমে সকল অংশের প্রতি যে মনঃ সংযোগ তাহাকে ‘গবেষণা’ কহে । বাহ্য পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনোগত ভাব সকলের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে ‘অনুধান’ কহে । একাধিক বিষয়ের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ার্থ ক্রমশঃ এক এক বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে ‘উপমিতি’ কহে ।” (গোপাল বাবু)

স্মৃতি ।—কোন এক বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় যদি অন্য বিষয়ের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় তবে প্রথম চিন্তার বিষয় অন্তর্হিত করিয়া দ্বিতীয় চিন্তার স্থান করিয়া দেয় । কিন্তু প্রথম চিন্তা লুক্কায়িত অবস্থাতে মনোমধ্যেই অবস্থিতি করে । আমরা যখন ইচ্ছা করি তখন আবার সেই পূর্ববিষয় আমাদের মনে আগরিত করিয়া তুলিতে পারি । এইরূপ গুপ্ত চিন্তাকে ইচ্ছামত আগরিত করার নামই স্মৃতি । ঘটনা বিশেষের সংঘটনেও সময় সময় পূর্ববিষয় স্মৃতিপটে আগরিত হয় । ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির কার্য্য অত্যন্ত প্রথম থাকে ।

ইহার পর যতই তর্ক ও বিচার শক্তির উন্নতি হইতে থাকে, ততই স্মৃতির শক্তি কমিয়া আসিতে থাকে ।

বাল্যকালে তর্ক ও বিচারের শক্তি খুব কম থাকে বলিয়াই স্মৃতি এত প্রবল । স্মৃত্তরাং বাল্য বয়সেই মুখস্ত করিবার বিষয়গুলি আরম্ভ করিতে হইবে । কড়া, গণ্ডা, নামতা প্রভৃতির ধারা, ব্যাকরণ ও ভূগোলের সূত্র ও নামাবলী বাল্যকালে শিক্ষা না করিলে, আর অধিক বয়সে শিক্ষা হয় না । যে সকল বালক শিশুকাল হইতেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসায়ের অনুরোধে অধিক বয়সে কড়া, গণ্ডা শিক্ষা করিতে হইয়াছে । কিন্তু তাহাদিগের এই বিষয়ে তেমন ক্ষিপ্রকারিতা দেখা যায় না । ইহারা ৪, ৫ দিয়া ভাগ করিয়া যতক্ষণে কত কড়া বা কত গণ্ডা ঠিক করিয়া থাকেন, তাহার বহু পূর্বেই, পাঠশালার বালকেরা উত্তর করিয়া বসে । কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যকালেও এই স্মৃতি শক্তির অপরিমিত পরিচালনা সম্ভব নয় । কারণ তাহা হইলে তর্ক ও বিচারের শক্তি একেবারে চাপা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে । স্মৃতির পাশে পাশে তর্ক ও বিচার শক্তির বৃদ্ধি করার জন্ত স্থান রাখিতে হইবে । যে শক্তি বশতঃ পরিজ্ঞাত বিষয় বহুদিবস পর্য্যন্ত মনে থাকে, তাহাকে 'ধারণা' শক্তি বলে । কাহারও ধারণাশক্তি কম, কাহারও বেশী । স্মৃতির প্রখরতা এই ধারণা শক্তির উপর নির্ভর করে । স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি নিম্নলিখিত বিষয় সাপেক্ষ (ক) অভ্যাস বা অনুশীলন (খ) মনোযোগ (গ) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি (ঘ) সময় ও পরিমাণ (ঙ) স্বাস্থ্য ও আরাম (চ) ভাবপ্রসঙ্গ (ছ) শৃঙ্খলা ।

(ক) অভ্যাস বা অনুশীলন ।—কোন বিষয়ের অনুশীলন করিলে যে সে বিষয় প্রকৃতিগত হইয়া যায় তাহা পরীক্ষিত সত্য । অনুশীলনের দ্বারা স্মৃতি, মনোযোগ, ইন্দ্রিয় বোধ প্রভৃতি বৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি পায় । বালকেরা অনেক সময় তাহাদের স্মৃতি শক্তির দুর্বলতাকে প্রকৃতিগত

অসম্পূর্ণতা বলিয়া পাঠাভ্যাসে বিরত থাকে । কিন্তু একরূপ ধারণা অনেক স্বেচ্ছা ভ্রম । অনভ্যাস হেতু স্মৃতি শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ; একটু চর্চা করিলেই আবার তাহা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে ।

যে বালকের স্মৃতি শক্তি এইরূপ দুর্বল, তাহাকে সকল বালকের সমান পাঠ দিতে নাই । এমত নাইন কি ছুটি লাইন মুখস্থ করিতে বা তাহার ভাব মনে করিয়া রাখিতে দিবে । তার পর ক্রমে ক্রমে মাত্র বাড়াইবে । যাহারা স্মৃতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্মৃতি শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তাহার সময় ও পরিমাণ এই দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে । প্রথম কিছু দিন হয়তঃ অর্ধ ঘণ্টায় ৫ লাইন মুখস্থ করিতে চেষ্টা করে ; তারপর অর্ধ ঘণ্টায় ৭ লাইন ; তার পর ১০ লাইন, এইরূপ করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতে থাকে । যে বালক অতি কষ্টে ২ ঘণ্টায় ৩৪ লাইনের অধিক মুখস্থ করিতে পারিত না, তাহাকে অর্ধ ঘণ্টায় এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করিতে দেখিয়াছি । বেশী দিনের চেষ্টায় নহে, ৮৯ মাসের মাত্র । তবে এই চেষ্টা নিয়মিত হওয়া আবশ্যিক । একবার যদি গ্রীষ্মের কি পূজার ছুটির সময়, অমুশীলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে অবকাশের পূর্বানুষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেই অনেক সময় লাগে । ১০।১২ বৎসরের বালকের পক্ষে প্রতিদিন অর্ধঘণ্টা মনোনিবেশ পূর্বক স্মৃতি শক্তির অমুশীলনই যথেষ্ট ।

(খ) মনোযোগ ।—স্মৃতিশক্তির অমুশীলনে মনোযোগ বিশেষ আবশ্যিক, তবে বিনা মনোযোগেও ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে করিতে অনেক বিষয় মুখস্থ হইয়া যায় । কিন্তু মনঃসংযোগপূর্বক মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলে অল্প সময়ে অধিক কার্য হয় । অনেক বালক প্রাতে ৫টা হইতে ৯টা পর্যন্ত পড়িয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে না । মনোযোগের অভাবই তাহার কারণ । মুখে তাহার পাঠের আবৃত্তি করে বটে, কিন্তু মনে মনে না বিষয় চিন্তা করে । অবশ্য একরূপ এক পাঠ লইয়া যদি বহুদিন

৪।৫ ঘণ্টা অভ্যাস করা যায়, তবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিবশতঃ, মুখস্থ হইতে পারে। কিন্তু অল্পসময়ে মুখস্থ করিতে হইলে, বিনা মনঃসংযোগে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। যেখানে গোলমাল হইতেছে বা যেখানে ভাগসা হইতেছে এরূপ স্থানে, বালকের পক্ষে মনঃসংযোগ করা শ্রুষ্কঠিন। রাস্তার পারে কি কোন কারখানার নিকট পাঠ্য গ্রন্থ হওয়া উচিত নহে। যেখানে বালকেরা বসিয়া পড়া শুনা করে সেখানে গল্প করা উচিত নহে। তাঁরপর পাঠের সময় “ওরে বাজারে গেলি না, ওরে গরুটা বাঁধত, ওরে রাস্তায় ফেরিওয়ালো কি ডাকে শোনত, ওরে মেয়েটা কাঁদে কেন দেখত” ইত্যাদি রূপ আদেশ করিয়াও বাপমা বালকদিগের মনঃসংযোগের বাধা দিয়া থাকেন। বরং ‘অর্দ্ধ ঘণ্টায় তোমাকে এই পরিমাণ মুখস্থ করিতে হইবে,’—এইরূপ কড়াকড়ি আদেশ করিলে বালকেরা অনেক সময় ভয় ভক্তিতে পাঠাভ্যাস করিয়া দেয়। এইরূপ ভয়ে ভয়ে কাজ করিতে করিতে মনঃসংযোগের অভ্যাস হইয়া যায়।

(গ) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।—কড়া, গুণ্ডা, নামতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, সঙ্গীত, সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি বালকেরা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করে। যাহা একবার মুখস্থ করা যায়, যদি তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা না যায়, তবে তাহা কিছুতেই মনে থাকিতে পারে না। এই জন্য পাঠের শেষে পুনরালোচনা করা আবশ্যিক (পাঠনার নোট লিখিবার পদ্ধতি দেখ)। যাহা একবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর পুনরালোচনার আবশ্যিক নাই, যে শিক্ষক এইরূপ মনে করেন তিনি সফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যতই আলোচনা করিবে, ততই বিষয়টি স্মৃতিতে গাঢ় ভাবে আবদ্ধ হইয়া যাইবে। এই আলোচনা আবার খুব ঘন ঘন হওয়া, কি বহুদিন অন্তর অন্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বালকদিগের বয়স ও বিষয় দৃষ্টে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালকগণ বাড়ীতে সন্ধ্যা কি প্রাতে তাহাদিগের দৈনিক মুখস্থের পাঠ, যদি পুস্তক বহু

করিয়া দুই তিন ঘণ্টা অল্প অল্প, তিনবার আবৃত্তি করে তাহা হইলো হইল । বিদ্যালয়েও নিয়ন্ত্রাথমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামতা প্রভৃতি সম্বন্ধে চারিবার, ভূগোল ব্যাকরণ তিন বার ও সাহিত্যের একবার পুনরালোচনা হওয়া আবশ্যিক ।

অদিত বিষয় পুস্তক দেখিয়া লিখিতে দিলেও পুনরালোচনার কার্য হয় । আর যদি পাঠের সাংগ্ৰহ নিজের ভাষায় বালকগণকে লিখিতে দেওয়া হয়, তবে পুনরালোচনার সঙ্গে রচনার কার্যও হইয়া যায় ।

(ঘ) সময় ও পরিমাণ ।—অনেক বালক প্রায় সমস্ত বৎসর আলসে নষ্ট করিয়া পরীক্ষার সময় পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করে । অল্প সময়ে অনেকগুলি বিষয় ভাতি কষ্টে মনে রাখিয়া শেষে পরীক্ষার কাগজে সেগুলি টানিয়া দিয়া আসে । এরূপ অনেক বালক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় বটে, কিন্তু পরীক্ষার ২৪ দিন পরে, তাহাদিগকে সে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর পাওয়া যায় না । যে বিষয় অভ্যাগে অল্প সময় নিয়োজিত হয়, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই মন হইতে সরিয়া পড়ে । এ বিষয়ের একটা পরীক্ষা করা যাইতে পারে । কোন বালককে একটা সামান্য অংশ মুখস্থ করিতে দেও ; মুখস্থের পবেই তাহাকে সেই অংশ পুস্তক বন্ধ করিয়া ৪ বার আবৃত্তি করিতে বল । তারপর অল্প আর একটা বিষয় মুখস্থ করিতে দাও । এবারে তাহাকে ঐ বিষয়টি পুস্তক বন্ধ করিয়া ২ ঘণ্টা পর পর ৪ বার আবৃত্তি করিতে বল । পরদিন বালককে দুইটি বিষয়েই পরীক্ষা কর । বালকের মনে যে দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশ অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার বেশ প্রমাণ পাইবে । এই জন্ত বৎসরের প্রথম হইতে যাহাতে বালকেরা সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অমুধাবন করিয়া মনে করিয়া রাখিতে যত্ন করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।

শিক্ষকেরও উচিত নয় যে তিনি অর্ধ ঘণ্টার ঝুড়ি ঝুড়ি বিষয় বাল-

কের গলাধঃকরণ করাইয়া দেন । তাঁহার শাসনে বা ভয়ে বালকেরা হয়ত সমস্ত বিষয় আলগা আলগা ভাবে মনে করিয়া রাখিতে পারে ; কিন্তু বেশী দিন মনে থাকিবে না ।

(ঙ) স্বাস্থ্য ও আরাম ।—স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে মনোযোগের শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে । বালকের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টায় বালকেরা সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে । এ সময় কোন আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহাদের মনে না থাকিবারই কথা । বসিবার অসুবিধা হইলে, কাণের কাছে গোলমাল হইলে, শীত বা গ্রীষ্মাধিক্য হইলে, বালকগণের মনোনিবেশের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া স্মরণশক্তির অনুশীলনের যথেষ্ট অসুবিধা হইয়া থাকে ।

(চ) ভাবপ্রসঙ্গ ।—ভাবপ্রসঙ্গে স্মৃতিশক্তির সহায়তা হয় । একটি পদার্থ দেখিয়া, একটি কথা শুনিয়া বা একটি বিষয় চিন্তা করিয়া, আমাদের মনে যে তাহাদের প্রসঙ্গে আরও অনেক ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই ভাবপ্রসঙ্গ বলে । ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখিলেই, ঘোড়ার কথা মনে আসে ; পাঠশালা দেখিলেই, নিজের বাল্যজীবনের কথা মনে আসে । একটা পদার্থ আর একটা পদার্থের স্মৃতিকে টানিয়া আনে । একটা ভাবের সহিত যদি অল্প ভাব যুক্ত না হয়, তবে কোন ভাবই আমাদের স্মৃতিতে থাকিতে পারে না । একটা ভাবকে যতই অগাধ ভাবের সহিত সংযোগ করা যায়, ততই তাহা মনে রাখিবার সুবিধা হয় । ইতিহাস শিক্ষায় মানচিত্রের সাহায্য লওয়া হয়—পাণিপথ দেখিলেই সেই স্থানের সমস্ত কথা মনে আসে । চিত্র দেখান হয়—তাজমহল দেখিলেই সাজাহানের কথা মনে পড়ে, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার দুর্দশার কথাও মনে পড়ে । এই জন্ত চিত্র, পুস্তক, মানচিত্র প্রভৃতির দ্বারা বালকগণের স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে ।

শিক্ষা দানে জ্ঞাত ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দিলে ভাবপ্রসঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে, জ্ঞাত বিষয় স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত বিষয়াদিও মনে আসিয়া পড়িবে । গ্রামে হয়ত কোন ধনী পরিবারে সম্পত্তির অধিকার লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে ও গ্রামের সকলেই এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে । শিক্ষক এই জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যোগ করিয়া ‘রাজ্যলোভে আওরঙ্গজেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে বিবাদ হইয়াছিল’ তাহা বর্ণনা করিতে পারেন । গ্রামের এই বৃহৎ ঘটনা (ছোট ছোট ঘটনা হইলে বালকদের মনে থাকিবে না) মনে হইলেই, আওরঙ্গজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির বিবরণ মনে আসিবে ; সেই সঙ্গে মোগল রাজত্বের অধঃপতনের কথাও মনে আসিবে ।

(ছ) শৃঙ্খলা ।—বিধিবদ্ধ একটা শৃঙ্খলা অবলম্বন করা উচিত । কাহার জীবনী বর্ণনাতে তাহার শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এই সাধারণ প্রকৃতিসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিলে বালকগণের অনুধাবন করিতে সুবিধা হইবে । আর যে প্রণালী এক দিন অবলম্বন করা হইবে, সে বিষয়ের পুনরাবলোচনা ঠিক সেই প্রণালী অনুসারেই করিতে হইবে । তবে উত্তমরূপ অভ্যাস হইয়া গেলে কোন পরিবর্তনে ক্ষতি হইবে না । ভূগোল ও ব্যাকরণের নাম বা শব্দের তালিকা অভ্যাস করিতেও একটা ধারা অবলম্বন করিতে হইবে ।

রাজমাহী বিভাগের জেলাগুলির নাম অভ্যাস করাইবার সময়, একদিন “রাজমাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা” অল্পদিন আবার “পাবনা, দিনাজপুর, রাজমাহী, রংপুর” ইত্যাদিরূপ বিশৃঙ্খল প্রণালী অবলম্বন করা উচিত নহে । একদিন প্র পরা অপ সম অল্পদিন আবার পরা সম অপ প্র ইত্যাদি ক্রম অবলম্বন করিলে সহজ শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবে । শব্দ মুখস্থ করিতে হইলে, ঠিক যাহার পর যে লাইন, প্রত্যহ সেইরূপ

আবৃত্তি না করাইয়া, লাইনগুলি বিশৃঙ্খল করিয়া দিলে, পদ্য মুখস্থ করা কঠিন হইবে । এক প্রণালী অবলম্বন করিলে, ভাবপ্রসঙ্গে একের পর অন্য বিষয় বা শব্দ সহজেই মনোমধ্যে উপস্থিত হইবে ।

দ্রব্য, প্রতিকল্প ও ক্রিয়া দর্শন করিয়া মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকে । “একবার লেখা পাঁচবার পড়ার সমান”—কথা মথার্থ ।

কল্পনা ।—শিক্ষায় এই বৃত্তির অনুশীলন বিশেষ আবশ্যক । জ্ঞাত বিষয়াদির সাহায্যে মনোমধ্যে যে একটা অজ্ঞাত বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করা হয়, তাহাকেই কল্পনা বলে । ইতিহাস, ভূগোল, বিষয়গুলি, বালকগণকে কল্পনার সাহায্যেই উপলব্ধি করাইতে হয় । বাল্যকাল হইতেই এ বৃত্তির ক্ষুরণ হইয়া থাকে । “মা আমি একখান আঙা কাপল নব” ইহার মধ্যেও, সেই ক্ষুদ্র শিশুর কল্পনা শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায় । “পূজার সময় আমার মখমলের জামা হইবে”—পাঁচ বৎসরের বালকের এই বাক্য যথেষ্ট কল্পনা লুক্কায়িত আছে । তারপর একটু বড় হইলে, বালকেরা যখন বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে, তখন শিক্ষকের নিকট কত অদ্ভুত জন্তু, বৃক্ষ, জনপদ, মনুষ্য প্রভৃতির গল্প শুনিয়া কল্পনা দ্বারা হৃদয় পটে তাহার চিত্র অঙ্কিত করে ।

“একটা নদীর বা পর্বতের বর্ণনা কর, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার পথের বর্ণনা কর, কোন বাজারের বর্ণনা কর” ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষকগণ বালকের কল্পনা শক্তির বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন ।

“স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও শিল্প সম্পন্ন অদ্ভুত পদার্থের আলোচনা দ্বারা এবং মহৎ ব্যক্তিগণের অপরিসীম দয়া ও মহত্বচক কার্যের বর্ণনা, সুবিখ্যাত মহাত্মবদিগের জীবন চরিত, ইতিহাস কাব্য ও কাল্পনিক

উপায়াসাদির পাঠ দ্বারা, কখনো শক্তির আলোচনা হয় এবং তদ্বারা তাহার তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়" (গোপাল বাবু)

চিন্তা ও বিচার ।—ছই বা বহু বিষয়ের তুলনা করিয়া তাহাদিগের গুণাগুণ প্রভৃতি নির্ণয় করাকে বিচার বলে । আব সেই বিচার করিয়া যে সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সিদ্ধান্ত । ভালমন্দ বিচারের শক্তি অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বিকশিত হয় । "এ সন্দেশটা ছোট—এটা চাইনা ঐটা চাই ; এ খেলনা চাঠনা, ঐ ভালটা"—ইত্যাদি বিচারের শক্তি, বাক্য স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টিয়া উঠে । কিন্তু বাল্যে এই শক্তির তেমন বৃদ্ধি হয় না । যৌবন কাল হইতেই ইহার প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় । এইজন্য তর্ক বিচার পরিপূর্ণ শাস্ত্রাদি (জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি) অপরিণত বয়স্ক বালককে পড়াইলে কোন ফল পাওয়া যায় না ।

বিচারের যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার মধ্যে আরোহী ও অবরোহী প্রণালী শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় (১) বৃক্ষ হইতে আপেল ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, উদ্ধৃদিকে চলিয়া গেল না ; আকাশে টিল ছুড়িলে তাহা ক্রমাগত আকাশে চলিয়া গেল না, মাটিতেই ফিরিয়া আসিল ; যে পাখী ক্রমাগত উড়ে উঠিতেছে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিলে, সে মাটিতে পড়িল । আর এই সমস্ত ঘটনা রাজে, দিনে, শীতে, গ্রীষ্মে, সর্বকালে ; মন্ডলুগিতে, সাগরে, ইউরোপে, আফ্রিকায় সর্বদেশে একরূপ ভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে । অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে সমস্ত জবাই পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে । এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিয়া একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত (সাধ্যাকর্ষণ) নির্ধারণ করাকে, অর্থাৎ ছোট ছোট তত্ত্ব হইতে ধীরে ধীরে বৃহৎ তত্ত্ব আরোহণ করাকে "আরোহী প্রণালী" বলে । বিজ্ঞানের প্রায় তত্ত্বই এই প্রণালী অনুসারে নির্ধারিত হইয়া থাকে ।

(২) “যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান”—এটা সাধারণ সত্য সিদ্ধান্ত । আমরা ইহার সাহায্যে প্রথম প্রতিজ্ঞাস্তম্ভে ‘ত্রিভুজের তিন বাহু যে পরস্পর সমান’ ইহা প্রমাণ করিয়া থাকি । সমবাহু ত্রিভুজের ‘তিন কোণ যে পরস্পর সমান’ (৫ম প্রতিজ্ঞাব অনুমান) ইহাও এই সত্য সিদ্ধান্তের দ্বারা আমরা সপ্রমাণ করি, এইরূপ একটা সাধারণ সত্য সিদ্ধান্তের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রমাণ করাকে অর্থাৎ একটা বৃহৎ সাধারণ তত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্বে নামিয়া আসাকে “অবরোহী প্রণালী” বলে । গণিতের তত্ত্বগুলি প্রায়ই এই প্রণালীতে প্রমাণিত হইয়া থাকে । ব্যাকরণেরও ঐ প্রণালী ।

বালকদিগের বিচারশক্তির বৃদ্ধি সাধনে প্রথম হইতেই যত্ন করিতে হইবে । কাহার মানচিত্র ভাল হইয়াছে কাহার মন্দ হইয়াছে ; কাহার হস্তলিপি সর্বাপেক্ষা উত্তম ইত্যাদি বিষয়ে বিচারের ভার মধ্যে মধ্যে বালকদের হাতে দিয়া বিচার কার্য শিক্ষা দিতে হইবে । এইরূপে অঙ্কন, আবৃত্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহারা ‘উত্তম, মধ্যম, অধম’ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলে যে, তাহাদিগের কেবল বিচার শক্তি বৃদ্ধি হইবে এমন নহে, নিজেরাও ‘উত্তম’ অবস্থা কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে ।

অনুভব বৃত্তি ।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি অনুভব বৃত্তিতে স্বার্থভাব প্রবল । আর দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিতে পরার্থভাব প্রবল । কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বৃত্তিরও আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহাদের মাত্রাধিক্য না হয় বা ইহারা বিপথগামী না হয় ইহাই দেখিতে হইবে । আর দয়া, মায়া প্রভৃতি বৃত্তি বাহাতে উন্নত হয়, তাহা চেষ্টা করিতে হইবে । বক্তৃতা, শ্রবণ বা উত্তম পুস্তকাদি পাঠ এ কার্যের কতক সহায়তা করে বটে, কিন্তু সৎ দৃষ্টান্তের অনুকরণ দ্বারাই সৎ বৃত্তির সম্যক পরিপুষ্টি সাধিত হয় ।

কতকগুলি অনুভব বৃত্তির অনুশীলন বিষয়ে শিক্ষককে একটু সতর্ক হইতে হইবে । যেমন—

(ক) বাজা ও ভয় ।—পড়া দিতে না পারিলে দণ্ডিত হইতে হইবে বা শিক্ষক তিরস্কার করিবেন, এরূপ কিছু বাজা বা ভয় থাকা আবশ্যক । যদি বালকের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, সামান্য ক্রটি হইলেই শিক্ষক বেত্র প্রহারে রক্তনদী প্রবাহিত করিবেন, তবে সে পাঠে মনোনিবেশ না করিয়া, বিদ্যাভয় হইতে পলায়ন করিবার পন্থা চিন্তা করিবে । ভক্তি সংযুক্ত ভয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিভীষিকা সংযুক্ত ভয় পরিত্যজ্য ।

(খ) আত্ম ক্ষমতা বোধ —কোন কঠিন অঙ্ক কষিতে পারিলে, বা কোন একটা কঠিন কাজ সম্পাদন করিলে, বালকের মনে একটা আত্ম প্রসাদ জন্মে । এ বৃত্তির অনুশীলন নিতান্তই আবশ্যক । দুর্বল বালককে ভাঙ্গ করিতে হইলে, তাহাকে সহজ সহজ অঙ্ক কষিতে দিয়া তাহার আপন শক্তির বোধ জন্মাইয়া দিতে হইবে । সে যখন দেখিবে যে সে বোকা নহে, সেও অন্যের মত সব কষিতে পারে, তখন সে নিজের ক্ষমতা দৃষ্টে আনন্দিত হইবে ও কার্য্যে উৎসাহিত হইবে ।

(গ) কার্য্যানুরাগ ।—বালকগণ সর্বদাই কার্য্যপ্রিয় । অন্যের মত উপবেশন বা শয়ন করিয়া বৃথা চিন্তায় সময়োতিপাত করিতে জানেনা । শিক্ষকের কর্তব্য যে তাহাদিগকে মকল সময়ই ভিন্ন ভিন্ন সংকার্য্য দিয়া ব্যাপ্ত রাখেনা । শিক্ষক বা অভিভাবক, তাহার কোন ব্যবস্থা না করিলে, সে নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইবে । কিন্তু বালকেরা ভাগ্যমন্দ বিবেচনা করিতে পারে না বলিয়া, তাহাদিগের নিজের ব্যবস্থার কার্য্য অনেক সময় অসৎ হইয়া পড়ে ।

(ঘ) প্রতियোগিতা ।—যেখানে এক সঙ্গে অনেক ব্যক্তি, এক বিষয় এক রকমে শিক্ষা করে, সেখানে প্রতियোগিতায় সুফল হইয়া

থাকে । অল্পেব অপেক্ষা আমি অধিক পরিমাণ উন্নতি করিব, এইরূপ ভাব উত্তম । কিন্তু ইহার সঙ্গে যেন, অল্পকে অত্যাধিকরূপে পরাস্ত করার ভাব না জন্মে । অল্পের পতনে বেন আনন্দানুভব করিতে না শিখে । শ্রেণীতে এই প্রতিযোগিতার ফলে যদি কেবল দুই একটি ছাত্র উত্তম হইয়া উঠে, তবে তাহাদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে । সেই জন্য প্রতিযোগিতার ইচ্ছা সকল বালকের প্রাণেই বলবতী করিয়া করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে । অন্যের চেয়ে বেশী নম্বর রাখিবার জন্য বালকেরা চেষ্টা করে—এও প্রতিযোগিতা । কিন্তু অন্য বালকের নম্বরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া, যদি ‘পূর্ণ নম্বরের সংখ্যার’ সহিত প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে যথেষ্ট সফল লাভ হয় (পরীক্ষা প্রশ্নালীর অধ্যায় দেখ) ।

(৬) যশো-লিপ্সা ।—সুখ্যাতি দ্বারা বালকেরা উৎসাহিত হইয়া থাকে । কিন্তু অধিক সুখ্যাতি লাভে আবার সময় সময় গর্ভিত হইয়া পড়ে । সুতরাং সুখ্যাতির পরিমাণ ঠিক রাখা আবশ্যক । কোন কোন শিক্ষক আবার এরূপ ক্ষুদ্রচেতা যে তাঁহারা সুখ্যাতি দানে বিশেষ কৃপণতা করিয়া থাকেন । বালক মাধ্যমত কার্য করিতে চেষ্টা করিতেছে, শিক্ষক সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না । কিন্তু তাঁহার মনোমত কার্য না হওয়াতেই, তিনি চটিয়া উঠিলেন । ইহাতে বালকেরা উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে । সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক—অতি বাল্যকাল হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায় । শিশু যখন হাঁটিতে আরম্ভ করে তখন দুই এক পা হাঁটিয়া “বা, বেশ” গুনিবার জন্য, বা উৎসাহসূচক হাসি দেখিবার জন্য, মার মুখেব দিকে চাহিয়া থাকে । শিক্ষক এইরূপ দুই একটি ‘বা, বেশ’ বলিয়া অনেক বালককে কৰ্মক্ষেত্রে হাঁটিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন ।

বিবিধ ।—এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে যাহা সকল সময়

আগাদিগের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না । মনেকর বালক গালাগালি কি মার খাওয়া কাঁদিতেছে । এমন স্বাভাবিক ; ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে ইহাকে নিবারণ করিতে পারে না । “কাঁদবি ও আবার মার খাবি, টেঁচাবি ও গলা কাটিয়া ফেলব” ইত্যাদি প্রকার ভয় দেখাইলে সে থামিল না বা নিজকে থামাইতে পারিল না । এখন এইরূপ অবস্থার জন্ত তাহাকে পুনঃ প্রহার করা নিষ্ঠুর ও নির্যাসের কার্য্য । বালকেরা কোন হাণ্ডজনক কার্য্য বা কোন হাণ্ডজনক ঘটনা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল । এটা স্বাভাবিক বৃত্তি ; নিবারণের কোন আবশ্যকতা নাই, (অবশ্য অত্যাশ কাবণে না হইলে) বরং এইরূপ হাসিলে বালকগণের হৃদয়ের আবেগ থামিয়া যায় ।

মানসিক বৃত্তি সমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি উপযুক্ত করিতে না শিথিলে বালকগণকে সুশিক্ষিত করিতে পারা যায় না । এই জন্ত শিক্ষাকার্য্য পরিচালনায় কিঞ্চিৎ মনোবিজ্ঞানের আলোচনা আবশ্যিক ।

ইচ্ছাশক্তি ।—মনের যে শক্তি আগাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে তাহাকে ইচ্ছা বলে । নানা উদ্দেশ্যে আগরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি ; কতক উদ্দেশ্য সং আর কতক অসং । বালকেরা সাহায্যে সং উদ্দেশ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, একপা ভাবে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা শিক্ষকের কর্তব্য । আবার কোন উদ্দেশ্যে ‘সাক্ষাৎ,’ আর কোনটী ‘স্বদূর’ । ‘খুব ভোরে দুগ থেকে উঠিলেও মার নিকট একটা পয়সা পাওয়া যাইবে’ এটা সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ; আর ‘এখন থেকে পরিশ্রম করিলে, বৎসরের শেষে পরীক্ষায় পুরস্কার পাওয়া যাইবে ।’—এটা স্বদূর উদ্দেশ্য । বালকেরা এই স্বদূর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না । কিন্তু ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে । বালক কেন, অনেক পরিণত বয়সের লোকও দুই উদ্দেশ্য ধরিয়া কাজ করিতে পারেন না । এমন কি জ্ঞানভিমানী ব্যক্তিদের মধ্যেও, একপা দৈর্ঘ্যহীন ব্যক্তি অনেক

দেখিতে পাওয়া যায়। একজনের সংস্কৃত পড়া দেখিয়া, আর একজন 'গুণ-বোধ' ক্রয় করিলেন। চারি পাঁচ দিন পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া পাঠও করিলেন কিন্তু আয়াসসাধ্য দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। একজন বেশ চিত্রাঙ্কন করিতে পারে দেখিয়া আর একজন পেনসিল, রবার, কাগজ সংগ্রহ করিলেন, ২ দিনের পর আর উৎসাহ থাকিল না। একজন বেশ বেহালা বাজায় দেখিয়া আর একজন বেহালা আনাইল। কিন্তু ৫।৭ দিন পর আর বাজাইতে ইচ্ছা হইল না। এরূপ যখন আমাদিগের দশা, তখন বাগকেরা কি করিবে ?

ইচ্ছার সঙ্গে অধ্যবসায়ের সংযোগ না থাকিলে, মহৎ কার্য সম্পাদিত হয় না। অধ্যবসায়ও অভ্যাসের ফল। বালকদিগকে ধৈর্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে। কোন ব্যর্থ অর্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখা অধৈর্য্যের লক্ষণ।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাঠকের মনে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র আন্দোচনা করিবার ইচ্ছা প্রাদীপিত করিয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য।

মনোবৃত্তি বিকাশে লক্ষ্য।—বৃত্তিসকলের বিকাশ সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক তাহা এ স্থলে বিবৃত হইতেছে—

- (১) বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়।
- (২) অনুকূল বিষয়ে, ব্রীতি অনুসারে পরিচালিত হইলে তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি পায়।
- (৩) প্রতিকূল বিষয়ে চালিত কিম্বা এককালে অত্যন্ত চালিত অথবা একেবারে চান্দনা বিরহিত হইলে বৃত্তি সকলের তেজ হ্রাস হয়।
- (৪) বৃত্তি সকল অনায়াসেই কুপথগামী হয়।
- (৫) ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। জড় পদার্থ ও জড় পদার্থের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বৃত্তি সকলের প্রথম চালনা আরম্ভ হয়।

(৬) বৃত্তি সকলের নিয়মিত চালনা হইলে অপর আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ রাখিলে বালকেরা সহজে পাঠে মনোযোগী হয়।

(৭) যে কর্ম পুনঃ পুনঃ করা যায় তাহাই অভ্যাস হয়।

(৮) যদি বালকেরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বৃত্তি সকলকে স্বল্প বিষয়ে চালনা করে তবে শীঘ্রই বৃত্তি সকল তেজস্বী হয়।

(৯) বিকাশ বিষয়ে বৃত্তি সকলের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে।

(১০) বৃত্তি সকলের বিকাশার্থ মনুষ্যের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। যে সময় বৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করে সেই সময় হইতেই তাহার চালনা বিষয়ে সহায়তা আবশ্যিক। (গোপাল বাবু)

শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক প্রণালী।—পণ্ডিতাগণ্য মহামতি হারবার্ট স্পেনসার শিশুশিক্ষার যে স্বাভাবিক প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে:—

১। বস্তু মাত্রেরই বুদ্ধির যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত। বুদ্ধির সাধারণ নিয়ম এই যে বস্তু মাত্রেরই ক্রমে সরল অবস্থা হইতে অটল অবস্থায় পরিণত হয়।

শরীরবুদ্ধিতে ইহা আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইজিরাঙ্গি-বিহীন ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গবৃত্ত বৃহৎ অটল দেহে পরিণত হয়। বুদ্ধিবুদ্ধিরও রীতি এই প্রকার। এক সামান্য বুদ্ধি হইতে ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়িণী বুদ্ধি অগিয়া থাকে। পুত্রের বুদ্ধির এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বাবস্থা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। মেরুপ অঙ্গ অগিতে মাজামিকী কাঠ নিষ্কপ করিলে তাহা নির্মাণ হইয়া যায়, সেইরূপ উদয়োদ্যুখী ধী-শক্তির প্রথম উদ্যমেই যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয় চাপাইয়া দিলে সহজেই তাহা প্রতিভা-শূন্য হইয়া যায়। অতএব সর্বদা সাবধান থাকা আবশ্যিক যে, শিশুরা

যাহা গ্রহণ করিতে পারে তদপেক্ষা যেন অধিক শিক্ষা দেওয়া না হয় ।

২। ধী-শক্তি উদয়ের দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, কতিপয় বৃত্তি প্রথমতঃ অন্তঃগূঢ় ভাবে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিত ও লক্ষিত হয় । বিদ্যা-চর্চা ও জ্ঞানোপদেশ তদনুসারে হওয়াই বিধেয় । মস্তিষ্কের প্রকৃতি এই যে, উহা জ্ঞাত মাত্র পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না । অত্যাশ্রয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় । অতএব সর্বতোমুখী বৃদ্ধি একদাই উৎপন্ন হয় না । সুতরাং কোন বিষয়ে বোধজন্মিবার সময় এক উদ্যমেই তাহার নিগূঢ়তত্ত্বগ্রহ হওয়া অসম্ভাবিত । প্রথমে সামান্যাকারে জ্ঞান জন্মে, অনন্তর সর্বিশেষ গম্য উপলব্ধি হইতে থাকে । যে শিশুর দৃষ্টি আলোক ও অন্ধকারের ভেদ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে কিনা সন্দেহ, সেই আবার পরে দৃষ্টিমাত্র নানাবিধ বর্ণের তারতম্য জ্ঞানে সক্ষম হয় । অতএব শিক্ষার সময় প্রথমতঃ দূরবগাহস্বক্ষা বিষয় সকল মনোনীত না করিয়া স্থূল স্থূল বিষয় শিখিতে দেওয়া উচিত ।

৩। নানা পদার্থের কি নানা বিষয়ের একবিধ ভাব বা গুণানুসাবে তাহার যে এক শ্রেণী নির্বিষ্ট হইতে পারে, তাহা বয়সের পরিণতি না হইলে বুঝিতে পারা দুর্ঘট । কৈশোর কালে বালকগণ গুণ অবগত হইয়া জব্যাদির শ্রেণী নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় না । সুতরাং অল্পবয়সে সূত্রাদি শিক্ষা দেওয়া অতীবধ । প্রথমে নানা পদার্থ পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ অবগত করান আবশ্যক । অনন্তর বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাহার যে যে সূত্রানুসারে শ্রেণী বিন্যাসের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে, তৎসমুদায় উপদেশ দেওয়া উচিত । অল্প বয়সে সূত্রশিক্ষার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি না করিলে, অনেক স্থলে সূত্রোপদেশের আবশ্যকতাই হয় না । শিশুরা স্বয়ংই শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করিতে করিতে, বিনা উপদেশে শ্রেণী নির্দেশ করিতে পারে ।

৪। মনুষ্য জাতি আদিম অসভ্যাবস্থা হইতে বর্তমান সভ্যাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া তদনুসারে শিক্ষা প্রণালী স্থির করা কর্তব্য। যখন পূর্বতন পুরুষের শারীরিক ও মানসিক দ্রাব্যিক গুণসমূহ অদৃশ্য পুরুষে বর্ধিত, তখন যে যে পথ অবলম্বন পূর্বক মানব জাতি কৌমার কাল অতিক্রম করিয়া বর্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, বালাকেরাও তদন্ত পথের পথিক হইলেই অবশ্যই জ্ঞানসম্পন্ন হইবে। আদিম অবস্থায় মনুষ্য জাতি সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। পরে ক্রমেক্রমে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা এই বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছেন। বালাকেরাও যে সেই প্রণালী অনুসারে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানসম্পন্ন করিবে সন্দেহ কি? সুতরাং মানবজাতির উন্নতি বিষয়ক ইতিবৃত্ত জানিয়া, শিশুদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রণালী নির্ধারিত করা উচিত।

৫। উক্তরূপে ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইয়া প্রণালী স্থির করিতে হইলে অবধারিত হইবে যে, অত্র কোন ব্যবস্থাপন শৃঙ্খলানুসারে উপদেশ না দিয়া অব্যবস্থিত ভাবে সামান্যাকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মনুষ্য-জাতি কোন বিষয়ক বিজ্ঞান শাস্ত্র জানিবার পূর্বে, তদ্বিষয়ক শিল্প অবগত হন। ক্রমে সেই শিল্পের চর্চা হইতে হইতে বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। তুল্যমান বিজ্ঞান প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্বে টেকি ও দাঁড়ি পাল্লার ব্যবহার হইত। রসায়ন শাস্ত্র প্রচারের পূর্বেই লোকে বস্তুরজন ও ধ্বংস করিতে পারিত। ফলতঃ কিছু কাল বিশৃঙ্খল ভাবে ও অব্যবস্থিত রূপে কোন বিষয়ের অন্বেষণ করিতে করিতে, তদ্বিষয়ের প্রকৃত নিয়ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত কোন বিষয় শিখাইতে হইলে অগ্রে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা জন্মাইতে এবং স্থূল স্থূল বৃত্তান্তের উপদেশ দিতে হইবে।

৬। শিশুগণ যাহাতে স্বয়ং শিথিতে চেষ্টা করে তাহার উপায় করা কর্তব্য। উপদেশ যত অল্প হয় ততই ভাল। যাহাতে শিশু স্বীয় যত্নে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কি জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উপদেশ ব্যতীত শিশুরা কিছুই শিথিতে পারে না, এই ধারণা ভুল। পাঠশালার শিক্ষিত বিষয় ব্যতিরিক্ত সহস্র সহস্র ব্যাপার বাহিরে স্বয়ং শিথিয়া থাকে এবং স্বীয় যত্নে অনুশিক্ষিত বালকেরা অন্যযত্নোপদিষ্টদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হয়। বারম্বার ‘পড় পড়’ বলিয়া যে তাড়না করিতে হয়, তাহা শিশুদিগের দোষ নহে, আগাদিগের অদূরদর্শিতার ফল। তাহাদিগের বাগনার বিরোধী হইলে ও কেবল আগাদের মনোনাভ বিষয়গুলি অধ্যয়ন করাইতে গেলেই ঐরূপ অমনোযোগিতা জন্মিবে। স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিলে এই অযত্ন ও অমনোযোগিতা কখনই প্রাদুর্ভূত হয় না।

৭। শিক্ষাপ্রণালী উত্তম হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষাদান কালে যে প্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছে, বা যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিশুর মনে আনন্দ জন্মিয়াছে কিনা তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি তাহাতে তাহার আনন্দ না হইয়া থাকে, তবে সে বিষয় বা প্রণালী অপকারী। ইহা পরিত্যাগ করিয়া শিশুর হৃদয়গ্রাহী অন্য কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা যতই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হই না কেন, স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অনৈসর্গিক মার্গে ধাবিত হইলে কদাচ অসুখ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব না। বালকেরা বস্তুতঃ অলস নহে। প্রকৃতিগত কোন দোষ না থাকিলে, কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না এবং নূতন নূতন বিষয় অবগত না হইয়া ক্ষান্ত থাকেনা। অতএব এই স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া জ্ঞানোপদেশ দেওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। বালকগণের শক্তিসাধ্য বিষয় শিক্ষা দিলে

আহ্বান ভিন্ন কখনও ক্রোশ হয় না । (যজ্ঞ বাবুর “শিক্ষণ বিচার” হইতে গৃহীত) ।

মৌখিক শিক্ষাদানের বিশেষ ধারা ।—মৌখিক শিক্ষাদানের নিমিত্ত সাধারণতঃ চারিটি ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে যথা :—

(১)	আদানের ধারা (প্রদান্যক)	এই ধারা পকাশের সাংকেতিক চিহ্ন ৭
(২)	প্রদানের ধারা (বর্ণনাত্মক)	“ ” “ ”
(৩)	পূরণের ধারা (সম্পূরণ)	“ ” []
(৪)	তুলনের ধারা (উপমিতি)	“ ” =

(১) শিক্ষার যে ধারানুসারে আমরা বালকগণের নিকট হইতে তাহাদিগের স্বোপার্জিত জ্ঞানের ফলাফল আদায় করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর জ্ঞান লাভে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি, তাহাকে ‘আদানের ধারা’ বলে ।

(২) শিক্ষার যে ধারানুসারে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য সে সমুদায় বিষয়ই আমরা বালকগণকে বলিয়া দিয়া (প্রদান করিয়া) শিক্ষাদান করি তাহাকেই “প্রদানের ধারা” বলে ।

শিক্ষাকার্য্যে এই দুইটি ধারাই যথেষ্ট পরিমাণে অমুসৃত হইয়া থাকে । কেবল বালকগণের বয়স অনুসারে মাত্রার কম বেশী করিতে হয় । নিম্ন শ্রেণীতে খুব কম বলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে আদায় করিতে হইবে । বালক যতই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবে আদানের ভাগ কমাইয়া প্রদানের ভাগ বাড়াইতে হইবে । অনেক শিক্ষক কেবল বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষার কার্য্য শেষ করেন । কিন্তু কেবল বলিয়া দেওয়া বা বক্তৃতা করাকেই প্রকৃত পাঠনা বলেনা । বালকগণকে সঙ্গে করিয়া জ্ঞানোদ্যানে লইয়া যাও, কোন্ ফলগুলি ভাল আর কোন্ গুলি মন্দ বলিয়া দাও, কিন্তু সেই ফলগুলি তুমি নিজে

পাড়িয়া দিওনা আর বাগকগণের উপকারার্থে সেইগুলি ভুগি নিজে খাইয়া ও জীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে কেবল জীর্ণাবশিষ্ট খাইতে দিওনা । ‘আদান’ অপেক্ষা ‘প্রদান’ অপেক্ষাকৃত সহজ । ‘প্রদানে’ বাগকের বয়স ও পুষ্ক জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যে গাছ ধারণা করিতে পারে ও মনে রাখিতে পারে তাহাকে সেইরূপ ও সেই পরিমাণ বিষয় বলিয়া দিতে হইবে । আদানের প্রণালী অপেক্ষাকৃত কঠিন বটে, কিন্তু ইহাতে যেরূপ শিক্ষাদান হইয়া থাকে অল্প কোন প্রণালীতে তাহা হয় না । এ বিষয় বিশদীকরণার্থ ছুঁটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

(ক) মনে কর, কোন বাগক “বেণী বড় ছুঁট বাগক” এই লাইন পড়িতে যাইয়া “বেণী বড়” পর্য্যন্ত পড়িয়াই থামিয়া গেল । ‘ছুঁট’ কথা পড়িতে পারিল না । যে শিক্ষক বলিয়া দেওয়ার প্রথানুসরণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ‘ছুঁট’ শব্দটী বলিয়া দিলেন । বাগক তাহার অনুকরণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল । কিন্তু যে শিক্ষক আদায় করিবার প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেন, তিনি প্রথমে বাগককে ছ পড়িতে বলিলেন । ‘দ’ এ হ্রস্ব উকার দিবে যে তাহার আকৃতির সাংখ্য পরিবর্তন হয়, তাহা সে জানে কিনা তাহা এইরূপে পরীক্ষা করিলেন । তারপর ‘ট’ কি কি অক্ষরযুক্ত, তাহাও তাহার নিকট হইতে আদায় করিলেন । হয়ত বোর্ডে ‘কট, নট’ প্রভৃতি ছুঁট একটী কথা লিখিয়া দিয়া তাহাকে পড়িতে বলিলেন । এরূপ করিয়া যিনি শিখাইলেন, তাহার বাগক ‘ছুঁট’ কি এরূপ অল্প কোন শব্দ পড়িতে আর কষ্ট বোধ করিবেনা ।

(খ) কেমন করিয়া মেঘ হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে । আশ্বনের উপরে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া শিক্ষক বুঝাইতেছেন যে, আশ্বনের তাপে জল ক্রমাগত বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে ও পাত্রের জল কমিয়া যাইতেছে । এখন যিনি প্রথম প্রথার সেবক, তিনি ইহার পরেই বলিয়া দিলেন যে এইরূপে সূর্যের তাপে নদী, হ্রদ, সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে

আকাশে উঠিয়া মেঘ হয় । কিন্তু যিনি দ্বিতীয় প্রাথন মেনক তিনি
বালকের নিকট হঠতে আদায় করিতে চেষ্টা করিতে পারিবেন না ।
আগুনের যে রূপ তাপ আছে সে রূপ তাপ আর কোন প্রিন্সিপল আছে ?
একখানি খাণায় জল রাখিয়া অনেক দূর বোঝে রাখিলে খাণায় জল
সমান থাকে কি কম বেশী হয় ? কম হইবার কারণ কি ? তবে নদী,
হ্রদ ও সমুদ্রের উপর সূর্য্যতাপ কিরূপ কাজ করে ? ইত্যাদি নানারূপ
প্রশ্ন করিয়া করিয়া, সূর্য্যতাপে যে সমুদ্রাদির জল বাষ্পে পরিণত হয়
ইহা আদায় করিয়া লইবেন । ‘আদান’ বলিলে কতকগুলি উদ্দেশ্য-
বিহীন অসংলগ্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্র, একথা যেন কেহ না বুঝেন ।
অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্য প্রতিপাদক প্রশ্ন করিতে বিশেষরূপ চিন্তা করিতে
হয় । কাজ তত সহজ সাধ্য নয় । তবে অভ্যাসের নিকট সকলই সহজ-
সাধ্য বোধ হইয়া থাকে ।

প্রশ্নের লক্ষণ ।—প্রশ্ন করিবার কৌশল শিখা করিতে হয় ।
উত্তম প্রশ্নই মৌখিক শিক্ষা দানের প্রাণ । পণ্ডিতগণ উত্তম প্রশ্নের
নিয়মিত নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন :—

১ । প্রশ্ন সরল (সহজবোধগম্য) হওয়া আবশ্যিক ।

(ক) সহজভাষায় ও অল্প কথায় প্রশ্ন গঠন করিবে । “কে বলিতে
পারে ? কেমন বুঝি জানা যাবে” ইত্যাদি বাজে কথায় প্রশ্ন দীর্ঘ করিবে না ।

(খ) পুস্তকের কথা ব্যবহার না করিয়া, নিজের কথায় প্রশ্ন রচনা
করিবে । পুস্তকের কথা ব্যবহার করিলে বালকেরাও পুস্তকের ভাষায়
উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে । তাহাদের নিজের চিন্তা ও রচনাশক্তির
আলোচনা হইবে না ।

(গ) এরূপ বিশদভাবে প্রশ্ন করিবে যে, তাহার যেন একটি মাত্র
উত্তরই সম্ভবপর হয় । “ভারতবর্ষের উত্তরে কি ?” শিক্ষকের মনের
ভাব, বালক “হিমালয়” বলে ; কিন্তু তিব্বত বা গঙ্গা বলিলে দোষ কি ?

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কি হইয়াছিল ? এ প্রশ্নের বহুপ্রকার উত্তর হইতে পারে ।

(ঘ) বালক যেরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ সেষ্টরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবে । “গজার দৈর্ঘ্য কত ?”—এরূপ প্রশ্নের উত্তর (পূর্বে জানা থাকিলে পৃথক কথা) বালকেরা আনন্দোৎসাহে উত্তর দিতে পারেনা ।

২ । প্রশ্নের উত্তরে যেন চিন্তাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক হয় ।

(ক) আনন্দোৎসাহ একটা যা তা উত্তর দেওয়া অনেক বালকের অভ্যাস আছে । এরূপ অভ্যাসের কখনই প্রশ্রয় দিবেনা ।

(খ) “হাঁ, না”—এরূপ এক কথায় যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, সেরূপ প্রশ্নের সংখ্যা খুব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে সময় সময় এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আবশ্যকতা হইয়া থাকে, যাহার উত্তর এক কথাতেই দিতে হয়, যথা ইতিহাসের তারিখ, ভূগোলের কোন নাম, ব্যাকরণের কোন শব্দরূপ ।

৩ । প্রশ্নের গঠনপ্রণালী এক রকম না হওয়াই উচিত । “কারসিংহ কোথায়, জব্বলপুর কোথায়, শিলচর কোথায়” এরূপ এক ধরে ‘কোথায়, কোথায়’, প্রশ্নে বালকের মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায় ।

৪ । প্রশ্নগুলি বিষয়ের অংশানুসারে শৃঙ্খলের অস্থির মত পর পর সজ্জিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ যেন প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সহিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরযুক্ত হইতে পারে, দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয় ইত্যাদি । আর প্রশ্নের উত্তর গুলি একত্র করিলে যেন বিষয়টির প্রধান প্রধান অংশ গুলি শৃঙ্খলা ক্রমে পাওয়া যায় ।

৫ । পাদপুরনার্থ যে সকল প্রশ্ন করা হয়, তাহাতে শিক্ষক প্রশ্নের বাক্য আরম্ভ করিয়া, তাহার অংশ মাত্র উল্লেখ করেন অবশিষ্টাংশ বালক পূর্ণ করে । যথা, “রাগচন্দ্র চৌদ্দ বৎসরের জন্য—?” তারপর বালকেরা পূরণ করিল “বনে গেলেন” । এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নশ্রেণীর পক্ষে

বিশেষ উপযোগী কিন্তু তাঁহা বালিয়া সকল সময়ে নয়। উচ্চ শ্রেণীতে একপ প্রশ্নের ব্যবহার সম্ভব নহে। (একপ প্রশ্নোত্তরকেই পুনঃপুনঃ ধারা বলে।)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ?—(ক) পুনরানোচনা (খ) পরীক্ষা (গ) শিক্ষাদান।

(ক) পুনরানোচনা দ্বারা বালকের স্মৃতিশক্তির সাহায্য করা হয়। যত আনোচনা করা যায়, ততই সে বিষয়টী মনোমধ্যে দৃঢ়তর ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এইজন্য কোন বিষয় বালকের মনে থাকিলেও তাহাকে সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। আনোচনা না থাকিলে ভুলিয়া যাউবে। প্রতিদিন পাঠের শেষে পুনরানোচনার রীতি আছে। (পাঠনার নোটের পরিচ্ছেদ দেখ)।

(খ) পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য, বালকের উপার্জিত জ্ঞানের পরিমাণ নির্দেশ করা অর্থাৎ কতদূর শিখিয়াছে তাহা জানা। অধীত বিষয় সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা জন্মিয়াছে কি না তাহা জানা, অধীত বিষয়েরও কোন অংশ তাহার অজ্ঞাত আছে কি না তাহা জানা।

(গ) শিক্ষা দানের নিমিত্ত যে প্রশ্ন করা হয়, তাহা দ্বারা বালকের চিন্তাশক্তির পরিচািননা হয়, আর প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যাস করিলে, মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ একপ্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, পূর্বে উত্তরটি শুদ্ধ হইয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে।

অবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস কেবল প্রশ্নের দ্বারা শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন বলিয়া ইহার নাম কেহ কেহ সক্রেটিক প্রথাও বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এই প্রণালীকে ‘সক্রেটিক প্রথা’ বলা সম্ভব নহে। কারণ সক্রেটিস প্রথমতঃ পরিণতবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন যুবকদিগকে শিক্ষা দিতেন। আর দ্বিতীয়তঃ শিষ্যগণের মনের

ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই তাঁহার শিক্ষার প্রদান মধ্য ছিল । কিন্তু শিশুশিক্ষায়
মেরূপ ভ্রান্তি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে । শিক্ষক যে বিষয় বাগককে
বুঝাইয়া দিবেন মনে করিয়াছেন সুকৌশলসম্পন্ন ধারাবাহিক প্রশ্ন
করিয়া বাগকের নিকট ঠষ্টে ঠাঠ আদায় করিবেন, এই মাত্র কথা ।
এ প্রশ্নকে ‘কথোপকথনের প্রশ্ন’ বলাই যুক্তিযুক্ত । মনে কর বাগক
“বদিল ৪ আর ৭ এ ১২” । বাগককে একবার ৪টা শুঁটী গণিয়া যাইতে
বল ; তারপর ৭টা । শেষে ৪টা আর ৭টা শুঁটী একত্র করিয়া গণিতে বল ।
নিজের ভুল নিজেই বুঝিবে । এখানে ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু
তাই বলিয়া সক্রেটিসের সেই দার্শনিক প্রশ্নানুযায়ী প্রশ্নাদির সঙ্গে এই
শিশুশিক্ষার সাংগান্য ব্যাপার যুক্ত করা সম্ভব নয় । নিয়ে কথোপকথন
প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

শিক্ষক । তোমরা কল্পতরুর কথা শুনেছ ।

ছাত্র । শুনেছি, একরকম গাছ, সে গাছে যে ফল চাওয়া যায় তাই নাকি পাওয়া যায় ।

শি । আচ্ছা, এমন গাছের একটা চারা পেতে ইচ্ছা করে না ?

ছা । ইচ্ছাত করে ।

শি । তা চেষ্টা করলে ইত পাওয়া যায় ।

ছা । তাও কি পাওয়া যায় ? ও একটা বাজে কথা ।

শি । তবে কি তুমি ও গাছের কথা বিশ্বাস করনা ?

ছা । এ কথাও কি কেউ বিশ্বাস করে ? ও একটা মনগড়া কথা ।

শি । আমি কিন্তু বিশ্বাস করি । কল্প তরু কোথায় জগো জান ?

ছা । (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) উঁহ ।

শি । নন্দনকাননে জগো ; আমার একটা এই গাছ আছে ।

ছা । (অবিশ্বাসের ভাবে) আপনি বলেন কি ?

শি । বাস্তবিক কথা । (পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া) এই টাকাটা
সেই গাছের ফল ।

ছা । (গুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আপনি কি ঠিক কথা বলছেন ?

শি । ঠিক কথা বই কি, তা না হলে এ টাকাটা পেলাম কোথায় ?

ছা। ও ত আপনার টাকা ।

শি। ঠিক কথা । আমি ত চুরি করে আনি নাই—তবে আমি যেমন কোথায় ?

ছা। আপনিত খুলে কাজ করার অর্থ টাকা পান—সেই টাকা ।

শি। তুমি খুলে কাজ করনা কেন—তা হইলে তুমিও ত টাকা পাবে ।

ছা। আমি যে পারি না ।

শি। কেন পারনা ?

ছা। আমি আপনার মত অত লেখা পড়া জানি না ।

শি। তাতে কি ?

ছা। আপনি অনেক জানেন বলিয়াহঁত আপনাকে টাকা দেয় ।

শি। ঠিক কি তাই ? তা হলে আমার বিদ্যাই কি টাকা আদায় ?

ছা। এক রকম তাই বই কি ?

শি। কি ?—তাহলে কি 'ভগ্নাংশ' ও 'গুণনাম' টাকার মা ।

ছা। (হাসিয়া) সেই রকমই বটে ।

শি। আচ্ছা, তোমরা এখানে কি কাজে এসেছ ?

ছা। আমরা শিখতে এসেছি ।

শি। বিদ্যা লাভের অর্থ এস নাই ?

ছা। অবশ্য, বিদ্যা লাভ বই কি ?

শি। আচ্ছা, যখন আমরা আস পাড়তে হলে আস গাছে উঠ, তখন কি বিদ্যা পেতে হলে বিদ্যাগাছে উঠতে হবে ?

ছা। (একটু চিন্তা করিয়া) এক রকম তাই বই কি ?

শি। আমাদের আদত কথা ভুলে গেছি,—কলতর কোথায় আছে ?

ছা। আপনি বলেছেন, নন্দনকাননে ।

শি। আর আমি যে সে গাছে চড়েছিলাম, তাওত বলেছি ।

ছা। উঁহু । তবে কি সেটা বিদ্যার গাছ ?

শি। তা না হলে, আমার টাকা এত কেনন করে ?

ছা। আপনার বিদ্যা আছে বলে ।

শি। আচ্ছা, কলতরতে যা চাওয়া যায় তাই যদি পাওয়া যায়, তবে ত টাকাও পাওয়া যায় ?

ছা। যদি তেমন গাছ থাকে তবে তাতে টাকা পাওয়া যায় বই কি ?

শি। আমি সেই গাছ থেকেই এই টাকা পেয়েছি।

ছা। আপনি বিদ্যার গাছে পেয়েছেন।

শি। তবে বিদ্যার গাছও যা কলতরার গাছও তাই, কেমন ?

ছা। যখন দুই গাছেই টাকা মলে, তখন দুইই এক গাছ বটে।

শি। আর কলতরার কোণায় অমো মনে আছে ?

ছা। (হাসিয়া) নন্দনকাননে।

শি। সে নন্দনকানন কই ?

ছা। (অফুর চিত্তে) এই স্থান।

(গুং সাহেনের অনুকরণে)

বুদ্ধিমান যুবকের শিক্ষার্থে সক্রটিক প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে। বন্ধিম বাবুর “অনুশীলন তত্ত্ব” কতকটা সক্রটিক প্রথাতে রচিত। নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য কেবল সক্রটিক প্রণালীই প্রদর্শন করা নহে। ইহাতে “প্রাকৃত ধর্ম কাহাকে বলে,” এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর পাওয়া যাইবে। আর দরিদ্র শিক্ষকগণ দারিদ্রতার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া মনকে একটু প্রবোধ দিতে পারিবেন।

গুণ। বাচস্পতি মহাশয়ের সংবাদ কি ? তাঁহার পীড়া সারিয়াছে ?

শি। তিনি শু কালী গেছেন।

গু। কবে আসিবেন ?

শি। আর আসিবেন না, দেশত্যাগী হইলেন।

গু। কেন ?

শি। কি স্থলে আর থাকিবেন ?

গু। ছুঃখু কি ?

শি। সবই ছুঃখ—ছুঃখের বাকী কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেরই স্থখ।

কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক, ইহা সন্দেহবাদী সম্মত। আর তাঁহার মত ছুঃখীও যে কেহ নাই, ইহাও সন্দেহবাদী সম্মত।

গু। হয় তাঁহার ছুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন।

শি। তাহার কোন দ্রুপ নাই? সে কি কথা? তিনি চির দরিদ্র, অন্ন চালাই। তার পর কঠিন রোগে ক্রিষ্ট। আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দ্রুপ কাছকে বলে?

শু। তবে তিনি ধার্মিক নন।

শি। সে কি? আপনি কি বলেন যে এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ সকলই কি অধর্মের ফল?

শু। তাই বলি।

শি। পূর্ব জন্মের?

শু। পূর্ব জন্মের কথার কাজ কি? এই জন্মেরই অধর্মের ফল।

শি। আপনি কি মানেন যে এ জন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়াই আমার রোগ হয়।

শু। জানিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি জান না যে হিম লাগাইলে যদি হয়, কি গুরু ভোজন করিলে অজীর্ণ হয়?

শি। হিম লাগান কি অধর্ম?

শু। অল্প অধর্মের মত শারীরিক একটা দর্শ আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী, এই জন্য হিম লাগান অধর্ম। * * *

শি। তাহা না হয় হইল, বাচস্পতি। এই দারিদ্র্য ও রোগ কোন অধর্মের ফল?

শু। দারিদ্র্য দ্রুপটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দ্রুপটা কি?

শি। থাইতে পায়না।

শু। বাচস্পতির সে কষ্ট হয় নাই ইহা নিশ্চিত, কারণ বাচস্পতি থাইতে না পাইলে এত দিনে মরিয়া যাইত।

শি। মনে করান সপরিবারে মোটা চালের ভাত আর কাঁচা কলা ভাতের থায়।

শু। তাহা যদি শারীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দ্রুপ মটে, কিন্তু উহা যদি শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না পাইলে দ্রুপ বোধ করা ধার্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্মিক।

শি। ছেঁড়া কাপড় পরে।

শু। বস্ত্র লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীত কালে শীত নিবারণও চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি?

শি। জুটতে পারে কিন্তু তাহারা আপনারা জন্ম ভুলে, বামন মাজে, ঘর বাঁট দেয় ।

শু। শারীরিক পরিশ্রম অথরের নিয়ম । যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্মিক । আমি এমন বলিতেছি না যে, ঘনে কোন প্রয়োজন নাই, অথবা যে ঘনোপার্জনে যত্ববান সে অধার্মিক । বরং যে সমাজে থাকিয়া ঘনোপার্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, সে অধার্মিক । আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্য পীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা ও কুসমনা—অর্থাৎ অধর্মের সংস্কার, তাহাদের কষ্টের কারণ ।

শি। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহার পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দ্রুপ ?

শু। অনেক—কোটি কোটি । যাহারা শরীর রক্ষার জন্য অন্ন বস্ত্র পায়না—আশ্রয় পায়না তাহারা যথার্থ দরিদ্র । তাহাদের দারিদ্র্য দ্রুপ বটে ।

শি। এ দারিদ্র্য কি তাহাদের এই জন্ম কৃত অধর্মের ভোগ ?

শু। অবশ্য ।

শি। কোন অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য ?

শু। ঘনোপার্জনের উপযোগী, অথবা গ্রামাচ্ছাদন আশ্রয়াদির উপযোগী যাহা, তাহা সংগ্রহের উপযোগী আমাদিগের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে । যাহারা তাহার সনাক অনুশীলন করে নাই বা সম্যকরূপে পরিচালনা করে না তাহারাই দরিদ্র ।

শি। তবে বুঝিতেছি আপনার মতে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম । তাহার অভাব অধর্ম । (বহুমান্তীর সংস্করণ বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী পৃঃ ৪৫৫) ।

বাচস্পতি যে অধার্মিক ইহাই প্রতিপন্ন করা শুনার উদ্দেশ্য ছিল এবং অকারণেই শিষ্যের ষারাই তাহা সিদ্ধান্ত করাইয়া দইগেন ।

উত্তরের লক্ষণ ।—কেবল উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ জানিলেই চলিবে না, উত্তম উত্তরের লক্ষণও জানা চাই । বালক নিজের চিন্তাশক্তির পরিচালনা করিয়া যে উত্তর দেয়, তাহাই উত্তম উত্তর । কিন্তু প্রশ্ন উত্তম না হইলে উত্তম উত্তর আশা করা বুঝা । উত্তর গ্রহণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

(ক) নিকত্তর ।—ভুগি প্রশ্ন করিলে, কিন্তু কোন উত্তর নাই। কেন উত্তর দিলে না ? হয় সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, বা সে প্রশ্ন বুঝিতে পারে না, নয় যে দিন সে বিষয় শিখান হইয়াছিল সে দিন সে বিদ্যালয়ে আসে নাই, বা সে অমনোযোগী। এত সকল কিছু শিক্ষকের দোষে ঘটে। নিকত্তরের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে শিখাইবার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) ভুল উত্তর ।—এক বিষয়গত ভুল, আর ভাষাগত ভুল—যেদুটি হউক শুদ্ধ করিয়া দিবে। অজ্ঞতা প্রযুক্ত অশুদ্ধ উত্তর দিলে ছেলেকে তিরস্কার করিবে না। বাগকের ভুল বুঝাইয়া দিবে। যদি বালকের একপ বিশ্বাস হয়, যে উত্তর ভুল হইলে শিক্ষক ঠাট্টা বা তিরস্কার করিবেন, তবে ভুল কেন সে শুদ্ধ উত্তর দিতেও ইতস্ততঃ করিবে।

(গ) আংশিক উত্তর ।—যখন উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে দেখিবে, অথবা যখন ভাষা অভাবে উত্তর সরগ করিতে পারিতেছে না দেখিবে, তখন সে প্রশ্ন পরিত্যাগ পূর্বক অত্যাশ্রয় প্রশ্ন দ্বারা তাহার অশুদ্ধ অংশ সংশোধনের চেষ্টা করিবে। পরে আবার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর উত্থাপন করিবে। উত্তর ভুল হইলেই “তোমার হল না, আর এক জন বল”এরূপ করায় শিক্ষকের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। বাগক যে টুকু শুদ্ধ করিয়া বলিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে উৎসাহিত করিয়া অশুদ্ধ অংশের ভুল সংশোধন করিয়া দাও।

(ঘ) শুদ্ধ উত্তর ।—ঠিক উত্তর দিলে বাগককে উৎসাহিত করিবার জন্য ‘বেশ, ঠিক কথা, হাঁ’ ইত্যাদি উৎসাহসূচক বাক্য ব্যবহার করায় বেশ উপকার হইয়া থাকে। তবে সকল সময় এইরূপ ‘বাঃ বেশ’ না বলিয়াও কেবল চক্ষুর দ্বারাও উৎসাহিত করা যায়। শ্রেণীর সকল বালকই সেই প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিতে সক্ষম হইয়া বুঝিতে পারিলে, সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

(ঙ) নির্দেশের মত উত্তর ।—‘চিন্তা’ কি পদ ? উত্তর, বিশেষণ পণ্ডিত মহাশয় । দ্বিতীয় বালক (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) ক্রিয়াপদ পণ্ডিত মহাশয় । তৃতীয় বালক, গোপ্পদ ইত্যাদি । ‘কোন খৃষ্টাব্দে আকবরের জন্ম হয় ?’ উত্তর, ১৫৪৩ সনে, তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র । এরূপ উত্তর দিবার কারণ কি ? যদি বালক আন্দাজী উত্তর দিয়া থাকে, অথবা শয়তানী করিয়াই বদিয়া থাকে, তবে সেই অনাবিষ্ট বালককে বিশেষ করিয়া শাসন করিবে । আর যদি খৃষ্টাব্দ প্রভৃতি কথার অর্থ না জানার দরুন এরূপ উত্তর দিয়া থাকে, কি কোন ইতিহাসের প্রণোক্তর মুখস্থ করিতে গিয়া গোলমাল করিয়া থাকে, তবে তাহার বিধান করিবে ।

(চ) পূর্ণ বাক্যে উত্তর ।—ইহাই সাধাবণ রীতি । দ্বীপ কাহাকে বলে ? “চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থল ভাগকে”—এরূপ উত্তর উত্তম নহে । “চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থল ভাগকে দ্বীপ বলে”—ইহাই পূর্ণ উত্তর । নদী ক্রমশঃ মুখের দিকে প্রশস্ত হয় কেন ? “কারণ অত্যাশ্রয় নদী ইহার সহিত গমনপথে মিলিত হয়”—এরূপ উত্তর ঠিক নহে । “নদী ক্রমশঃ মুখের দিকে প্রশস্ত হইয়া থাকে, কারণ ইহার গমন পথে অত্যাশ্রয় নদী আসিয়া মিলিত হয়”—এইরূপ উত্তরই উত্তম ।

তবে শিবাজীর জন্মের, তারিখ বল, ভারতবর্ষের রাজধানীর নাম কর, একটা বিশেষ্য পদের উল্লেখ কর, সাধু শব্দের জীবিলে কি হয় বল, ইত্যাদি রূপ প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ বাক্যের বিশেষ্য প্রয়োজন নাই ।

(ছ) উত্তর সুসঙ্গত হওয়া আবশ্যক ।—‘কেরানী বাবু তাড়াতাড়ি লিখিতেছেন’ তাড়াতাড়ি কি পদ ? বিশেষণ পদ । এখানে ‘ক্রিয়ার বিশেষণ’ বলাই অধিকতর সঙ্গত উত্তর । আকবরের ধর্ম্মমত উল্লেখ কর ? ইহার উত্তরে বালক আরম্ভ করিল “আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র” ইত্যাদি—শেষে,

ধর্মমতেবও উদ্যোগ করিল। একপ উত্তরে কি অসম্ভব দোষ হইল তাহা বাণককে বুঝাইয়া দিয়া, উত্তরের কোন্ অংশ বদ্বিতে হইবে শিখাইয়া দিবে।

তুলনের ধারা (বা সাদৃশ্য পদ্ধতি বা উপমিতি)।—
জ্ঞাত পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া আগবা অজ্ঞাত পদার্থের বিষয় অবগত হই। বিড়ানোর গুণাগুণ জানিয়া আমরা ব্যাঙ্গের গুণাগুণ নির্ধারণ করি। ছবি দেখিয়াও আগবা অনেক দ্রব্যের আকার অবগত হই—কাবণ ছবি বস্তুর সাদৃশ্য। অনেক জিনিষ মনে রাখিবার জন্য আগবা এই প্রথা অবলম্বন করি ; যথা ভারতবর্ষ ত্রিভুজের সদৃশ, ইটাদি বুটজুতা সদৃশ, পূর্ব বঙ্গ ও আসামের মানচিত্র বেঙের সদৃশ। ৯ কাব যেন ডিগবাজী থায়। এইরূপে অনেক কথার প্রথম অক্ষর মনে রাখিবার কোশল করিয়া আগবা এই সাদৃশ্য প্রথা অবলম্বন করি। রামধনুব রঙ গুলি পব পব কিকপ ভাবে সাজান থাকে তাহা মনে রাখিবার জন্য “বেণী আসহ ফলা” (অর্থ, বেণী আসিয়া ফলা খাও) এই বাক্য আগবা মনে রাখি। ইহাতে ‘বেণী’ প্রভৃতি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সদৃশ স্ববযুক্ত শব্দগুলি আগাদিগের মনে আসিয়া পড়ে। যথা—

বে=বেঙের Violet. নী=নীল Indigo. আ=আগমানী Blue. স=সবুজ Green. হ=হলুদ Yellow. ক=কমলা Orango. ল=লাল Red.

বোর্ডে যে আগরা চিত্রাদি অঙ্কিত করি তাহা এই সাদৃশ্য প্রথার দৃষ্টান্ত। “একটা চোখ দুইটা কানের সমান” ইহা পরীক্ষিত সত্য। চোখের দ্বাধাই আগরা সর্কোপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য জ্ঞান লাভ করি। আগগাছ কলাগাছ, দুরশব্দ নিকটশব্দ, কোমল কঠিন, স্নগন্ধ দুর্গন্ধ, কটু কষায় প্রভৃতি সাদৃশ্য জ্ঞান সাপেক্ষ। বিসদৃশ করিয়া দেখাইতেও এই প্রথানুযায়ী কার্য হয়। হিমালয় পর্বত ৫ মাইল উচ্চ ;

বন্দোপসাগরের গভীরতা ২৥ মাইল । হিমালয়কে বন্দোপসাগরে ডুবাঠিয়া দিলেও হিমালয়েষ মাথা জলের উপরে থাকিবে । কিংসারগার্টেন ও পদার্থবিদ্য শিক্ষাগ্রন্থে এথা যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্কিত হইয়া থাকে । এও একরাস্তরে “জ্ঞাত পদার্থের সহিত অজ্ঞাতের তুলনা ।”

ইহাবই আবার একাব ভেদে ‘বিশ্লেষণ’ ও ‘সংশ্লেষণ’ নামে দুই প্রথা আছে । কাপড়ের বিষয় বুঝাইতে গিয়া যখন আগবা তাঁতি, মাকু, নলী, তাঁত, সূতা, তুলা প্রভৃতির উল্লেখ করি তখন বিশ্লেষণ প্রথা (অর্থাৎ কাপড় ছিন্ন করিয়া তাহার পদার্থ) অবলম্বনকারি । কিন্তু যখন কাপড়ের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া,—তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া, তাঁত দ্বারা কাপড় বয়ন হয়—এইরূপ বুঝাই, তখন সংশ্লেষণ প্রথা (অর্থাৎ সংযোগ করা) অবলম্বন করি । ইহাও একরাস্তরে আনোহী ও অবরোহী প্রথা (১০৮ পৃঃ দেখ) ।

জ্ঞানোপার্জনোর ক্রম ।—(১) আমাদিগের চিত্ত সর্বদাই নবনব জ্ঞান লাভের জন্য উন্মুখ । (২) এই উন্মুখীভূতি লষ্টয়া আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি । (৩) পরে এই সমস্ত নূতন জ্ঞান তুলনা করিয়া বিচার করি । (৪) এইরূপ বিচার করিয়া একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই । (৫) শেষে এই সিদ্ধান্তের সত্য কার্য্য বিশেষে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞান লাভের উপকারিতা উপলব্ধি করি । জ্ঞানোপার্জনোর এই ক্রম দৃষ্টে পণ্ডিতগণ শিক্ষাদানের যে “অষ্ট বিধান” নির্দেশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল :—

১। বিচার ।—কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে হইলেই বিচার আবশ্যক । পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা বিচার কার্য্যে সহায়তা হয় । আনোহী অবরোহী প্রণালী ও সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের প্রথা বিচারের অন্তরূপ ।

সুপ্রসিদ্ধ হক্সলী সাহেব বিচারের নিম্নলিখিত প্রণালী নির্ধারণ করিয়াছেন :—

(১) কার্যকারণ পর্য্যবেক্ষণ করা । (পরীক্ষণও এক প্রকার পর্য্যবেক্ষণ) ।

(২) সমধর্মীক্রান্ত দ্রব্য সমূহকে এক শ্রেণী ভুক্ত করা ।

(৩) এক শ্রেণীভুক্ত বস্তুকে সমধর্মীক্রান্ত অনুমান করা ।

(৪) আর আশাদিগের এইরূপ অনুমান, সত্য কিনা তাহা প্রমাণ করিয়া নির্ধারণ করা । (Huxley—Lay Sermons.)

২। অন্তর্বোধ—জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্য ভিন্ন অজ্ঞাত বিষয়ের অন্তর্বোধ জন্মিতে পারে না । এইরূপ বর্তমান ভিন্ন ভূত ভবিষ্যৎ, সরল ভিন্ন জটিল, ও সহজের সাহায্য ভিন্ন কঠিন বিষয় বুঝিতে পারা যায় না । বালককে ‘ম্যামথ’ বুঝাইবার সময় যদি বলা যায় যে ‘ম্যামথ’ ম্যাস্টোডনের মত জীব’ তবে বালকের কোনরূপ অন্তর্বোধ হইবে না । কিন্তু যদি পরিচিত হস্তির সহিত তুলনা করিয়া ম্যামথের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করা যায়, তবে বালকের একটা ধারণা হইতে পারে ।

যখন অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানবান করিতে হইলে, অজ্ঞাত বিষয়াদি জ্ঞাত বিষয়াদির সাহায্য ব্যতীত তাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না, তখন জ্ঞানদান বিষয়ে আশাদিগের দুইটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য :—

(১) সেই অজ্ঞাত বিষয় আর (২) যাহাকে সেই বিষয়ক জ্ঞান দান করিতে হইবে, তাহার তৎতুল্য বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিমাণ । যেমন বিদেশী ভাষার অপরিচিত কথাগুলি আমরা আশাদিগের পরিচিত দেশী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ অপরিচিত বিষয়কেও পরিচিত বিষয়ে অনুবাদ করিয়া তাহার মর্ম গ্রহণ করি । সুতরাং বালকের জ্ঞানের সীমা ও তাহার পরিচিত বিষয়ের পরিমাণ, শিক্ষকের নিতাস্তই

জানা আবশ্যক ; কারণ তাহা না হইলে শিক্ষক হয়ত এক অজ্ঞাত বিষয় বুঝাইতে গিয়া অন্য অজ্ঞাত বিষয়ের অবতারণা করিয়া বসিবেন । যে প্রথাতে এক শব্দের অর্থ বোনের নিমিত্ত অল্প আর একটা প্রতিশব্দ মাত্র দিয়া শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষানামে অভিহিত করা যায় না—অল্প যে কোন নামে ইচ্ছা অভিহিত করিতে পার । (Dr. W. T. Harris—Philosophy of Education.)

৩। উদ্দেশ্য ।—একটা নির্দিষ্ট ও সুখকর উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে । আর বালকগণকেও সেই উদ্দেশ্যের আভাস প্রদান করিতে হইবে ।

শেষে কি হইবে ইহা না জানিলে, বালক তাহার সমস্ত সামর্থ্য নিয়োগ করিতে পারিবে না । যদি শেষ ফলের আভাস পায়, তবে সে তদনুরূপ সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে বদ্ধ করিবে । অপরিচিত স্থানে, অজ্ঞাত রাস্তা দিয়া, বালককে লইয়া যাইতেছ—তাহা হাতে ধরিয়া কোন প্রকৃত স্থানেই হউক বা প্রাণ করিয়া কোন কল্পিত বিষয়েই হউক, সেই স্থান বা বিষয়ের কথা তাহাকে না বলিয়া দিলে সে কিছুতেই আগ্রহ হইতে ইচ্ছা করিবে না । তুমি জোর করিয়া গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে পার কিন্তু সে সেখানে গিয়াই দিশে হারা হইয়া পড়িবে । কোন রাস্তায় আসিয়াছে, তাহা আর সে তখন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে না । কার্যের ফলের সহিত তাহার পরিশ্রমের যে কি সম্বন্ধ তাহাও সে পরিমাণ করিতে পারিবে না । কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য উপলক্ষ করিয়া কার্য করিলে, সেই লক্ষ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, এই অনির্দিষ্ট ব্যাপারে তাহার সেরূপ কোন সুখোদয়ও হইবে না । (Dr. Rehn—Theorie und Praxis.)

৪। আত্মনির্ভর ।—বালকগণ নিজের চেষ্টায় যত শিক্ষা করিতে

পারে, ততই ভাল । আত্মনির্ভরের শক্তি বৃদ্ধিতেই ইঞ্জিয়াদির পূর্ণবিকাশ সম্ভব । আর এই ইঞ্জিয়াদির সম্যক বিকাশেই মনুষ্যত্ব ।

শিক্ষাকার্য্যে বালকের মনে আত্মাবলম্বনের ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রদীপিত করিয়া দিতে হইবে । বালকগণ যাহাতে স্বয়ং সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে । তাহাদিগকে সম্ভবমত অতি কম বলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে তাহারা স্বয়ং জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপ উৎসাহিত করিতে হইবে । মনুষ্য সমাজ নিজে নিজের শিক্ষাগুরু হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে । সূক্ষ্ম লাভ করিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক লোককেই সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে । স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সকল কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । (H. Spencer—Education).

৪ । পরিগ্রহ ও পরিবীক্ষণ ।—আমরা একটি একটি ভাব পরিগ্রহ বা সংগ্রহ করি, আর সেই সমস্ত ভাব একত্র করিয়া অন্তর মধ্যে পরিবীক্ষণ বা বিশেষ রূপে চিন্তা করি । ইহাতেই আমরা শৃঙ্খলাক্রমে একটা বিষয়ের সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই ।

পরিগ্রহ ও পরিবীক্ষণ যেন মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস — বাহিরে যেমন অবিরত নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে, মনমধ্যে সেইরূপ পরিগ্রহ ও পরিবীক্ষণের কার্য্য চালাইতে হইবে । ভাবগুলিকে একটি একটি করিয়া সুস্পষ্টরূপে মনোমধ্যে উপলব্ধি করাকেই পরিগ্রহ কহে, আর সেই সকল ভাব সংগ্রহ করিয়া শৃঙ্খলাক্রমে চিন্তা করাকেই পরিবীক্ষণ কহে । বালকগণের এই দুই বৃত্তির অনুশীলনে যত সাহায্য করিবে, তত সূক্ষ্ম লাভ পাইবে । (Herbart—Paedagogische Schriften)

৬ । কার্য্যাত্মিক বৃত্তি ।—আমরা যাহা চিন্তা করি কি কল্পনা করি তাহা যদি আমরা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি, তবে সেই চিন্তা ও

কল্পনার বিষয়ের প্রকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। কিঞ্জারগাটেন প্রণালীতে কাষ্ঠখণ্ড, কাগজ, মৃত্তিকাদির দ্বারা গঠনের এত ব্যবস্থা এই জন্তে। বালক ঘরের বিষয় চিন্তা করিল, আর তখনই কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ঘর নির্মাণ করিল। চিন্তাতে তাহার যে ভ্রম বা ভ্রুটি ছিল, কার্যে প্রয়োগ কালে সে ভ্রম ভ্রুটি সারিয়া গেল। এই জন্ত বালকের কার্য-
অধিকার বৃত্তিকে সর্বদা জাগরিত রাখা আবশ্যক।

অনেক শিক্ষক ও পিতা মাতা বালকগণের কার্যাদিকার বৃত্তিকে বৃথা চাঞ্চল্য মনে করিয়া, বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। যে বৃত্তিকে প্রধান অবলম্বন করিয়া বালককে শিক্ষা দান করিতে হইবে, যে বৃত্তির ক্রমবৃদ্ধির জন্ত যত্ন করিতে হইবে, সেই বৃত্তির উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা, কি ভীষণ ভুল! (Froebel—The Education of Man.)

৭। অমুরাগ।—অমুরাগ ভিন্ন কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। আবার স্বার্থের সংশ্রব ভিন্ন অমুরাগ জন্মে না।

বালকদিগকে কোন কিছু শিক্ষা করাইয়া সেই বিষয়টি জ্ঞানিবার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ বুঝাইয়া দিলে পাঠ গ্রহণে সমধিক অমুরাগ হয় এবং নিম্প্রয়োজনীয় কর্মে সময়ান্তিপাত করা অনুচিত বোধ হইয়া থাকে। যাহাতে আপনার বা অন্যের উপকার দর্শে, এমনত সকল বিষয়েতেই কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, মনুষ্য মাত্রেই বিশিষ্ট মনোযোগ হইয়া থাকে। (ভূদেব—শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব)।

৮। অমূর্খতা।—শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হইলে এবং অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত না হইলে বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কিরূপে সংস্পৃষ্ট হইয়া বৃদ্ধিতে পারিলে, তবে সেই বিষয়গুলির প্রতি আমাদের অমুরাগ

অনিতে পারে। অতএব শিক্ষার বিষয়গুলিকে আনের শ্রমের মত এক-
টার সহিত অল্পটিকে গ্রহণ করা যুক্ত করিতে হইবে। বিষয়গুলিকে পর্যাপ্ত
যুক্ত রাখিতে হইবে ও সেই সময়েই বালকের প্রকৃতির সহিত একেবারে
মিশাইয়া দিতে হইবে। বিষয়ই আশাপ্রসাদের বস্তু—বিষয়ই শিক্ষার
ইহে, শব্দ নয়। (Pestalozzi)

এ সকল ছাড়া শিক্ষার আরও বহু বিধান আছে। তবে এই কয়েকটি
বিধান যে বিশেষ আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে আর ভুল নাই।
এই আট বিধানকে প্রথম পথ প্রদর্শক মনে করিয়া শিক্ষক শিক্ষাকালে
ব্রতী হইবেন।

শিক্ষাদানের উপকরণাদির ব্যবহার।—শিক্ষাদানের উপ-
করণের মধ্যে ব্র্যাকবোর্ডের মত আবশ্যকীয় আর কিছুই নাই।
ব্র্যাকবোর্ড বাতীত শিক্ষাদান অসম্ভব। ব্র্যাকবোর্ডে লিখিত চিত্র
বা অঙ্কিত চিত্রাদি বালকদিগের চাক্ষুশ প্রত্যক্ষের সহায়তা করে।
চক্ষুতে যাহা দেখে তাহাই মনোগম্য বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া
থাকে।

পাঠনা কালে কঠিন শব্দ, ছায়াচিত্রের চিত্র, মানচিত্রে প্রকৃতি প্রাণ-
বোর্ডে লিখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্র্যাকবোর্ডে ছিঁদ্র অঙ্ক শিখাইয়া
উপায় নাই। ব্যাকরণ, রচনা, ভূগোল শিক্ষা দানের ব্র্যাকবোর্ডে
আবশ্যক। পাঠনার সারাংশ ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া না দিলে চলেনা।
কোন প্রয়োজনীয় নিয়ম, শিক্ষার বা অধ্যয়নের দিকে বিশেষ জ্ঞান
বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে হইলে, ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।
কোন জবাব তুলনা করিতে হইলে, ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া বা চিত্র অঙ্ক
করিয়া দিলে যেমন সুবিধা হয় আর কিছুতেই হেমন হয় না। পদার্থবিজ্ঞান
ও বিজ্ঞান পাঠনায় বোর্ডেই অধিক কাজ করিতে হয়। ব্র্যাকবোর্ডে
মধ্যেই সম্ভাব্য করিতে হইবে। ব্র্যাকবোর্ডের উপর উদ্ভব অঙ্ক

পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে । পাঠনার সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকীয় বিবরণ (সংক্ষেপে), কঠিন শব্দ, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া যাইবে । পাঠনা শেষ হইলে, বোর্ডে পাঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে ।

বালকগণের দ্বারাও বোর্ডে অনেক সময় লিখাইতে হয় । কোন অঙ্ক কঠিন বোধ হইলে বালকের দ্বারা বোর্ডে সেই অঙ্ক কসাইতে হইবে । তাহা হইলে কোথায় তাহার ক্রটি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । বালকের দ্বারা বোর্ডে মানচিত্র ও চিত্রাদি অঙ্কন করানও বিশেষ আবশ্যক ।

যাঁহারা চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পটু নহেন তাঁহারা পূর্বেই (যদি সুবিধা থাকে) বোর্ডে আবশ্যকীয় চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিবেন । কিন্তু শিক্ষক পাঠনার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল চিত্র বা মানচিত্র অঙ্কিত করেন তাহাই সর্বাঙ্গীণ । বালকেরা চিত্রের প্রত্যেক অংশ অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে । পূর্বাঙ্কিত চিত্রের সমস্ত অংশগুলি এক সঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অংশগুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিবার সুবিধা হয় না । তাহা হইলেও সুরঞ্জিত মুদ্রিত চিত্র অপেক্ষা একরূপ পূর্বাঙ্কিত চিত্র অধিকতর ফলপ্রসূ ।

চিত্র বা মানচিত্রের দাগগুলি একটু মোটা করিয়া না দিলে দূরের বালকেরা ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে না । আর বোর্ডখানিও এমন স্থানে রাখিতে হইবে যে সকল বালক যেন স্থানে বসিয়াই বোর্ডলিখিত বিবরণ অনায়াসে পাঠ করিতে পারে । বোর্ডের উপর বাহিরের আলো পড়িলে দেখার অসুবিধা হয় ।

ভূগোল-ইতিহাসের পাঠ দান কালে মানচিত্র, পদার্থপরিচয় শিক্ষায় রস্তু বা তাহার কোন প্রতিকৃতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় যন্ত্রাদির ব্যবহার নিতান্তই কর্তব্য । এ সম্বন্ধে ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থপরিচয় ও বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদে বিশেষ করিয়া লিখিত হইল ।

শ্রেণী পাঠনা ।—পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার প্রথায় বিশেষ কোন শ্রেণী ভাগের ব্যবস্থা ছিল না । এখনও টোলে কোন শ্রেণী নাই । যে, যে পরিমাণ পারে, সে সেই পরিমাণ অধ্যয়ন করে । যতগুলি শিক্ষার্থী ততগুলি শ্রেণী । এই প্রথাতে বালকগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অল্প কি অধিক সময়ে পাঠ সমাপন করিয়া থাকে । প্রমোশন পাইল না বলিয়া কাহাকেও তাড়াইয়া দিতে হয় না । সকলেই শিক্ষা লাভ করে, তবে কেহ অল্প সময়ে, কেহ অধিক সময়ে । বর্তমান (ইউরোপীয়) প্রণালী অনুসারে এক সঙ্গে অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । ইহাতে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে । সুবিধার মধ্যে এই যে, এই প্রথায় অল্প সময়ে অনেক ছাত্রকে পড়ান যায়, আর ছাত্রেরাও প্রতিযোগিতায় উন্নতি করিতে বিশেষ যত্ন করে । এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এতদূর শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা মনে থাকে বলিয়া, সময়ের সদ্যবহার করিতে শিক্ষা করে । আর অসুবিধা এই যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন বালকগণকে একসঙ্গে শিখাইতে গিয়া উভয়েরই কিছু অনিষ্ট করা হয় । তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন বালক শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিতে পারেনা, কারণ তাহাকে সকলের সঙ্গে চলিতে হয় । আর স্থূল বুদ্ধিবালকও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বালককে অনুসরণ করিতে পারেনা ; হয়ত তাহাকে শেষে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয় । এক মাঝারী ছেলেদের কোন অসুবিধা হয় না । আগাদিগের সাবেক প্রথাতেও দোষ আছে, বর্তমান প্রথাতেও দোষ আছে । তবে বর্তমান প্রথাকে উন্নত করিবার জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিতেছেন ।

এক সঙ্গে অনেক ছাত্র পড়াইতে হইলে বিদ্যা ছাড়া আরও গুণ চাই । ছাত্রগণকে শাসনে রাখিতে হইবে । কিন্তু যাহাতে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য করে, তাহাই করিতে হইবে । শাসনের ভয়েও কার্য করে বটে কিন্তু শাসন একটু ঢিল পড়িলেই, বালক আবার নিজমূর্তি

ধারণ করে। তার ক্রমাগত শাসনে শাসনে বালাকেরা ঘ্যাচড়াও হইয়া পড়ে।

“কি করিতে হইবে, বলিয়া দাও। কেমন করিয়া করিতে হইবে, বুঝাইয়া দাও। তারপর বালক তাহা করে কিনা, দেখিয়া লও।”—এই তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য শিক্ষা দানের সংক্ষিপ্ত সার।

সকল বালকের দিকেই দৃষ্টি রাখিবে। ভাল ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে না। বরং দুর্বল ছেলেটির দিকেই একটু বেশী দৃষ্টি রাখিবে। পাঠনার সময় সকলেই যেন বুঝিতে পারে যে, সকলের প্রতিই শিক্ষকের সমদৃষ্টি আছে।

যে বালকটি অধিক দুর্বল, তাহার জন্য একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইতে পারে। সকলের সঙ্গে সমান অঙ্ক না দিয়া তাহাকে একটা সহজ অঙ্ক দাও, সকলকে যে পরিমাণ মুখস্থ করিতে দিবে তাহাকে তার চেয়ে একটু কম দাও। এইরূপে তাহাকেও এক বৎসরে না হউক দুই বৎসরে শ্রেণীর উপযোগী করা যাইতে পারে।

অধ্যাপনা বেশ সুখপ্রদ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই বালকগণ গোলমাল না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়া শুনিবে।

পাঠনার সময় বালকগণকে বাহিরে যাইতে না দেওয়াই উচিত। এক শ্রেণীর বালক অন্য শ্রেণীতে স্ট্রেট বা পেন্সিল আনিতে গিয়া অনেক সময় উৎপাত করে। এরূপ অভ্যাসের প্রায়শ্চেষ্ট দেওয়া কর্তব্য নহে। অন্য কোন শোককে পাঠনার সময় শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দিবেনা। একে ছেলের চঞ্চল মন, তাহাতে এরূপ বাধা পাইলে তাহাদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটিবে।

পড়াইতে পড়াইতে উঠিয়া যাওয়া বড়ই দোষের বিষয়। যে সকল পুস্তক বা উপকরণের আবশ্যক, তাহা পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখা কর্তব্য।

গৃহে পাঠাভ্যাস।—সময়ের স্বল্পতা ও বিষয়ের আদিক্য বশতঃ বালকগণকে সময় সময় বাড়ীতেও পাঠাভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে পাঠ নির্দেশ করিতে হইলে, বালকগণের বয়স ও গৃহপাঠ বিষয়ের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের বয়স বিবেচনায় তাহাদিগের গৃহে পাঠের নিমিত্ত কোনরূপ বিষয় নির্ধারণ না করাই উচিত। তাহারা যে সামান্য বিষয় পাঠ কবে তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে বিদ্যালয়ের ৫ ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট। বাড়ীতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহারা খেলা করিবে। অপরিণত শক্তিক, অপরিমিত সঞ্চালনে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের প্রবিশ্রুত ডিরেক্টর পণ্ডিত সব এলফ্রেড ক্রফ্ট সাহেব বয়স হিমায়ে বালকগণের পাঠের সময় নির্ধারণ করিয়া এক আদেশ প্রচার করেন। আমরা যতদূর মনে হইতেছে বালকগণের মানসিক পনিশ্রম বিষয়ে তিনি নিম্ন-লিখিত রূপ সময় নির্দেশ করিয়াছিলেন :—

৫ হইতে ৭ বৎসর	...	...	...	২ ঘণ্টার অধিক নয়।
৭ হইতে ১০ বৎসর	...	...	...	৩ " "
১০ হইতে ১২ বৎসর	...	...	...	৫ " "
১২ হইতে ১৪ বৎসর	...	...	...	৭ " "
১৪ হইতে ১৭ বৎসর	...	...	...	৯ " "
১৭ হইতে ২১ বৎসর	...	...	...	১১ " "
২১ হইতে ২৫ বৎসর	...	...	...	১২ " "

বিদ্যালয়েই সমস্ত বিষয় পড়াইয়া দিতে পারিলে আর বাড়ীতে পাঠের আদেশ করিবার আবশ্যকতা হয় না। করমিয়াং ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে দেখিয়াছি যে অনেক ছাত্র (আমাদিগের মধ্য শ্রেণীর সমান শ্রেণীভুক্ত) বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করে না। যত কিছু পড়াশুনার কাজ সমস্তই বিদ্যালয়ের ৫ ঘণ্টায় শেষ হয়। এমন কি বালকগণের সাহিত্য

পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকও থাকে না । ব্যাকরণ, ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পাটীগণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়, শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া দেন । তবে এক কথা এষ্ট যে একরূপ বন্দোবস্ত বোর্ডিংস্কুলেই (অর্থাৎ যেখানে বালকেরা বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকে) সম্ভবপর । ডেস্কুলের (অর্থাৎ যেখানে বালকেরা নির্দিষ্ট সময় আসে এবং ছুটি হইলেই বাড়ী চলিয়া যায়) কার্যো বড়ীতে কিছু কিছু পড়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতে পারে । শিক্ষক বালকগণকে বিদ্যালয়ে কি পরিমাণ শিখাইয়া দিবেন ও বালকেরা নিজ চেষ্টায় গৃহে কি পরিমাণ পাঠাভ্যাস করিবে তাহা নিজের চিত্ত দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে ।

নিম্ন প্রাথমিক		
৫	উচ্চ প্রাথমিক	
৪	মধ্য ইংরাজী	৬
৩	মোট কিউলোন	৭
২	ইন্টার মিডিয়েট	৮
১	ব্যাচেলার সিপ	
	মাষ্টার সিপ	

১১ চিত্র । বিদ্যালয়ে ও গৃহে পাঠের পরিমাণ ।

গৃহে পাঠের আদেশ করিবার সময় নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

(১) প্রত্যেক বালকের অভিভাবক একরূপ উপযুক্ত নহেন যে বালককে যমস্ব বিদ্যায় উপযুক্ত রূপ সাহায্য করিতে পারেন । ইহাই মনে রাখিয়া কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(২) বালকের খেলার সময়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে তাহাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হয় । খেলার সময় বাদ রাখিয়া কার্যের হিসাব করিবে ।

(৩) কঠিন বিষয়ে পাঠ দিলে হয় ন বালাকেরা অভ্যাস করিবেনা, না হয় অনোর নকল করিয়া আনিবে । সুতরাং সূক্ষ্ম না কঠিন কৃষ্ণ হইবে । অতএব কঠিন বিষয়ে পাঠ দেওয়া উচিত নহে ।

(৪) বাড়ী হইতে বালাকেরা যে সকল কাজ করিয়া আনিবে তাহা শিক্ষক উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবেন, নচেৎ বালাকেরা বাড়ীর কাজে উপযুক্ত রূপ মনোযোগ করিবে না ।

(৫) বাড়ী হইতে কোন কাজ করিয়া না আসিলে তাহাকে ছুটির পর বিদ্যালয়ে আবদ্ধ করিয়া সেই কাজ করাষ্টয়া দিবে । মূলতবী পড়িলে বালাক আর সারিয়া উঠিতে পারিবে না । যে বালাক ছুটির দিনের জন্ত কাজ মূলতবী রাখিয়া দেয়, তাহার কাজ কখনও শেষ হয় না । একবার কোন এন্ট্রেন্স স্কুলের শিক্ষকগণের পরিচালনার জন্য গ্রুপার্চের নিম্নলিখিত রূপ একটা তালিকা করিয়াছিলাম :—

বিষয়	মধ্য বিভাগ		উচ্চ বিভাগ	
	পরিমাণ	সময়	পরিমাণ	সময়
১০ আঙ্গুর	১০ লাইন	১ ঘণ্টা	২০	১ ঘণ্টা
ইতিহাস	অর্ধ পৃষ্ঠা	২ ঘণ্টা	১ পৃষ্ঠা	১ ঘণ্টা
ভূগোল	...	২ ঘণ্টা	...	২ ঘণ্টা
ইং বাং বা সংস্কৃত ব্যাকরণ	...	২ ঘণ্টা	...	২ ঘণ্টা
অক্ষ, পাটীগণিত, বীজগণিত পরিমীতি	২টি	২ ঘণ্টা	৪টি	২ ঘণ্টা
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা	১টি	২ ঘণ্টা	২টি	২ ঘণ্টা
জ্যামিতির অনুশীলন	১টি	২ ঘণ্টা	১টি	২ ঘণ্টা

বিষয়	মধ্য বিভাগ		উচ্চ বিভাগ	
	পরিমাণ	সময়	পরিমাণ	সময়
রচনা	৮১০ লাইন	২ ঘণ্টা	১২১৪ লাইন	৪ ঘণ্টা
অনুবাদ	৪১৫ লাইন	১ ঘণ্টা	৮১০ লাইন	১ ঘণ্টা
মানচিত্র	১ খান	১ ঘণ্টা	১ খান	১ ঘণ্টা
ডুইং	...	২ ঘণ্টা	...	১ ঘণ্টা
সংস্কৃত	...	...	৮১০ লাইন	১ ঘণ্টা
অনধীত বিষয়	...	১ ঘণ্টা	...	২ ঘণ্টা

বাড়ীতে সাহিত্য, ঐতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয়ক অধীতপাঠের পুনরালোচনা করিবে মাত্র । এই তালিকায় সেই পুনরালোচনার সময়ই নির্দিষ্ট হইল । শ্রেণীতে অক্ষ কিবা জ্যামিতি শিক্ষা দিবার পরে, আনোচনার অন্ত ২৩টা নুতন (কিন্তু সহজ) অক্ষ বা একটি অনুশীলন বোর্ডে লিখিয়া দিবে । বাড়ী হইতে বাগকেরা এই সকল অক্ষ বা অনুশীলন কমিয়া আনিবে । রচনা বা অনুবাদে আবশ্যক মত নুতন কি পুরাতন বিষয়ের নির্দেশ করিতে পার ।

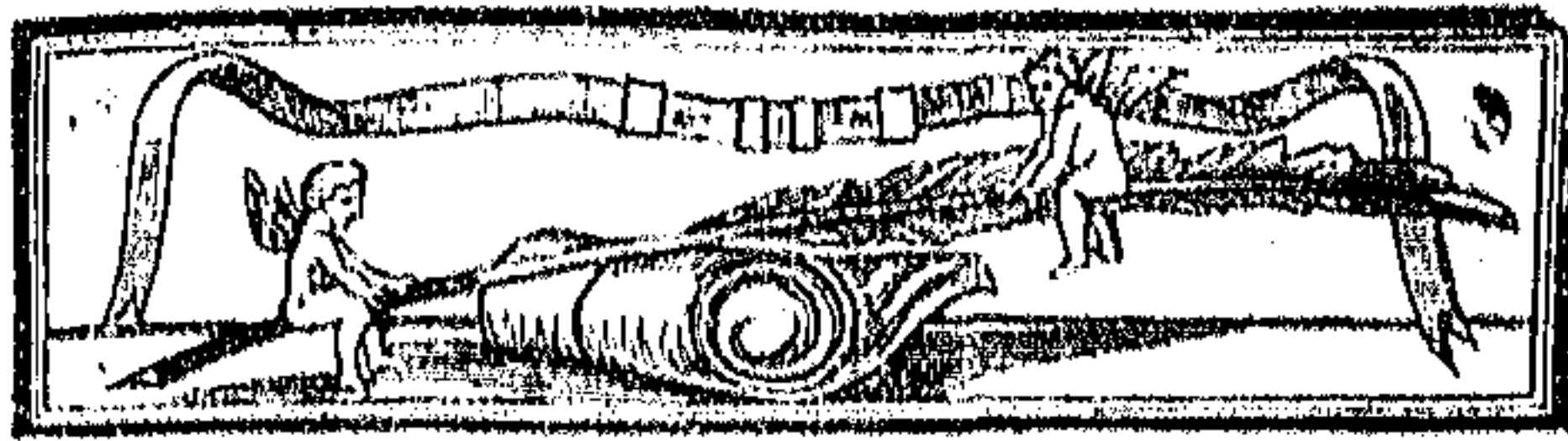
এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে গৃহপাঠের একপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে মধ্যবিভাগের ছাত্রগণকে ২৩ ঘণ্টা ও উচ্চ বিভাগের ছাত্রগণকে যেন ৩৪ ঘণ্টার অধিক বাড়ীতে পড়িতে না হয় । তবে ডুইং ও রঙের দ্বারা মানচিত্রাদি অক্ষনে বাগকগণ ক্রান্তি বোধ করেনা । একপ কার্যের সঙ্গে অন্য কার্যের সময় একটু অধিক হইলেও হইতে পারে । বেশী অক্ষ কসিতে দিলে কি বেশী পড়া মুখস্থ করিতে দিলে কোন কাজ হয় না ।

কারণ বালকেরা করে না ও করিতেও পারে না। আর আশাততঃ জোর করিয়া করাইলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। নিয়ম বিভাগের ছাত্রের অল্প বাড়ীতে কোন কার্যের ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে একটী গোপনীয় কথা।—সকল বাবসায়েরই একটা গুপ্ত আছে। শিক্ষকতা কার্যও ছুই একটা গুপ্ত আছে। পাকা শিক্ষকগণকে আর সে সকল গুপ্তের কথা শিখাইতে হয়না। কিন্তু শিক্ষানবিস শিক্ষক ও নূতন শিক্ষকের পক্ষে বাবসায়ের গোপন কথা ছু একটা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

যে দিন প্রথমে স্কুলে যাইবে সেদিন অনেক বিষয়ে সাবধান হইবে। (১) পোষাক পরিচ্ছদ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু সম্পন্ন হইবে, আগে দর্শন দারী পরে গুণ বিচার। (২) ঠিক ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীতে প্রবেশ করিবে (৩) বেশ। গভীর ভাব ধারণ করিবে, বেশী কথা বলিবেনা। (৪) শ্রেণীর পাঠ্যাদির বিষয় পূর্বেই অবগত হইবে ও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিবে। (৫) শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াই কার্য আরম্ভ করিয়া দিবে। (৬) নূতন শিক্ষক দেখিলে ছুই বালকেরা উৎপাত করিতে চেষ্টা করিবে। আবশ্যক হইলে সর্বাপেক্ষা ছুই বালকটিকে ছু চার ঘা লাগাইয়াও দিবে। (৭) যদি প্রথম দিন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত না হইয়া থাক তবে শ্রেণীতে কখনই উপস্থিত হইবে না। তুমি যে প্রস্তুত হইতে পার নাই, একথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বুঝাইয়া বলিলেই তিনি আর তোমাকে শ্রেণীতে যাইতে বলিবেন না। প্রথম দিনে বালকেরা যদি বুঝিতে পারে যে তুমি সময়নিষ্ঠ, সুপণ্ডিত আর শাসনেও খুব কড়া, তবে তাহাদিগের সেই দারুণা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যদি প্রথম দিনেই তাহারা বুঝিতে পারে যে, তুমি ভাল পড়াইতে পারনা ও ছুটানী করিলে কিছু বলনা, তবে তুমি শেষে হাজার পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর, কি হাজার শাসন কর, সফল লাভ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে।





বিবিধ বিধান ।

দ্বিতীয় ভাগ—বিশেষ বিধান ।

“Teach things, not words.”—Pestalozzi.

প্রথম প্রকরণ—শরীরপালন বিষয়ক ।

১। ব্যায়াম ।

“শরীরসাধ্যং ধর্মমসামন্যম্ ।”



উ

পকারিতা ।—(১) ব্যায়াম চর্চায় শরীর সবল ও
জুঠাশ হয় । (২) মানসিক চিন্তায় মস্তিষ্কে যে
রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ব্যায়ামাদির অমুশীলনে
সেই রক্ত মস্তিষ্ক হইতে শরীরের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত
হইয়া পড়ে । (৩) বঙ্গাশূল প্রসারিত হওয়াতে

কৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের শক্তি বৃদ্ধি হয় । (৪) রোগ ব্যাধির হস্ত হইতে
পরিজ্ঞান পাওয়া যায় । (৫) দৈহিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি
পায় । (৬) মেহাদিও সরল ও সবল হওয়াতে শরীরের শ্রী স্পন্দন হয় ।

(৭) মনোবস্তু অধ্যয়ন দ্বারা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা জাগ্রত । (৮) মানসিক পরিশ্রম কনিষ্ঠার শক্তি বৃদ্ধি পায় (৯) শৃঙ্খলাবদ্ধ মনোবস্তু কাৰ্য্য কনিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগ্রত (১০) নৈতিক চরিত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য হয় ।

অশস্ত বক্ষঃস্থল, ক্ষীণ কটদেশ, শক্ত পেশী সমূহ কেবল যে মুহূর্ত্তীয় ব্যক্তির লক্ষণ তাহা নহে, এ সমস্ত স্থলী স্ত্রী পুংসের লক্ষণও বটে । বৃহৎ কটদেশ, অশস্ত বক্ষঃস্থল, অম্লমুত্থ মাংস পেশী ও উন্নত উন্নত কদাকারের লক্ষণ । আমাদের দেশে পুঙ্লকালে নানাক্রম ব্যায়ামাদির অনুশীলন হইত । তদাধো নৃত্য মঙ্গলোৎসব আনন্দপ্রদ ব্যায়াম ছিল । স্ত্রী নৃত্য লাল্য ও পুং নৃত্যকে তান্ত্রিক বলিত । এখন পুংসেরা নৃত্য নাই, স্ত্রীলোকের নৃত্যও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে । নৃত্যে বক্ষঃস্থল অশস্ত ও পদদ্বয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয় । বালকদিগের বিদ্যালয়ে যেকোন ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে, বালিকা বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কিছু করা আবশ্যিক । ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে বালিকাদিগের ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা আছে । এই কারণে উক্ত দেশ সমূহের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই সবল ও স্থলী । অশ্রান্ত বিষয়ের সহিত, ব্যায়াম বিষয়ক কিছু জ্ঞানও শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । অগ্নি দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে, দরখাস্তকারীকে, অশ্রান্ত গুণের সহিত, তাঁহার ব্যায়াম বিষয়ক গুণ ও ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলা বিষয়ে পারদর্শিতার উল্লেখ করিতে হয় ।

ওজন ও উচ্চতা ।—যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা আছে, সেখানে সুবিধা হইলে একটা মানুষ ওজনের মাপ (দেহাণ্ডয়ে ট্রেনের ওজন যন্ত্রের সহ) ও একটা উচ্চতা মাপের যন্ত্র (হাত ও তাঁহার ভাগ যুক্ত একখানি দণ্ডা কাঠ খণ্ড—তাঁহার সহিত লম্ব ভাবে একখানি সরু কাঠ খণ্ড একপ ভাবে সংযোগ্য যে, এই সরু কাঠ খণ্ড ইচ্ছা মত উপর নীচে উঠাইতে নামাইতে পারা যায় । বাবককে কাঠ খণ্ডের নিকট দাঁড়া করাইয়া, সেই সরু কাঠ খণ্ড তাঁহার মাথার উপরে রাখিলে, যে চিহ্নের নিকট এই কাঠ খণ্ডের গোড়া থাকে, তাহাই ষাটকের উচ্চতা) রাখা আবশ্যিক । প্রত্যেক তিন মাস অন্তর বালকগণের ওজন ও উচ্চতা নির্ধারণ করিয়া পূর্বের ওজন ও উচ্চতার সহিত তুলনা করিতে হইবে ।

যদি ওজন ও উচ্চতা বাড়ি না পাওয়া থাকে, তবে অতিরিক্ত কারণ অনু-
সন্ধান করিয়া প্রতিকাব করা আবশ্যিক ।

নিম্নবিধি ৭ প্রতিকাবমে সুস্থকায় বাবক বালিকাদিগের এক
বৃদ্ধি একটা মেটাগুটি পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

(এই ছুট গ্রন্থিকা কাবটার ও বটকৃত ইংনাটা 'ব্যাগামানুশীলন'
হইতে গৃহীত হইয়াছে ।)

বালকগণের বৃদ্ধির তালিকা ।

(একটা পয়সার বাস এক ইঞ্চি, এক পৌণ্ড ত্রায় অঙ্ক মের) ।

বয়স	উচ্চতা (ইঞ্চের হিসাব)	বাৎসরিক উচ্চতা বৃদ্ধি	ওজন (পৌণ্ডের হিসাব)	বাৎসরিক ওজনের বৃদ্ধি ।
৫	৪১'১৫		৩৭'৭১	
৬	৪৩'১৮	২'০৩	৪০'৬৭	২'৯৬
৭	৪৫'১৫	১'৯৭	৪৪'০	৩'৩৩
৮	৪৬'৯২	১'৭৭	৪৭'১৫	৩'১৫
৯	৪৯'৫২	২'৬	৫১'২	৪'১৪
১০	৫১'৫২	২'০	৫৫'৫	৪'২১
১১	৫২'৮৭	১'৩৫	৬০'১৫	৪'৬৫
১২	৫৪'৪৫	১'৫৮	৬৪'৫২	৪'৩৭
১৩	৫৬'৫৬	২'১১	৭১'০	৬'৪৮
১৪	৫৮'৫৬	২'০	৭৯'৫৭	৮'৫৭
১৫	৬০'৭৭	২' ২১	৯১' ৪৩	১১'৮৬
১৬	৬৩'৪২	২'৬৫	১০৭'১৬	১৬'৪৩
১৭	৬৪'৯৫	১'৫৩	১১৮'১৮	১০'২২
১৮	৬৫'৬৯	১'৭৪	১২৭'২৫	৯'১৭
১৯	৬৬'৩৭	০'৬৮	১৩১'৪৮	৪'২৩
২০	৬৬'৮০	০'৪৩	১৩৫'২৮	৩'৮
২১	৬৬'৮৭		১৩৬'২৮	

বালিকাদিগের বুদ্ধির তালিকা ।

বয়স	উচ্চতা (ইঞ্চির হিসাবে)	বায়সারিক উচ্চতার বুদ্ধি	ওজন (পৌণ্ডের হিসাবে)	বায়সারিক ওজনের বুদ্ধি ।
৫	৪১'২৯		৩৯'৬৬	
৬	৪৩'৩৫	২'০৬	৪৩'২৮	৩'৬২
৭	৪৫'৫২	২'১৭	৪৭'৪৬	৪'১৮
৮	৪৭'৫৮	১'৭৯	৫২'০৪	৪'৫৮
৯	৪৯'৩৭	১'৯৭	৫৭'০৭	৫'০৩
১০	৫১'৪২	২'০৮	৬২'৩৫	৫'২৮
১১	৫৩'৪২	২'৪৬	৬৮'৮৪	৬'৫৯
১২	৫৫'৮৮	২'২৮	৭৮'৩১	৯'৪৭
১৩	৫৮'১৬	১'৭৮	৮৮'৬৫	১০'৩৪
১৪	৫৯'৯৪	১'১৬	৯৮'৪৩	৯'৭৮
১৫	৬১'১০	'৪৯	১০৬'০৮	৭'৬৫
১৬	৬১'৫৯	'৩৩	১১২'০৩	৫'৯৫
১৭	৬১'৯২	'০৩	১১৫'৫৬	৩'৫০
১৮	৬১'৯৫		১১৫'৫৬	

ব্যায়ামের বয়স ।—তালিকা লিখিত সংখ্যাগুলি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বালকেরা একাদশ বর্ষ পর্যন্ত একটু একটু করিয়া বাড়ে, একাদশের পর হইতেই তাহাদের বুদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক । ১৬ বৎসর পর্যন্ত এই ভাবে খুব বৃদ্ধি হইয়া, ১৭ হইতে আবার বুদ্ধির পরিমাণ কমিতে থাকে ; ২১ বৎসর পবে আর বড় একটা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না ।

বালিকাদিগের সম্বন্ধেও সাধারণ বুদ্ধির নিয়ম এইরূপ । তবে বয়সের কিছু তারতম্য আছে । ৯ বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধি কম মাত্রায় ; তার পর হইতে বুদ্ধির মাত্রা বেশী হইয়া থাকে । ত্রয়োদশ পর্যন্ত এইরূপ

অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি হয় । তার পর আবার অল্প অল্প বৃদ্ধি হইয়া ১৮ বৎসরেই শেষ হয় ।

বালক বালিকার স্বাভাবিক শরীর বৃদ্ধির বিষয় শিক্ষা কার্য্যে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যিক । ৫ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কপ ব্যায়ামের ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে । কারণ এ সময়ে বাল-স্বভাব-স্বলভ-চাক্ষু্য বশতঃ বালকেবা ছুটাছুটি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ অল্প সঞ্চালন করিয়া থাকে । ১২ হইতে ১৬ বৎসর (বালিকার পক্ষে ১০ হইতে ১৩) পর্য্যন্ত শারীরিক বৃদ্ধির মাত্রা অধিক্য বশতঃ দেহস্থ শাস্নু, পেশী প্রভৃতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে । এ সময়ে বিশেষ সাবধানে ব্যায়ামাদি কার্য্য পরিচালনা করা কর্তব্য । সামান্য পরিমাণ সহজ ব্যায়ামাদির অনুশীলন করা যাইতে পারে । কিন্তু এ সময়ে ব্যায়ামের মাত্রা অধিক হইলে, উত্তেজিত শাস্নুপেশী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শীঘ্রই দুর্বল হইয়া পড়িবে । স্মৃতবাং বালক বালিকার শরীর বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটবে । এরূপ দৃষ্টান্তও বিবল নহে । যাহারা এইরূপ বয়সে অত্যধিক মাত্রায় অল্প সঞ্চালন করে তাহারা প্রায়ই খর্বাকৃতি হইয়া থাকে । ডাক্তারেরা এ বয়সে বালক বালিকার বিবাহ দেওয়াকে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানি জনক মনে করিয়া থাকেন । তার পর ১৬ হইতে ২১ পর্য্যন্তই ব্যায়াম চর্চার উপযুক্ত কাল । ২১ বৎসরের পর যে ব্যায়াম চর্চার আবশ্যিকতা নাই তাহা বলিতেছি না । ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাল । আগর-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতেছি বলিয়া, ২১ বৎসরের একটা সীমা নির্দেশ করিয়াছি মাত্র ।

১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকার ব্যায়াম সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে । এ বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকার শক্তির বিশেষ কোনরূপ তারতম্য দেখা যায় না । তবে ১৩ বৎসরের পর.

হইতে বাগ্‌কেব শক্তি বাগিকার অগ্‌গ্‌না অনেক পারমাণে বৃদ্ধি হয় বলিয়া, ব্যায়ামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । বাগক বাগিকার দৈহিক মৌদ্ধ্য বৃদ্ধির জন্ত মধ্যম ব্যায়ামের নিত্য প্রয়োজন ।

১৩ বৎসরের নিম্ন বয়সের বাগক বাগিকার জন্ত (বিশেষ ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত) নানাবিধ খেলাই জন্ত মধ্যমের উপযুক্ত বিধি । তবে এই বয়সের বাগক বাগিকাদিগকে সামান্যকপ ড়িল করান যাইতে পারে । কিন্তু বাব ব্যায়াম (প্যারাদেল, হার্টজট্যাং, ট্র্যাপিজ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যায়াম) নিষিদ্ধ । ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত পেশী সমূহে বিশেষ উন্নতি হয় না—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । সেই জন্ত এই বয়সে তাহাদিগেব হস্তেব মাংসপেশী বাব ব্যায়ামের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী থাকে । সামান্যকপ দেশী ব্যায়াম (নিহর ও বৈঠক) করান যাইতে পারে । কিন্তু কঠিন ব্যায়াম, (ডন, চাল ও কুলাট) যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাহুর শক্তির আবশ্যক করে, তাহা না করানই যুক্তি । হস্তের পেশীর পূর্বে পায়ের পেশী উন্নত হইয়া থাকে । এনিমিত্ত যে সকল ব্যায়ামে পায়ের মধ্যমের আবশ্যক তাহাই পূর্বে আরম্ভ করাইতে হইবে ।

ব্যায়ামের সময় ।—কেবল বয়স বিবেচনা করিলেও চলিবে না । বাগক কোন রোগ প্রাপ্ত কিনা, প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত আহার পায় কিনা, তাহাদিগের কোন অঙ্গ বিকল কিনা, রাজে তাহাদিগের অনিদ্রা হয় কিনা, এ সমস্ত বিবেচনা করা আবশ্যিক । এক সঙ্গে ড়িল (বা দেশী কসব) করাইতে হইবে বলিয়া সমস্ত ছাত্রকেই এক দলভূক্ত করা বিধেয় নহে ।

এইকথা বিশেষ রূপ মনে রাখা আবশ্যক যে, ক্রান্তি উপস্থিত হইবার পূর্বেই বাগকগণকে ব্যায়ামাদি হইতে বিরত করিতে হইবে ।

তবে অভ্যাসে যখন শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন ৩৩ সপ্তকে ক্রান্তি উপস্থিত হয় না। সেই ক্ষণ প্রথম ৫ মিনিটের অধিক কাল ব্যায়ামাদির অনুশীলন কর্তব্য নহে। শেষে ধীরে ধীরে ১০।১৫ মিনিট পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আবার বিনা বিশ্রামে এক সপ্তকে ১৫ মিনিটকাল ব্যায়াম করানও মুক্তি যুক্ত নহে। ১০ মিনিটই সাধারণতঃ কঠিন ব্যায়ামের পক্ষে দীর্ঘ সময়। আর এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, ক্রান্তি উপস্থিত হইলেই বালকেরা হাঁপাইতে আরম্ভ করে। এই সময় অধিক বায়ুর প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহার নাকে মুখে বায়ু গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু মুখের দ্বারা বায়ু গ্রহণ অনিষ্টকর। বালকগণ যাহাতে মুখ বন্ধ রাখিয়া, কেবল নাকের সাহায্যেই শ্বাসের কার্য করে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাবধান করিতে হইবে।

বালকেরা অপরাহ্নে দুটির পর হইতে ক্রিকেট ফুটবল, হকী, হাডুডু প্রভৃতি খেলিতে আরম্ভ করে, আর সন্ধ্যার যে কাল পর্যন্ত যাবত দেখা যায় সে পর্যন্ত ছাড়ে না। ফলে ইহাই হয় যে, রাত্রে আর তাহার পাঠাদির কার্য করিতে পারে না। অতিশয় ক্রান্তি বশতঃ শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়ে। কেবল ইহাই নহে, প্রাতঃকালে উঠিতেও দেরী করিয়া থাকে। বিশেষ কোন মাচের (প্রতিযোগিতায় খেলা) বন্দোবস্ত থাকিলে পৃথক কথা, কিন্তু সাধারণতঃ ১০।১৫ মিনিটের অধিক কাল খেলিতে দিবে না।

অঙ্গ সঞ্চালন।—ব্যায়ামে যাহাতে সর্কাসের পরিচালনা হয় একরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বার ব্যায়ামে কেবল হস্ত ও বক্ষঃস্থলের পেশীর চালনা হয়। ফুটবলে পায়ের অধিক সঞ্চালন হয়, ক্রিকেটে বাহুস্থলের। কুস্তি, ডন প্রভৃতি ভূব্যায়ামে নানারূপ অঙ্গের সঞ্চালন হইয়া থাকে। এই ক্ষণ ব্যায়ামের রুটিন প্রস্তুত করিবার সময়,

পর্যায়ক্রমে সাহায্যে সকল অঙ্গেরই উপযুক্তরূপে সঞ্চালন হইতে পারে, সেরূপ বিধান করা উচিত । সাধারণতঃ কেবল বার ব্যায়াম অভ্যাস করে, তাহাদিগের বাহ্য ও বক্ষের পেশী সমূহ বেশ শক্ত ও সবল হইয়া থাকে, কিন্তু পায়ের পেশীগুলি বড়ই ক্ষীণ দেখায় । আবার সাধারণতঃ কেবল সাইকেল অভ্যাস করে, তাহাদিগের পায়ের পেশী সমূহ বেশ শক্ত ও সবল হয় বটে, কিন্তু বাহ্য ও বক্ষস্থল ক্ষীণ প্রাপ্ত হয় ।

ব্যায়ামের বিভাগ ।—ব্যায়ামাদি সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত (১) শক্তি সাপেক্ষ (২) সহন সাপেক্ষ (৩) কৌশল সাপেক্ষ (৪) ক্ষিপ্ততা সাপেক্ষ ।

(১) যে সকল ব্যায়াম বা কার্যে যথেষ্ট পরিমাণ বলের আবশ্যক হয়, তাহাই শক্তি সাপেক্ষ । বড় বড় পাথর উচ্ছে উত্তোলন করা, নিজের স্বাক্ষের উপর অনেকগুলি বালককে একসঙ্গে দাড়া করান, বাঁশের ছুইদিকে আট দশটি ছেলে ঝুলাইয়া সেই বাঁশ ঘূর্ণন, ভারী লৌহ বল বা মুদগর উচ্ছে ফেপণ প্রভৃতি ব্যায়াম বিশেষ শক্তি সাপেক্ষ । ইহাতে পেশী সমূহের উপরে যে পরিমাণ জোর লাগে, তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, ও অণেকের অন্ত রক্ত সঞ্চালনও বন্ধ হইয়া পড়ে । বালকগণের পেশী সমূহ যেরূপ দুর্বল, তাহাতে এরূপ ব্যায়ামের অনুশীলনে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । এই কারণে শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিধানে বর্জনীয় ।

(২) অধিক প্রমের কার্য না হইলেও, যদি অনেক ক্ষণ এক কার্য পরিচালনা করা যায়, তবে তাহাতেও অবসাদ আসিয়া পড়ে । অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা কার্যের কষ্ট সহ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে সহন সাপেক্ষ বলে । সাধারণতঃ হাঁটিবার সময় আমরা কোনরূপ কষ্ট বোধ করি না, কিন্তু যদি দূরদেশে অধিকক্ষণ হাঁটিয়া যাইতে হয় তবে কষ্ট বোধ

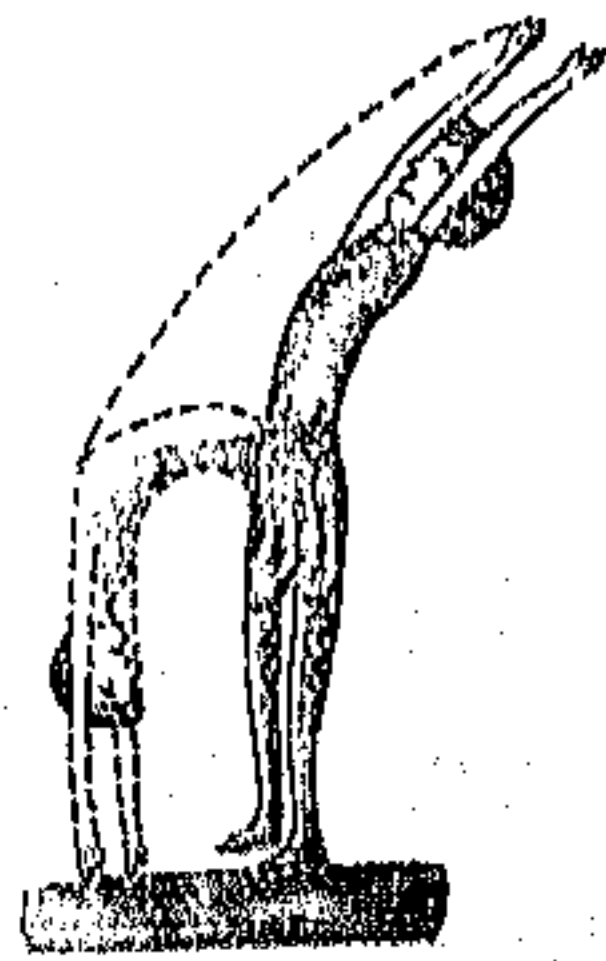
হয় । বালকগণের মধ্যে অনেকগণ এক কার্যে শক্তি নিয়োগ অহিত-
কর । মধ্যে মধ্যে শক্তির পুনঃ সঞ্চারের জন্য বিশ্রাম আবশ্যিক । এই
জন্য সহন সাপেক্ষ ব্যায়ামাদিও বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত নয় ।

(৩) যে সকল ব্যায়ামে কৌশলের আবশ্যক হয়, সে সকল ব্যায়ামও
বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত নহে । কৌশল দেখাইতে হইলে মস্তিষ্কের
পরিচালনা আবশ্যিক । বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাদির অনুশীলন দ্বারা কেবল
যে বালকগণের শক্তি বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য তাহা নহে, মানসিক বৃত্তি
গুলিকে বিশ্রাম দেওয়াও ইহার অপর উদ্দেশ্য । সর্প গতি, গবাক্ষের
মত অঙ্গ স্থানের মধ্য দিয়া লক্ষ প্রদান করিয়া গমন করা, দড়ির উপর
ভ্রমণ, বলের উপর নৃত্য, ছুইটা বোতলের উপর ময়ূর হওয়া প্রভৃতি
অনেক পরিমাণ কৌশল সাপেক্ষ । বিদ্যালয়ে এ সমস্তের চর্চা করা
কর্তব্য নহে ।

(৪) যে সকল ব্যায়ামে ঘন ঘন ও অতি দ্রুতবেগে অঙ্গ সঞ্চালন
করিতে হয় তাহাকেই ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়াম বলে । শক্তি সাপেক্ষ ও
ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামের দ্বারা অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ শরীর
সঞ্চালন হইয়া থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে শক্তি
সাপেক্ষ ব্যায়ামে এক সঙ্গে ও বিনা বিরামে পেশী সমূহকে অধিকগণ
সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে হয় ; কিন্তু ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামে ঘন ঘন
বিরাম ও সঞ্চালন হেতু, পেশী সমূহও ঘন ঘন সঙ্কুচিত ও প্রসারিত
হইয়া থাকে । এই হেতু শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়ামে যত শীঘ্র ক্রান্তি উপর
করে, ক্ষিপ্ৰতা সাপেক্ষ ব্যায়ামে তাহা করে না । এই কারণে ক্ষিপ্ৰতা
সাপেক্ষ ব্যায়ামই বিদ্যালয়ের পক্ষে উত্তম । দৌড়, লক্ষ প্রভৃতি
যাহাতে হস্ত পদাদি দ্রুত সঞ্চালন করিতে হয় অরূপ ভূব্যায়াম ক্ষিপ্ৰতা
সাপেক্ষ । এই সকল ব্যায়ামে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গের সঞ্চালন হয়,
অল্প সময়ে খুব কম ক্রান্তি বোধ হয়, বালকগণের স্বভাব সুলভ

চপলতা এসমস্ত ব্যায়ামের মহত্ব হয়, এবং সমস্ত অঙ্গের সমন্বয় সম্ভব হয় । আবার এইরূপ ব্যায়ামে বিরাগের প্রচুর স্বেদোৎপাদিত হয় ।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ।—আজ কাল চিকিৎসকেরা বক্ষঃস্থলের উন্নতি বিধানের জন্য পুরক (ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিয়া লওয়া) রেচকের (ধীরে ধীরে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করার) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও উন্নত হইলে অনেক ছত্রাঙ্গাঙ্গী রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয় । ব্যায়ামশিক্ষাদানের কিছু পূর্বে কোন কোন বিদ্যালয়ে ২৩ মিনিট পুরক ও রেচক করান হইয়া থাকে । পুরক ও রেচকের এইরূপ প্রণালী :—



১২ চিত্র । পুরক রেচক ।

১ম) মাথা নীচু করিয়া, দুইহাত প্রসারণ পুরক ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিতে আরম্ভ কর ও সঙ্গে সঙ্গে হাত ও মাথা উঁচু করিতে করিতে মাথা পশ্চাতে যতদূর হেলাইতে পার তাহা কর ।

(২য়) তার পর ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও হাত নামাইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববৎ মাথা হেট কর । দুই অবস্থাতেই হাত ও মাথা একপাশে একসঙ্গে সম্মিলিত হইবে যে হাতের অঙ্গ ভাগের উপর যেন সকল সময়েই চক্ষুর দৃষ্টি থাকে ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা আর এক উপকার এই হয় যে কোন কার্যে সহসা ক্লান্তি বোধ হয় না । যে সমস্ত ব্যায়ামাঙ্গীলনে অগ্নিকের জ্বল ও শ্বাসের কার্য বন্ধ করিতে হয়, সে সমস্ত ব্যায়ামে বক্ষঃস্থলের উন্নতি হইয়া থাকে । কিন্তু বক্ষঃস্থলের উন্নতি বিধানের পক্ষে ধাবন (দৌড়ন) মেরূপ হিতকর মেয়াদ আর কোন

ব্যায়াম নহে । আমাদিগের দেশীয় খেলা হাডু-ডুডু এ বিষয়ে ক্রিকেট ফুটবল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত । হাডু-ডুডু বক্ষঃস্থলের প্রশস্ততা বৃদ্ধির সাহায্য করে ।

ড্রিল বা দেশী ব্যায়ামের মধ্যে যে গুলিতে হাত উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার রীতি আছে, তাহাতে মস্তকও সঙ্গে সঙ্গে হেলাইয়া হাতের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক ।

আমাদিগের সেক্রেটারিয়েট প্রেস হইতে প্রকাশিত ব্যায়ামশিক্ষা পুস্তকের অন্তর্গত, দ্বিহস্ত নিহর, হস্তপদ প্রসারণ মুখাবর্তন নিহর ও ও নিশান ডন নামক ব্যায়ামত্রয় এইজন্ত কিছু অসম্পূর্ণ । এই সকল ব্যায়ামে “এই অবস্থায় মস্তক গোজা ও দৃষ্টি কোন দূরবর্তী পদার্থের উপর রাখিবে,” কেবল এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, হাত উত্তোলনের সঙ্গে মস্তক হেলাইয়া হস্তের অগ্রভাগ দেখিবার ব্যবস্থা করিলে, এইগুলির অনুশীলনে বক্ষঃস্থলের উন্নতির সহায়তা হইতে পারে । এইজন্ত ডম্বেল ব্যায়ামে হাত উত্তোলনের সঙ্গে, চক্ষু হাতের অগ্রভাগে বিচলিত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় ।

ব্যায়ামের প্রকার—ব্যায়ামের বহু প্রকার আছে, তন্মধ্যে যে গুলি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যে প্রচলিত, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

- ১। খেলা—কানা মাড়ি, পাগানটুট, হাডুডু ।
- ২। ধাবন—দৌড়ন, লগান, উল্লঙ্ঘন, একপায় গমন, নিতম্ব স্পর্শ দৌড়, বৈঠক দৌড় ।
- ৩। ভূম্যায়াম—নিহর, বৈঠক, ও ডন (হস্তগানডন, পার্শ্বডন, একপদডন, হিমোলডন, একহস্ত ডন, শরীর উত্তোলনডন, ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের জন্ত নয়)
- ৪। ড্রিল ও মার্চ (মার্শবৃত্তি ড্রিল পুস্তক হইতে)
- ৫। বিলাতি খেলা—ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ।
- ৬। বার ব্যায়াম—পারেলোলবারে—দোলন, বারক্লিয়ার, সিঙ্গলমার্চ, ডবলমার্চ ।
হরাইজন্টেলবারে—ওঠা নাচা, লেগ গ্রাইন্ডিং, মাসল গ্রাইন্ডিং (১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্কের জন্ত নয়)

৭। উল্লেখ—সাতোঁ সাহেব প্রণবিত ৮ নকশের বায়াম (শেখ ও নকশ ১৪ বৎসরে নিম্ন বয়স্কের জন্য নয়)

বায়ামের রুটীন ।—শিক্ষক সংখ্যা বেশী থাকিলে প্রত্যেক ঘণ্টার পরে ৫ মিনিট করিয়া ড্রিল করান মন্দ নহে । কিন্তু যেখানে শিক্ষকের সংখ্যাকম ও যেখানে এক সঙ্গে সকলকে ড্রিল করাইতে হয়, সেখানে সময় নির্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় । স্কুলের কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে ড্রিল বা ব্যায়াম করান নিষেধ । বালকেরা খাইয়াই স্কুলে আসে, এ অবস্থায় ভরা পেটে ব্যায়াম করাইলে পেটের ব্যথা ও মাথার ব্যথা হওয়ার খুব সম্ভাবনা । বিদ্যালয়ের পরেও ব্যায়াম করাইতে নাই—সে সময়ে বালকেরা সমস্ত দিনের মানসিক শ্রম ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে । প্রথম তিন ঘণ্টা কার্যের পর—টিফিন ঘণ্টার অব্যবহিত পূর্বে, ড্রিল ও ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় ; ব্যায়ামের পরেই বালকেরা টিফিনের বিশ্রাম পাইবে । বড় বড় স্কুলে ড্রিলের জন্য পৃথক গৃহ থাকে । যেখানে এরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানে ড্রিলের স্থানের পূর্বে ও পশ্চিম দিকে কতক গুলি গাছ লাগাইয়া দেওয়া আবশ্যিক । তাহা না করিলে দ্বিপ্রহরের প্রথর রোদে বালকগণের কষ্ট হইবে । কেহ কেহ বলেন যে এরূপ একটু রোদবৃষ্টি সহ্য করিতে অভ্যাস করাট বরং বাঞ্ছনীয় ।

ড্রিল ও ব্যায়ামের জন্যও একটা রুটীন করিয়া রাখা আবশ্যিক । প্রত্যহ যাঁহাতে সকল অঙ্গের সঞ্চালন হইতে পারে রুটিনে সে বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কিন্তু আবার প্রত্যহ যাঁহাতে কেবল এক নকশ ব্যায়ামের অনুশীলন না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । নিম্নে রুটিনের একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল । ড্রিল ও ব্যায়াম শিক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হয় সেই সকল পুস্তক দৃষ্টে ব্যায়ামের নথর গুলি বসাইয়া লইবে ও নিজ নিজ অবস্থা দৃষ্টে পরিবর্তন করিয়া লইবে :—

নিম্নবিভাগ (১৪ বৎসরের নিম্ন) ।

- সোমবার—বাহির নিমিত্ত নিহর, পদের নিমিত্ত বৈঠক ।
 মঙ্গলবার—গার্পের পুস্তক হইতে অমুক অমুক নথর ডিল ।
 বুধবার—দৌড় (১০০ গজ) হরাইজন্টাল বারে মৌলন ।
 বৃহস্পতিবার—অগ্নান, উল্লঙ্ঘন এবং প্যারালালে মৌলন ।
 শুক্রবার—ডম্বেল (প্রথম তিন প্রকার), একপায় দৌড় ।
 শনিবার—ক্রিকেট, ফুটবল বা হাডুডু ।

উচ্চবিভাগ (১৪ বৎসরের উর্দ্ধ) ।

- সোমবার—প্যারালাল বারে সিঙ্কল বা ডবল মার্চ (একবার),
 হরাইজন্টাল বারে লেগ্, গ্রাইনডিং (৩ পাক),
 একপ্রকার মার্চ বা চা'ল ।
 মঙ্গলবার—ডম্বেল (২ রকমের কঠিন), ডন (একরকমের ৩ বার),
 ডিলের টরগিং (২ রকমের),
 বুধবার—নিহর (২ প্রকার), নিতম্পর্শ দৌড় (২৫ গজ),
 বৈঠক (২ প্রকার) ।
 বৃহস্পতিবার—হরাইজন্টাল বারে ওঠা (২ প্রকার), সাধারণ
 দৌড় (১০০ গজ), প্যারালাল বারে ডন (১ প্রকার) ।
 শুক্রবার—চা'ল (বুদ্ধিক চা'ল প্রভৃতি একরকম), ডম্বেল
 (সহজ ২ রকম), অগ্নান ও উল্লঙ্ঘন এক পায়ে ও গৌড়পায়ে ।
 শনিবার—ক্রিকেট, ফুটবল, হাক, হাডুডু ।

গ্রীষ্ম বা পূজা উপলক্ষে বিদ্যালয়ের বন্ধের সময়, এমন কি রবি-
 বারেও ব্যায়াম চর্চা বন্ধ করা প্রাস্থ্য বিরুদ্ধ । তবে রোগগ্রস্ত হইলে কি
 অথবা কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে, বন্ধ করা যাইতে পারে । নিহর,
 বৈঠক, ডন, ডম্বেল প্রভৃতি ব্যায়াম যখন শরীর গৃহেও অভ্যাস করা

যাইতে পারে, তখন কোনরূপ অসুবিধার কারণ নাই । খোঁহান সাধারণ ডম্বেল অপেক্ষা কাঠের ডম্বেল ভাল ; এক ঘোড়ার দাম ১৮ আনা । অভাবে একখানি দেড় ঠিক মোটা, ৬৭ ঠিক দামা গোল কাঠ বা বাশ হঠনোও চলিতে পারে । বীতিমত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায়, কি কেবল প্রাতে ৮।১০ মিনিট করিয়া এইরূপ ব্যায়াম করিলে বৃদ্ধও সবল হইয়া থাকে । দুর্বল লোকের পক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দ্রুত ভ্রমণ উত্তম ব্যায়াম ।

অন্যান্য কথা ।—খেলার মাঠের নিকটে একজন শিক্ষকের থাকা আবশ্যিক । তিনি বালকদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না বটে, কিন্তু ইহাতে এই ফল হইবে যে বালকেরা কোনরূপ অসভ্যতা করিতে সাহস করিবেন না । বিলাতে খেলার মাঠে বালকেরা ওয়াটারলুব বুদ্ধ জয় করে, কিন্তু আমাদিগের হতভাগ্য দেশে এই খেলার মাঠেই অনেক বালকের সর্বনাশ হয় । এই খেলার মাঠেই খেলার উপলক্ষ করিয়া নানারূপ বদকার্যের অনুশীলন করে । যদি কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকিতে না পারেন, তবে উচ্চ শ্রেণীর কোন সচ্চরিত্র বালকের উপর ভার দেওয়া মন্দ নহে ।

বালকেরা যাহাতে সন্ধ্যাব প্রদীপ জ্বলাইবার পূর্বেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে, এইরূপ সময়ে খেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে । সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকিতে দিলে নানারূপে চরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে ।

বিদ্যালয়ের বালকদিগের সঙ্গে বাহিরের লোককে খেলিতে দেওয়া উচিত নহে । তবে মাচকি টুর্নামেন্টের সময় কোনরূপ আপত্তি না করিলেও চলিতে পারে । শিক্ষকগণ সময় সময় বালকগণের খেলায় যোগদান করিবেন ।

সাধারণ পরীক্ষার পরে, ব্যায়ামের পরীক্ষা উপলক্ষ করিয়া

অভিভাবক ও অন্যান্য ভ্রাতৃদোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে ব্যায়ামানু-
শীলনে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হইবে ।

কিন্তু এককথা মনে রাখা উচিত যে শারিরীক বৃত্তির অতিরিক্ত
অনুশীলনের উৎসাহ দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে । ব্যায়ামেব
উদ্দেশ্য কেবল শরীর সুস্থ ও সবল রাখা, আর শরীর সুস্থ বাধিবার উদ্দেশ্য
মানসিক শক্তির উন্নতিপথ উন্মুক্ত রাখা । বিদ্যালয়ে মানসিক বৃত্তির
অনুশীলনকেই প্রাধান্য দিতে হইবে । এইজন্য যে বালক পড়াশুনার
ভাল নয়, তাহাকে কেবল ব্যায়ামাদির জন্য পুরস্কার বা উৎসাহ দেওয়া
সঙ্গত নহে । আবার যে বালক ব্যায়ামাদির সাধারণ রূপ অনুশীলনেও
অপটু, তাহাকে কেবল পড়াশুনার জন্য পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত
নহে । দুই দিকেই চাই, তবে মাত্রার কম বেশী ।

২ । স্বাস্থ্যরক্ষা ।

বিদ্যালয়ে ।—(১) স্কুলের ঘর ও ঘরের চারিদিক বেশ পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে । বিদ্যালয় গৃহে বালকগণের প্রবেশ করিবার
অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে, ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি খুলিয়া দিতে
হইবে । ইহাতে দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে । আর
বিদ্যালয়ের ছুটি হইবার অন্ততঃ অর্ধঘণ্টা পরে বিদ্যালয়ের দরজা জানালা
বন্ধ করিতে হইবে । তবে সামান্য খড়ের ঘরে এ ব্যবস্থা না করিলেও
চলে । ঘরে উত্তমরূপ আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রাখা আবশ্যক ।

(২) কলকেরা বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া কি
খেলায় ক্লান্ত হইয়া জল খাইতে দৌড়ায় । কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিলে
জল খাইতে দিবে না । উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য ।
অভাব পক্ষে কলগী ফিটার করিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হইবে ।

(৩) একসঙ্গে তিন ঘণ্টার অধিককাল একরূপ ভাবে বসিয়া থাকিলে মেরদণ্ডে বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্য ৩ ঘণ্টা পর টাফিন কি শ্রেণী পরিবর্তন কি দণ্ডায়মান করাইয়া কোন কার্য করান কর্তব্য। অনেকক্ষণ দাঁড়া করাইয়া রাখা, নীলডাউন করা প্রভৃতি শাস্তি স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ।

(৪) বিদ্যালয় গৃহে থুথুফেলা সম্পূর্ণরূপ নিষেধ করা কর্তব্য। ডাক্তারগণ প্রমাণ পাইয়াছেন, থুথু হইতেই অনেক রোগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কোন বালককে ময়লা কি ভূগর্ভস্থ কাপড় পরিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেনা।

ছাত্রাবাসে বা হোষ্টেলে।—বালকেরা অনেক সময় জ্ববাণ্ডাণ্ডাণ্ডের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, মূল্যের স্বল্পতার দিকে দৃষ্টিকরে এইজন্য কখন কখন তাহারা অতি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া নিজে রোগগ্রস্ত হয় ও অপরকেও রোগগ্রস্ত করে। হোষ্টেলের অধ্যক্ষকে খাদ্য দ্রব্যাদির উত্তমত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল বালকগণের ধূমপান রোগ প্রবল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহারও প্রতিবিধান আবশ্যক।

(২) এক বিছানায় একজনের অধিক লোকের শয়ন স্বাস্থ্যে বিরুদ্ধ। বিছানার চাদর, বালিশের খোল প্রভৃতি অন্ততঃ ১৫ দিন পর একবার উত্তমরূপ ধৌত করা আবশ্যক।

(৩) ঘরে থুথু ফেলা, ঘরের নিকট প্রস্রাব করা, তক্তোপোষে নীচে ছেঁড়া কাগজ ফেলা, স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিজনক। পাকা মেঝে হইলে, অন্ততঃ মাসে একবার উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে, কাঁচ হইলে নিকাঁহিতে হইবে। বালকেরা যাহাতে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও দ্রব্যগুলি বেশ গোছ গোছ করিয়া রাখে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

(৪) বালকেরা যাহাতে সমস্ত কার্যই নিয়মিত সময়ে নির্বাহ করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময়, স্নানের সময়, আহারের সময়, সন্ধ্যায় পাঠে বসিবার সময় ঠিক থাকা উচিত। কোন কোন হোষ্টেলে এই সমস্ত সময় জ্ঞাপন করিয়া ঘণ্টা দেওয়া হইয়া থাকে। অধিক রাত্রজাগরণ এবং দিবা নিদ্রা নিষিদ্ধ।

সংক্রামক রোগে।—হোষ্টেলে, রোগীর জন্য একটি পৃথক ঘর রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কোন রূপ সংক্রামক রোগ হইলে, রোগীকে অন্যত্র পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। বিশেষ বসন্ত ও গোগে এই রূপ ব্যবস্থা করা নিতান্তই কর্তব্য। খোস, পাচড়া, দাদ প্রভৃতি রোগ-গ্রস্ত বালকের সহিত অন্য বালককে মিশিতে দিবে না। সংক্রামক রোগ-গ্রস্তকে স্কুলেও আনিতে দিবে না। এমন কি যে বালকের বাড়ীতে কোনরূপ সংক্রামক পীড়া হইয়াছে, তাহাকেও স্কুলে আনিতে দিবে না। বালকদিগের সংক্রামক পীড়া হইলে কতদিন পর্যন্ত তাহদিগকে ছুটি দিতে হইবে তাহা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে :—

রোগ	যতদিন পর্যন্ত সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।	পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও যে কয়দিন সে বিদ্যালয়ে আসিবে না।

চোক উঠা	৭ হইতে ১৫ দিন, যে পর্যন্ত চোখের জলপড়া বন্ধ না হয়	৭ দিন।
গাল ফুলা	৭ হইতে ১৫ দিন।	ঐ
গলায় ক্ষত—	ঐ	ঐ
হপিকানি—	যে পর্যন্ত কাশি না সারে।	১৫ দিন।

হাত (কোদা, মুতি, পেরা)—১৪ হইতে ২১ দিন,

১৪ দিন ।

যে পর্য্যন্ত গাজের শুষ্ক খোলস

না পড়িয়া যায় ও কাশি না সারে ।

এই শুষ্ক খোলসেই নোগ

বিস্তার করে ।

জলবদন্ত—

৩ হইতে ৫ সপ্তাহ—

ঐ

যে পর্য্যন্ত সমস্ত শুষ্ক খোলস

ঝড়িয়া না পড়ে ।

বদন্ত—

যে পর্য্যন্ত না সারে ও

২১ দিন ।

শরীরের গর্ভগুলি পুরিয়া উঠিতে

আরম্ভ না করে ।

আকস্মিক বিপদে ।—হাত কাটা, পা ভাঙ্গা, জলে ডোবা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি নানারূপ আকস্মিক বিপদ ঘটয়া থাকে । বিপদ কঠিন হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হইবে । তবে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে সময় পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে নিয়ে তাহাই লিখিত হইল :—

কাটা ।—ছুরিতে সামান্য রূপ হাত কাটিয়া গেলে একটা জলপট দিয়া বাধিয়া রাখিবে । গাঁদার পাতা (অভাবে ঘাস) খেতলাইয়া সেই পাতা কাটার উপর চাপিয়া বাধিয়া দিলেও রক্তপড়া বন্ধ হয় । রেড়ি তৈল বা কাঠেরঅইলে নেকড়া ভিজাইয়া কাটার উপর চাপিয়া দিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয় । কাটা ঘায়েব ভিতর কোনরূপ ময়লা কি কাচ ভাঙ্গা থাকিলে পূর্বেই বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে । তবে শিরাসিক ধমনী কাটিয়া গেলে বিপদের কথা । ইহাতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে আবশ্য হয় । ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যিক । ডাক্তার আসিবার পূর্বে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা, ক্ষত স্থানের উর্দ্ধদিকে (ধড়ের দিকে) ও একটু উপরে,

খুব কমিয়া একটা বাঁধ দিয়া রাখিবে ও ক্ষত অঙ্গকেও উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ধরিয়া থাকিবে । ঠাণ্ডা জলদ্বারা প্রায় সকল প্রকার কাটাতেই উপকারী ।

ভাঙ্গা ।—হাত, পা কি আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গেলে (ডাক্তার আসিবাব পূর্বে) সেই অঙ্গকে সরল ভাবে ধরিয়া একখানা পাতলা কাঠ কি বাঁশ কি লাঠী, তার পাশে দিয়া, নেকড়া দিয়া জড়াইয়া ফেলিবে ও সেই নেকড়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া দিবে । বোঁগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে । ভাঙ্গা অঙ্গ নাড়িতে দিবে না ।

মুচ্ছা ।—খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়া কি ব্যাট বা বলের আঘাত লাগিয়া অনেক সময় মুচ্ছা হয় । রোগীর গায়ের জামা চাদর খুলিয়া ফেলিবে । তাহাকে ছায়াবৃত্ত অথচ মুক্ত স্থানে চিৎ করিয়া শোয়াইবে । একটা বালিশ পাইলে ভাল, নচেৎ তাহার জামা চাদর প্রভৃতি দ্বারা বালিশ করিয়া মাথাটা একটু উঁচু করিয়া রাখিবে । চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিবে ও আঁস্তে আঁস্তে বাতাস করিতে থাকিবে । চারি দিকের লোকজন সরাইয়া দিবে ।

জলে ডোবা ।—মুচ্ছাতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় বোঁগীকে রাখিবে । শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তাহার বাহুদ্বয় একবার মস্তকেব দিকে টানিয়া আনিয়া, আবার বক্ষের উপরে ভাঙ্গিয়া ধরিবে । প্রতি চারি সেকেন্ডে এইরূপ প্রক্রিয়া যাহাতে একবার সম্পন্ন হইতে পাবে সেইরূপ ধীরতা এবং ক্ষিপ্ততার সহিত এই কার্য্য করিতে হইবে । সে পর্য্যন্ত রোগীর নিশ্বাস না চলে সে পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে । এক জনের হাত লাগিলে আর জনের উপর ভার দিবে । অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা এইরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যিক ।

আঙুনে পোড়া ।—যদি স্কুলে থাকে তবে ভাল, না হইলে নিকটের কোন বাড়ী হইতে চুণেরজন আর নারিকেলের তেল আনাইয়া একত্র

মিনাও । এঁই তেবে ন্যাকড়া ভিজাঠিয়া ঘায়েন উপর জড়াঠিয়া দিয়া, তান উপর তুলা ও জাকড়া দিয়া, কি কেবল ন্যাকড়া দিয়া বাদিয়া দাও । পূবে কি নিকটেই কোন বাড়াতে মোড়া (বাঁঠি কান) থাকিয়ে তহা জনে জুদিয়া দক্ষ স্থানে জাগাঠিয়া, তুলা ও ন্যাকড়ান দ্বারা জড়াঠিয়া দিলেও হয় । কিছু না জুটিবে কেবল ন্যাকড়ান দ্বারা জড়াঠিয়া রাখিবে । কথা এই যে, পোড়া ঘাগ কিছুতেই বাঁতাম লাগিতে দিবে না ।

মাপেকাটা ।—বিষাক্ত মাগে কাটিলে, তৎক্ষণাৎ অনস্থানে উপরে খুব কমিয়া ছুঁটী বাধ দিবে । ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া পাঠাইবে ।

ক্ষিপ্ৰকুরে কামড়ান । ক্ষতস্থান উত্তমরূপে মোত করিয়া কারবলিক বা নাইটিক এমিডেব দ্বারা পোড়াঠিয়া দিবে । আর নিকটেই থানায় বা সবভিভিসনে কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দখখাস্ত করিয়া রোগীকে কোমলী হাসপাতালে পাঠাইবান ব্যবস্থা করিবে । গরীব হইলে গভর্ণমেণ্টে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া থাকেন ।





দ্বিতীয় প্রকরণ—শিশুশিক্ষা বিষয়ক ।

১। কিণ্ডারগার্টেন ।



ব্দের অর্থ ।—কিণ্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষার প্রণালী বিশেষ । শিশুশিক্ষায় এই প্রণালী বিশেষ ফলপ্রসূ বহিয়া, সভ্য জগতের সর্বত্রই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে । কিণ্ডারগার্টেন জার্মান ভাষার শব্দ । কিণ্ডার অর্থ “শিশুগণ” আর গার্টেন অর্থ “উদ্যান ।” সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ “শিশুগণের উদ্যান” । বাঙ্গালী-ভাষায় এই কথাটির একটা প্রাতিশব্দ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইলে ‘বাল্যবাগ’ * শব্দের দ্বারা সে ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে । কিন্তু যখন এই প্রণালীর জন্মদাতা, তঁহাকে ‘কিণ্ডারগার্টেন’ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন আমাদের এই নাম ব্যবহার করাই কর্তব্য ।

এই প্রণালী অনুসারে শিশুশিক্ষার জন্ম প্রথমে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে উদ্যান সংলগ্ন করা হইয়াছিল । শিশুশিক্ষার পক্ষে এইরূপ উদ্যান অধিকতর আবশ্যকীয় দেখিয়া, সাধারণ লোকে

* ‘বাল্যবাগ’ না বলিয়া ‘নন্দনকানন’ বলিলে কেমন হয় ?—সঃ ।

শিশুগণের বিদ্যালয় না বদিয়া নতুন সমস্ত পাঠশালাকে 'শিশুগণের উদ্যান', এই নামে অভিহিত করিয়াছিল। পলাশীরা সৃষ্টিকর্তার স্নেহে এই নামেই নিজ প্রাণীকে অভিহিত করিয়াছিলেন। তবে তিনি এই কথাটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া একটা গুঢ় অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় উদ্যানস্বরূপ, বালকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঞ্জরূপ, আর শিক্ষক উদ্যানপাল। উদ্যানপাল বৃক্ষে পরিমিত সার প্রয়োগ করিয়া বৃক্ষের বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করে, শিক্ষক (বোর্ডিং স্কুলে) শিশুকে উপযুক্ত আহারাদি প্রদান করিয়া তাহার দেহের পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করেন *। উদ্যানপাল পরিমিত জল সেচন করিয়া বৃক্ষকে সরস করে, শিক্ষক সেইরূপ পরিমিত জ্ঞানবারি সেচন করিয়া বালকের মন সরস করিয়া থাকেন। উদ্যানপাল যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে না অর্থাৎ সে যেমন নিজ ইচ্ছামত বৃক্ষকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইতে ইচ্ছা করে না (ও করিলেও পারে না), সুশিক্ষক সেইরূপ শিশুর মন ও দেহকে (পরাক্রম্য পাপ করাইবার নিমিত্ত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে) শীঘ্র শীঘ্র অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বর্ধিত করিতে চেষ্টা করেন না। উদ্যানপাল যেমন অকালে ফলের প্রত্যাশা করেন না, সুশিক্ষকও সেইরূপ অকাল পক্কতা প্রত্যাশা করেন না। উদ্যানপাল যেমন বেড়া দিয়া বৃক্ষকে পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করে, শিক্ষকও সেইরূপ ধর্ম ও নীতির বেড়া দিয়া শিশুকে কু-সঙ্গীর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। অপরিমিত সার প্রয়োগ বশতঃ বৃক্ষের অপরিমিত বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে যেমন ফুল ফল জন্মে না; অপরিমিত অধুনা দ্বারা বালকের দেহ অতিরিক্ত পুষ্ট হইলে, তাহার বৃদ্ধি বিকশিত হইতে পারে না। অপরিমিত জল সেচনে বৃক্ষের মূল যেমন পচিয়া যায়, অপরিমিত

* সকল দেশেই কিওয়ার্গার্টেন শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান দানেও সেই রূপ বাণকের বুদ্ধির মূল (মস্তিষ্ক) নষ্ট হইয়া যায়। নানা জাতীয় বৃক্ষ প্রতিপালনের জন্য যেমন নানা রূপ ব্যবস্থার আয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাণকের শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার আবশ্যক। সুশেখর সহিত বাণকের এতদূর সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, বালক-সমগ্ৰিত বিদ্যালয়কে বৃক্ষ-সমগ্ৰিত উদ্যানের সহিত তুলনা করা সম্ভব হইয়াছে।

পেট্রোলজী।—দে প্রণালী এখন কিওয়ারগার্টেন প্রণালী বলিয়া পরিচিত, সে প্রণালীর প্রবর্তক, ফ্রিটজারগ ও নিবাসী পেট্রোলজী সাহেব। পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ সহজ শিল্প শিক্ষাও কর্তব্য, তাহা তিনিই প্রথমে নির্ধারণ করেন। দরিদ্র কৃষক সন্তান-গণের শিক্ষাতেই তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠের সঙ্গে কৃষি কার্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘতঃ বালকেরা বিদ্যালয়ের গৃহে পাঠাদির আয়োচনা করিত ও গীথে উদ্যানে কি কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম শিক্ষা করিত। তিনি মনে করিতেন যে বালকের পক্ষে নানাজানি উপার্জনকরা অপেক্ষা, উত্তমরূপে মদাচারী হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিতেন যে “বালককে সুন্দর ও পবিত্র পদার্থের প্রতি অনুরক্ত করিতে চেষ্টা কর,—তাহার জীবন ইহাতেই সমুন্নত হইবে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করিয়া দিলে, মানসিক প্রবৃত্তিগুলির কুকার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় নাই।” এইজন্য পেট্রোলজী বালকগণকে নানারূপে পবিত্রকার্য্যে-বাপ্ত রাখিতেন, পবিত্র বিষয়ে তাহাদিগের চিন্তাশ্রোত পরিচালিত করিতেন, এবং এতাহ তাহাদিগকে ভগবানের উপাসনায় নিয়োজিত করিতেন। শিক্ষাদান বাহাতে মানব মনের ক্রমিক বিকাশের সাধুবৃত্ত হয়, সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাই পেট্রোলজীয় প্রণালীর সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। (পেট্রোলজীর জন্ম ১৭৪৬, মৃত্যু ১৮২৭)

ফ্রবল্।—কিন্তু কিওয়ারগার্টেন প্রণালীর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা জর্জগদেগ নিবাসী ক্রোডারিক ফ্রবল্ সাহেব—তিনি পেট্রোলজীর নিকট শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা করেন এবং স্বল্প প্রদর্শিত প্রণালীর একরূপ আয়ত্ত সংস্কার করেন যে, এখন এই প্রণালী ফ্রবল প্রবর্তিত বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত। ১৮৩৭ খৃঃ তিনি এই নুতন প্রণালী মত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং তাহার এই নুতন প্রণালীকে কিওয়ারগার্টেন নামে অভিহিত করেন। (ফ্রবলের জন্ম ১৭৮৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৫২ খৃঃ)

কিওয়ারগাটেন প্রণালী কি ?—বালকগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা পানিচানিও করাই বিওয়ারগাটেন প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য । এণ্ডাও আড়নক পদার্থে, বালকগণের একটা স্বাভাবিক আশক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । সংসানে সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা খেদার সামগ্রীত বালকের নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম পদার্থ । আর সর্বকার্য অপেক্ষা খেদাও তাহা । সপ্তাপেক্ষা প্রিয়তম কার্য । সুতরাং এহ আড়া ও আড়নক আনকে বহিঃস্থনিয়মিত করিয়া, কোন উদ্দেশ্য-বিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত পোষণ করিতে পারা যায়, তবে বালকগণ জ্ঞানোপাঞ্জনজনিত কষ্ট বোধ না করিয়াই বিদ্যানাভ করিতে সমর্থ হইবে ।

বিমুশর্মা ।—এইরূপ স্বাভাবিক-প্রকৃতি-অনুসৃত শিক্ষাদানের পথ সুপ্রাচীন পণ্ডিত বিমুশর্মা কর্তৃকই সৰ্ব্ব প্রথমে নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । যখন বিদ্য রাজপুত্রকে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন) কোন শিক্ষক “বাল্যোত্ত শিক্ষাদিতে পারিলেন না, তখন রাজা বিমুশর্মাকে ডাকিয়া পাঠাতেন । পণ্ডিতপন্থ রাজপুত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজাকে ইহা বলিয়া সাবধান করিয়া দিখেন যে, “বিমুশর্মা যে রাজপুত্রের শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা যেন রাজপুত্র জানিতে না পানেন ।” পণ্ডিত দেখিলেন যে বালক কপোত পক্ষীর প্রাতি অধিক পরিমাণে অনুরক্ত । তাহার পূর্ববর্তী শিক্ষকগণ বালকের এই কপোতপ্রাতি নিবারণের নানারূপ চেষ্টা করিয়া বিফল সমোরণ হইয়াছেন । কিন্তু বিমুশর্মা বালকের এই কপোতপ্রাতি নিবারণ না করিয়া, বরং কপোতের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই যত্ন করিতে থাকিলেন । কপোত কয়, কপোত গৃহ নির্মাণ, কপোতের আহার সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিমুশর্মার বিশেষ যত্ন দেখিয়া বালক বিমুশর্মার প্রাতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল । এদিকে কপোতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের নামাকরণ করা আবশ্যক হইল । রাম, হরি, ইত্যাদিকণ নামাকরণও হইল । কিন্তু এহ বস্তু নামে কপোতকে ডাকিলে, রাজবাড়ীর ঐ নামযুক্ত ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইত । এই অসুবিধা নিবারণের জন্য বিমুশর্মা রাজকুমারকে অশ্রুপ নাম রাখিতে উপদেশ দিলেন । বালক, তাহার বস্তু (শিক্ষক নয়) বিমুশর্মার উপর সে কার্যের ভার অর্পণ করিল । বিমুশর্মা খন অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি একাক্ষরী নামে কপোতগুলির নামাকরণ করিলেন । রাজপুত্র

এই সমস্ত নতুন খেলা সহজ নাম যত্ন সহকারে অভ্যাস করিলেন । কিন্তু ইহাতেও কিছু অসুবিধা হওয়াতে, পায়রাডালকে সহজে চিনিমান নিমিত্ত তাহাদের গলায় ঐ সমস্ত নামের মাতৃত্তিক চিহ্ন (অ, ই, ঈ, ঐ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, ঍, ঔ) যত্ন টিকিট দিয়া দেওয়া হইল । বালক মিজের আগ্রহ ক্রিয়া টিকিটগুলি লিখিত, বিয়ু শর্মা পরিচালিত কবিতেন মাজ । তার পর কপোত-গণের জোড়া নিল কাঁচা করা, খেলা, ইত্যাদি দুই অক্ষর যুক্ত কথা ও তাহার লেখাও শিক্ষা দেওয়া হইল । তার পর কপোতের শাবক হইলে অমর, মদন ইত্যাদি তিন অক্ষর, অমর, মদন, পদতল প্রভৃতি চারি অক্ষর শব্দেও শিক্ষা হইতে লাগিল । এই প্রণালী ক্রমে নানাকপ অক্ষর শিক্ষা দেওয়া হইল । বালক কিন্তু এ পর্যন্ত মনে ভাবিতেছে যে একপ নাম ও সংকেত তাহাদিগেরই অপূর্ণ সৃষ্টি । এইরূপ মাতৃত্তিক চিহ্নে কপোতের নানাকপ বিবরণ, কপোতের আহাৰ বিহারের প্রণালী লেখিত ও লিখিত হইল । শেষে এই কপোতের গল্প উপলক্ষ করিয়া বালককে অতি অল্প সময়ে রাজনীতি পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইল ।—(হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র চিরদিন ইহার মাফা প্রদান করিতেছে)—তারপর একদিন রাজপুত্রকে রাজ সভায় উপস্থিত করাইয়া বিয়ু শর্মা রাজাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর করিলেন । বালককে তখন বিবিধ ধর্ম ও রাজনীতি প্রশ্ন পাঠ করিতে দেওয়া হইল । বালক অনাম্যাসে সেই সমস্ত পাঠ ও বাখ্যা করিতে লাগিল ।—কিন্তু তাহাদিগের লিখিত সংকেত অথো ক্রমে জানিতে পারিয়া ইহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইল । রাজা মস্তক হইয়া বালককে শিরঃচুম্বন করিলেন, ও বালকের নিকট বিয়ু শর্মার পরিচয় প্রদান করিলেন । বালক তখন অপ্রাপ্ত জোচনে বিয়ু শর্মার পদবুলি গ্রহণ করিয়া ও তাহান সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন । বিয়ুশর্মাসিনী প্রদত্তকে ফিরাইয়া এইরূপে অতীষ্ট পথে আশ্রয়ন করা যাইতে পারে ।

ঔষধ বাইতে কষ্ট হয় বলিয়া নানাকপ গিষ্ট ঔষধের ব্যবস্থা হইতেছে । তিস্ত ঔষধ চৌমের (ক্যাপসিউল) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে । দূরদেশে গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ জন্ত দ্রুতগামী রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের সৃষ্টি হইয়াছে । এইরূপ সমস্ত বিষয়ের কষ্ট নিবারণ জন্তই চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু বালক যে পুস্তক হাতে করিয়াই নয়নধারায় বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিত মেনিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না । লেখা পড়াকে সুখকর করিবার জন্ত এ পর্যন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই । মহাত্মা ফ্রবলই এই কার্যের অগ্রণী হইয়া শিশুশিক্ষার পথ বহুল পরিমাণে সুখকর করিয়াছেন ।

ফ্রবল প্রদর্শিত দ্বাদশ বিধান ।—বিভাবগার্টেন প্রণালী

মত কার্য্য করিতে হইলে শিক্ষকগণকে এই দ্বাদশ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। যেকোন ধর্ম্মভাব, ভগবানের মহিমা শিশুহৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে, শিশুর অন্তরে সেই ভাবের উদ্যোগ কনিয়া দিবে ও তাহান পোষণে এবং পরিবর্দ্ধনে সহায়তা কনিবে ।

২। ধর্ম্ম শাস্ত্রের যে সকল সরল শৌক বাক্যগণ মুগ্ধ করিয়া উপাসনা বন্দনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে মুগ্ধ করাইতে হইবে ।

৩। জ্ঞানোপার্জন, শরীর সঞ্চাদান প্রভৃতি কার্য্যকে মানসিক উন্নতি সাধনের সহায় বলিয়া মনে করিতে হইবে ।

৪। প্রকৃতি ও বাহ্য জগতের বিষয়ে শিশুর চিত্তা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে পরিচালিত করিতে হইবে ।

৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জীবগণের কাব্যাকাব্য বিষয়ক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কবিতা মুগ্ধ করাইতে হইবে, ও মনো মনো সরল স্বর সংযোগে মেজলি গান করাইতে হইবে ।

৬। মনের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবান শক্তি লাভের নিমিত্ত শিশুগণকে সাধু ভাষায় বাক্য রচনার অনুশীলন করাইতে হইবে ।

৭। বস্তুর আকারাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভার্থ আকার প্রকারের অনুশীলন আবশ্যক । কাদার দ্বারা জব্যাদির প্রতিকৃতি গঠন এই কার্য্যের যথেষ্ট সহায় ।

৮। চেক কাগজে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে ।

৯। নানা বস্তুর জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে ও সে সমস্তের ব্যবহার (কাগজে চিত্র অঙ্কন করিয়া) শিক্ষা দিতে হইবে ।

১০। সাধারণ খেলা বা কিতোরগার্টেন প্রথা নির্দিষ্ট খেলায় বালকগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে ।

১১। দিনের বা কাণের ঘটনান সহিত যোগ করিয়া গল্প, উপকথা, উপগ্রাস প্রভৃতি শুনাইতে হইবে ।

১২। শিশুগণকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী সুন্দর সুন্দর স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে ।

ক্রীড়ণক ব্যবহারে লক্ষ্য ।—কিওয়ারগাটেন প্রথা কেবল কতকগুলি ক্রীড়া ও ক্রীড়ণকেন সমষ্টি মাত্র । এই ক্রীড়া ও ক্রীড়ণকের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় সে দিকে দৃষ্টি না রাখিলে সমস্ত কার্যই বিফল । ফ্রবল এই চার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন :—

(১) বালকেরা স্বাধীনতা প্রিয়, সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে । তবে যাহাতে বিপথগামিনী না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যে কার্য তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহাদিগের দ্বারা একপ কার্য করান কখনই কর্তব্য নহে ।

নীতিবিগর্হিত বা অনিষ্টজনক কার্য বাতীত বালকের অন্য কোন কার্যে বাধা দেওয়া বিধেয় নহে । তাহাদিগের জন্য উত্তম উত্তম খেলার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে । ক্রীড়ণকগুলি যাহাতে তাহাদিগের মনোমত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যাহাতে সমস্ত ক্রীড়ণকগুলি তাহারা অবাধে ব্যবহার করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । প্রত্যেক পদার্থ যাহাতে বালকেরা ইচ্ছামত পদাঙ্গক করিতে পারে সে ব্যবস্থা করাও আবশ্যক ।

(২) বালকেরা ভাঙ্গা গড়া ভালবাসে । ধূলি বালি দিয়া তাহারা ইচ্ছামত ~~কি~~ গড়ে । এইরূপ ভাঙ্গা গড়া করিয়া শিশুগণ বস্তুর আকার, বর্ণ, কঠিনত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ কবে । সুতরাং বালকের ক্রীড়ণকগুলি এরূপ সুকৌশল সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যে, তাহা দ্বারা বালকগণ যেন নানারূপ ভাঙ্গা গড়া করিতে পাবে । কবি যেমন কবিতার দ্বারা, চিত্রকর যেমন চিত্রের দ্বারা, গায়ক যেমন সঙ্গীতের দ্বারা মানসিক

ভাবের বিকাশ করিয়া থাকেন, নানাবিধ জীবন অনুকরণে নানারূপ গঠনের দ্বারাও বালকগণ মনে-পাশে মনোমত ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে । ইহাতে উদ্ভাবনী শক্তির মণ্ডেই অনুশীলন হইয়া থাকে ।

অনেক অল্প বয়স্কের একরূপ বিশ্বাস যে বর্ণপরিচয়াদির শিক্ষা ভিন্ন অর্থহীন লিপিত পুস্তক বা মুদ্রিত পুস্তকাদির পাঠ ভিন্ন জ্ঞানোপার্জন অসম্ভব । কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে বাহ্য অঙ্গের যে সমস্ত বিবরণ লিপিত থাকে, তাহা যদি মুদ্রিত পুস্তক পাঠ না করিয়া বাহ্য অঙ্গরূপ বস্তু প্রকৃতি পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, তবে পুস্তক দ্বিত্ব বা অল্প বস্তুক সংগৃহীত জ্ঞানের আলোচনার আবশ্যকতা কি ? বালকেরা যাহাতে এই জ্ঞান সাফল্যে সম্বন্ধে ও তত্ত্ব জ্ঞান হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, আজ কাল সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্যই পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিতেছেন । কিংডারগার্টেন, পদার্থপরিচয় প্রভৃতি সেই চেষ্টার কিঞ্চিৎ ফল মাত্র ।

(৩) বালকেরা কার্য প্রিয়, সর্বদাই কোন না কোন কার্যে ব্যাপ্ত থাকিতে ভালবাসে । তাহাঙ্গুলি তাহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ । কিন্তু আবার এক প্রকার কার্যে অধিকক্ষণ, বা অধিকক্ষণে অল্প ও ক্ষুদ্র কার্য ভিন্ন অল্পরূপ কার্যে, মনোনিবেশ করিতে পারে না । খেলায় বালকের পক্ষে ক্ষুদ্র কার্য । বালকের স্বাভাবিক কার্যকারিণী হইলোকে সমা ব্যাপ্ত রাখিবার জন্য নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । আর সেই খেলাগুলি দ্বারা যাহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । উদ্দেশ্যশূন্য ও বিশৃঙ্খল খেলারও আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোনরূপ ফল লাভ হয় না । ফল সাধেব কর্তৃক রচিত ক্রীড়া ও ক্রীড়নক গুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ।

(৪) বালকের বৃত্তির ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খেলারও পরিবর্তন আবশ্যিক । জ্ঞানোপার্জনে, চক্ষুই প্রথমে অধিক কার্যক্ষম হইয়া থাকে । সেইজন্য প্রথমেই চক্ষুর সাহায্যে আকার, বর্ণ প্রভৃতির শিক্ষাবিষয়ক

খেলার আবশ্যিক । তৎপরে স্পর্শ—হস্তের সাহায্যে কঠিন, কোমল, কঠিন প্রভৃতির শিক্ষা । কমেজিয়ার মধ্যে আবার পদদ্বয়ই সর্বপ্রথমে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে । অতঃপর সে সকল ভঙ্গী-মঙ্গীতে বা খেলার পদ সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে, প্রথমে তাহাষ্ট আরম্ভ করা কর্তব্য । ইজিয়াদির এইরূপ ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষারও ক্রমিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করা আবশ্যিক । প্রবল বলিয়াছেন “ভগবান যাহা (দেহ, মন ও আত্মা) সংযুক্ত করিয়াছেন, মাছুয়ে যেন তাহা বিচ্ছিন্ন না করে ।” শিশু শিক্ষায় যাহাতে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । একতীর উন্নতি করিতে গিয়া যেন অন্যটী উপেক্ষিত না হয় ।

ইজিয়ার সাহায্যে শিক্ষার প্রণালী (অর্থাৎ কোন্টীর পর কোন্টীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সেই সেই ইজিয়ার সাহায্যেই বা কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে) বঙ্গদেশের ডিরেক্টর জীবন্ত পেডেলার সাহেব প্রদর্শিত (বঙ্গদেশের উপযোগী) কিংডারগার্টেন পদ্ধতি দৃষ্টে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিতে পারা যাইবে । তাহাও শিশু শ্রেণীর তিন মানের প্রচুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

(১) চক্ষুর সাহায্যে (রূপ)—

(ক) আকার বিষয়ক শিক্ষা—বেঁকা (বক্র) রেখা, সোজা (সরল) রেখা, একাধিক (কুটিল) রেখা ; গোলাকার পদার্থ ।

(খ) রঙ বিষয়ক শিক্ষা,—কাল ও সাদা পদার্থ ; হলুদ ও লাল পদার্থ ; নীল ও সবুজ পদার্থ ।

(২) হস্তের সাহায্যে (স্পর্শ)—

শক্ত (কঠিন) ও নরম (কোমল) পদার্থ ; খসখসে (বন্ধুর) ও তেল তেলে (মসৃণ) পদার্থ ; ভারি (ভার) ও হালকা (লঘু) পদার্থ ; ঠম্‌ক (ভঙ্গুর) ও ঠম্‌ক (ঘাতমহ) পদার্থ ।

(৩) জিহ্বার সাহায্যে (রস)—

সিঁঠা (মিষ্ট) ও টক (অম্ল) পদার্থ, ঝাল (কটু) ও তিতা (তিক্ত) পদার্থ, লোণ (লবণাক্ত) ও কষা কষায় (পদার্থ)।

(৪) কর্ণের সাহায্যে (শব্দ)—

নামাবিধ জীব জন্তুর শব্দের পার্থক্য, মধুর ও কবণ শব্দ, আনন্দের ও নিরানন্দের শব্দ, দূরস্থ ও নিকটস্থ শব্দ, উচ্চ ও মৃদু শব্দ।

(৫) নাসিকার সাহায্যে (গন্ধ)—

হৃগন্ধ ও দুর্গন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গন্ধ, মূরের গন্ধ ও নিকটের গন্ধ।

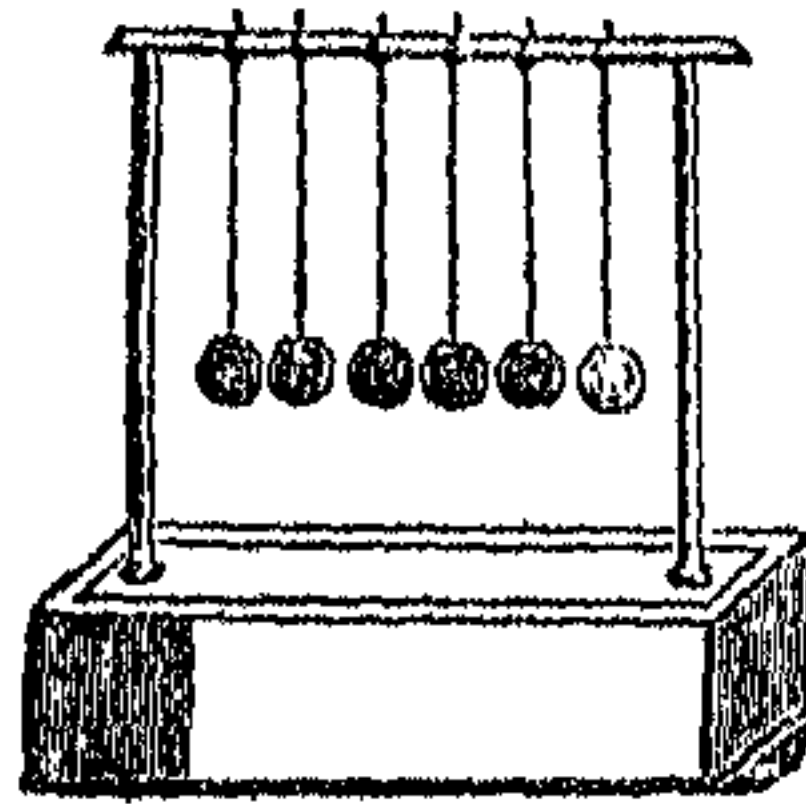
আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্যের এইরূপ ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন। যে প্রণালীতেই হউক ইতিমাদির বিকাশের সাহায্য করিতে হইবে। আর চক্ষুর কার্যই যে প্রথমে আরম্ভ করিতে হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

শিক্ষার সরঞ্জাম ।—কিওয়ারগার্টেন শিক্ষার সরঞ্জামগুলি অল্পব্যয়ে সংগ্রহ করা কঠিন। সুন্দর গৃহ, সুন্দর উদ্যান, সুন্দর ডেকা, চেয়ার, বেঞ্চ এবং বহু সুশিক্ষিত শিক্ষক আবশ্যিক। এক বিদ্যালয়ে ২০ জনের অধিক বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা কৰ্ত্তব্য নহে। স্ত্রী শিক্ষকগণই কিওয়ারগার্টেন শিক্ষার উপযুক্ত পাত্রী। শিশুশিক্ষায় যে পরিমাণ স্নেহ ভালবাসা ও দৈর্ঘ্যের আবশ্যক তাহা পুরুষের নিকট আশা করা যায় না। বিশেষ শিশুগণ শিক্ষককে মাতৃ মূর্তিতে দেখিলে বিদ্যালয়ের কার্য তেমন ভীতি জনক মনে করিবে না। ফ্রান্সে রচিত ক্রোড়নক গুলিও সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে মূল্যবান। আবার ক্রোড়নক গুলির ব্যবহারের যেকোন উৎকৃষ্ট প্রণালী, একটীর সঙ্গে অল্পটী যোগন সংশ্লিষ্ট, তাহাতে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কেবল পুস্তক পড়িয়াই তাহার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়া স্ককঠিন। আমাদিগের দেশে কিওয়ারগার্টেন বলিয়া যে প্রণালী প্রচলিত তাহা ফ্রান্সের প্রণালীর ছায়া মাত্র।

কিওয়ারগার্টেন ক্রোড়নক ।—ফ্রান্সে ২০ প্রান্ত গেলনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ক্রোড়নকগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য (১) নানারূপ আকারের

অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া (২) সংখ্যা, শৃঙ্খলা ও অক্ষুপাত শিক্ষা দেওয়া (৩) মৌলিক ও সমতা শিক্ষা দেওয়া । ১০ প্রান্তের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যবহার প্রণালী প্রদত্ত হইল । আমাদের বিদ্যালয় সমূহে এই ১০ প্রান্তের কিছু কিছু প্রচলন আছে ।

১ম খেলনা ।—একটা লম্বা বাঁক, তাহার ভিতর উলো মোড়া ছয় রঙের ৬টি রঙের বল—লাল, নীল, হলুদ তিনটি মূল রঙ, আর বেগুনে কমলা ও সবুজ তিনটি মিশ্র রঙ । এই ছয় রঙের ৬ গাছি সূতাও থাকে । আর তিনখান কাঠের কাঠী থাকে । দুইখান কাঠী বাঁকের উপর খাড়া করিয়া, আর একখানা তার উপরে আড়ের মত করিয়া আঁটিয়া



১০ চিত্র ।—নানা রঙের বল ।

দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ কতকগুলি ছিদ্র আছে । সূতার দ্বারা এই আড়ের সঙ্গে বল ছয়টি বুলাইতে পারা যায় ।

এই খেলনা খুব ছোট ছোট ছেলোদের (বয়স ৩৪ বৎসর) জন্য রচিত । রঙ, আকার ও সংখ্যা শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ।

এই প্রথম শিক্ষা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বালকদিগকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বার্তা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । শৃঙ্খলাশিক্ষাও এই সময়েষ্ট আরম্ভ করা হয় ।

এই বলের সাহায্যে নানারূপ খেলা শিখাইবার বিধান আছে । নিম্নে আদর্শ স্বরূপ কয়েক প্রকার খেলা বর্ণিত হইল ।—প্রথমে এক একটা বল লইয়া খেলা আরম্ভ করিতে হইবে । পরে বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে । সূতার সহিত বুলাইয়া বা আলাগা ভাবেও বলগুলির ব্যবহার করা যাইতে পারে । ছোট ছোট বালকদিগের শিক্ষায় এক

কথা পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক বিধায়, অনেক কণার পুনরাবৃত্তি
হইয়াছে ।

প্রথম পাঠ (উদ্দেশ্য)—বনের আকার শিক্ষা, শব্দের অর্থ উল্লেখ শিক্ষা
ও নতুন কথা শিক্ষা ।)

প্রণালী :—ছেগেদের মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা কাঠের বন্ড দাও । কি
এক জনের হাতের নিকট বন্ডগুলি রাখিয়া তাহাকে সেগুলি এক এক করিয়া চালাইয়া
শিক্ষা দেও । এই শৃঙ্খলাশিক্ষার আরম্ভ । শিশুগণকে বন্ডগুলি নিজ নিজ মন্থনে
রাখিতে বল । তার পর প্রফুল্ল বদনে স্থানীয় প্রণেয় দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ কর :—

আমাদের এই খেলার জিনিষ গুলির নাম কি ? বন্ড । আমার কাছেও একটা বন্ড
আছে, দেখেছ ? আসি আমার এই বন্ডটি হাতে লইলাস, তোমরাও তোমাদিগের মকলের
বন্ডগুলি হাতে লইয়া বলত "আমরা বন্ড হাতে করিয়াছি" । (শিশুগণের তক্ষণ করণ)
নিজের নিজের বন্ডটি বেশ করিয়া দেখ, বন্ডটি কেমন ? গোলা, ঠিক বণা, বন্ড যে
"আমাদের বন্ড গোলা" । (শিশুগণের তক্ষণ করণ) ।

বন্ডটি আর কেমন ? "নরম"—ঠিক কথা । সকলে বল যে "আমাদের বন্ড নরম"
(শিশুগণের তক্ষণ করণ) সকলেই নিজ নিজ বন্ড হাতে টিপিয়া দেখ, নরম কিনা
"আমাদিগের বন্ড নরম" । আচ্ছা বন্ডটি আবার দেখ । বন্ডটি কি দিয়া তৈয়ার করিয়াছে ?
"বন্ড উলে তৈয়ারী" । আচ্ছা বেশ, সরলা তার নিজের বন্ডের আর কি কথা বলিতে পারে
দেখা যাউক । "নীল" । "নীল" না বলিয়া "এই বন্ডটি নীল" এইরূপ বল । তারপর
সরলার বন্ডের রঙের সঙ্গে আর সকলের বন্ডের বর্ণ মিল করিয়া দেখিতে বল "এক
রকম কিনা ?" "আমাদের বন্ড একরকম রঙের নয় ।" পুনরালোচনা—আমাদের
বন্ড গোলা । "আমাদের বন্ড নরম" "আমাদের বন্ড উলে দিয়া তৈয়ারী" "সরলার বন্ড নীল" ।
তারপর বন্ডগুলি একত্র করিয়া হাতে হাতে ফিরাইয়া দেও ।

২য় পাঠ (উদ্দেশ্য)—ডান হাত ও বাম হাত শিক্ষা দেওয়া । 'উপর নীচ' কথা
শিক্ষা দেওয়া) । প্রণালী—পূর্বপ্রণালীর মত এক একটা বন্ড হাতে লইলে—ছচারিটি
প্রণেয় দ্বারা পূর্ব দিনের পাঠের পুনরালোচনা করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে ।

আজ বন্ড দিয়া আমরা আর এক খেলা খেলিব । আচ্ছা, তোমাদের কয়খানা
হাত ? হাত তোলত ? (শিক্ষকের নিজের ও তক্ষণ করণ) আমার হাত নানাও ।
সরলার দিকে যে হাত সেই হাত তোল । আর এক হাতও তোল । দুই হাতের

ছই নাম । পরস্পর দিকে যে হাত তার নাম কি" ? "ডান হাত ।" "হ্যাঁ, ঠিক কথা, সকলে ডান হাত তোল ।" "আমরা ডান হাত তুলিয়াছি" । "ডান হাত মাথার উপর রাখ" । "আমরা ডান হাত মাথার উপর রাখিয়াছি ।" "ডান হাতে বল্ লও", "আমরা ডান হাতে বল্ নিয়েছি ।" "হাত নামাও, বল্ রাখ ।" তারপর বাঁ হাতেও এইরূপ অভ্যাস করাইবে ।

"আচ্ছা, রাখালের কোন হাতে বল্ আছে বলত ?" "ডানহাতে" । এইরূপ শিক্ষক ডান বাঁম জ্ঞান কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবেন । "বল্ টা টেবিলের উপর রাখ ।" "বল্ টা কোথায় আছে" ? "বল্ টেবিলের উপর আছে" । এইরূপ বেঞ্চের উপর রাখিতে বল । তারপর টেবিলের নীচে, তারপর বেঞ্চের নীচে ইত্যাদি শিক্ষা দাও । সকলেই বল্ ডান হাতে কর, আবার বাঁ হাতে কর ? আবার ডানহাতে কর । ইত্যাদি রূপে এক সঙ্গে কার্য করা শিক্ষা দাও । তারপর পূর্ববৎ বল্ গুলি একত্র করিয়া বাক্সে রাখিয়া দাও ।

অনেক বিদ্যালয়ে ছুটির সময় ডান বাঁম প্রভৃতি শিক্ষার সাহায্যার্থে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে ; সকলে ডান হাতে পুস্তক লও, সকলে বাঁম হাতে পুস্তক লও, ডান হাত উঠাও, ডান হাত নামাও, ডান হাতে পুস্তক লও, বাঁম হাত উঠাও, বাঁম হাত নামাও, দাঁড়াও, একে একে বাড়ী যাও ইত্যাদি ।



২৪ চিত্র ।—ডান বাঁম পরিচয় ।

তৃতীয় পাঠ ।—উদ্দেশ্য—নীলরঙ শিক্ষা দেওয়া । (কেহ কেহ প্রথমে লাল রঙ শিক্ষা দেওয়া ভাল মনে করেন আবার কেহ কেহ প্রথমে কাল ও মাদা শিক্ষা দেওয়াই

যুক্তিসম্মত মনে করেন। শিক্ষক নিজের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন।। এবিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নাই। আমরা এখানে নীল রঙ শিক্ষার আদ্য প্রদান করিলাম।)

প্রণালী :—পূর্বের মত বালকদিগের দ্বারা বর্ণগুলি সকলের হাতে হাতে বিতরণ করিয়া, পূর্ন পাঠের পুনরালোচনার পর, “যাহার হাতে নীল রঙের বর্ণ আছে, সে হাত তোল”। “আচ্ছা স্বধার বর্ণটা নীল কিনা বলত ?” “না এটা নীল নয়”। (তারপর স্বধার বর্ণটা নীলরঙের বলের পাশে রাখিয়া, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে বল) “যাহার যাহার নীল বর্ণ নাই, তাহারা এই বাগ হইতে এক একটা নীল বর্ণ বাহির করিয়া লও।” কেহ কেহ ভুল করিলে, তাহাদিগের ভুল বর্ণটা নীল রঙের বলের পাশে রাখিয়া ভুল সংশোধন করাইয়া দিবে। “সকলেই নীল বর্ণটা ডান হাতে লও, তার বল যে আমার ডানহাতের বর্ণটা নীল।” “আচ্ছা এই ঘরে নীল রঙের আর কোন জিনিস আছে?” “নদীর সাড়ীখানি নীল”। আকাশের রঙ কোন বর্ণের মত ? “আকাশের রঙ এই নীল বর্ণের মত।” (এখানে এক কথা বলা আবশ্যক। এই যে নীল বর্ণের কথা বলা হইতেছে, ইহা আকাশের মত নীল বর্ণের কথা অর্থাৎ আসমানী রঙের কথা ; গাঢ়নীল অর্থাৎ নীল-বড়ির মত রঙের কথা নহে) “কি রকম দিনোআমরা আকাশে বেশী নীল দেখিতে পাই?” “যে দিন মেঘাখাকৈ না, সেই দিন। আকাশ বেশ নীল থাকে”। তারপর আসমানী রঙের কাগজ, কাপড়, ফুল প্রভৃতি দেখাইয়া এই রঙটা বেশ করিয়া পরিচয় করাত। অত্যন্ত রঙের পরিচয় করাইবারও এই রীতি। রঙগুলি শিক্ষা দিবার সময়, রঙগুলি মিশাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। কোন্ কোন্ রঙ মিশাইলে কিরূপে কি রঙ উৎপন্ন হয় পরে লিখিত হইল।

চতুর্থ পাঠ।—ঝুলান বল। উদ্দেশ্য—ঝুলন ও ঘূর্ণন শিক্ষা দেওয়া।

প্রণালী—ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিষয় পুনরালোচনা করিয়া, শিক্ষক নিজহস্তস্থিত বল এক গাছি সূতা বাঁধিবেন। বালকগণকে তদ্রূপ সূতা বাঁধিতে শিখাইয়া দিবেন। তারপর নিজ হস্তস্থিত বলটা ঝুলাইয়া দিয়া—“বলটা কি করিতেছে?” “বলটা ঝুলিতেছে” “এ রকমে আর কি ঝুলিতে দেখিয়াছ ?” “দোলনায় করিয়া ছোট ছেলেকে এইরূপ ঝুলাইয়া থাকে”। “আর কি জান ?” “ঝুলনযাত্রা ও দোলার সময় ঠাকুরকে এই রকমে ঝুলান হয়”। “আর কোন জিনিসকে এরূপ ঝুলিতে দেখিয়াছ ?” “বড় বড় দোলন এইরূপে ঝুলিতে থাকে”। “যড়ির দোলন ঝুলিবার সময় কিরকম শব্দ হয়?” “টক্ টক্ শব্দ হয়”।

“তোমাদের বস্তুগুলি ঘড়ির ঘোড়ানের মত খুঁজাও” । তারপর বস্তুটি ঘুরাইয়া তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে ।

পঞ্চম পাঠ :—বনের বিষয় একটা ভঙ্গী-সঙ্গীত (ভঙ্গী-সঙ্গীত প্রকরণে এবিষয় বিশদীকৃত করা হইয়াছে) ।

প্রণালী :—হস্তের ভঙ্গী করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা সম্বন্ধে আবৃত্তি করিবে :—

বল্ গোল (১)

বেল গোল (২)

আর গোল (৩) গোলা (৪)

গড়িয়ে দিগে (৫)

গড়গড়িয়ে (৬)

অগ্নি তাদের (৭) চলা (৮)

(বেল গড়াইয়া দিগে, কেমন গড়াইয়া গড়াইয়া যায়, তাহা) বালকগণকে পূর্বেই একবার দেখাইতে হইবে ।) হস্তের ভঙ্গীর প্রকরণ :—

(১) ডান হাতে গোলায় আকার দেখাইয়া

(২) বাঁ হাতে “ “ “

(৩) (পুনঃ) ডান হাতে “ “

(৪) “ বাম হাতে “ “

(৫) ডান হাতে গড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গী করিয়া

(৬) বাঁ হাতে “ “

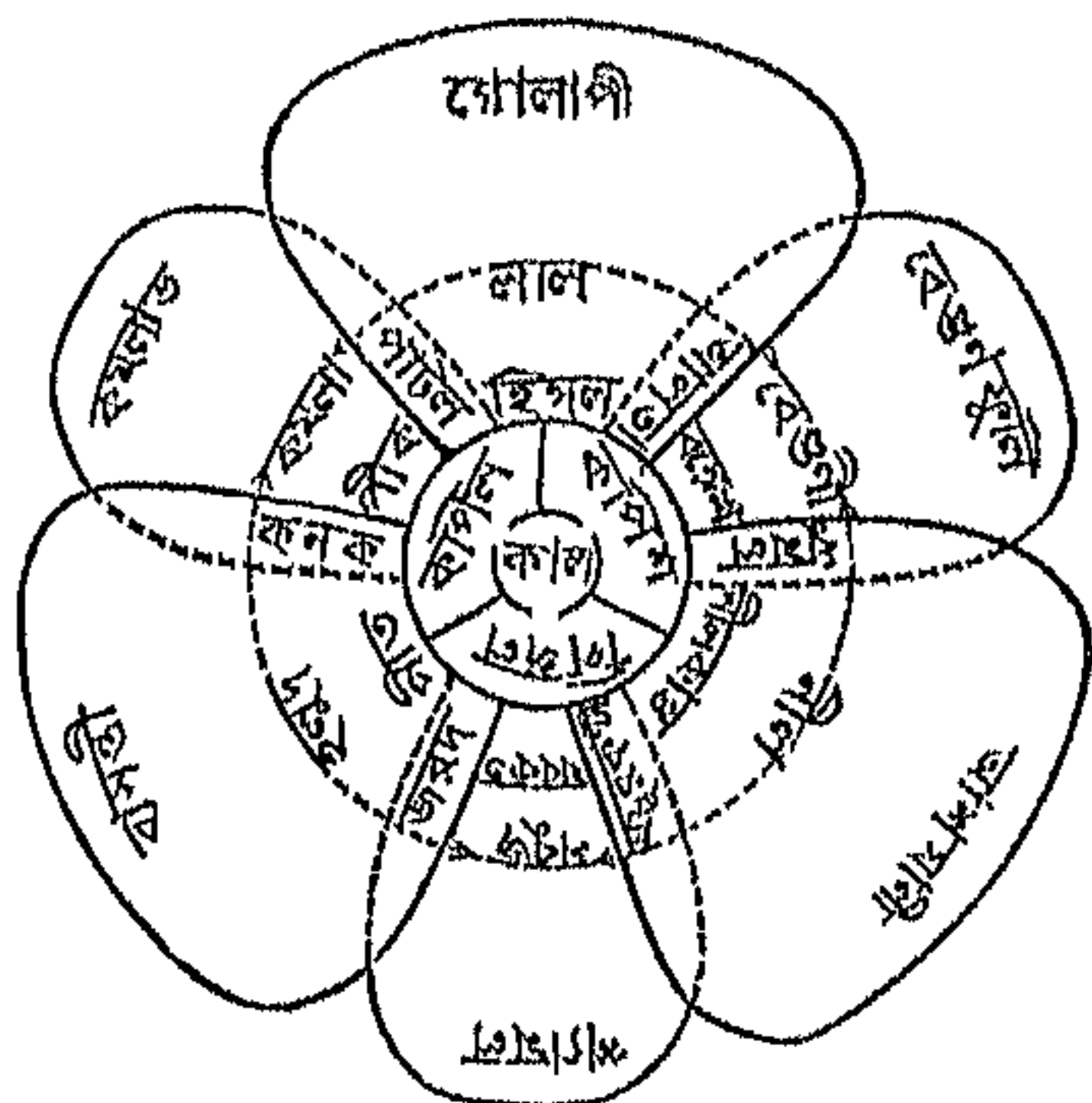
(৭) (পুনঃ) ডান হাতে “ “

(৮) “ বাম হাতে “ “

এইরূপ ভাবে বল্ উপগঙ্গ করিয়া বালকগণকে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । এই পাঁচ পাঠে প্রণালীর কেবল আভাস ও আদর্শ মাত্র দেওয়া হইল । শিক্ষকগণানিজেৰ সুক্ৰি পরিচালনা করিয়া এইরূপ নানা পাঠের সৃষ্টি করিতে পারিবেন ।

রঙের বিবরণ ।—কোনটা মূল রঙ, কোনটা মিশ্রিত রঙ, কোন রঙের সহিত কোন রঙের মিল করিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মিশ্র রঙের উৎপত্তি হয় তাহা শিক্ষকগণ নিজে উত্তমরূপ না জানিলে বালকগণকে শিক্ষা দিতে পারিবেন না । এইজন্ত নিম্নে কিকিৎ রঙের বিবরণ প্রদত্ত হইল । কিন্তু তাই বলিয়া এত রঙের বিবরণ বালকদিগকে এক

দিনে কি এক বৎসরে শিফা দিতে হইবে না । একে একে তাহারা যতই বড় হইবে ততই নানারূপ মিশ্র রঙের বিবরণ শিথিতে থাকিবে ।



১৫ চিত্র ।—রঙ পরিচয় ।

লাল—(মূলবর্ণ) লোহিত, রক্ত । দাড়িখ ফুলের বর্ণ ; পলাশ ফুল, চীনে অবা ফুলের বর্ণ ।
 বিশুদ্ধ রক্তের বর্ণ লাল । পদামুখী অবা, শিমুল, ফুল, মিন্দুর হিজল বর্ণ ।
 সাধারণ গোলাপের বর্ণ গোলাপী বা রক্তাভ । লাল রঙ পাতলা হইলেই গোলাপী হয়, আর গাঢ় হইলেই হিজল হয় ।

নীল—(মূলবর্ণ) সাধারণতঃ আকাশের বর্ণকে নীল বর্ণ বলে । কিন্তু প্রকৃত নীল বর্ণ, আকাশের নীল বর্ণ হইতে গাঢ় । অপরাজিতা, নীল বাঁটা, তিমির ফুলের বর্ণ কতক নীল । হাইকোর্টের উকিলবাবুদিগের গাউনের বর্ণ প্রকৃত নীল । আকাশের বর্ণকে আসমানী রঙ বলে । খুব গাঢ় নীল বর্ণকে (আম কাল রঙের মত) নীলকান্ত বলে । দাঁড়কাকের রঙ কাল নয়, নীলকান্ত ।

হলুদ—(ফুলবর্ণ) হলুদ বা হলুদে । শুষ্ক হলুদার বর্ণ । অতসী ফুল, কনকী ফুল, কোন কোন গাঁদা ফুল হলুদ বর্ণের । হলুদ গাঢ় হইলে পীত বলে । পিতলের বর্ণ পীত । পাতলা হলুদকে বাগন্তী বলে, যেমন সর্ষপ ফুলের রঙ ।

সবুজ—(মিশ্রবর্ণ) নীলে হৃদয়ে মিশাইলে সবুজ হয় । কলার পাতা, কচুপাতা, ধান গাঢ় প্রভৃতির রঙ । সাধারণতঃ সকল পাতাকেই সবুজ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক পাতার বর্ণ ঠিক সবুজ নয়, সবুজের সহিত একটু কাল মিশ্রিত । গাঢ় সবুজকেই গরক্ত বলে ; দূর হইতে নুতন ধানের ক্ষেত যেমন দেখায় । শ্যামল—পাতলা সবুজ ; নুতন ধানের বর্ণ বা ধানের উপর তিন চারি দিন এক থানা হট চাপা দিয়া রাখিয়া, পরে সেই হট সরাইলে, ধানের যে রঙ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে নীলের ভাগ অতি সামান্যই থাকে । আগাদিগের দেশের অনেক চিত্রকর রামচন্দ্রের চিত্রে সবুজ রঙ ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেটী অত্যন্ত ভুল । রামের বর্ণ নব-দুর্বাদলের আয় গৌরবর্ণ ।

কমলা—(মিশ্রবর্ণ) লাল ও হলুদে মিশাইলে কমলা হয় । পাকা-কমলার রঙ । গাঢ়-কমলা-বর্ণকে পীক বলে, কাঁচা হলুদের রঙ । চুণে হলুদে মিশাইলেও পীক বর্ণ হয় । অনেক গাঁদা ফুলের বর্ণ পীক । পাতলা-কমলা বর্ণকে কমলাভ বলে, যথা কমলা লেবুর শুষ্ক খোসার রঙ, বা ডাঁসা কমলা লেবুর রঙ ।

বেগুণে—(মিশ্রবর্ণ) নীলে ও লালে মিশাইলে বেগুণে হয় । কচি বেগুণের রঙ । বেগুণ বড় হইলে যে গাঢ় বেগুণে রঙ হয়, তাহাকেই বজ্রেশ বা বজ্রনেশ রঙ বলে । বেগুণ ফুলের বর্ণ পাতলা বেগুণে ।

আলতা—লালের সহিত একটু নীল মিশ্রিত, যথা মেজেন্টারবর্ণ, আলতার বর্ণ ।

পাটল—লালের সহিত সামান্য হলুদ, যেমন ইটের বর্ণ ।

কনক—পীতের সহিত ঈষৎ লাল মিশ্রিত, পাকা সোণার বর্ণ ।

অরদ—হলুদের সহিত একটু সবুজের আভা, যেমন পাকা বাতানী লেবুর (আবুরার) রঙ ।

নয়নকণ্ঠী—নীলের ভাগ অধিক যুক্ত সবুজ, নয়নের কণ্ঠের রঙ ।

ধুমল—নীলের মধ্যে একটু বেগুণের আভা, রামধনুর নিম্নাংশের রঙ ।

কপিল—লাল হলুদের সহিত একটু কাল রঙের মিশ্রণ ।

কপিথ—নীল ও লালের সহিত একটু কাল ।

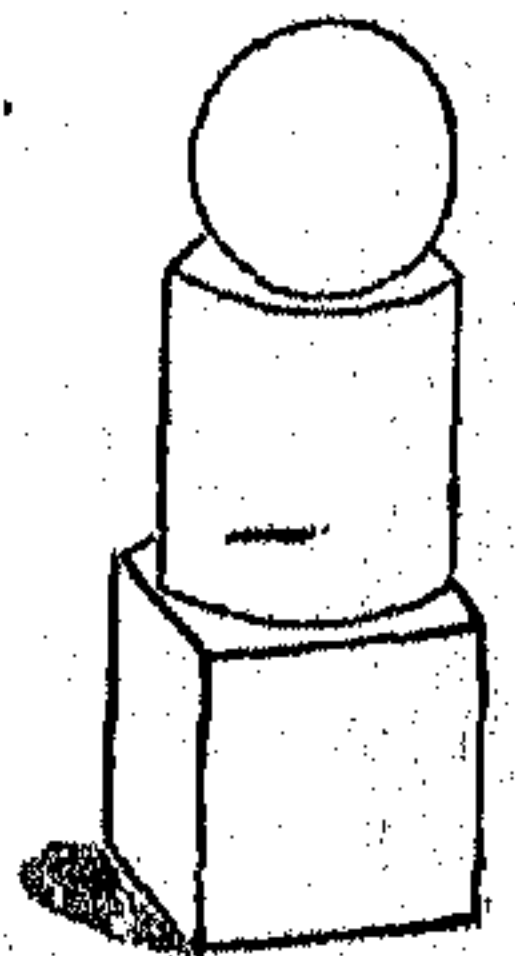
পিঙ্গল—নীল ও হলুদের সহিত একটু কাল ।

ধূসর—সাদার সহিত একটু কাল মিশ্রিত ; ছাই । কোন প্রবোর প্রকৃত রঙের বিবর্ণত্ব খটিলে তাহাকে পাংশু, পাংশুটে, পিংশে বলা হয় । ধূসরের সহিত একটু লাল বা হলুদ মিশ্রিত হইলে কটা রঙ হয় ।

রঙ ঘন হইতে হইতে কাল রঙের দিকে অগ্রগম হয় ; আবার পাতলা হইতে হইতে সাদা রঙের দিকে চলিয়া আসে ।

মিশ্র রঙের মধ্যে সবুজ, বেগুনে ও কমলা রঙের উৎপত্তি বালকগণের সম্মুখে শিক্ষক পরীক্ষা করিয়া দেখাইবেন । লাল, নীল ও হলুদ রঙের ওঁড়ি কিনিতে পাওয়া যায় । সেইগুলি জলে গুলিয়া দ্বোতলে পুরিয়া রাখিবেন । পরীক্ষার সময় একটা চীনে মাটির বাটীতে প্রথমে একটা রঙ ঢালিবেন—মনে করুন হলুদ । তারপর এই হলুদের সহিত একটু একটু করিয়া নীল রঙ মিশাইয়া ও তুলির দ্বারা সেই রঙ কাগজে লাগাইয়া, শ্যামল, সবুজ ও মরকত বর্ণ দেখাইয়া দিবেন । এইরূপে বেগুনে ও কমলা মিথাইতে হইবে । অত্যান্ত মিশ্রবর্ণ নিম্ন শ্রেণীতে মিথাইবার আবশ্যকতা নাই ।

২য় খেলনা ।—একটা লম্বা বাকোর ভিতর একটা কাঠের গোলা, একটা কাঠের ঢোল ও একটা কাঠের ছক । গোলার ব্যাস, ঢোলের ও ছকের উচ্চতার সমান বা কিছু কম বেশী । আর ছকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমান । অতঃপর বাঁধিবার জন্ত ইহাদের গায়ে ছোট ছোট ছক লাগান থাকে । পূর্ব খেলনার সেই বলের সহিত যোগ করিয়া ২য় খেলনার সৃষ্টি । ২য় খেলনার সৃষ্টিতে যে কোশলের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিলে, ক্রবলের প্রতিভা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে । একটা মাটির



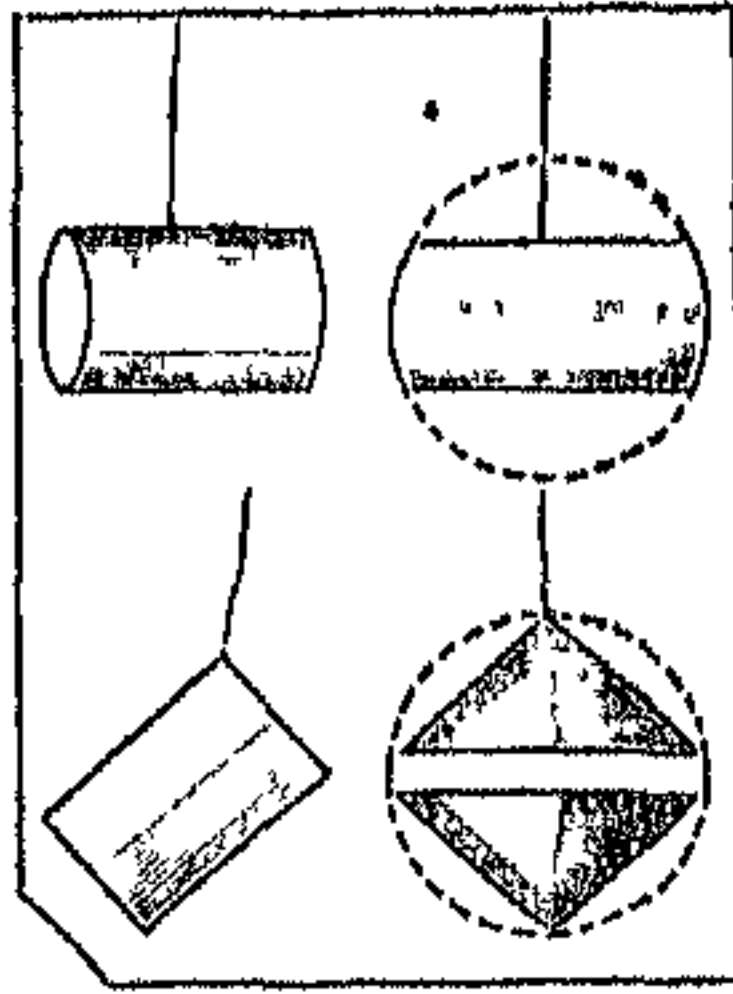
গোলায় এক অংশ ছুরি দ্বারা ভূমির সমান্তর করিয়া কাট, ঠিক তার বিপরীত দিকও এইরূপ করিয়া কাট । গোলা হইতে ঢোল উৎপন্ন হইল । আবার এই ঢোলের কুল পাশ্চ চারভাগ করিয়া কাটিলেই ছক হইল । সেই প্রথম খেলার বল অবলম্বন করিয়া ঢোল, আর ঢোল হইতে ছক গঠন করা হইল । দ্রব্যাদির সাধারণ আকারও এই তিন প্রকার, গোলাকার, ঢোলাকার ও ছকাকার । আবার বিশ্বরাজ্যে গোলাকার জিনিষই বেশী । চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই গোলাকার । নয়ন মেলিয়াই আমরা প্রথম এই সমস্ত দেখি, আর এই সমস্ত আলোক দান করিয়াই আমাদের সমস্ত দেখায় । তারপর পৃথিবীতে দেখি ঢোলাকার জিনিষই বেশী । গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, মানুষের অঙ্গ, পশু পক্ষীর অঙ্গ সমস্তই ঢোলাকার । ছকাকার দ্রব্য আমরা করিয়া লইয়াছি, আমাদের গৃহ সামগ্রীর মধ্যে অনেক গুলিই ছকাকার যথা দালান, কোঠা, বাক্স, তক্তপোশ, পুস্তক, টেবিল ইত্যাদি ।

গোলায় কথা ।—গোলা, ঢোল ও ছক বালকের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কোনটা দেখিয়াছে । বালক অবশ্য গোলায় কথাই বলিবে । তারপর সেই উলের বল ও এই কাঠের গোলা দুইটা লইয়া তুলনা করিতে আরম্ভ কর । উলের বল ধসুধসে, নানা রঙের, উলের বল নরম, গড়াইলে শব্দ হয় না, তেমন তাড়াতাড়ি গড়ায় না, ফেলিয়া দিলে তেমন শব্দ হয় না, লাফাইয়া উঠে । কিন্তু কাঠের বল তেলতেলে সাদা রঙের, কাঠের তৈয়ারী, শক্ত, গড়াইলে শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি গড়ায়, ফেলিয়া দিলেও শব্দ হয়, আর তেমন লাফাইয়া উঠে না । এইরূপ কাঠের বলকে গোলা বলে । লৌহার, মীসার, পিতলের বলকেও গোলা বলে ।

বালকেরা গোলায় মত যে সকল জিনিষ দেখিয়াছে তাহার নাম করিবে । বেল, তাল, কুল, কলস, গোলা, মারবেল, ছানাবড়া, গোলক ইত্যাদি যে কয়টা নাম করিতে পারে । শিক্ষকও ইহার মধ্যে ২-১টা সহজ মত দেখাইয়া শিখাইয়া দিতে পারেন । তারপর গোলা বুলাইয়া দেখাইবেন যে গোলাও বলের মত বুলে । গোলা ঘুরাইয়া দেখাইবে যে গোলা ঘুরাইলেও গোল দেখায় । তারপর বালকগণকে গোলাকার করিয়া দাঁড়া করাইয়া

একজনকে গোলাটা আশে-নিকট গড়াইয়া দিতে বল । সে আবার তার নিকটবর্তী বালকের নিকট গড়াইয়া দিবে ইত্যাদি প্রণালীক্রমে বালকেরা গোলা লইয়া খেলা করিবে। ছুইজন বালকের মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বের হিসাবে কি পরিমাণ জোরে গোলা ঢালান আবশ্যক বালকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে। হাতের স্থিতিতা জগাইবে। চক্ষুর দ্বিধা দৃষ্টির অভাগ হইবে, স্তম্ভাং চক্ষু ও হস্তের একত্র কাৰ্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

টোলের কথা ।—গোলার সহিত, চকের ও টোলের আকারগত পার্থক্য কি? টোলের পাশ গোলায় মত গোল, আর উপর নীচের ভাগ চকের পাশের মত চাপটা।



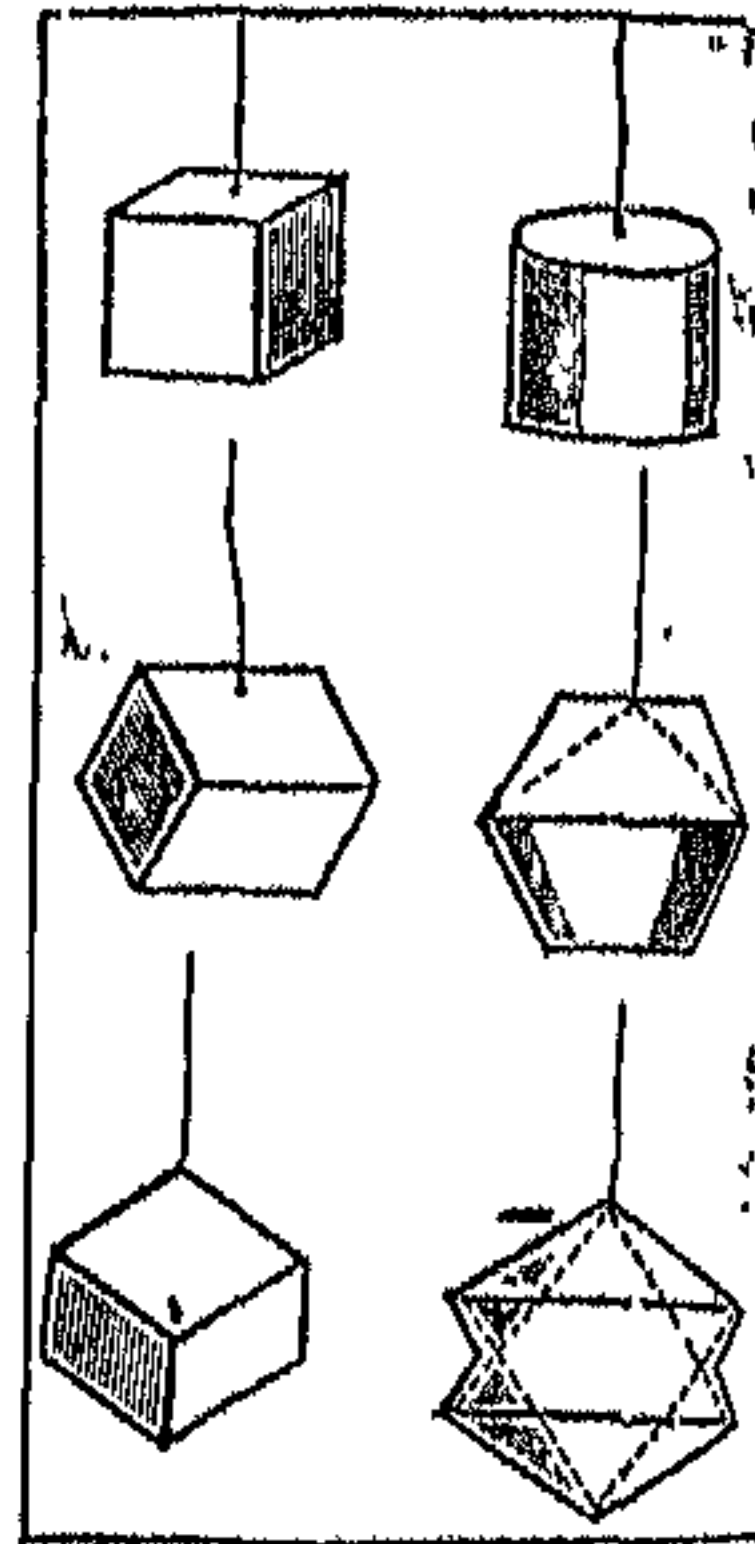
১৭ চিত্র—টোল ঘুরাণ ।

গড়াইয়া যায়, চাপটা পাশে গড়ায় না। টোলকে লম্বালম্বি ঝুলাইলে টোলের মতই দেখায় কিন্তু পাশে ঝুলাইয়া ঘুরাইলে গোলার মত দেখায়। (১৭ চিত্র দেখ)

আবার এক ধারে ঝুলাইয়া ঘুরাইলে ছুইটা নোচার মাথার মত দেখায়।

এই টোল গড়াইয়াও পুকের মত খেলা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ খেলা যে গোলার মত সুবিধাজনক হইবে না অর্থাৎ টোল যে গোলার মত বেশ উত্তমরূপে গড়াইবে না তাহা বালকেরাই বুঝিতে পারিবে।

বালকেরা টোলের মত যে সকল স্তিমি দেখিয়াছে তাহার নাম করিবে। (গোল খাম, বাজাইবার টোল, গাছের ডুঁড়ি, বাঁচ, বোতল, গেলাস প্রভৃতি) গোলাকে যে কোন পাশে গড়াইয়া দিলেই গড়াইয়া যায়, কিন্তু টোলকে গোলার মত পাশে গড়াইলেই

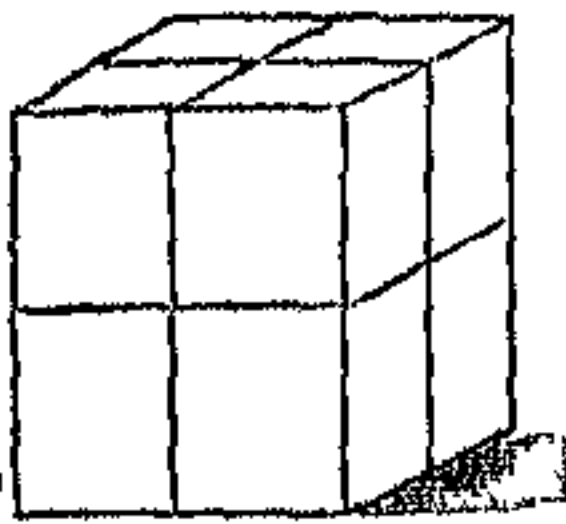


১৮ চিত্র । ছক ঘুরাণ ।

ছকের কথা ।—ছকের সত জিনিষের নাম কর (বাক্স, পুস্তক, মাঝান, ঈট ইত্যাদি), পাশ (৬টি) ধার (১২) ও কোণের (৮টি) পরিচয় করাও ও গণনা করাও । তারপর ছকের ঘূর্ণনে ভিন্ন ভিন্ন আকার দেখাও । ১৮ চিত্র দেখ ।

- (১) পাশে খুঁতা বাঁধিয়া ঘুরাইলে ঢোল হয় (ঢোলের সহিত ছকের মিল) ।
- (২) একধারের শিরের উপর খুঁতা বাঁধিয়া ঘুরাইলে গাড়ীর চাকার ধূনের মত দেখায় ।
- (৩) এক কোণে ঘুরাইলে দুইটা মোচার মাথার মত দেখায় ।

৩য় খেলনা ।—একটা ছই ইঞ্চি ছককে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ৮টা ১ ইঞ্চি ছক করা হইয়াছে ।



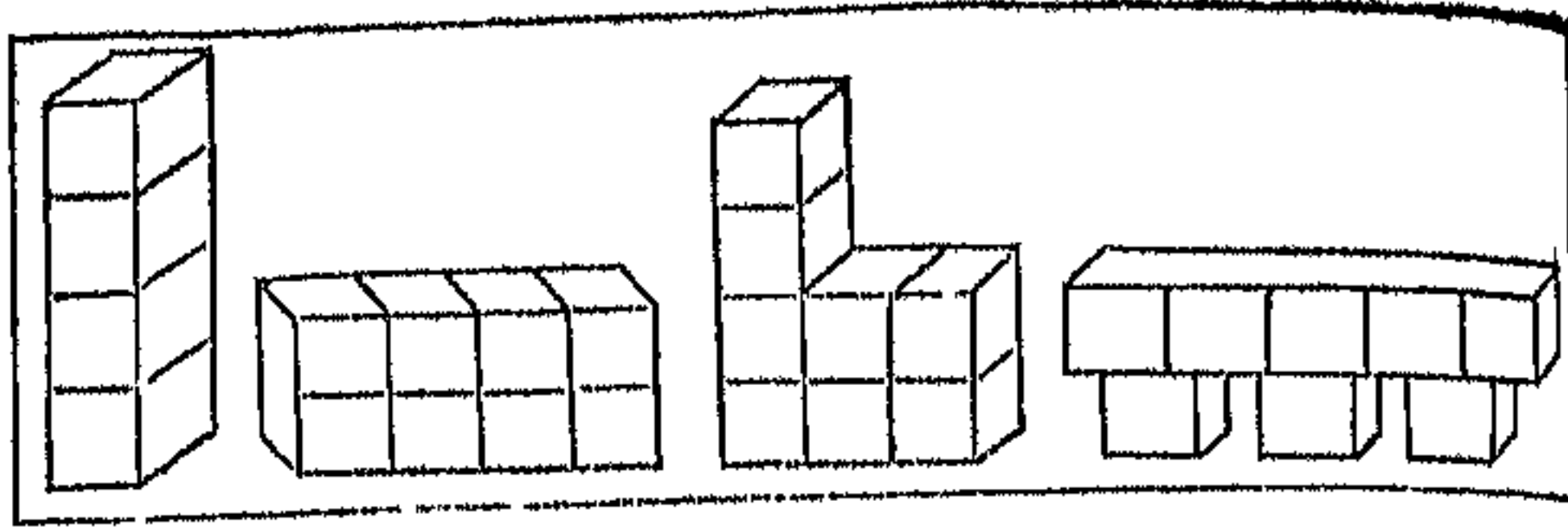
২য় খেলনায় ছকের সাধারণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । এই ছককে এখন ভাঙ্গিয়া দেখাইতে হইবে । বালকেরাও একটা খেলনা পাইলে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিতে ভালবাসে । ভাঙ্গা গড়া বালকের স্বাভাবিক

১৯ চিত্র । ছক । প্রবৃত্তি । এই ৩য় খেলনা, ৩ বৎসরের হইতে ৬ বৎসরের বালকের জন্য রচিত । বয়সভেদে বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে ।

বালকের সম্মুখে ছকটি স্থাপন কর । বালকেরা আস্ত ছক ভাঙ্গিয়া বাহাতে আবার পূর্ববৎ গড়িতে পারে সেরূপ শিক্ষা দাও ।

গঠন শিক্ষা ।—৩, ৪ বৎসরের বালকগণের পক্ষে পদার্থের অমুকরণে গঠন করা আশোদজনক । ছকগুলি মাজাইয়া থাম, দেওয়াল, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতির অমুকরণ করা যাইতে পারে । শিক্ষক নিজের টেবিলের উপর গঠন করিবেন, বালকেরা তাহাদের নিজ নিজ ছক দ্বারা তাহাদের সম্মুখে মাটি বা টেবিলের উপর শিক্ষকের অমুকরণে গঠন করিবে । নিম্নে গঠনের কয়েকটা নমুনা দেওয়া হইল :—

কোন জায়গার গঠন করিতে শিখিলেই চলিবেনা, সেই জায়গা মধ্যস্থ সাধারণ জাতীয় বিষয়ও কিছু নিছা শিক্ষা দিতে হইবে । নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চেয়ার উপলক্ষ করিয়া একটা পার্টের আভাস দেওয়া হইল (চিত্র দেখ) ।



খাম

দেয়াল

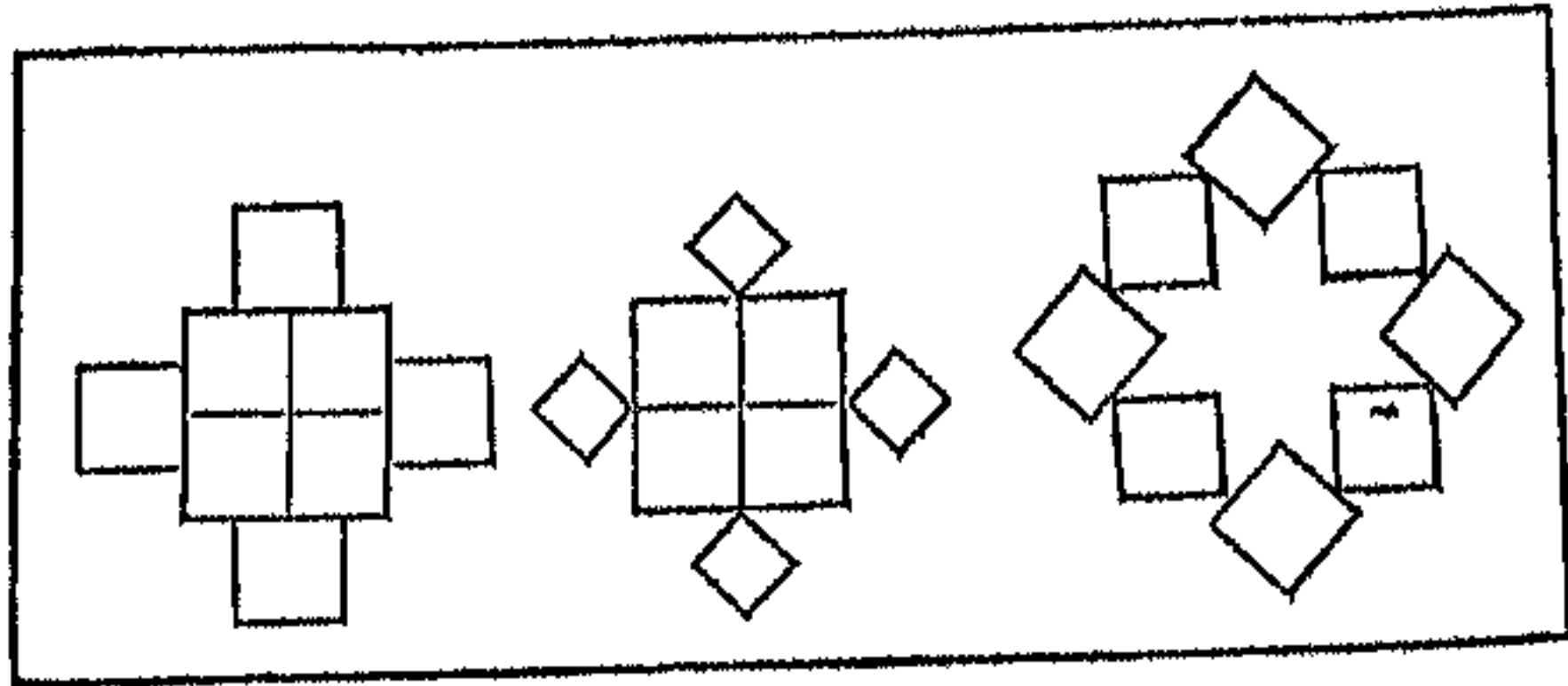
চেয়ার

গাঁকো

২০ চিত্র ।—ছকের দ্বারা জায়া গঠন ।

“এই জিনিষটা কোন জিনিষের মত ?” “এটা চেয়ারের মত” “ইহার কোন জায়গায় বাস আর কোন জায়গায় ঠেস দেয় ?” “(দেখাইয়া) এই জায়গায় বসে, এই জায়গায় ঠেস দেয়” “যেখানে ঠেস দেয় তাহাকে চেয়ারের পিঠ বোলে—এই চেয়ারের পিঠ দেখাও ? (শিক্ষকের চেয়ার দেখাইয়া) ইহার পিঠ দেখাও ।” “চেয়ার কি দিয়া তৈয়ারী কবে ?” “কাঠ কোথাও পায় ?” “কেমন করিয়া তত্ত্বা করে ?” “যে লোক চেয়ার, বাক্স, টেবিল তৈয়ারী করে তাহাকে কি বলে ?” ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া বালককে আবশ্যকীয় ছচারিটি নূতন কথা শিখাইতে হইবে । কিন্তু সাবধান যেন মাতা অধিক না হয় । এইরূপ যে দিন যে জিনিষের গঠন করিবে সে দিন সেই জিনিষ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবে ।

সৌন্দর্য ও সমতা শিক্ষা ।—টেবিল বা মাটির উপর (ছকের) কাঠের খণ্ডগুলি পাতিয়া নানারূপ সাজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে । ইহাতে বালকগণের সমতা ও সৌন্দর্য বোধ জন্মে । নিম্নে আদর্শ স্বরূপ কয়েকটি সাজের নমুনা দেওয়া হইল :—



২১ চিত্র ।—ছকের দ্বারা সাজ গঠন ।

শিক্ষকগণ নিজেরা এই আদর্শে নানা সাজের রচনা করিতে পারিবেন। বালকেরাও নানাধরণে সাজ নিজেবাই কল্পনা করিতে পারিবে। নিম্ন শ্রেণীর বালকগণকে এইরূপে সাজ রচনায় নিযুক্ত রাখিলে, তাহাদিগের সময় আনন্দে কাটিবে, কোনরূপ গোলমাল হইবে না, আর শিক্ষক এই সময়ে অন্য শ্রেণীতে কার্য্য করিবার অবসর পাইবেন।

গণনা শিক্ষা ।—এক এক খণ্ড কাঠ লইয়া বালকদিগকে প্রথমে ১, ২ গণনা শিক্ষা দিতে হইবে। ছকের খণ্ডগুলি সমস্ত এক জায়গায় রাখ। বালকেরাও তাহাদের খণ্ডগুলি নিজের নিজের সম্মুখে রাখিবে। শিক্ষক এক একখানি কাঠখণ্ড সরাইবেন আর ১, ২, ৩ ইত্যাদি গণনা করিবেন, বালকেরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুকরণে এক একটা কবিতা কাঠ সরাইবে ও ১, ২, ৩ প্রভৃতি গণনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে (এক দিনের নয়) বালকদিগের সংখ্যাবোধ হইবে। দুই হাতের অঙ্গুলি লইয়াও এইরূপে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হয়। কাঠের দ্বারা সংখ্যা শিক্ষার প্রণালী অষ্টম খণ্ডনাম বিবৃত হইয়াছে।

তারপর যোগ শিক্ষা ।—একটা ছোট ছক কাছে রাখ, বালকেরাও তদ্রূপ করিবে। আর একটা ছক ঐ প্রথমটির কাছে সরাইয়া বল “এক ছক আর এক ছক, ২ ছক”। আর একখানি, এই দুইখানির নিকট সরাইয়া আনিয়া বল “২ ছক ও ১ ছক, তিন ছক”—বালকেরা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিবে, ইত্যাদি।

এইরূপে যোগ শিক্ষার পর বিয়োগের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। একটা ছকের সহিত আর একটা ছক যোগ কর আর পূর্বের মত বল “১টা ছক ও ১টা ছক, ২টা ছক”। তারপর এই দুইটা হইতে ১টা সরাইয়া বল “২টা ছক হইতে ১টা ছক সরাইলে, ১টা ছক থাকে”। আবার দুইটা ছকের সঙ্গে ১টা যোগ করিয়া বল “২টার ছকের সঙ্গে ১ ছটা ছক যোগ করিলে ৩টা ছক হয়” “৩টা ছক হইতে ১টা ছক নিলে ২টা ছক থাকে”। “৩টা ছক হইতে ২টা ছক নিলে ১টা ছক থাকে” ইত্যাদি—দুইটা সরাই-

গড়াভাঙ্গার সাধারণ নিয়ম ।—এইরূপ গড়াভাঙ্গার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যক :—

- (১) ছকটিকে বাজকের সম্মুখে (না ভাঙ্গিয়া) আঁতু রাখিয়া দিবে ।
- (২) বাজকও কার্যের শেষে খণ্ড-ছকগুলি মিলাইয়া বড় ছক রচনা করিয়া বাক্সে রাখিবে ।
- (৩) সমস্তগুলি খণ্ড-ছকের ব্যবহার করিতে হইবে ।
- (৪) একটা গঠনের সহিত যোগ বিয়োগ করিয়া অত্যাশ্চর্য গঠনের সৃষ্টি করিতে শিক্ষা দিবে । অর্থাৎ একটা গঠন সম্পূর্ণরূপে না ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত ছটার খান ছক যোগ করিয়া বা তাহা হইতে ছটার খান সরাইয়া, বা ছটার খানির স্থান পরিবর্তন করিয়া নূতন জিনিষের রচনা করিবে ।
- (৫) যে জিনিষের রচনা বা গঠন করা হইবে, সেই জিনিষ সম্বন্ধে বাজকগণকে সামান্য সামান্য শিক্ষাও দিতে হইবে ।
- (৬) বাজকেরা যে জিনিষ গড়িবে, তাহার একটা নামকরণ (যে জিনিষের প্রতিকৃতি তাহার নাম অনুসারে) করা আবশ্যক । আর সেইরূপ গঠনের সেই নামই ঠিক রাখ আবশ্যক ।
- (৭) বাজকেরা যাহা রচনা বা গঠন করিবে, তাহা যাহাতে অন্য বাজকে ভাঙ্গিয়া না দেয় সে বিষয়ে সাবধান করিতে হইবে । যাহাতে বাজকেরা অপরিষ্কার বা বিশৃঙ্খলভাবে কাজ না করে, সে বিষয়ে শিক্ষককে মনোযোগী হইতে হইবে । একজনের ছকগুলি যেন অগ্রে ব্যবহার না করে ।
- (৮) প্রত্যেকবার বাজকগণকে নূতন নূতন জিনিষ বা মাজ রচনা করিতে উৎসাহ দিবে । এক রকমের রচনা করা বাঞ্ছনীয় নহে ।

৪র্থ খেলনা ।—এটিও দ্বিতীয় খেলনার মত । একটা ২ ইঞ্চি ছক । তবে ২য় খেলনায় ছক, ৮টা ছোট ছোট ছকে ভাগ করা হইয়াছে, আর এই খেলনায় ছককে হাঁটের মত লম্বা আকারে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । ইহার দ্বারাও নানা জিনিষের প্রতিকৃতির আয়ুর্করণ করা যাইতে পারে ।

আগাদিগের বিদ্যালয়ে এ সমস্তের ব্যবহার নাই বলিয়া এই চতুর্থ

খেলনা বিষয়ে অধিক দেখা হইল না । বাহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহারাও যদি এ বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তবে কিওয়ার-গার্টেন সম্বন্ধীয় নানারূপ ইংরেজী পুস্তকের অন্তর্গত ছবিগুলি দেখিলেই এই সমস্ত খেলনার শিক্ষাপ্রণালী বুঝিতে পারিবেন ।

৫ম খেলনা ।—এটি একটা ৩ ইঞ্চি চক । ইহাকে ২৭ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । ইহার দ্বারাও নানারূপ গঠনের কার্য্য হইয়া থাকে ।

৬ষ্ঠ খেলনা ।—একটা ৩ ইঞ্চি চক, ২৭ খানি হীটের মত লম্বা ফলকে ভাগ করা হইয়াছে । ইহার দ্বারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর জবোয় গঠন করা যাইতে পারে ।

৭ম খেলনা ।—বর্গক্ষেত্র ও ত্রিভুজের আকারে কতকগুলি রঙ করা পাতলা কাঠ বা মোটা কাগজ কাটা ; এইগুলি মাটি বা টেবিলের উপর সাজাইয়া নানাবিধ জবোয় অনুকরণ করা যাইতে পারে ও সুন্দর সুন্দর ফুল ও সাজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে । শিক্ষকগণ ইচ্ছা করিলে রঙ করা কাগজে কতকগুলি বর্গক্ষেত্র ও কতকগুলি ত্রিভুজ (নানারকমের) কাটিয়া দিতে পারেন । বালকেরা সেগুলি সাজাইয়া নানারকমের সাজ রচনা করিবে । বিলাতী কাপড়ে যে সকল ছবি আঁটা থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়াও এই রকমের খেলনার রচনা করা যাইতে পারে । একখানি ছবিকে কাঁচি দিয়া ৪ ভাগ করিয়া কাটিয়া দাও, বালকেরা সেগুলি সাজাইয়া পুরা ছবি করিবে । এইরূপ আর একখানিকে ৮ ভাগে, অন্য একখানিকে ত্রিভুজের মত ভাগ করিয়া, বালকগণকে সাজাইতে বলিলে, তাহারা বেশ আনন্দ বোধ করিবে ।

৮ম খেলনা ।—১ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি, ৪ ইঞ্চি ও ৫ ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি কাঠী । কাঠীগুলি দেখানাহি এর কাঠী বা কাঁটার কাঠীর মত সরু । কিওয়ারগার্টেন বাক্সের সঙ্গে যে কাঠী বিক্রয় হয় সেগুলি কাঠের,

সহজেই ভাষিয়া যাইতে পারে। বাঁশের কাঠী কাঠের কাঠী অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর, সহজ প্রাপ্য ও সম্ভা।

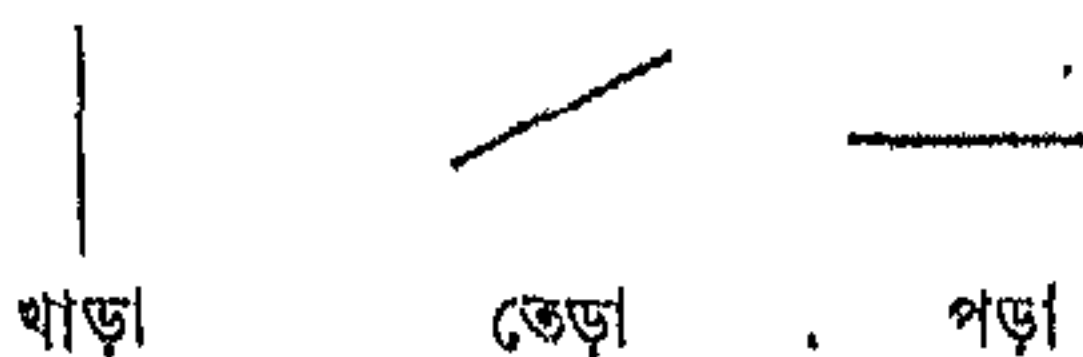
৬ষ্ঠ খেলনা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধযুক্ত কাঠ ফলকের ব্যবহার ছিল। তবে ৬ষ্ঠ খেলনায় কাঠ ফলকগুলির বেধ কমিয়া গিয়াছিল। ৭ম খেলনায় আবার এই বেধ একবারে কমিয়া গিয়াছে। বেধকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া (সপ্তম খেলনায়) কেবল দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট সমতল লাইনাই দ্রব্যাদির রচনা করা হইয়া থাকে। এই অষ্টম খেলনায় আবার সেই সমতলও পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমতলস্থ সরল রেখা মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম বিষয়ে প্রবেশ করা হইতেছে।

কিওয়ারগার্টেন খেলনাগুলি না কিনিয়া নিজেও প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক অল্প সময় খেলনা শিক্ষক ক্রয় করিতে বা প্রস্তুত করিতে পারেন বা নাই পারেন, এই অষ্টম খেলনা তাঁহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে। খরচও নাই, তেমন পরিশ্রমও নাই আর এই খেলনার মত আনন্দকর খেলনাও আর নাই। অক্ষর শিক্ষা, অঙ্কন শিক্ষা, গণিত শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষার মূল এই খেলনায় নিহিত।

কাঠী সাজান।—খাড়া, পড়া ও তেড়া এই তিনটাই সরল জিনিষের সাধারণ অবস্থা। এক বালককে শ্রেণীর সম্মুখে খাড়া করিয়া বল “বালকটী দাঁড়াইয়া বা খাড়া হইয়া আছে।” তাঁহাকে টেবিলের উপর শোয়াইয়া বল “বালকটী টেবিলের উপর শুইয়া বা পড়িয়া আছে।” তাহাকে দেওয়ালের গায়ে হেলাইয়া বল যে “বালকটী দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া বা তেড়া হইয়া আছে।” তারপর একটা ছাতা টেবিলের উপর খাড়া করিয়া বল যে “খাড়া ছাতা,” শোয়াইয়া বল যে “পড়া ছাতা,” হেলাইয়া ধরিয়া বল “তেড়া ছাতা”। বালকেরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে খাড়া ছাতা, পড়া ছাতা ও তেড়া ছাতা বলিবে। তার পর টেবিলের উপর একটা পেন্সিল খাড়া করিয়া ধর, আর বালকগণকে পেন্সিলের অবস্থা

জিজ্ঞাসা কর। বালকেরা ‘খাড়া পেন্সিল বলিতে’ শিখিয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপে পেন্সিল টেবিলের উপর শোয়াইয়া রাখিয়া ও তেড়া করিয়া ধরিয়া বালকের জ্ঞান পরীক্ষা কর। তার পর নিজে একটা বড় কাঠা, লও ও বালকগণের হাতেও একটা কাঠা দাও। নিজে কাঠা টেবিলের উপর খাড়া করিয়া বল “খাড়া কাঠা”, বালকেরাও নিজ নিজ কাঠা, মাটি বা ডেস্কের উপর খাড়া করিয়া বলিবে “খাড়া কাঠা”। এইরূপে শিক্ষক টেবিলের উপর কাঠা তেড়া করিয়া বলিবেন “তেড়া কাঠা”। বালকগণও তদ্রূপ করিবে। এইরূপে “পড়া কাঠা”ও শিখাইতে হইবে। একটু অভ্যাস হইলে পরে বালকগণকে বিদ্যালয় গৃহস্থিত খাড়া, তেড়া, পড়া বাঁশ বা কাঠ দেখাইতে হইবে। (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চের পা, দরজার খাড়া চৌকাঠ, ঘরের থাম প্রভৃতি খাড়া; ঘরের চালের বাঁশ বা কাঠের কয়া তেড়া; চৌকাঠের উপরনীচের কাঠ, বেঞ্চের তক্তা পড়া।

ইহার পর খাড়া, তেড়া, পড়া, আবার অল্প রকমে শিখাইতে হইবে। শিক্ষক নিজের সম্মুখে টেবিল বা মাটির উপর লম্বভাবে একখানি কাঠা রাখিয়া বলিবেন “খাড়া কাঠা”, তারপর সেই কাঠা ঠিক নিজের চক্ষের সমান্তর করিয়া বলিবেন “পড়া কাঠা।” বোর্ডেও চক দিয়া এইরূপে



খাড়া, তেড়া ও পড়া কাঠা আঁকিয়া দিবেন। বোর্ডে অঙ্কিত এই তিন প্রকারের টান (বালকেরা রেখাকে ‘টান’ বলে) যাহাতে বালকেরা দেখিয়াই বুঝিতে পারে সেরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। ২।৩ দিনেই বালকেরা খাড়া টান (রেখা) পড়া টান ও তেড়া টান বুঝিবে ও বলিতে শিখিবে।

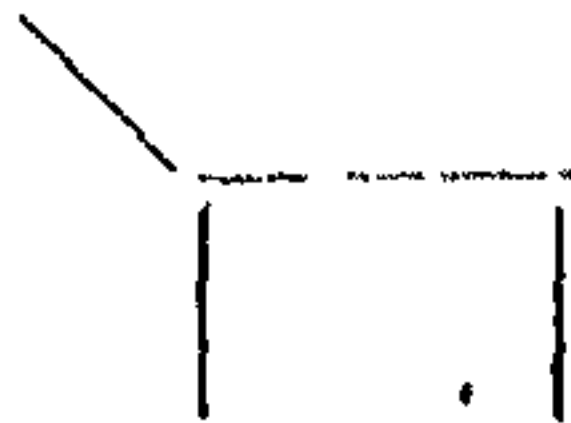
গঠন শিক্ষা ।—(১) বালকগণের ডান হাতের পাশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ১০।১২টি কবিতা ২ইঞ্চ ও ৫ইঞ্চ কাঠী রাখ । তারপর নিজে বোর্ডে চক দিয়া একটা পড়া-টান দিয়া বল “এই রকমে বড় কাঠী দিয়া



২৩ চিত্র ।—বেঞ্চ ।

একটা পড়া-কাঠী সাজাও ।” তারপর শিক্ষক বোর্ডে চক দিয়া সেই পড়া-টানের নীচে, একটু দূরে দূরে ২টা ছোট খাড়া-টান দিয়া বলিবেন “পড়া কাঠীর নীচে এইরূপ ২টা ছোট কাঠী খাড়া করিয়া লাগাও ।” বসিবার বেঞ্চ হইল । এখন বেঞ্চ বিষয়ে বালককে গল্পছলে ছ’চারিটা কথা শিখাইয়া দাও ।

(২) বালকের পাশে ৩ইঞ্চ, ২ইঞ্চ কাঠী রাখ । বোর্ডের উপর চক দিয়া আঁক আর বল “এই রকমে একটা ছোট পড়াকাঠী সাজাও ; তার সঙ্গে এই রকমে ২টা ছোট খাড়াকাঠী লাগাও, আর তার সঙ্গে এই রকমে একটা তেড়াকাঠী লাগাও ; বালকেরা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিবে । বালকেরা ঠিক করিয়া কাঠী সাজাইতে পারিল কিনা তাহা

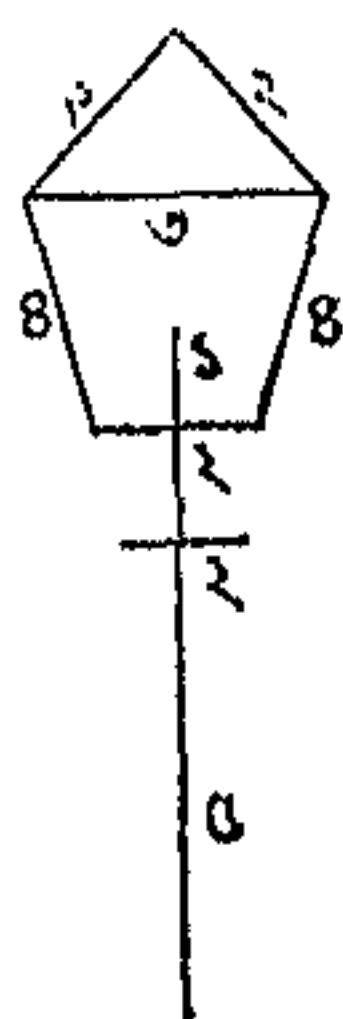


২৪ চিত্র ।—চেয়ার ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে । একথানা চেয়ার হইল । এখন চেয়ার সম্বন্ধে বালককে ২।৪টা কথা শিখাও ।

(৩) পাঁচ রকমের কাঠীর বাহাতে ব্যবহার হইয়া থাকে এরকমের একটা দৃষ্টান্ত দিলে শিক্ষকগণ কাঠীর দ্বারা গঠনের বিষয় সমস্তই বুঝিতে পারিবেন । শিক্ষক বোর্ডের উপর একটা একটা করিয়া দাগ দিতে

থাকিবেন আর বালকেরা কাঠির দ্বারা তাহার অনুকরণ করিবে। কাঠিগুলির নাম এক ইঞ্চ কাঠি, দুই ইঞ্চ কাঠি এরূপ বদিলে হয়ত বালকেরা ধরিতে পারিবে না, সেই জন্য কেহ কেহ বড়কাঠি, মেজোকাঠি, সেজোকাঠি, ছোটকাঠি প্রভৃতি নামাকরণ করা পাছন্দ কবেন। যাহা হউক এ সকল বালকের বুদ্ধি ও শিক্ষকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। ৫ রকমের কাঠিদ্বারা একটা রাস্তার ল্যাম্প-পোস্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী দিখিত হইল :—



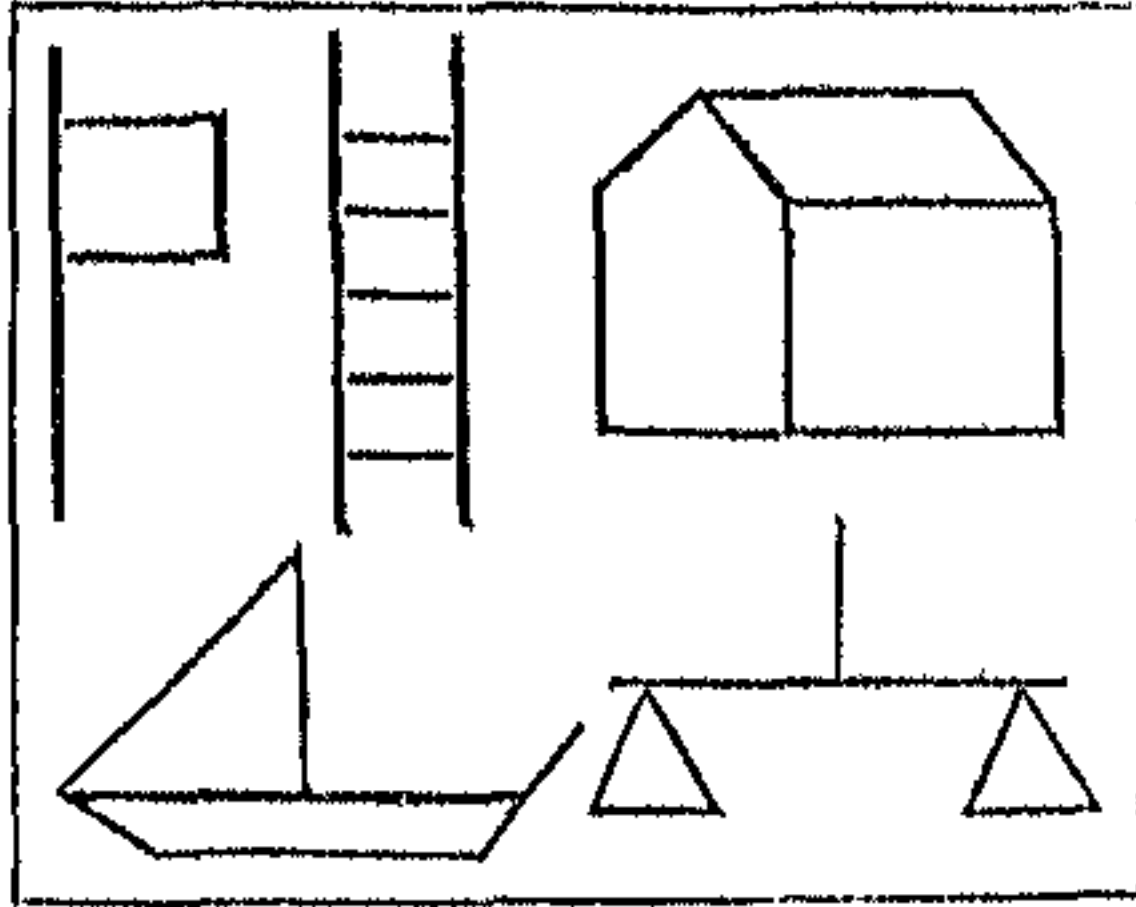
শিক্ষক শিশুগণকে এইরূপ আদেশ করিবেন :—“একটা ৩ ইঞ্চ পড়কাঠি সাজাও (শিক্ষক এইরূপ আদেশের সঙ্গে, একে একে বোর্ডে আঁকিতে থাকিবেন, আর বালকেরা মাটি বা টেবিলের উপর চিত্রের অনুকরণে কাঠি সাজাইতে থাকিবে) ; তার পর দুইটি ২ ইঞ্চ তেড়া কাঠি লাগাও ; তার নীচে দুইটি ৪ ইঞ্চ তেড়া কাঠি সাজাও ; তার নীচে একটা ৫ ইঞ্চ খড়কাঠি লাগাও ; ২ ইঞ্চ পড়কাঠির উপর একটা ১ ইঞ্চ খড়কাঠি বসান । ” এইরূপে সাজান হইলে গঠনের সমস্ত অংশের পরিচয় করাও, অর্থাৎ কোন্টি গঠনের চাল, কোন্টি ভাল (বা ছাদ), কোন্টি পাশ, কোন্টি তলা (বা মেজ) , কোন্টি বাতি, কোন্টি খাম, কোন্টি মই লাগাইবার আড়া ইত্যাদি দেখাইতে বল ।

২৫ চিত্র।—রাস্তার আলো ।

তারপর এই গঠন উপলক্ষ করিয়া বালকগণকে কিছু শিক্ষাও দিতে হইবে। রাস্তায় আলো দেয় কেন, এই আলোতে কি রকম তেল ব্যবহার করে, কত রকম তেলের নাম জান, কোন তেলের দ্বারা কি করা হয়, আলো কাচ দিয়া ঢাকে কেন, টিন কি কাঠ দিয়া ঢাকিলে কি হয়, না ঢাকিলে কি হয় ইত্যাদিরূপ প্রশ্নোত্তরে দ্বারা বালকগণকে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

নিম্নে আরও ২৩টি গঠনের আদর্শ প্রদত্ত হইল শিক্ষকগণ চিত্র

করিয়া নানারূপ গঠন আবিষ্কার করিতে পারিবেন । একথা মনে রাখা আবশ্যক যে অধিকাংশ চিত্রেই প্রথমে পড়াবেথা তাঁকিয়া চিত্র আরম্ভ করিতে হইবে, তারপর ভেড়া, খাড়া ।



২৬ চিত্র ।—পাখা, সিঁড়ি, ঘর, নোকা, দাঁড়িপাল্লা ।

অক্ষর শিক্ষা ।—কাঠির দ্বারা বাজালা অক্ষর শিখান তেমন সুবিধা হয় না । ইংরাজী অক্ষরগুলি বেশ শিখান যায় । বাজালা অক্ষর শিখাইবার পক্ষে তেঁতুলের বীজ বেশ সুবিধাজনক । তবে সরল রেখাযুক্ত বাজালা অক্ষরগুলি কাঠির সাহায্যে শিখান যাইতে পারে । আবার অক্ষর শিক্ষার সাধারণ নিয়মও এই যে, প্রথমে সরল রেখাযুক্ত অক্ষরগুলিই শিক্ষা দিতে হইবে । প্রথমে ব্যাকরণসম্মত প্রণালী অবলম্বন করা সুবিধাজনক নহে ।

ব র (ক) ঝ (ম) (ফ) য এই কয়েকটি সরল রেখাযুক্ত । তবে 'র'এর ফোটা, 'ক'এর ও 'ফ'এর আঁকড়ী, সরল কাঠির দ্বারা হয় না । এইজন্য 'র'এর ফোটার স্থানে একটা ছোট মাটী বা হুঁটের টুকরা কি একটা বীজ ব্যবহার করিতে হইবে । আর 'ক'এর ও 'ফ'এর আঁকড়ী, কাঠি একটু একটু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া (একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিয়া) প্রস্তুত করিতে হইবে ও আঁকড়ীর মাথার ফোটার স্থানে

মাটি বা ইটের ছোট টুকরা বা কোন বীজ বসাইতে হইবে। এইরূপে কাঠী ভাঙ্গিয়া অল্পাংশ অনেক অক্ষর প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

এখন অক্ষর শিক্ষা দিবার প্রকরণ জানা আবশ্যক। প্রথমে 'ব' শিখাইতে হইবে। বোর্ডের উপর প্রথমে একটা খাড়াটান দাও। বালকগণকে কাঠী দিয়া, একটা 'খাড়াকাঠী' সাজাইতে বল। তারপর নিজে বোর্ডের উপর ২টা তেড়া, ও মাত্রার স্থানে একটা পড়াটান দেও। আর বালকগণকে ২টা 'তেড়াকাঠী' ও মাত্রার স্থানে একটা 'পড়াকাঠী' সাজাইতে বল। সকলকে এক সঙ্গে 'ব' বলিতে বল। তারপর একটা বটগাছ আঁকিয়া তাহার 'ব' (বুরি) দেখাও। যদি কোন নিকটস্থ বটগাছে 'ব' দেখান যাইতে পারে তবে আরও ভাল হয়। তারপর উক্তরূপে 'ক' প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দাও। 'ক'এর আঁকড়ীর কাঠীগুলি



২৭ চিত্র। বোর্ডে বক অক্ষর।

শিক্ষক নিজে ভাঙ্গিয়া না দিলে বালকেরা ভাঙ্গিতে পারিবে না। এইরূপে ছোট্ট অক্ষর শিক্ষা হইলে ছোট্ট অক্ষর একত্র করিয়া 'বক' উচ্চারণ করাও।

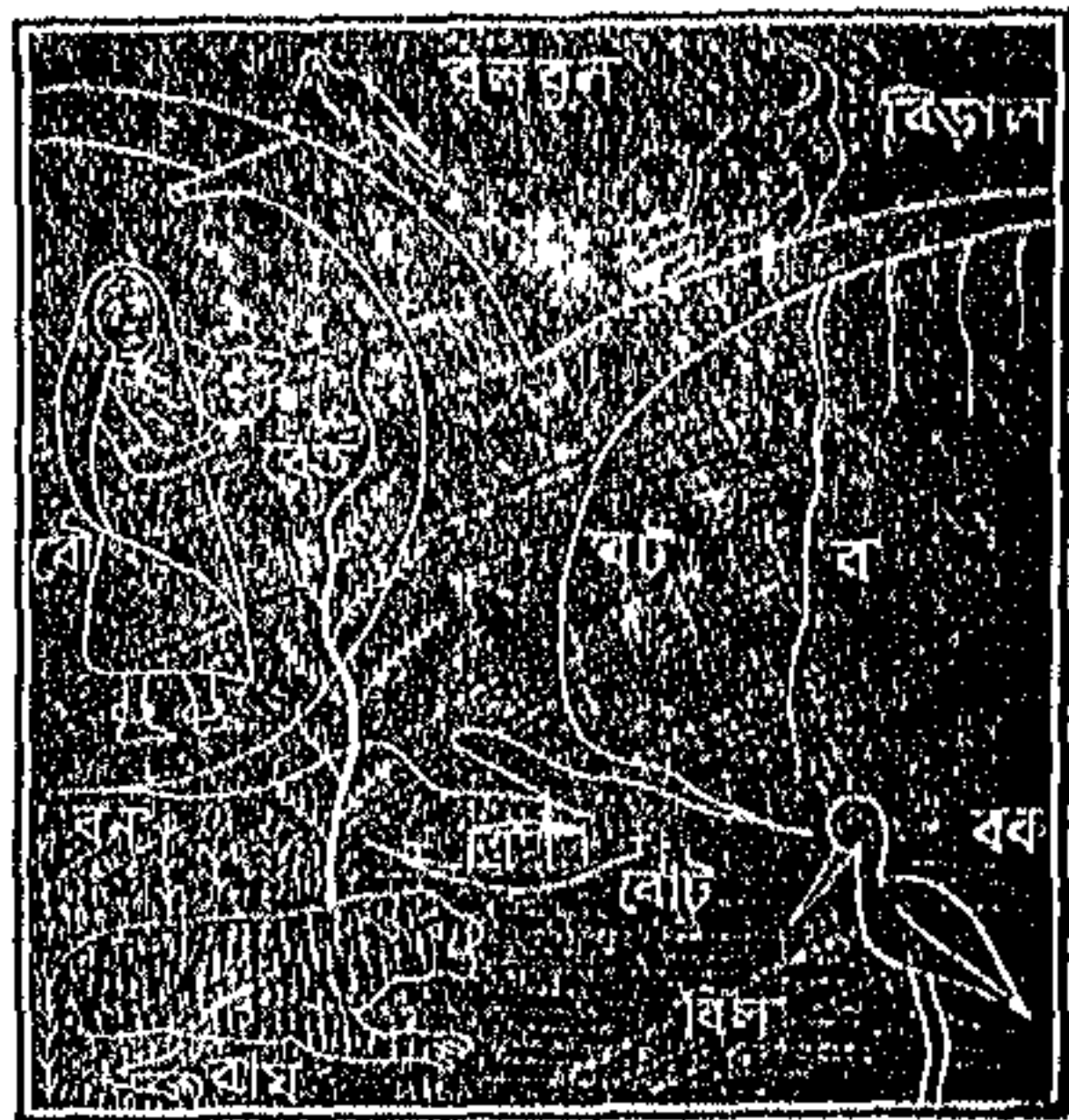
সকলে সমস্তরে 'বক' উচ্চারণ করিবে। বোর্ডে 'বক' শব্দ লিখিয়া তাহার পাশে একটা বকের ছবি আঁকিয়া দাও। কি যদি 'ব' লেখার পর 'ক' লেখা শিখান পছন্দ কর, তবে 'ক' শিখাইয়া 'বক' লিখিয়া দিবে ও বোর্ডে একটা বরের আকৃতি করিয়া দিবে। এ সমস্ত চিত্রে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই। একটা মোটামুটি রকমের রৈখিক চিত্র (out-line) হইলেই চলিবে।



২৮ চিত্র। বোর্ডে বর অঙ্কন।

কেবল বরের মাথার টোপরটি একটু আঁকা করিতে হইবে, কারণ টোপরেই বরের পরিচয়। এইরূপে 'ব' ও 'ক' ঠিক রাখিয়া, বল, বস, বন, কল, রথ প্রভৃতি কথা শিখাইতে হইবে। যে সকল শব্দে কোন জিনিষ বুঝায়, এরূপ শব্দই প্রথমে শিক্ষা দিবে। কেবল একটা মাত্র চিত্র অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে আকার ইকার প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারা যায়। চিত্রাঙ্কনে কিঞ্চিৎ পটুতা থাকিলেই এরূপ শিক্ষা দান সহজ ও সুখকর করিতে পারিবে। মনে কর প্রথমে একটা বটগাছ আঁকিলে (কেবল লাঠনের দ্বারা অঙ্কন—খুব শক্ত নয়), তার ব (বুরি) দেখাও; গাছের ওঁড়ি, ডাল ও বুরি দ্বারা যে একটা ব এর মত অঙ্কন হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখাইতে পার। তার পর 'বট' লিখিয়া বটের গাছের বিষয় গল্প কর। এক ধারে 'বন' আঁক ও লেখ। বনের মধ্য হইতে 'বাঘ' (ব এ আকার যোগ শিখাইবার জন্য) বাহির কর। 'বিলের' (ইকার যোগ) ধারে 'বক' বস। গাছের উপর 'বিড়াল' বস। আর এক ডালে 'বুলবুল' আঁক ইত্যাদি। একখান বোর্ডে, দিন দিন একটু একটু চিত্র বাড়াইবে, আর কেবল পরিচিত পদার্থের চিত্রাঙ্কন করিয়া আকার, ইকার প্রভৃতির ব্যবহার শিখাইবে।

পূৰ্ব্ব দিনেৰ (বোৰ্ডেৰ) চিত্ৰ পুঁছিয়া ফেলিবেনা আৰু তাৰ সৰিহ যোগ কৰিয়া যাইবে । চিত্ৰখণ্ডি একপ ভাবে পৰাম্পৰেৰে সৰিহ সংস্থাই হইবে যে, সমস্ত চিত্ৰখানি যেন একটা মন্তবপৰ ব্যাপাৰেৰ ছবি হয় ।



২৯ চিত্ৰ । চিত্ৰাবলম্বনে শব্দ শিক্ষা ।

শব্দটী শিক্ষাৰ সঙ্গে সেই জিনিস বা জিনিয়েৰ ছবি দেখাইলে' বালকগণেৰ বড়ই আনন্দ হয় । আৰু তাহাৰা যে জ্বা বিশেষেৰ নাম পড়িতে বা লিখিতে জানে ইহা বুঝিতে পাৰিয়া উৎসাহিত হয় ।

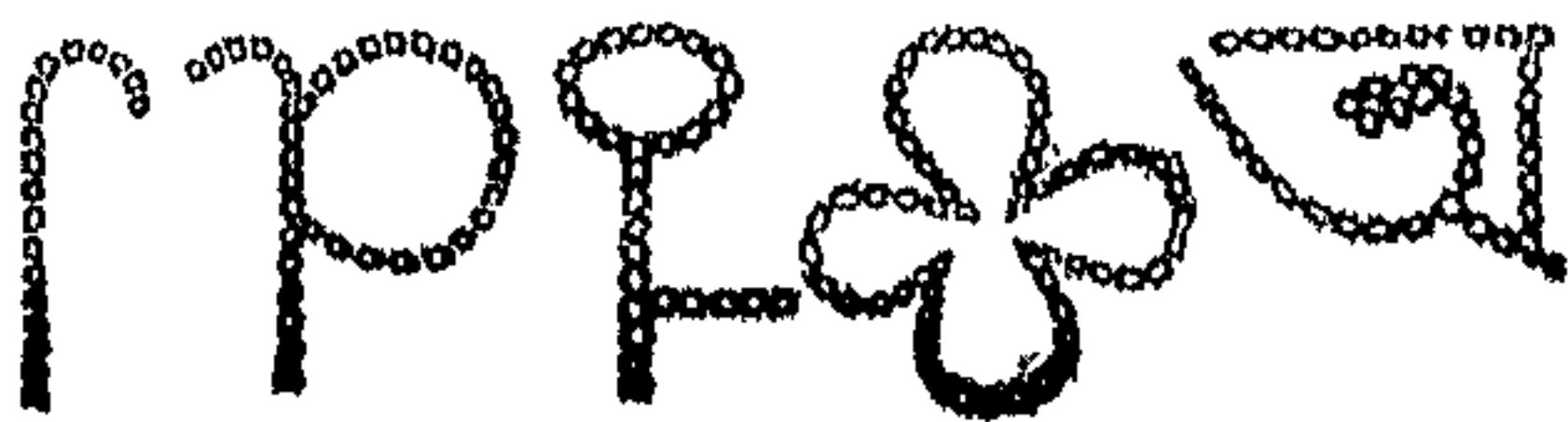
ষেটীৰ পৰ যে অক্ষৰ শিক্ষা দিওৱা সুবিধা হওতে পাৱে নিম্নে তাহাৰ আভাস দেওৱা গেল ।—

ব	র	ক	খ	বা	ধা	।	য	য	ফ	ঘ	।	ন	ণ	ম	থ	খ	ল	শ	।
ত	অ	আ	ভ	৯	।	ঢ	ট	ঠ	চ	ছ	।	ড	উ	ঊ	ঔ	জ	।		
হ	ই	দ	গ	প	।	এ	ঐ	ঔ			।	ও	ঔ			স	ঈ	।	

তবে যে ঠিক এই শৃঙ্খলাক্ৰমেই শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নহে । আবশ্যক বোধে শিক্ষক নিজেৰ মত বিভাগ কৰিয়া লইতে পাৱেন । আৰু

এক কথা, ১০।১৫টা অক্ষর শিক্ষা হইলে পর বিশেষ কোন শৃঙ্খলার আবশ্যক হইবে না।

বীজ সাজান।—তেঁতুলের বীজ, কড়ি, ছোট ছোট পাথরের টুকরা দ্বারা বাজানো অক্ষর প্রাপ্ত করা হইতে চাইবে। প্রথম প্রথম মাটির উপর কি স্ট্রোটের উপর ঢকের দ্বারা অক্ষর লিখিয়া দিবে। বালকেরা বীজ বা কড়িগুলি অক্ষরের দাগের উপর সাজাইবে। এইরূপ দু চারি দিবস অভ্যাস হইলে, একটা অক্ষর (যথা ব) লিখিয়া দিবে আর সেই অক্ষরের একটু একটু পরিবর্তন করিয়া অল্প অক্ষর প্রাপ্ত করাইতে শিখাইবে। মনে কর প্রথমে তেঁতুল বীজ দিয়া একটা 'ব' সাজাইলে বালক 'ব' প্রাপ্ত করিল এবং মুখেও 'ব' পড়িল। তারপর একটা বীজের দ্বারা ফোঁটা দিয়া বালক 'ব' কে 'র' করিল ও 'র' পড়িল। তারপর ফোঁটার বীজটা তুলিয়া, 'ব' এ আঁকড়ী লাগাইয়া 'ক' করিবে, ও 'ক' বলিয়া পড়িবে। এইরূপে 'ক'এব আঁকড়ী সরাইয়া 'খ' করিবে ইত্যাদি। কথা এই যে একটা অক্ষর আবস্ত করিয়া, তাহারই কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া সেই আকারের অন্যান্য অক্ষর প্রাপ্ত করাইতে হইবে।



৩০ চিত্র।—বীজের ব্যবহার।

তেঁতুলের বীজের দ্বারা দ্রব্যের অনুকরণ বা নানারূপ সাজ প্রাপ্ত করা হইতে হইবে। কাঠী দ্বারা বক্ররেখা করা যায় না, কিন্তু তেঁতুলের বীজ সাজাইয়া সহজেই বক্ররেখা করা যাইতে পারে। এইজন্য কাঠীর গঠনে যে সকল মিত্র দেওয়া হইয়াছে, বীজের দ্বারা সে সকল ত করা যাইতে

পারে, তাহা ছাড়া লাঠী, পাখা, টাবি, ফুল প্রভৃতি বক্র রেখাযুক্ত দ্রব্যের গঠন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

অক্ষর শিক্ষা বিষয়ে আরও অনেক কথা “বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা” অনুচ্ছেদে লিখিত হইল। কাঠী, বীজ প্রভৃতির সাহায্যে অক্ষ শিক্ষার প্রণালী ‘পাটীগণিত’ অনুচ্ছেদে লিখিত হইল।

৯ম খেলনা।—কতকগুলি ছোট ছোট লৌহ-বলয়। তার কতকগুলি আঁস্ত, আর কতকগুলি আঁদখান ও শিকিখান করিয়া কাটা। এই গুলির দ্বারা বক্র রেখাযুক্ত নানাবিধ মাজ প্রস্তুত করাইতে হয়।

এরূপ খেলনা আগাদিগের বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়না বটে কিন্তু আমাদিগকে বক্র রেখা ও কুটিল রেখা শিখাইতে হয়। বক্র (বঁকা) ও কুটিল (এঁকাবঁকা) রেখা শিখাইবার সময় যদি শিক্ষক বালকগণের হাতে একটু একটু লৌহ-তারের টুকরা দিতে পারেন তবে কাজের বেশ সুবিধা হয়। অভাবে পাতলা বাঁশের চটা বা সরু কাঠী বা বেতের টুকরা হইলেও চলিতে পারে। শিক্ষক নিজে তার বা বাঁশের চটা হাতে করিয়া বলিবেন “এই তার সোজা” তার পর বঁকাইয়া বলিবেন “এই তার বঁকা হইল”। বালকেরা নিজের তার বঁকাইয়া শিক্ষকের অনুকরণ করিবে। তারপর দুইটা ছেলেকে দাঁড় করাইয়া তাহাদের হাতে একগাছি দড়ি দিয়া টান করিয়া ধরিতে বলিবে। টান করিয়া ধরিলে সোজা রেখা হইল। একটা ছেলেকে অপর ছেলেটির দিকে সরাইলেই দড়ি টিল পড়িয়া বঁকা রেখার দৃষ্টান্ত হইবে। ধনুক, থালা, বাটী ও আম কাঁটাল পাতার ধার, চণ্ডের জ্র প্রভৃতি বঁকা রেখা। শিক্ষক বোর্ডে নানা রকমের বঁকা রেখা আঁকিয়া দিবেন। তারপর শিক্ষক হাতের তারকে সাপের গতির মত এঁকাবঁকা করিয়া গড়িয়া, এঁকাবঁকা রেখা দেখাইবেন। বালকেরা নিজের তারে তাহার অনুকরণ করিবে। মাটির উপর দড়িগাছি সাপের গতির মত এঁকাবঁকা করিয়া রাখিলেও এঁকাবঁকা রেখার দৃষ্টান্ত

হইবে। বেগুনের পাতা, কুমড়ার পাতা ও গোলাপের পাতার দ্বারা এঁকা-
বেঁকা। শিক্ষক বোর্ডে এঁকাবেঁকা রেখা আঁকিয়া দিবেন। (এই
সমস্ত পাতা বা অল্পাংশ দ্রব্য শিক্ষককে পূর্বেই এ পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া
রাখিতে হইবে যে সকল বালকই যেন প্রত্যেক রকমের পাতা বা জিনিষ
একটা একটা নিজেরা পরীক্ষা করিতে পারে)।

১০ম খেলনা।—শিক্ষকের জন্য একখান কিওয়ারগার্টেন বোর্ড
ও বালকদিগের জন্য কিওয়ার গার্টেন স্লেট বা খাতা। চিত্রাঙ্কন শিক্ষাই এই
খেলনার উদ্দেশ্য।

কিওয়ারগার্টেন বোর্ড।—সাধারণ কাল বোর্ডের উপর লম্বালম্বী ও পাশাপাশী ১ ইঞ্চ ফাঁক
করিয়া লাল রঙের কাল কাটা। একপ কাল কাটিবার প্রণালী পরিশিষ্টে বোর্ড নির্মাণ পদ্ধতিতে
লিখিত হইয়াছে। একপ বোর্ড কিনিতেও পাওয়া যায়।

কিওয়ারগার্টেন স্লেট।—একখানি স্লেটের এক পৃষ্ঠের উপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ $\frac{3}{4}$ ইঞ্চ ফাঁকে
ফাঁকে লোহ প্রোক বা শলাকার দ্বারা কাল কাটা। একপ স্লেট কিনিতে পাওয়া যায়, তবে
শিক্ষক নিজে হাতেও করিয়া দিতে পারেন।

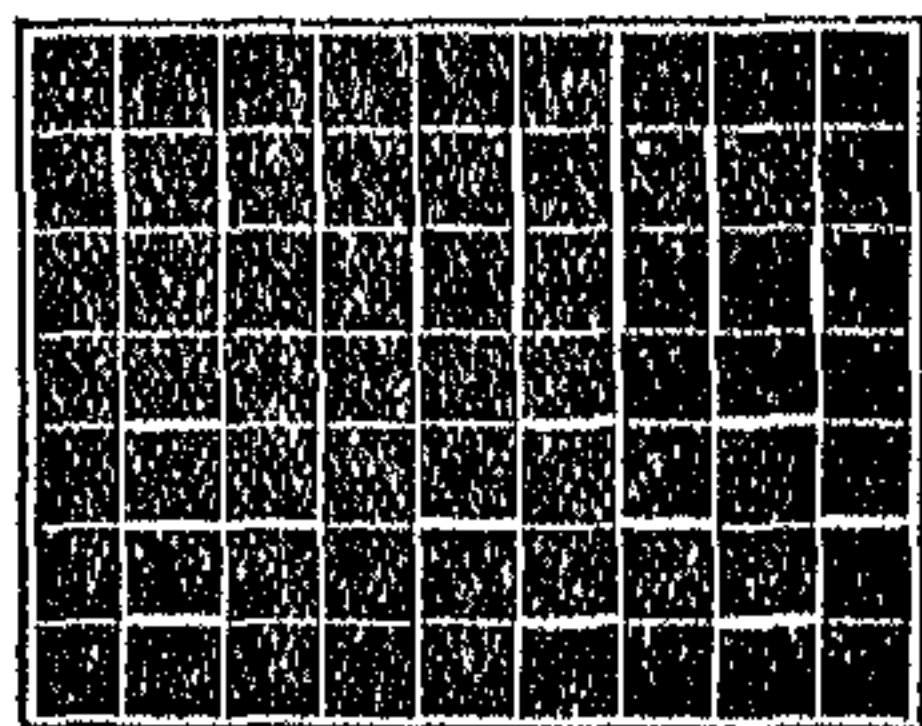
কিওয়ারগার্টেন খাতা।—কাগজের উপর পেন্সিল বা খুব পাতলা সবুজ বা নীল কালী
দ্বারা $\frac{3}{4}$ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে কাল কাটা। একপ খাতাও কিনিতে পাওয়া যায়।

বালকের বয়স যখন ৪ বৎসর তখনই তাহার হাতে স্লেট, পেন্সিল
দিতে হইবে। সে পেন্সিলের দ্বারা স্লেটের উপর তাহার ইচ্ছা মত হিজি-
বিজি করিবে। চক দিয়া মাটি বা বোর্ডের উপর এইরূপে যথেষ্ট দাগ
কাটাকাটি করিবে। ইহার দ্বারা হাতের জড়তা দূর হইবে। কিরূপ
জোরে পেন্সিল ধরিতে হয়, কেমন করিয়া দাগ কাটিতে হয় তাহা বালক
এইরূপ অনুশীলনে নিজেই বুঝিতে পারিবে।

৫ বৎসর বয়সে কিওয়ারগার্টেন স্লেট হাতে দিবে। ইহার পূর্বেই
বালকদিগের খাড়া, তেড়া ও পড়া রেখার এবং বেঁকা ও এঁকাবেঁকা
রেখার শিক্ষা দিতে হইবে (৮ম ও ৯ম খেলনার বিষয় পাঠ কর)।

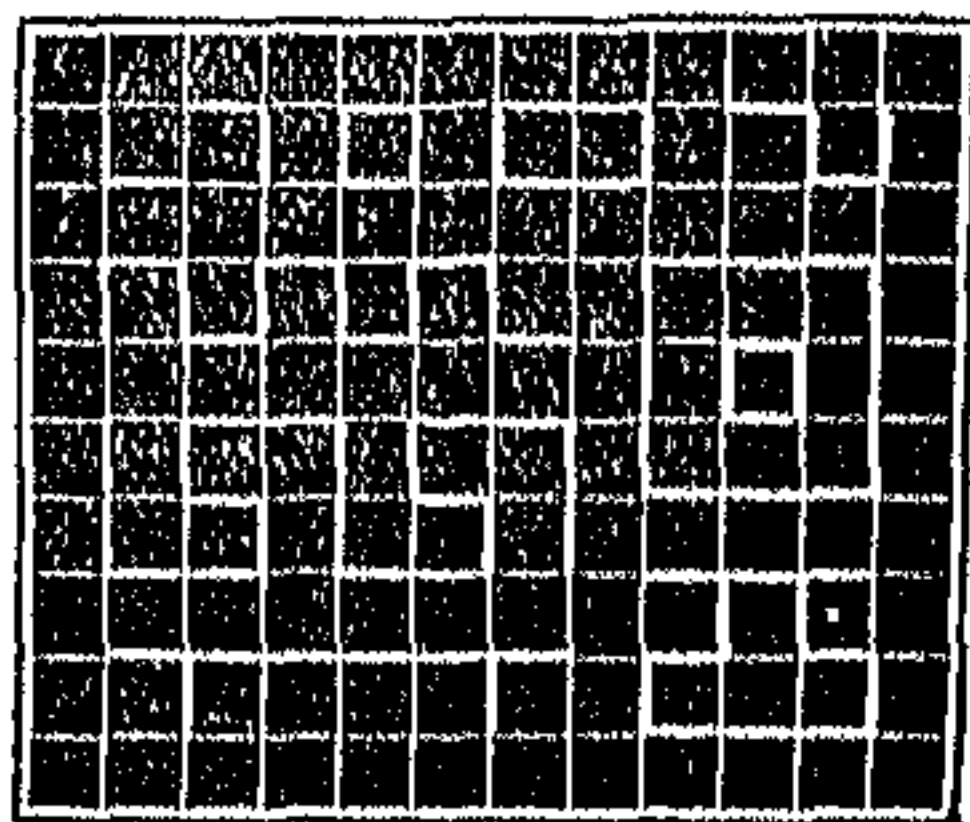
প্রথমে স্লেটে খাড়া রেখা ও পড়া রেখা অঙ্কন অভ্যাস করিবে।

প্রথমে সমান সমান রেখা, তান পব একটা আপমান জগনাটী দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদি অঙ্কন করিবে । শুভান দ্বারা অল্পপাঃঃঃ উনম জ্ঞান জগাইবে । নিম্নের চিত্র দেখিলেই শিক্ষকেরা এ পদ্ধতি বুঝিতে পারিবেন । শিক্ষক বোর্ডে এইরূপ দাগ কাটিবেন আর বানাকেরা সেটে তাহান অঙ্কন করিবে ।



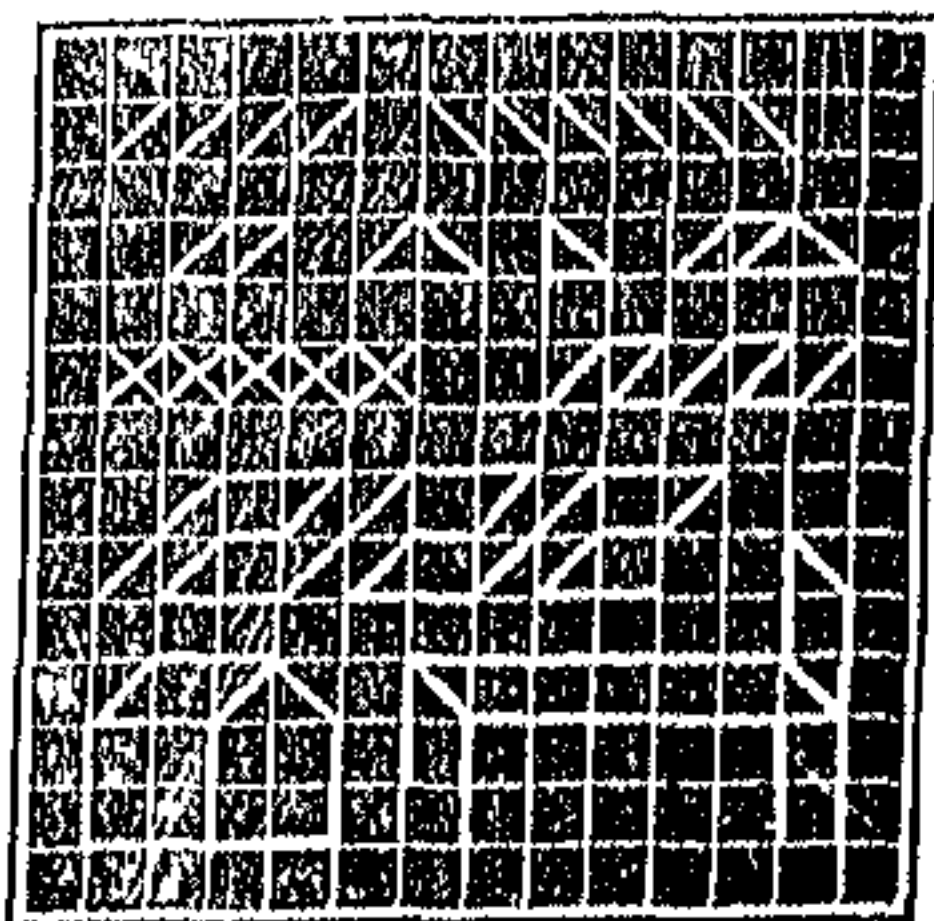
৩১ চিত্র । খাড়া ও পড়া টান ।

এইরূপ খাড়া ও পড়া রেখা অঙ্কন কিছু অভ্যাস হইলে, খাড়া ও পড়া রেখা দ্বারা নানারূপ দ্রব্য ও সাজ প্রস্তুত করিতে শিখাইতে হইবে :—



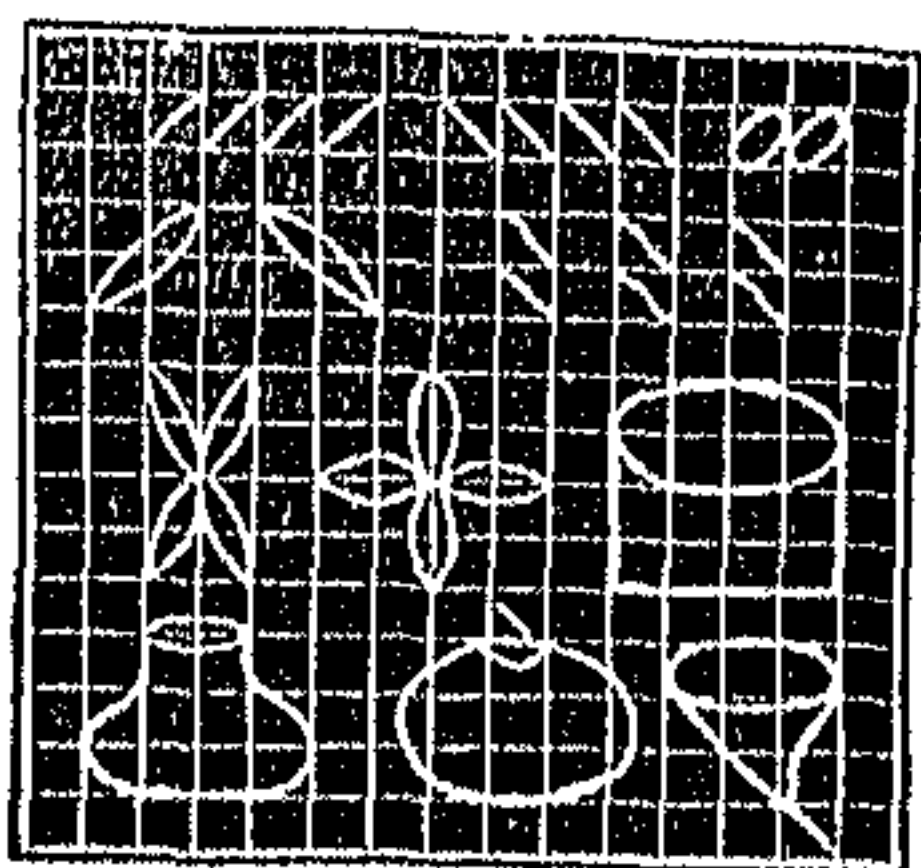
৩২ চিত্র ।—খাড়া টান ও পড়া টানের যোগ ।

ইহার পব তেড়া রেখা অঙ্কন শিখাইতে হইবে । বর্গক্ষেত্রগুলি কর্ণ রেখা ক্রমে যোগ করিলেই তেড়া রেখা হইবে । তার পর তেড়া, খাড়া, পড়া রেখা দ্বারা দ্রব্য ও সাজ অঙ্কন শিখাইবে । নিম্নে আদর্শ প্রদত্ত হইল ।—



৩৩ চিত্র ।—তেড়া টানের যোগ ।

ইহাব পর বঁকা বেখাব ব্যবহার শিখাইতে হইবে ।—



৩৪ চিত্র ।—বঁকাটানের যোগ ।

প্রথম শিক্ষার সময় বালকেরা যাহাতে মোটাগুঠী রকমে ভাব প্রকাশ করিয়া চিত্র অঙ্কন করিতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে । লাইন উত্তম হইল না, কি গঠন সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইল না, এসকলের দিকে তেমন দৃষ্টি রাখার আবশ্যক নাই; একটু একটু ভাব প্রকাশ হইলেই চিত্রাঙ্কনের প্রতি বালকের আশক্তি জন্মিবে । আর আসক্তি জন্মিলেই তাহার চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিবার জন্য একটা আকাজক্ষা হইবে । এই আসক্তি জন্মাইয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য । বালককে পঞ্চমবর্ষেই রবি বর্ণীয় পরিণত করা উদ্দেশ্য নহে । চিত্রাঙ্কন পরিচ্ছেদে এই বিষয় সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞাতব্য উপদেশ জষ্টব্য ।

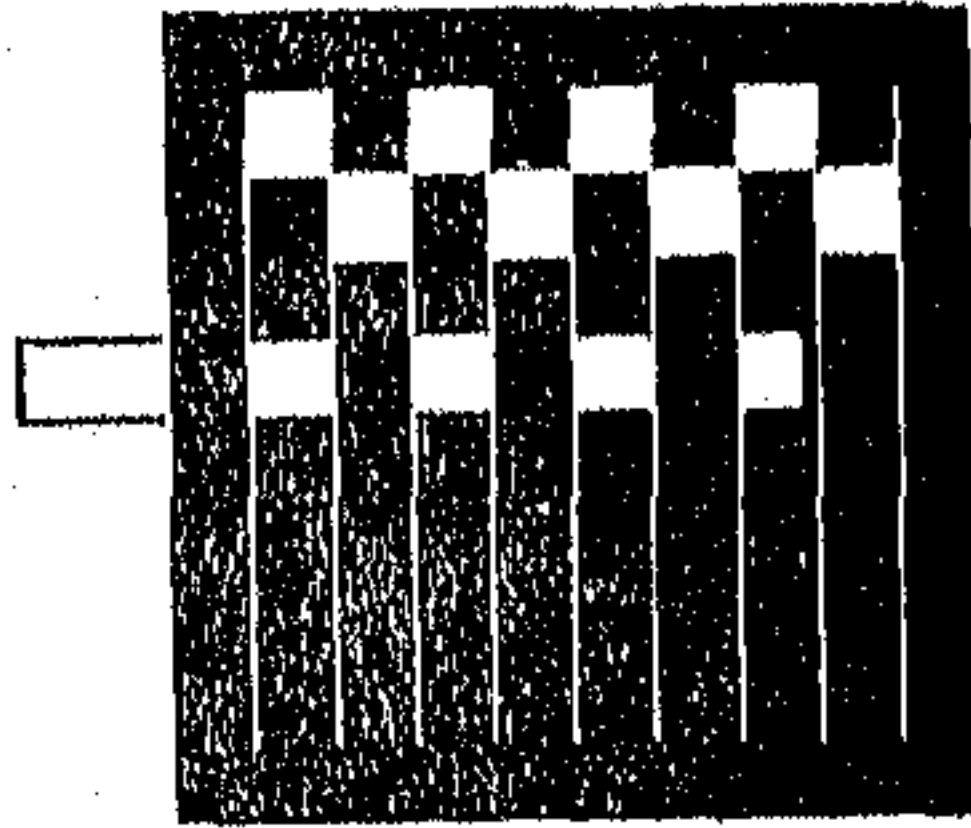
১১শ খেলনা ।—১০ম খেলনায় বেধশূন্য রেখার ব্যবহার করা হইয়াছে । এই ১১শ খেলনায় সেই রেখার সূক্ষ্মতম অংশ 'বিন্দু' লইয়া কারবার । কেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি ! ১১শ খেলনার বিষয়, পূর্বের খেলনার মত চেক্-কাটা কাগজ আর একটা মোটা স্ক্‌চ । এই স্ক্‌চের দ্বারা কাগজের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া নানারূপ লতা পাতা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এই খেলনা বিশেষ আবশ্যকীয় । এই রকম ছিদ্র করিবার জন্য চিহ্নযুক্ত চেক্-কাটা মোটা কাগজ কিনিতে পাওয়া যায় ।

১২শ খেলনা ।—এটাও বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় । ঐ ১১শ খেলনার ছিদ্রকরা কাগজে উল কি রঙকরা সূতা দিয়া (স্ক্‌চের সাহায্যে) নানারূপ ফুলপাতা বুনন করাই এ খেলনার উদ্দেশ্য ।

১৩শ খেলনা ।—রঙকরা কাগজ ও একখানি মাথামোটা কাঠী (ছোট ছোট বালকগণকে সূক্ষ্মমাথায়ুক্ত কাঠী দিতে নাই । অসাবধানে কোথাও বিদ্ধ করিয়া কষ্ট পাইতে পারে) আর একশিপি আঁটা । কাগজের ফুল ও পাতা ও সাজ কাটা শিখাইতে হইবে । লাল কাগজে সুন্দর সুন্দর ফুল কাটিয়া ও সবুজ কাগজে পাতা কাটিয়া, আঁটার দ্বারা সাদা কাগজে লাগাইলে বেশ দেখায় । আবার থাকে থাকে কাগজ আঁটিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর ফুল ও পাতা প্রস্তুত করা যায় । এই সমস্ত কাগজের ফুল পাতা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়াই ১৩শ খেলনার উদ্দেশ্য ।

১৪শ খেলনা ।—কাগজের চাটাই বুনন । ইহার এত রকম আছে যে তিন বৎসরের শিশু হইতে ১৩শ বৎসরের বালক পর্যন্ত এই খেলনায় আমোদ পাইতে পারে । এই খেলনার আমবাঁও মূল্যবান নহে । বাজারে যে একপিট উজ্জল রঙকরা এক রকম কাগজ

পাওয়া যায় তাহাই ইহার প্রধান উপকরণ। তবে ছোট ছেলেদের জন্য, শিক্ষককে একখানি ধারাল ছুরি ও রুলের সাহায্যে কাগজ কাটয়া দিতে হইবে।



৩৫ চিত্র।—চাটাই বুনন।

একখানি আয়ত ফেত্রাকার (মনে কর $৬'' \times ৪''$) রঙ করা (মনে কর সবুজ) কাগজের উপর নীচে একটু কাগজ বাদ দিয়া ফালি কাটিবে, যেন কাগজের ফালিগুলি পড়িয়া না যায়। তারপর অন্তরালের কাগজে, (মনে কর লাল) ঠিক এই সকল ফালির প্রস্থের সমান করিয়া, আর কতকগুলি আলাগা ফালি কাটয়া লও। এখন চিত্রের অনুরূপ, একটার নীচে একটার উপরে দিয়া, আলাগা ফালিগুলি লাগাইয়া যাও; বেশ সুন্দর চাটাই হইবে। প্রথম ফালিগুলি যেমন ভাবে বসাইবে, দ্বিতীয় লাইনে ঠিক তার বিপরীত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম লাইনে ১টার উপর ১টার নীচে চালাইলে, দ্বিতীয় লাইনে ১টার নীচে ১টার উপরে না গাঁথিলে সুন্দর দেখাইবে না। আবার এই রকমে :—

(২) এক লাইনে ২টার উপরে, ২টার নীচে, পরের লাইনে ২টার নীচে, ২টার উপরে,

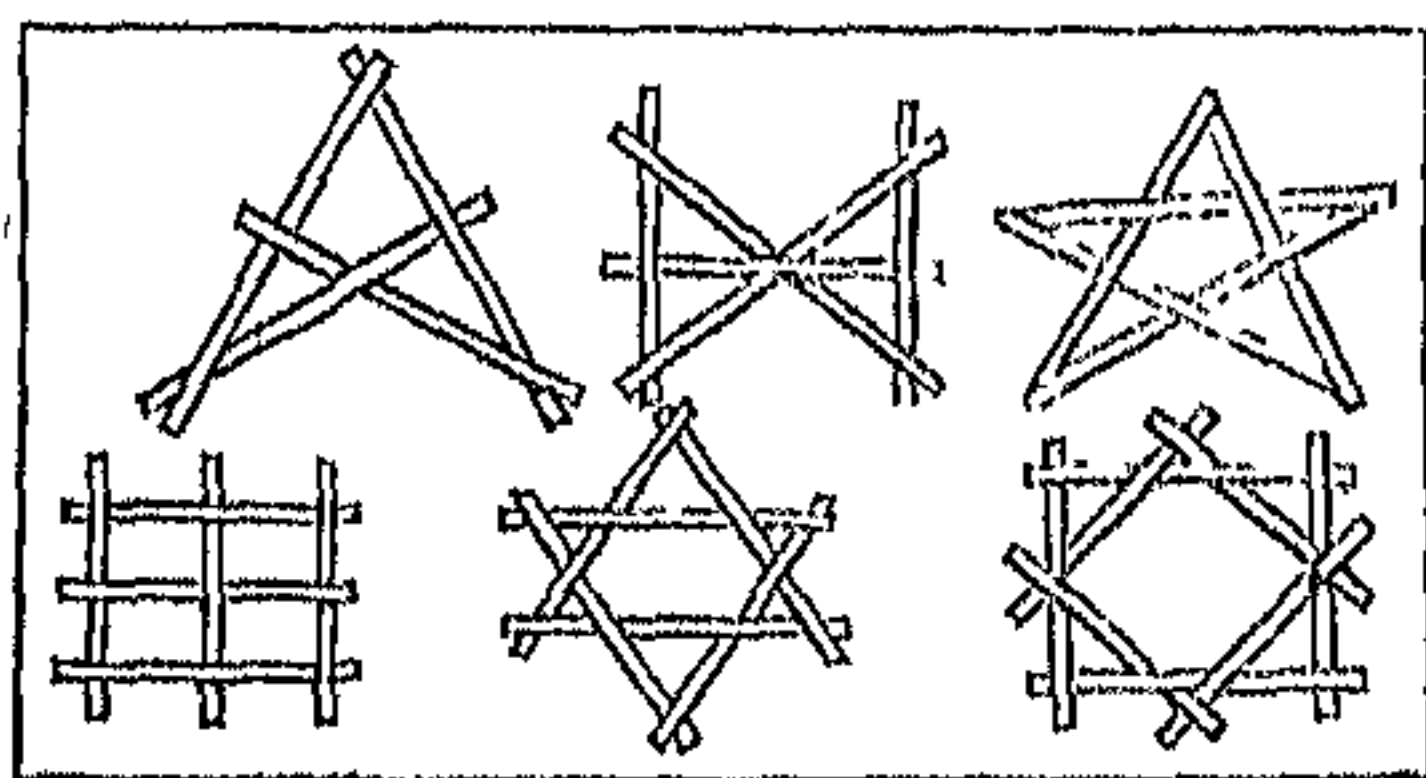
(৩) " " ২টার উপরে, ১টার নীচে, " " ২টার নীচে, ১টার উপরে,

(৪) " " ৩টার উপরে, ১টার নীচে, " " ৩টার নীচে, ১টার উপরে,

(৫) " " ৩টার উপরে, ২টার নীচে, " " ৩টার নীচে, ২টার উপরে,

ইত্যাদি নানাপ্রকার চটাই বুনন শিখাইতে পারা যায়। শিক্ষক নিজে একখানি বুনিতে আরম্ভ করিবেন আর যেকাপ আদর্শ বালকগণের দ্বারা আলোচ্য করা হইতে ইচ্ছা করেন, সেই ধারায়সারে বালকগণের পরিচালনার্থ এইরূপে ডাকিয়া বলিবেন :—“১ উপর, ২ নীচ” অর্থাৎ প্রথম ৩টার উপর দিয়া যাইবে তারপর ২টার নীচে দিয়া যাইবে; এইরূপ ১ উপর ২ নীচ করিয়া প্রথম লাইন শেষ হইলে, আবার “২ উপর ১ নীচ” এইরূপ ডাকিয়া বলিবেন। বালক-বালিকাগণ দ্বিতীয় লাইনে এই অঙ্গুসারে কার্য্য করিবেন। এই সমস্ত চটাইএর আলাগা ফালিগুলি একটু আটা দিয়া আটিয়া যদি খাতার উপর লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে খাতার বেশ সুন্দর মলাট হয়। এই খেলনায় দুই হাতেরই চালনা হইয়া থাকে। বালকগণের নিপুণতা অভ্যাস হয়। শিষ্য শিক্ষার এই সমস্তই সূচনা।

১৫শ খেলনা।—১০ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ইঞ্চি চওড়া ও চট্ট ইঞ্চি মত পুরু কতকগুলি বাঁশের চটা। বিলতি কি গুঁড়গাটেন বাক্সের সঙ্গে *তলা কাঠের চটা থাকে, কিন্তু বাঁশের চটাই আমাদের পক্ষে সস্তা ও বৈধাজনক। এইগুলির দ্বারা নানা রকমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পূর্বে খেলনায় কাগজের ফালিগুলির যেমন ব্যবহার হইয়াছে, এবারে এ চটাগুলিরও প্রায় সেটরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। নিম্নের চিত্র দেখিলেই শিক্ষকগণ ইহার ব্যবহার বুঝিতে পারিবেনঃ—



৩৬ চিত্র :—চটাসাজান।

১৬শ খেলনা ।—১৫শ খেলনার মত কাঠের চটা, তবে লম্বায় ৪ ইঞ্চি মাত্র । এই ছোট ছোট চটাকুলি কজায় দ্বারা আটা । ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যায় । ইহার ব্যবহার কতকটা পূর্ব খেলনার মত, তবে তাহা অপেক্ষা একটু জটিল ।

১৭শ খেলনা ।—সাদা বা রঙ করা কাগজের দশ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া কতকগুলি ফাটি । ব্যবহার ১৬শ খেলনার মত, তবে তাহা অপেক্ষা একটু অধিক শক্ত ।

১৮শ খেলনা ।—কাগজ ভাঁজ করা । এ খেলনার দ্বারা অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারা যায় । আর এ খেলনায় খরচও নাই । এক টুকরা সাদা কাগজ হইলেই হইল ।

প্রথমে বালকগণকে ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২ ইঞ্চি প্রস্থ আয়ত ক্ষেত্রাকার কাগজের টুকরা দাও । ভাঁজ শিক্ষা দিবার পূর্বে, বালকগণের সঙ্গে কাগজ সম্বন্ধে গল্প কর । কাগজের রঙ সাদা, কাগজ পাতলা, মসৃণ, ভাঁজ করা যায়, সহজে ছেঁড়া যায়, ছেঁড়া নেকড়া দিয়া কাগজ তৈয়ারী করে ইত্যাদি মোটামুটি বিষয়ে একটু আলোচনা কর । তারপর এই কাগজ টুকরার ৪ কোণ, ৪ ধার । ৪ ধারের, দুই দুই ধার সমান ; আবার ২ ধার বড়, আর দুই ধার ছোট । কোণ ৪টি সমকোণ । টেবিলের কোণ, স্টুটের কোণ, ঘরের কোণ প্রভৃতি সমকোণ ।

তার পর ভাঁজ করা—নোচের দ্বার তুলিয়া উপরের ধারের সহিত মিল কর । মধ্য টিপিয়া ভাঁজ কর । একটা আয়ত ক্ষেত্রে, ২টি সমান সমান আয়ত ক্ষেত্র হইল, ইত্যাদিরূপে শিক্ষা দাও ।

ইহার পর বর্গক্ষেত্রাকার কাগজের টুকরা দাও । “চারধার সমান, ৪ কোণ সমকোণ হইলে তাহাকে বর্গক্ষেত্র বলে” ইহা বুঝাইয়া দাও । তারপর ভাঁজ আরম্ভ কর ।

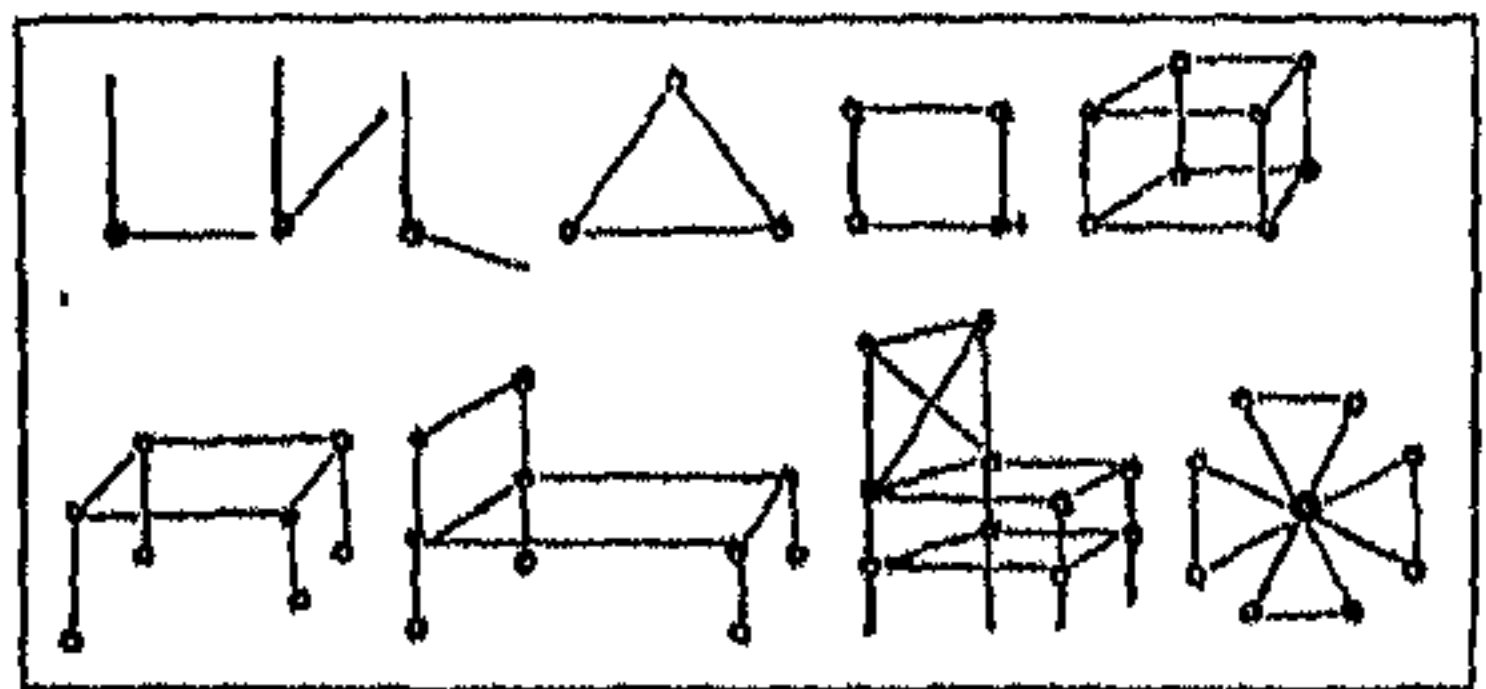
বর্গক্ষেত্রকে মধ্য ভাঁজিয়া ২টি আয়তক্ষেত্রে ভাগ কর । কর্ণরেখা

ক্রমে ভাঁজিয়া ২টী সমান সমকোণী ত্রিভুজ কর; এই বেথাকে কর্ন রেখা বলে; কর্ন বেথার দ্বারা এইকণ ফেঁদা দুই সমানভাগে বিভক্ত হয় ইত্যাদির আয়োচনা করিতে হইবে। অত্যাশ্রিত ভাঁজ নিম্নের চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। এই খেলনা জ্যামিতি শিক্ষার সূচনা।



৩৭ চিত্র।—কাগজ ভাঁজ করা।

এ সকল ভাঁজ শিক্ষার পর কাগজের নৌকা, টুপি, দোয়াত, বাস, পাখা প্রভৃতির গঠন শিখাইতে হইবে। এ সমস্ত খেলনা অনেকই গড়িতে জানেন বহিয়া, এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ লিখিত হইল না। যে শিক্ষক না জানেন, তিনি অল্পের নিকট শিখিয়া লইবেন। এ বিষয়ে লিখিয়া উপদেশ দিতে গেলে কেবল পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় মাত্র, কারণ লিখিত উপদেশ বুঝিবার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক হয় না।



৩৮ চিত্র—মটর ও কাঠী দ্বারা গঠন।

১৯শ খেলনা।—খুব সরু কাঁটার কাঠীর মত কতকগুলি বাঁশের শলাকা, আর বড় বড় মটর। মটরগুলি ১২ ঘণ্টা জলে ডিজাইয়া

বাধিতে হইবে, আর কাঠাগুলির অগ্রভাগ আবশ্যিক মত ছুরির দ্বারা
সক করিয়া ঘাইতে হইবে। সুতরাং এক একখানা ছুরি থাকাও
আবশ্যক। দেশী কামান্বেবা ছ পয়সা, চাঁদ পয়সা দামের যে ছুরি বিক্রয়
করে, তাহাই একটু ঘাসিয়া ধারান কাবয়া এঠিনোই চলিবে। এই ভিজ্ঞান
মটরের সঙ্গে, কাঠী গাঁথিয়া নানা প গঠন করা যাওতে পারে। ওচ
চিত্র দেখিলেই প্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে।

মটর না ভিজাইয়া, ছোট ছোট করিয়া ভালুন টুকরা কাটিয়া দইলেও
হয়। তরমুজের বা কুমড়ার খোসা, দাড়ির মাথা প্রভৃতি তরকারীর,
পরিত্যক্ত জিনিষ গুলিও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ব্যবহার করা
যায়। পিটেপোড়া, কনককনবা প্রভৃতির ফল কাটিয়াও একাজ
কবিত্তে পারা যায়। খরচ নাই, কেবল শিক্ষকের একটু যত্ন ও চেষ্টা,
আবশ্যক।

এই খেলনায় বালকগণকে পরিমাণ মত কাঠী কাটিয়া লইতে হইবে।
পরিমাণ ও অনুরূপত বোধের অনুশীলন হইবে। পূর্ক্স বর্ণিত খেলনার
প্রণালী মত প্রত্যেক গঠন লইয়াই বালকগণকে কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব
শিখাইতে হইবে।

২০শ খেলনা।—ঠাকুর-গড়া মাটি, মোম বা পুটীন (পুটীন
প্রস্তরের প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে), কয়েকখানি খামোর শক্ত
চটা ও মাটি রাখিবার জন্য এক এক টুকরা কাঠ বা টিন। মোম,
পুটীন দামী জিনিষ। মাটির দ্বারা যখন বেশ কাজ চলিতে পারে,
তখন দামী জিনিষের আবশ্যকতা নাই। পূর্ক্সোক্ত সমস্ত খেলনায়
জব্যাদিব একটা মোটামুটি অনুকরণ কবা হইয়াছে মাত্র। এই শেষ
খেলনায় জব্যের সম্পূর্ণ ও সর্ক্বাঙ্গান অনুকরণ করাই উদ্দেশ্য। মাটির
দ্বারা ছক, ঢোল, বল, বোতল, গেগাস বাটী প্রভৃতি হইতে নানা রকমের
কল, ফুল, পাতা পর্যন্ত গঠন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই খেলনা,

বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও আগোদবর্ধক। মাটির দ্বারা প্রবোর প্রতিকৃতি করিতে গেলেই প্রবোকে পুজাপুজারূপে পবিত্র করিতে হইবে। এই খেলনায় সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির সুন্দর অনুশীলন হইয়া থাকে। যাহারা কিওয়ারগার্টেনের অন্ত কোন খেলাই পছন্দ করেন না, তাহারাও এই খেলনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাহি। কাদামাটি লইয়া খেলা করাও বালকগণের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ কাদা কোমল অঙ্গুলির অতি সহজ সঞ্চালনেই ইচ্ছানুরূপ নানা আকারে পরিবর্তিত হয়। মৃদুর্ভি গঠন পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

কিওয়ারগার্টেনের অন্যান্য কার্য।—কিওয়ারগার্টেন নির্বাচিত বিশেষ খেলা ছাড়া আরও কতকগুলি অতিরিক্ত খেলা ও খেলনার বিধান আছে। কিওয়ারগার্টেন খেলনার সহিত এই গুলিকে পৃথক করিবার অস্ত্র, ইহাদিগকে কিওয়ারগার্টেন খেলনা বা বিলয়া কিওয়ারগার্টেন কার্যা বলা হইয়া থাকে। কিওয়ারগার্টেন কার্যের মধ্যে ভঙ্গী-সঙ্গীত সুবল-সম্মত। অন্যান্য কার্যা নানা ব্যক্তি দ্বারা ক্রীত।

ভঙ্গী-সঙ্গীত।—যে সকল সঙ্গীতের সম্মত করিবার সময় সঙ্গীত-নির্দিষ্ট ভাব গুলি ভঙ্গীর দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাকে ভঙ্গী-সঙ্গীত বলে। মনোগত ভাব প্রকাশের প্রধান উপায় শব্দ ও ভঙ্গী। যেখানে এই শব্দ ও ভঙ্গী একত্র মিলিত হয়, সেখানে ভাবও উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয়। তবে বালকগণের সহজ বোধের নিমিত্ত প্রথম প্রথম কিওয়ারগার্টেন-সম্মত সঙ্গীতে ভঙ্গীর আধিক্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষে এই আধিক্য কমিয়া গিয়া নিয়মিত ভঙ্গীতে পরিণত হয়।

ভঙ্গী-সঙ্গীত-শিক্ষায় শিক্ষকগণকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে :—

(১) কিওয়ারগার্টেন খেলনায় বা কার্যে যে বিষয়ের আলোচনা হইবে, তাহা উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীত বচনা করিতে হইবে (১ম খেলনার

শেষ অংশ পাঠ কর) অথবা কোন সরল উপকথা বলিয়া, তাহাই উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে হইবে ।

(২) যাহাতে গীতটী বালকেরা মোটামুটী রকমে বুঝিতে পারে সেরূপ ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে । বালকগণের বয়স বিবেচনায় ভঙ্গী-সঙ্গীতের ভাব, ছন্দ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে । ছোট ছোট শিশুগণের পক্ষে সহজ ভাব, সরল ছন্দ ও স্বল্প পরিমাণ বিধেয় ।

(৩) সঙ্গীত গুলি ছড়ার আকারে হইলেই চলিবে—পদ্যের নিয়মানুসারে অক্ষর গণনাদির বিশেষ প্রয়োজন নাই ।

(৪) এই সঙ্গীত গুলি কবিতার মত আবৃত্তি করিলেই চলিবে । তবে পারিলে একটু সরল সুর সংযোগ করা মন্দ নয় । শিক্ষক প্রথমে সঙ্গীতটী খুব সহজ সুরে গান করিয়া শুনাইবেন ও গানের বা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সুরসঙ্গত ভঙ্গী প্রদর্শন করিবেন । বালকগণ নিবিষ্ট-চিত্তে শিক্ষকের অনুকরণ করিবে ।

(৫) সঙ্গীতটীর সমস্ত অংশ একেবারে শিখাইতে চেষ্টা করিবেন না । প্রথম অংশ উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় অংশ হইলে তৃতীয় ইত্যাদি ।

(৬) যাহাতে সকল বালকের সমান সুর ও ভঙ্গী হয়, ও যাহাতে সকল বালক এক সঙ্গে একরূপে অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতে পারে, সে বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।

(৭) ভাব-ভঙ্গী সমূহ যাহাতে বালকগণের সুখপ্রদ হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এই ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষার বয়স ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত । ইহার পর হইতে অভিনয় শিক্ষা দিতে হইবে । ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ২ জনের (কথোপকথন) ও তাহার পরে বহুজনের (নাটকের) অভিনয় শিক্ষা দেওয়া রীতি ।

ভঙ্গী-সঙ্গীতের আদর্শ :—১। মনে কর শোনাতে বালকগণকে মাদা কাল
রঙ (বঙ্গীয় কিতাবগার্টেনের প্রথম মান) শিখা দেওয়া হইল। এই শিক্ষার শেষে
বালকগণের সুখকর অথচ নিম্ন সংস্কৃত একটা ভঙ্গীমধ্যম শিখা দিতে পারিলে আমোদ
ও আলোচনা ছুইই হইবে। নিম্নে এইরূপ মধ্যম বা চড়ার একটা আদর্শ দেওয়া
হইল :—

দাঁত মাদা (১)

নথ মাদা (২)

মাদা কাপড় খানি (৩)

চুল কাল (৪)

ভুরা কাল (৫)

কাল চোখের মণি (৬)।

- (১) দক্ষিণ হস্তের তর্জনির দ্বারা দাঁত দেখাইয়া।
- (২) দক্ষিণ হস্তের তর্জনির দ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুলির নথ দেখাইয়া।
- (৩) দুই হাতে কোঁচার কাপড় একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া।
- (৪) দক্ষিণ হাতের তর্জনির দ্বারা চুল দেখাইয়া।
- (৫) বাম হস্তের তর্জনির দ্বারা বাম ভুরা দেখাইয়া।
- (৬) দক্ষিণ হস্তের তর্জনির দ্বারা দক্ষিণ চোখের মণি দেখাইয়া।

প্রথমে, প্রথম দুই লাইন শিখাইবে। তারপর অবশিষ্ট অংশ। প্রথম প্রথম
অভ্যাসের জন্য ৫।৭ বারের অধিক আলোচনা করা কর্তব্য নহে। মাত্রাদিকা হইলে বালক-
গণের বিরক্তি জন্মিতে পারে। উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, মনস্ত সঙ্গীত এক সময়ে ৭
বারের অধিক আবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

২। উপকথা অমুচ্ছেদে লিখিত ৩য় গানের সংলাপে নিম্নলিখিত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া
যাইতে পারে :—

তাই তাই তাই*, সামাবাড়ী* যাই*

মাগা দিল* দই মলেশ*, মোরে* বসে থাই*

মাগী এস* মাঠী হাতে*, পালাই পালাই**

- (১) তিনবার হাতে তালি দিয়া।
- (২) ডান হাতের তর্জনি দ্বারা দূরে বাড়ী দেখাইয়া।
- (৩) এক পা আগ্রসর হওন, যেন কোথাও যাওয়া হচ্ছে।
- (৪) ডান হাত নাড়াইয়া কোন গ্রন্থি দিবান মত ভঙ্গী করিয়া।

(৫) কোন জিনিষ লইবার জন্ত যোগন করিয়া হাতের তালু পাতিতে হয় সেইরূপ করিয়া ।

(৬) ডান হাতের তর্জনী দ্বারা দরজা দেখাইয়া ।

(৭) ডান হাতে খাইবার গুত ভক্ষী করিয়া ।

(৮) পশ্চাতের দিকে চাহিয়া, যেন পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিতেছে এই ভাব দেখাইয়া ।

(৯) দুই হাতে লাঠী পরিবার গুত ভাব করিয়া ।

(১০) সকল বালক একসঙ্গে ৪৫ পা দৌড়াইয়া যাইবে । (সঙ্গে সঙ্গে ছুটি কি টিফিনের ছুটির ব্যবস্থা হইলে উত্তম হয়) ।

৩। কোন কোন পাঠ (যথা বঙ্গীয় কিডারগার্টেন ১ম মান—শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেবল এইরূপ সঙ্গীতের সাহায্যেই শিক্ষা দিতে পারা যায় :—

এইটী মস্তক মোর, এ দুটী চরণ,
এইটী উদর মম, এ দুটী নয়ন ।
এই বক্ষ, এই নাভি, এই দুটী উরু,
এই মোর কটদেশ, এই দুই ডুব ।
ললাট, চিবুক, নাসা, কর দরশন,
এই দুই গণ্ড মম, এ দুই শ্রবণ ।
অধর নীচের ঠোঁট, উর্দ্ধে তার গুঁঠ,
এই দুই জজ্বা মম, এ দুই প্রকোষ্ঠ ।
জামু, গুলফ, মণিবন্ধ, এ দুই কফোনি ।
কনিষ্ঠা, ও অনাসিকা, মধ্যমা, তর্জনী ।
অঙ্গুষ্ঠ ইহার নাম, এই গ্রীবা দেশ,
দুই দিকে দুই কক্ষ, এই কৃণ কেশ ।
জিহ্বা, দন্ত, দুই ক্ষক, এ দুই অগণ্ড,
দুই পার্শ্ব, এক পৃষ্ঠ, এক মেরুদণ্ড ।
যকৃত দক্ষিণে আছে, মীহা থাকে বাম,
বক্ষ মধ্য রক্তাধার, হৃদপিণ্ড নাম ।
পাকস্থলী এই খানে, অস্ত্র যুক্ত তার,
ফুসফুস দুই পাশে, মস্তিষ্ক মাথায় ।

এই সব অঙ্গ সোঁর যাঁহার রচনা,

ছুটী হস্ত জুড়ি করি তাঁহারে বন্দনা ।

এই কবিতা আবৃত্তির সহিত যেরূপ ভঙ্গীর আবশ্যক তাহা শিক্ষকগণ বিনা উপদেশেই বুঝিতে পারিবেন, তবে এক কথা বলা আবশ্যক যে, এই সমস্ত অঙ্গই ছুই হাতে দেখাইতে হইবে । ছুই মণিবন্ধ দেখাইবার সময়, ছুই হাতের ঘরা মণিবন্ধ আড়াইয়া ধরিতে হইবে ।

৪ । কোন পাঠ বা গল্পের উপলক্ষ না করিয়া, কেবল নানাকল্প কর্ণের ধারাও, ভঙ্গী সঙ্গীতের ঘরা গীত হইয়া থাকে ; যথা—ধানকাটা, নৌকাবহা, মাজ ধরা, তাঁত বোনা প্রভৃতি কার্য্য । নিম্নে ধানকাটার বিষয়ে একটি ভঙ্গী সঙ্গীতের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

আয়রে ভাই ধান কাটিগে কচাকচ ।

ডান হাতে ধরে কাচি, বাম হাতে ধরব শুছি,

গোড়া পেড়ে মারব ফ্যাগ, ফসফস্ ।

শুছি শুছি একে একে, রাখব ভূয়ে ভাগে ভাগে,

শুছিয়ে নিয়ে বাঁধব আঁটা, টপাটপ্ ।

মাথায় করে সজ্জাবেলা, আনব বাড়ী করব পালা,

শুকিয়ে গেলে মলব ধান, গজাগজ্ ।

ভান্ব ধান চেকি ফেলে, রাখব ভাত নুতন চেলে,

খাব ভাই মনের সুখে, মপামপ্ ।

৫ । নিম্ন প্রাথমিকের ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী একটি শূঙ্গ অভিনয়ের আদর্শ প্রদত্ত হইল । মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের অস্থায়ী যোগীন্দ্রনাথ বসুর “ভারতের মানচিত্র দর্শন,” কাগিনী রায় কৃত “একলব্য” প্রভৃতি অভিনয়ের উত্তম বিষয় ।

যড় স্বাত্ত্ব ।

(নিম্ন লিখিত শূঙ্গা জন্মে এক এক জন করিয়া প্রবেশ)

১ । গ্রাণ্ডের (লাল কাপড় পরিয়া) প্রবেশ—

প্রথম ভাসুর তেজে পৃথিবী তাপিত,

অনিল অনল সম ধূলি-ধূসরিত ;

কোণা জল কোণা বায়ু,
গেল প্রাণ গেল জায়ু,
ফুকানিছে জীবগণ হইয়া কাতর ;
ঐশ্বর্য প্রতাপ দেখে কত ভয়ঙ্কর ।

২। বর্ধীর (বেগুনে কাপড়) প্রবেশ—

চাকিয়াছি দিক দেশ সব দেখে দিয়া,
ভরিয়াছি খাল বিল সলিল ঢালিয়া,
অশনির গরজন,
ভয়াকুল প্রাণিগণ,
বিদ্রাৎ চমকে কাঁপে স্থাবর জগৎ,
বরষার তাই দেখে প্রতাপ কেমন ।

৩। শরতের (নীল কাপড়) প্রবেশ—

গ্রীষ্ম, বর্ষা গেছে চলে ভারত ছাড়িয়া,
শীতকাল বহু দূরে আছে দাঁড়াইয়া,
ভানু-ভেজ কমিয়াছে,
চপলাও নিবিয়াছে,
নিদ্রাঘ শিশিরে গেছে কেমন মিশিয়া,
শরতের শোভা দেখে নয়ন ভরিয়া ।

৪। হেমন্তের (সবুজ কাপড়) প্রবেশ—

সোণার বরণ মাঠ দানে বাজ মল,
শিশির মুকুতা পাঁতি করে উজমল,
প্রফুল্ল সবার প্রাণ
পাইয়া নুতন দান,
ধন-ধান-দাতা বলি আগারে আনয়ে,
হেমন্ত আমার নাম রক্ষা করি নয়ে ।

৫। শীতের (হলুদ কাপড়) প্রবেশ—

শাক, ভুই, আমোয়ান, চাপর, কদল,
 লেপ, আর ছেঁড়া কাঁথা, যা আছে মদল,
 বের কর শীঘ্র করি,
 নহিলে যাইবে মরি,
 আসিয়াছি আমি শীত মবে তাড়াইয়া,
 আমার প্রতাপে কুর্গা গিয়াছে মরিয়া ।

৬। ষড়ুরাজ বসন্তের (কমলা কাপড়) প্রবেশ—

(গান)

বসন্তে আজি, টাঁক চকোরে, পাগল গুধু হাসিয়া,
 ঢল ঢল তরু, আনন্দে বিভোর, নাচিছে হেলিয়া ছলিয়া ।
 শিশির অবশে পড়িয়াছে চলে,
 বরষা স্মুরে গিয়াছে যে চলে,
 শুধু বনরাজি হাসিছে মূছল কহুমে কুহুম মিলিয়া ॥
 কোকিল পাশিয়া ভাবে মাতোয়ারা,
 জানেনা কেন যে গাইতেছে তারা,
 ধীরে ধীরে ধীরে, স্বরের সহবী, উঠিছে গগন ভেদিয়া ॥
 জোড়না মাথিয়া বসন্ত যানিনী,
 মলয় অনিলে খেলিছে মোচিনী,
 কুহুম-পরাগে পরিমল মাখি প্রকৃতি যাইছে ভাসিয়া ॥

৭। সূর্য্যের (সাদা কাপড়) প্রবেশ—

এরা সব কেউ কিছু নয়, আমি সবার রাজা ;
 আসা ছাড়া হয় না ঋতু, এরা আমার প্রজা ॥

৮। সকলে (সূর্য্যকে আহ্বান করিয়া)—

সূর্য্যামা, সূর্য্যামা, দাঁড়াও মোদের সাথে,
 তোমা ছাড়া আমাদের কি বড়াই করা সাজে ।

(সূর্য্য সন্ধ্যাহ্নে দাঁড়াইলে পর, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে নৃত্য করিতে করিতে) —

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ আর ছয়,
এগ্নি করে ঘুরে ঘুরে ষড়্ ঋতু হয় ;
গ্রীষ্ম এল, বর্ষা গেল, শরৎ তৎপর,
হেমন্ত পরেতে শীত বসন্তে বৎসর ॥

(এক লাইন হইয়া দর্শকসমুহকে অভিবাদন করতঃ সকলের প্রস্থান ।)

গ্রীষ্মকালের জীবন তাপ প্রকাশের জন্য লাল কাপড়, মেঘের বর্ণ অনেক সময় বেগুনে বলিয়া বর্ষার বেগুনে রঙের কাপড়, শরতের আকাশ নির্মল নীল বলিয়া শরতের নীল কাপড়, হেমন্তে মাঠ শস্যপূর্ণ বলিয়া হেমন্তের সবুজ কাপড়, শীতে গাছের পাতা সমস্ত পাকিয়া হলুদবর্ণ হয় বলিয়া শীতের হলুদ কাপড়, বসন্তে নানাক্রম লাল হলুদ পুষ্প প্রফুল্লিত হয় বলিয়া বসন্তে লাল হলুদ মিশ্রিত কমলা কাপড় । এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া ছয়জনে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলে রঙ শিক্ষা দিবারও সুবিধা হইবে । যারপর যে রঙ হওয়া আবশ্যক, এই বিন্যাসে তাহাই দেখান হইয়াছে । আবার সূর্য্য রশ্মিতে এই ছয়বর্ণ (আসমানী ও নীল এক ধরিয়া) বিন্যাসন । সাদা কাপড় পরিয়া সূর্য্য মধো দাঁড়াইলে, এই ছয় জনের দ্বারা তাহার ছয়বর্ণের রশ্মি প্রকাশিত হইবে । এখানে কেবল কাপড়ের কথাই উল্লিখিত হইল।—অভিনেতৃগণের অন্যান্য সাজগোজ শিক্ষকগণ নিজের পতনের মত করিয়া দিবেন । ফুলের মাল্য, ফুলের মুকুট, ফুলের বলয় প্রভৃতির দ্বারা বসন্তকে সাজাইতে হইবে আর শরতকে নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইবে । বসন্ত ঋতুরাজ বলিয়া, তাহার কবিতা একটু বড়, এইটী গাইতে পারিলেই ভাল হয় । বালিকা বিদ্যালয়েও এ অভিনয় করান যাইতে পারে । কোন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যই ইহা রচিত হইয়াছিল ।

উপকথা ।—বালকেরা উপকথা শুনিতে যে বড়ই ভালবাসে, তাহা সকলেই জানেন । সুন্দর সুন্দর উপকথা কেবল যে আনন্দবর্জক তাহা নহে, ইহা দ্বারা বালকগণের ভাষাজ্ঞান জন্মে, তাহাদিগের বর্ণনা-শক্তি বৃদ্ধি পায় আর তাহাদিগের চরিত্র-গঠিত হয় । কিন্তু উপকথা তেমন সুন্দর-ভাবে বলিতে না পারিলে সুখপ্রদ হয় না । স্থান বিশেষে স্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ করিতে হইবে আর চোখ, মুখের ও হাতের ভঙ্গী করিতে হইবে অর্থাৎ

একাঠি নানা জনের অভিনয় করিতে না পারিলে গল্প শুধুই হইবে না ।

উপকথা শুধি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত,--(১) সত্য ঘটনা অবলম্বনে, (২) কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে । আবার কাল্পনিক ঘটনাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) স্বাভাবিক, ও (খ) অস্বাভাবিক । অস্বাভাবিক কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে যে সকল উপকথা রচিত (যথা, হিতোপদেশের গল্প, ঈমপের গল্প, পরীর গল্প, ভূতের গল্প ইত্যাদি), তাহার দ্বারা বালকগণকে প্রকৃতিসত্ত্বের মিথ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, এই এক শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের মত । কেহ কাল্পনিক অথচ স্বাভাবিক গল্পগুলি (নাটক, নভেল, উপন্যাসের গল্প) পর্য্যন্তও পছন্দ করেন না । যাহা হউক এ সম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয় । শিক্ষকগণ নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন ।

বালকগণের বয়স ও জ্ঞান বিবেচনায় উপকথার ভাব, ভাষা ও পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে ।—বিদ্যালয়ের নীতি শিক্ষার জন্য পৃথক সময়ের ব্যবস্থা থাকিলে সেই সময়েই এইরূপ উপকথার কথন আবশ্যক । সেকথা ব্যবস্থা না থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্যে যখন আবসর পাওয়া যাইবে, অথবা যে দিন ব্যুটিব জন্ত বা অন্য কোন কারণে বালকগণ টিফিনের ছুটিতে বাহিবে যাইতে পারিবে না, অথবা যে দিন বা মে সময়ে ডিল ও ব্যায়ামের অনুশীলনে কোন বাধা ঘটিবে, সেই সময়ে উপকথা দ্বারা বালকগণকে নিযুক্ত রাখা সম্ভব । নিম্নে শিশু-শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী তিনটি উপকথার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

(১) সত্য ঘটনা ।—রঘুনাথ নামে একটা ছেলে টোলে পড়ত । রঘুনাথের পণ্ডিত একদিন বললেন “রঘুনাথ ঐ ভট্টাচার্য্যদের বাড়ী থেকে একটু আশ্বিন নিয়ে এসত বাবা ।” রঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়াই আশ্বিন আনতে ছুটে গেল ।

রঘুনাথ রামাঘরের কাছে গিয়া দুহাত পাতিয়া বলিল “মা

’ গিল্লি বলিলেন “তুইত বড় বোকা ছেলে, আশ্বিন কি হাতে

করে নেওয়া যায় ?” এই কথা শুনিয়াই রঘুনাথ বলিল “তা নেওয়া যায় না ।” এই বলিয়াই এক অঁজল ধূলি হাতে করিল, তার পর সেই ধূলির উপর আঙুন দিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে উপস্থিত । সকলে রঘুনাথের বুদ্ধি দেখে অশ্রবাক । এই রঘুনাথই শেষে খুব বড় পণ্ডিত হয়েছিল । (এক বালকের হাতে ধূলা দিয়া তার উপর আঙুন রাখিয়া কার্যাতও দেখাইয়া দিতে হইবে ।)

(২) কাল্পনিক অথচ স্বাভাবিক ।—একটা কাকের খুব পিপাসা লেগেছে । এক জনের বাড়ীর উঠানে একটা ঘড়া দেখে, জল খাবার জন্য সেই ঘড়ার উপর গিয়া বসল । কিন্তু ঘড়ায় জল খুব কম, কাক চোঁট দিয়া জল পায় না । তখন কাক এক এক খান করে পাথরের (বা ইটের) টুকরা এনে জলের মধ্যে ফেলতে লাগল । যখন জল ঘড়ার মুখের কাছে এল, তখন সে পেট ভরিয়া জল পেল । (একটা গেলানে অন্ন জল রাখিয়া তার মধ্যে পাথর বা ইটের ছোট ছোট টুকরা ফেল । কেমন করিয়া জল উঠু হইয়া উঠে তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও) ।

(৩) কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক—টুঙ্গ বুলু ছই ভাই । টুঙ্গ অন্ন, আর বুলুর পেটের অম্বখ । বাড়ীতে ছই ভাই কেবল খাব খান করে কান্দিতে লাগল । তাদের মা কিছুই খেতে দিল না । তখন বুলু বলল “ভাই টুঙ্গ মামার বিয়ে, চল মামার বাড়ী যাই, সেখানে অনেক জিনিষ খেতে পাব ।” তাদের মামার বাড়ী অনেক দূর—কেমন করে যাবে ? তাই দুজনে একটা ইঁহুরের কাছে গেল । ইঁহুর ঘুসিয়ে ছিল, তার ঘুস ভাঙ্গাবার জন্য টুঙ্গ বুলু তাই দিয়া বলল—

ভাই ভাই ভাই, ওরে ইঁহুর ভাই,

মামা বাড়ী বে’ দেখতে কেমন করে যাই ?

ইঁহুর বলল, তা আমাকে যদি খুন খেতে দিস্ তবে আমি তোদের দুজনকে পিঠে করে নে যেতে পারি ।” টুঙ্গ বুলু বলল, “আচ্ছা তোমাকে খুন খেতে দেব ।” ইঁহুর রাজি হ’ল । টুঙ্গ বুলু ইঁহুরের পিঠে উঠে ছুট । মামা বাড়ীতে এলেই, মামা তাদের দেখে খুব স্তম্ভী হ’ল । আর দই সন্দেশ খেতে দিল

ভাই ভাই ভাই, মামা বাড়ী যাই,

মামা দিল দই সন্দেশ দোরে বসে থাই ।

তারা ছই ভাই দোরে বসে দই সন্দেশ খেতে লাগল ; আর ইঁহুরটাও তাদের লাগল । ইঁহুরটা খুব বড় কিনা তাই তার কুটুর কুটুর করে খাওয়ার

মামী জেগে উঠে । মামী ঘবে ঘুমিয়ে ছিল । মামী দেখে যে মস্ত একটা ইছর, আর কানের দুটা ডেনে এসে সব মনোহর ভেয়ে মেরে । অসনি এক লাঠী নিয়ে জাড়া । টুটু বুঝে ডোড়—এক দৌড়ে বাড়ো মাসা ।

ভাই ভাই ভাই মাসা বাড়ী যাঠ

মাসা দিল দই মনোহর, মোহে বসে থাই,

মামী এল লাঠী হাতে, পাধাই পাধাই ।

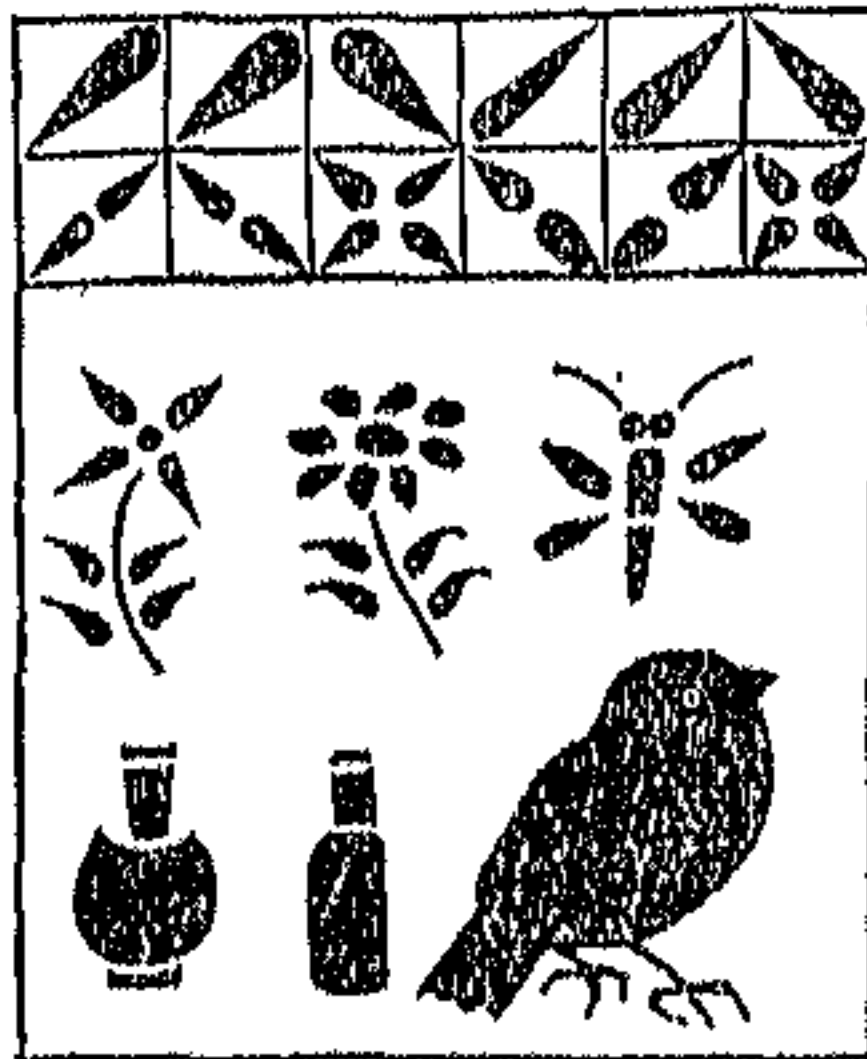
এইরূপ উপকথা, ছুই তিন দিন বহিবার পর, বামকগণকে বর্ণিত উপকথা শ্রুত করিতে বলিবে । প্রথম প্রথম ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া গল্প আদায় করা যাইতে পারে । যথা—
কাকের কি হয়েছিল ? সে উঠানে কি দেখিল ? এল থাইতে পারিল না কেন ? তার পর কি করিল ? ইত্যাদি

ইংলিশ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট (সরকারিউলার ৩২২) নিম্নলিখিত কিওয়ার্ডগেটেন কার্যাবলী অনুমোদন করিয়াছেন :—

(১) মূল্যায়ন মূল্য গঠন (মূল্য প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে) ।

(২) অঙ্কন ও রংগন ।—অঙ্কনের বিষয় পূর্বে (১০ম খণ্ডনায়) বর্ণিত হইয়াছে । তবে সে কেবল পেন্সিলের দ্বারা অঙ্কন । আজ কাল রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কনশিক্ষাবস্তু কনস্ট্রাক্ট আনেকে স্মরণ মনে করেন । রঙ চিত্রাকর্ষক ও রঙের দ্বারা অঙ্কিত গা, পাতা, ফুল প্রভৃতি প্রকৃত পদার্থের অনেকটা নিকটবর্তী হয় বলিয়া এই সকল চিত্র অধিকতর উৎসাহবর্ধক । রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা কনিতে খরচও বেশী নয় । প্রত্যেক বালককে মূল্যবান রঙের বাঁক তিনিতে হইবে না । বাজারে যে সকল ছুঁড়া রঙ—থুনথারাপী, ম্যাজেন্টার, ভাইওলেট গ্রীন, নীলবড়ি, পেউড়ী প্রভৃতি বিক্রয় হয় তাহাঁই ছুঁড়ার পরসার করিয়া কিনিয়া জলে গুলিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে । কতকগুলি অল্পদামের চীনামাটির ছোট ছোট বাটি (১০ ১৫ /০ দাম) কিনিয়া রাখিবে । পাঁঠার খাড়ের লোম দিয়া কতকগুলি তুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিবে । তুলি কনিতেও পাওয়া যায় । সাধারণ কাজ চলার মত একটা তুলির দাম

১৫ কি ১০ । ৩ কি ৪ নম্বর তুলিই বালকগণের পক্ষে উপযোগী ।
 বালকগণের হাতে একটা তুলি দাও, ও এক একটা বাটিতে একটু একটু
 রঙ ঢালিয়া দাও । প্রথমে এক রঙেই চিত্রাদি অঙ্কন করিবে । বাল-
 কেরা প্রথম প্রথম তুলির দ্বারা নিজের হৃদয়মত কাগজে রঙ লাগাইবে ।
 এইরূপ ছ চার দিন আধাণভাবে তুলি চাটানো করিলে, তাহারা বিনা
 উপদেশেই তুলির ব্যবহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ কিরূপ
 করিয়া তুলি ধরিতে হইবে, কিরূপ জোরে তুলি চাপিয়া ধরিলে মোটা
 বেথা হইবে, কিরূপ করিলে সরু রেখা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু
 জ্ঞান জন্মিবে । সময়মত শিক্ষককেও একটু একটু সাহায্য করিতে
 হইবে । তার পর তুলির দ্বারা চেক (বর্গক্ষেত্রাক্ত) কাগজে চিত্রাঙ্কন
 আরম্ভ করাও । ১,২ কি ৩ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে পেনসিলের কল কাটিয়া
 দাও বা এইরূপ চেক কাগজ ক্রয় করিয়া আন । তার পর তুলির দ্বারা
 যেরূপ ধারাবাহিক রূপে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নিজের চিত্র
 দেখিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিবেন :—



৩৯ চিত্র—তুলি ব্যবহার ।

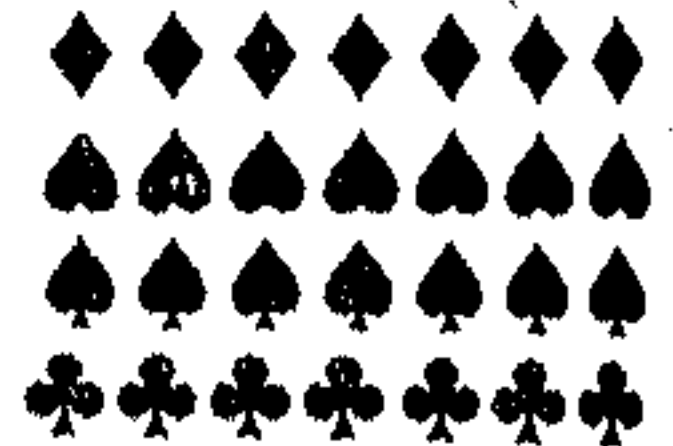
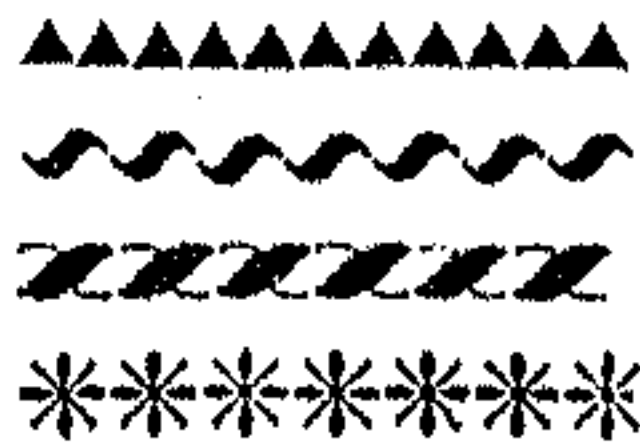
সজ্জিত স্থান ফাঁক রাখিলে এই সমস্ত চিত্র সুন্দর দেখায় । ফুলের

পাঁপড়ী গুলির জোড়ের স্থান, পাতার ও ডালের জোড়ের স্থান, মাছির পরীরের নানা জোড়ের স্থান, বোতল, মগহঁএর সংযোগ স্থান ফাঁক রাখা হইয়াছে । তবে জোড়ের স্থান ফাঁক না রাখিয়াও চিত্রাঙ্কন করাইতে পারা যায় । যথা ।—



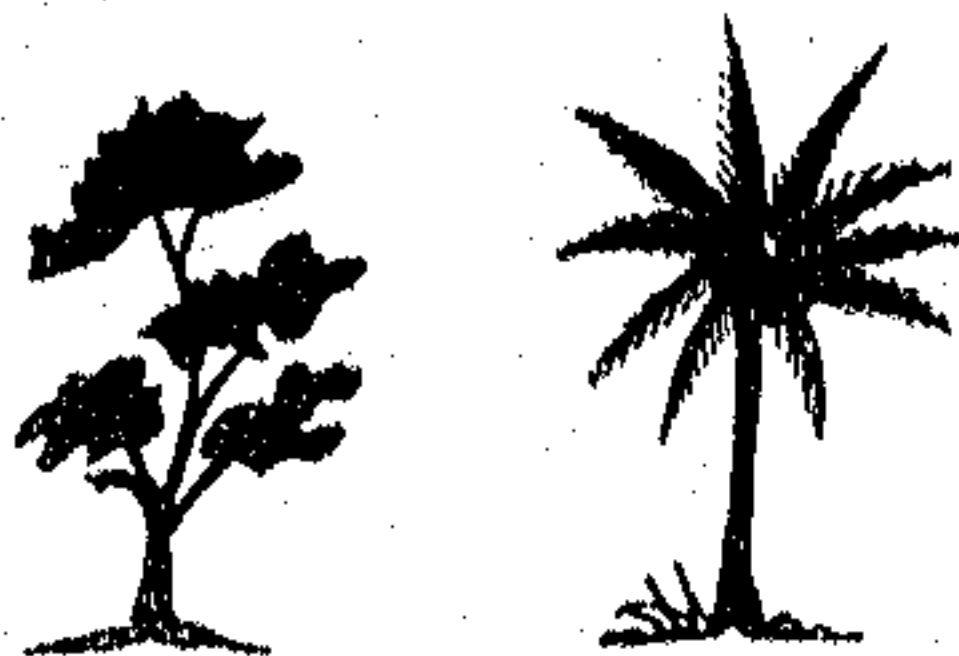
৪০ চিত্র । এক রঙের ডাল পাতা ।

রঙের দ্বারা কেবল ফুল পাতা না করাইয়া নানারূপ বড়ডারের (পাড়) চিত্রও করান যাইতে পারে । যথা :—



৪১ চিত্র । এক রঙের বড়ডার ।

কেবল এক রঙের দ্বারা নানারূপ বৃক্ষ, পাতা, পশু, পক্ষীর চিত্রাদির অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ।



৪২ চিত্র । এক রঙের দ্বারা বৃক্ষ ।

কেবল এক রঙের দ্বারা নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর ভাবও দেখান যাইতে

পারে । কিন্তু বালকগণের পক্ষে এরূপ অঙ্কন সহজ নহে । শিক্ষকগণের আমোদার্থ নিম্নে একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল :—



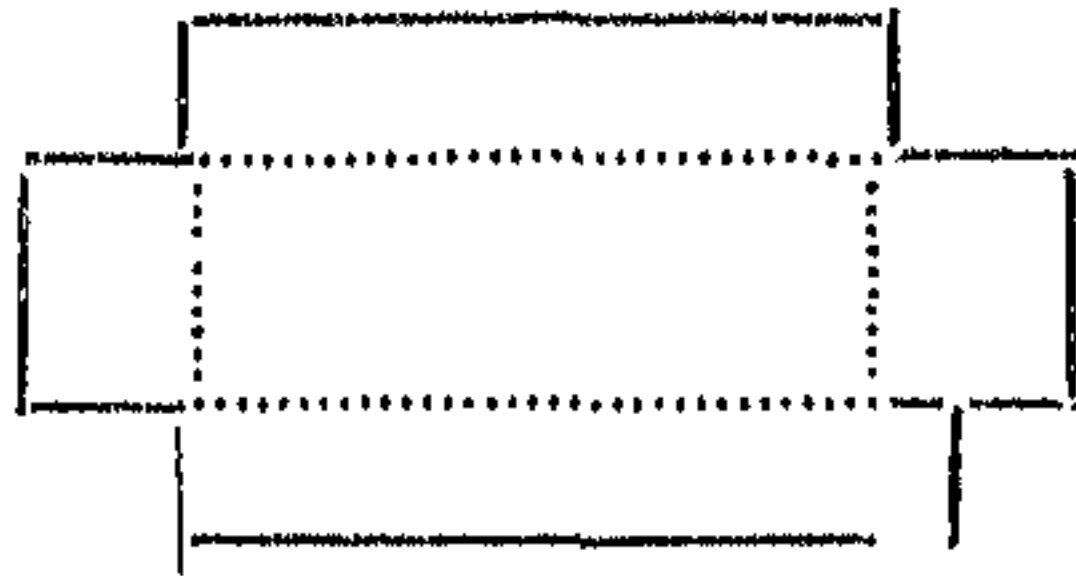
৪৩ চিত্র ।—এক রঙের দ্বারা ভঙ্গী ।

বিনা লাইটে, কেবল এক রঙের দ্বারা চিত্র অঙ্কনে, হয় কাল রঙ না হয় কপিল রঙ (Burnt Sienna) ব্যবহার করিবে ।

(৩) কাগজ কাটা ।—সাদা কাগজে জ্যাগিতিক চিত্রাঙ্কন করিয়া কাঁচির দ্বারা কাটা । কাগজ ভাঁজ করিয়াও নানারূপ জ্যাগিতিক চিত্র দেখান যাইতে পারে (১৮ খেলনা) । সাদা কাগজে অঙ্কর কাটিয়া, লাল, নীল বা সবুজ কাগজের উপর আঠার দ্বারা আঁটিয়া নীতি বাক্য রচনা করা যাইতে পারে । এইরূপ নীতি বাক্যের দৃষ্টান্ত ;—“সময় চলিয়া গেলে ফিরিবেনা আর, মস্তের সাধন কি শরীর পাতন, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন, সুসময়ে অনেকেই বদ্ধ বটে হয়, যতন বিহনে কোথা মিলয়ে রতন, দানেই হস্তের শোভা না হয় কঙ্কণে, বিদ্যাই আনিয়া দেয় সুদিন সম্পদ” ইত্যাদি । কাগজ কাটিয়া ঘড়ি প্রস্তুত করাইলে ছোট ছোট বালকগণকে সেই সঙ্গে ঘড়িতে সময় দেখা শিখান যাইতে পারে । সাদা কাগজে চারিটা গোল বৃত্ত কাটিয়া একখানি নীল কাগজের উপর বৃত্তাভাসের পথে (ঋতু পরিবর্তনের চিত্রানুকরণে) আঠার দ্বারা আঁটিয়া ঋতুপরিবর্তনের চিত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে । সূর্যের বিপরীত অংশ কালির দ্বারা কাল করিয়া দিতে হইবে । নক্ষত্রাকারে একটুকরা কাগজ কাটিয়া (সূর্য) বৃত্তাভাসের মধ্যে বসাইবে ।

লাল কালির দ্বারা পৃথিবীর গতিপথ চিহ্নিত করিবে। ছোট ছোট নক্ষত্র কাটিয়া নীল কাগজে লাগাইয়া, মণ্ডারিমণ্ডল ও ঐক নক্ষত্র, এবং কাগপুরুষ ও লুকক প্রভৃতি করিলে, আশোদের সঙ্গে অনেক শিক্ষা হয়।

শক্ত কাগজ কাটিয়া বাক্স প্রস্তুত করা নিধান হইয়া থাকে। এই কার্যের জন্য ক্রিপা কাগজ কাটিতে হইবে, তাহা নিম্ন চিত্র দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে :—



৪৪ চিত্র।—কাগজের বাক্স।

(৪) তার বৈকাইয়া নানারূপ ফল ও অক্ষর নিম্মান।

বঙ্গীয় কিশোরগার্টেন।—(বাক্সলা গবর্ণমেন্টের রিজলিউশন নং ১, তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৮৯১) আমাদের প্রদেশে বঙ্গীয় কিশোরগার্টেন নামে যে প্রণালী আছে, তাহা ফলের কিশোরগার্টেন ও হারবার্টের পদার্থ-পরিচয় মিশ্রিত একপ্রকার প্রণালী। যাহারা কিশোর গার্টেন ও পদার্থ পরিচয় প্রকরণ দুইটি উত্তম রূপে পাঠ করিবেন, তাহারা বঙ্গীয় কিশোরগার্টেন সমস্ত মর্ম বুঝিতে পারিবেন।

২। বর্ণপরিচয়।

কিশোরগার্টেনের অষ্টম খেলনায় অক্ষর শিক্ষার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষকগণ এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিবার পূর্বে একবার উক্ত অংশ পাঠ করিয়া লইবেন। “গোথা ও পড়া একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া বর্তমান প্রণালী-সম্মত। গোথা শিখাইবার পূর্বে ক্রমে খাড়া, পড়া ও তেড়া রেখা শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাও ১০ম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে। হস্তাক্ষর শিক্ষার পরিচ্ছেদে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক অক্ষর

শিক্ষার সঙ্গে, তাহার উচ্চারণ তাহার যোখা, তাহা দ্বারা সহজ শব্দ নির্মাণ ও সেই শব্দ পঠনশিক্ষা দিতে হইবে ।

অক্ষর উচ্চারণের ধারা ।—অক্ষরগুলির উচ্চারণ শিক্ষায় তিনটা ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে, (১) বর্ণের ধারা (২) ধ্বনির ধারা (৩) শব্দের ধারা ।

(১) বর্ণের ধারা ।—প্রথমে শৃঙ্খলাক্রমে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালার সাধারণ উচ্চারণ শিক্ষা দিয়া, পরে তাহার দ্বারা শব্দ নির্মাণ শিক্ষা দেওয়াকে বর্ণের ধারা বলে । সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণের ধারা । এই প্রণালীই ভাষা শিক্ষাদানের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । বিশেষ, অগ্রাণু প্রণালী অপেক্ষা এইটাই সহজ—শিক্ষকের পক্ষেত নিশ্চয়ই । কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায় যে এই প্রণালীতে বর্ণগুলির প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না । আমরা যখন ক, খ প্রভৃতির উচ্চারণ শিক্ষা দান করি তখন প্রকৃত ক, খ উচ্চারণ না করিয়া, পরযুক্ত (অযুক্ত) ক, খ উচ্চারণ করিয়া থাকি । ইহাতে যে দোষ হয় তাহা একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছি । ‘বক’ উচ্চারণ করিতে আমরা অকার যুক্ত ব উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু অকার যুক্ত ‘ক’ ত উচ্চারণ করিলাম না । এখানে ক এর ঠিক উচ্চারণ হইল । কিন্তু ক শিখাইবার সময় আমরা অকার যুক্ত ‘ক’ এর উচ্চারণ শিখাইয়া থাকি । এইজন্য পণ্ডিতেরা একটা ধ্বনির ধারা নির্ধারণ করিয়াছেন ।

(২) ধ্বনির ধারা ।—স্বরবর্ণের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া, বাজনবর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত যে ধ্বনি মাত্র করা হয় তাহাকে ধ্বনির ধারা বলে । ‘ম’ উচ্চারণ করিবার সময়, আমরা প্রথমে ওষ্ঠ অধর সংলগ্ন করি, পরে ম এর অকারাংশ উচ্চারণের জন্ত আবার ওষ্ঠদ্বয় বেভিন্ন করি । কিন্তু যদি ম উচ্চারণে আমরা ওষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিয়াই আর

ফাঁক না করি, তবেই ম এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। ‘আম’ উচ্চারণ করিতে যে অকারশূন্য ম এর উচ্চারণ হয়, তাহাষ্ট ম এর প্রকৃত ধ্বনি। ক্ষুদ্র শিশুর অর্ধক্ষুট উচ্চারণ শুনি যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই ব্যঙ্গনের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে এ প্রথা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও, খুব কঠিন। সকল শিক্ষকের দ্বারা এই প্রথা অনুযায়ী বর্ণ শিক্ষা হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপে বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দিলে বালকগণের ত্রুটিভ্রামী অভ্যাস হইতে পারে। কিন্তু এ প্রথার সে রূপ কোন দোষ থাকিলেও, বর্ণের প্রকৃত শক্তি শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইহার আয়োচনা যে বিশেষ আবশ্যিক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

(৩) শব্দের ধারা।—এই ধারাকে সাধারণতঃ ‘দেখা পড়া’ ধারা বলে। এই ধারার প্রবর্তকেরা বলেন যে, যখন আমরা প্রথমে শব্দ শিক্ষা করিয়া থাকি অর্থাৎ যখন আমরা অ অা ক খ না পড়িয়াই প্রথমে নানা শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করি, তখন বিশ্লেষণ প্রথানুসারে শব্দ ভাঙ্গিয়া বর্ণ শিক্ষা করা কর্তব্য, কারণ শব্দই ভাঙ্গাঙ্গির পার্শ্চিৎ, আর বর্ণ অপার্শ্চিৎ। এই প্রণালীতে বর্ণ শিক্ষা দানের একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। বোর্ডের উপর উত্তম অক্ষরে ‘বক, বর, বন, বল’ লিখিয়া দিবে। বালকেরা এ সমস্ত কথা জানে। তারপর, দর্শনী কাঠির দ্বারা এক একটি শব্দ দেখাও, আর উচ্চারণ কর ও বালকগণকে বোর্ড লিখিত শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উচ্চারণ করিতে বল। এইরূপে শব্দের আকৃতি বোধ জন্মিলে—অর্থাৎ যখন বালকেরা বোর্ড লিখিত শব্দ শিক্ষকের বিনা সাহায্যে পড়িতে শিখিবে—তখন বক, বর ও বন, বল প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ পৃথক করিয়া (ধ্বনির ধারানুসারে) শিখাইতে হইবে। বর্ণের আকার ও উচ্চারণ এক সঙ্গেই শিক্ষা হইবে।

(৪) বিশেষ উচ্চারণের ধারা ।—ইংরাজী বর্ণমালা অসম্পূর্ণ বলিয়া, ইংরাজেরা একটা বিশেষ উচ্চারণের ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন । ইংরাজীর অনেক বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ এক, কিন্তু শব্দের সংযোগে তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ হইয়া থাকে । cut এখানে c এর উচ্চারণ ক এর, city এখানে c এর উচ্চারণ স এর মত । এইজন্ত ইংরাজী ২৬টা অক্ষর ভাঙ্গিয়া, তাহার ৪০টা অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালী অক্ষর ঞ্জি, ঞ্জিয়ার অক্ষরের সহিত তুলনায়, এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । সুতরাং বাঙ্গালী বর্ণমালায় এ ধারার কোন আবশ্যকতা নাই ।

উচ্চারণ ।—বালাকগণকে বর্ণগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হইবে । অ, আ না বলিয়া, কেহ কেহ স্বরের অ, স্বরের আ, এইরূপ ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন । স্ববের অ, আ ভিন্ন, ব্যঞ্জনের অ, আ নাই । যে বর্ণকে অন্তস্থ অ (য) বলা হয়, তাহার উচ্চারণ অ নয়, ‘ইয়’ । সুতরাং অন্তস্থ য কে, ‘ইয়’ বলিয়া উচ্চারণ করা কর্তব্য । হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই দুইটা কথা শিশুগণের উচ্চারণের পক্ষে শক্ত বিবেচনা করিয়া, কেহ কেহ ছোট ই, বড় ই এবং ছোট উ, বড় উ, এরূপও পড়াইয়া থাকেন । এ মন্দ নয় । বর্ণের উচ্চারণের সময় ওষ্ঠদ্বয়ের যথোচিত সঞ্চালন ও বিস্তারণ আবশ্যক । মুখ বুজিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণ বিশেষ দোষের । ক, খ প্রভৃতি যেন ঠিক কণ্ঠ হইতেই নির্গত হয় । গ, ঘ উচ্চারণে যেন অস্পষ্ট পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় । বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এক রকমে উচ্চারণ করা ছেলা বিশেষের দোষ—এইজন্ত ঘর কে ‘গর, ‘ভাত’ কে ‘বাত,’ ‘ধান’ কে ‘দান’ বলিতে শুনা যায় । ও কে উয়া বলা ভুল, ঠিক কণ্ঠ হইতে ‘অঙ্গ’ মত ধ্বনি নির্গত হইবে । বাঙ্গালার সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণই এক মাত্র ‘অ’ এর যোগে উচ্চারিত হয়, সুতরাং ‘য়া’ হইবে না । ‘রঙ’ উচ্চারণে ও এর প্রকৃত ব্যঞ্জন উচ্চারণ পাওয়া যায়—ইহার সহিত অ যোগ করিয়া পড়িলেই, ও বর্ণের উচ্চারণ হইবে । চ বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ তালু সহিত সংলগ্ন করিতে হইবে । কোন কোন জেলায় কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূলে লাগাইয়া চ বর্ণের উচ্চারণ

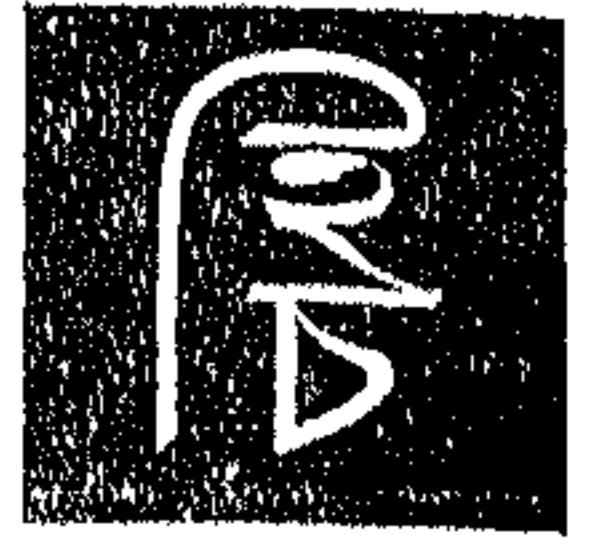
করিয়া থাকে । কিন্তু চ তালব্য বর্ণ, দন্ত বর্ণ নহে । এও এর উচ্চারণ হই (ন) য —জিহ্বা তালব্য সহিত নাগালিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে । ট বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ বক্র করিয়া দন্ত ও তালব্য সন্ধিস্থলের কিঞ্চিৎ উপরে স্পর্শ করাইতে হইবে । ত বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্ত স্পর্শ করিবে । প বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ নীচেব দন্তপার্শ্বের নিম্নে থাকিবে, কারণ প বর্ণে কেবল ওষ্ঠের কার্য্য । ক বর্ণে জিহ্বার অগ্রভাগ কণ্ঠ । নিমট, চ বর্ণে তালব্য সহিত ভাগে, ট বর্ণে দন্ত ও তালব্য সন্ধিস্থলে, ত বর্ণে দন্তের উপর, প বর্ণে দন্তের নীচে—কেমন শৃঙ্খলাক্রমে জিহ্বা মুখ গহবনে ঘুরিয়া আসিল । য উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ (বাঙ্গালায় এই য এর প্রকৃত উচ্চারণ হয় না বলিয়া) তালুতে, ব উচ্চারণে দন্ত তালব্য সন্ধিস্থলে, ল উচ্চারণে দন্তে ও ব উচ্চারণে দন্তের নীচে থাকিবে ।

বাঙ্গালায় ণ ও ন এর ভিন্ন উচ্চারণ নাই । তবে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা ট বর্ণের বর্ণ-উচ্চারণ স্থানে ও ন উচ্চারণের সময় ত বর্ণের বর্ণ-উচ্চারণের স্থানে থাকিবে । বাঙ্গালায় ব ছইটীরও উচ্চারণ এক কিন্তু নিম্নকরণের প্রকৃত-উচ্চারণ জানিয়া রাখা ভাল । অল্পস্থ ব, ‘ওয়াও’ মত উচ্চারণ করিতে হয় । তিনটি ণ একরূপে উচ্চারিত হয় । কিন্তু ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন । শা উচ্চারণে (চ বর্ণের মত) জিহ্বা তালব্য সহিত সংলগ্ন হইবে, স উচ্চারণে (ত বর্ণের মত) জিহ্বা দন্ত স্পর্শ করিবে, । এই স কতকটা কোমল ছ এর মত উচ্চারিত হয় (ইংরাজীর s ও পার্শ্বের মিল) । ছাত্রগণ অল্পতঃ বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িলে, তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে বাঙ্গালা ছাড়া অন্য কোন ভাষার কথায় ‘স’ দেখিলে, তাহা যেন কোমল ছ এর মত পড়ে । কারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলেও নানা দেশীয় নামের স কোমল ‘ছ’ এর মতই উচ্চারণ করিতে হইবে । যথা ইরাসিন, সাইন বোর্ড, সলফর,

লিসবন, ওয়েগেসলি, মোড়া ওয়াটার, সনজুজিন ইত্যাদি। য এর উচ্চারণ কোমল থ এবং মত । ড, ঢ ও র এর উচ্চারণ পৃথক করিতে পারে না বলিয়া, অনেক ছাত্র ড এ বিন্দু র, ঢ এ বিন্দু র—ও বএ বিন্দু র এইরূপে পড়িয়া থাকে । জিহ্বা খুব বক্র করিয়া তালুব সহিত লাগাইয়া ড, ঢ উচ্চারণ করিতে হইবে । ‘সকল’ বলাতে ‘ইকল’, ‘শশা’ স্থানে ‘হোশা,’ ‘শাক’ স্থানে ‘হাগ’ আবার ‘হরি’ বলাতে ‘শরি,’ ‘হাত’ বলাতে ‘মাত’ ইত্যাদি বিকৃত উচ্চারণ, স ও হ এর উচ্চারণ গত পার্থক্য না মিথাই-বাব দোষেই ঘটিয়া থাকে । কোন কোন জেলায় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ একেবারেই হয় না, যথা চাঁদ, বাশ, পাঠা ; আবার কোন কোন জেলায় কিছু বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয় যথা কৈন, এসেছ, কুঁড়ে ইত্যাদি । শিক্ষককে প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হইবে । বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় অবশ্য তাহাদিগকে এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না, শিক্ষক নিজে উত্তম রূপ উচ্চারণ করিলে বালকেরা সহজেই অনুকরণ করিতে পারিবে ।

স্বর সংযোগ ।—আকার, ইকার প্রভৃতির সংযোগ শিক্ষায় বালকগণের চক্ষু কর্ণ—ছইই ব্যবহার করাটবে । শিক্ষক বোর্ডে লিখি-বেন ও উচ্চারণ করিবেন বালকেরা বোর্ডের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষকের অনুকরণে উচ্চারণ করিবে । মনে কর আকার সংযোগ শিক্ষা দিতে হইবে । বোর্ডের উপর ক, আ এই দুই অক্ষর খুব পাশাপাশী করিয়া লিখিয়া দিলে । তারপর ক, আ এই বর্ণ দুইটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে করিতে এক ক্ষত উচ্চারণ করিবে যে ক এর সঙ্গে আ যুক্ত হইয়া কা উচ্চারিত হইবে । আবার লেখাতে এইরূপ প্রথমে ক আ থাকিবে, পরে আ বর্ণের অ ভাগ অল্পে অল্পে পুঁছিয়া দিবে, কেবল মাত্র । থাকিবে । এখন কা এই রূপ লিখিয়া কা উচ্চারণ শিক্ষা দাও । ক এর সহিত যে আ যুক্ত হইল, ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য । এই-

রূপে ব জা=বা শিখাইবে। পরে কাকা বাবা প্রভৃতি শব্দ শিখা
দিবে। ইকার সংযোগ প্রথমে ঈ এইরূপ
লিখিবে, তাবপর ইকারের মাথান বুঁটিটাকে
বামেব দিকে টানিয়া নাগাঠিবে, পরে অনাবশ্য-
কীয় অংশ পুঁছিয়া ও কিছু কিছু পরিবর্তন



করিয়া কেবল ঐ এই অংশ বাগিবে। এইরূপে নি শিখাইয়া 'চিনি' কথা
শিখাইবে। উকার সংযোগে উ এইরূপে লিখিয়া, পরে একটু একটু পরি-
বর্তন করিয়া কু করিবে। তার পর "কুকু" কথা শিখাইবে। সঙ্গে সঙ্গে
পরিচিত কথা লিখিত পড়িতে শিখিলে বালাকগণের আনন্দ হইবে ও
শিথিতে আগ্রহ জন্মিবে। অন্যান্য স্বর সংযোগও এইরূপে শিখাইবে।

সংযুক্তবর্ণ।—সংযুক্তবর্ণ শিক্ষাদানেও পূর্বেোক্ত বীতি অবলম্বন
কবিতে হইবে। 'শস্ত্র' লিখিবার সময় প্রথম শ্র না লিখিয়া সয় এই
রূপ লিখিবে ও পড়িবার সময় 'শসয়' (শসঠয়) এইরূপ পড়িবে।
তারপর স এ যুক্ত য পুঁছিয়া পুঁছিয়া া এইরূপে পরিবর্তন করিবে।
'ভাদ্র' শিখাইবার সময় ড কে দয় এইরূপে লিখিবে, ও 'ভাদর' এইরূপ
পড়িবে। তার পর পুঁছিয়া পুঁছিয়া কবিবে ও 'ভাদ্র' পড়িবে। 'সর্প'
শিখাইবার সময় র্প কে র্প এইরূপ লিখিবে, পরে র এর কতক অংশ
। ছিয়া কেবল একটা (রেফের) টান গাজ রাখিবে। কিনাপে বর্ণগুলি
সংযুক্ত হয় তাহাই বালাকগণকে দেখান উদ্দেশ্য। 'অজ্ঞ' শিখাইবার
সময় জ এর সহিত যে কেমন করিয়া এ সংযুক্ত হইল অর্থাৎ জ এর
কোন অংশের সহিত এ এর কোন অংশ যুক্ত হইয়া জ্ঞ এই অক্ষর
হইল, তাহা দেখাইয়া দিবে। এক কথা মনে রাখা কর্তব্য যে বালা-
কেবা বালাগুলি চোখের সাহায্যেই অধিক পরিমাণে শিক্ষা করে,

সুতরাং বাণান শিক্ষায় বোডেব যথেষ্ট ব্যবহার হওয়া কর্তব্য । বালক-গণকে লেখা ও পড়া এক সঙ্গে শিখাইতে হইবে ।

৩ । ধারাপাত ।

দৈনিক কাজ কর্মে ধারাপাতেব বিশেষ আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং সকল শ্রেণীর নোকের পক্ষেই ধারাপাত শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় । সাধারণ দোকানদারগণ কেবল ধারাপাতেব বিদ্যাতেই সুচারুরূপে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতেছে ।

সংখ্যা অবধারণে বালকগণেব একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় । তাহারা সংখ্যাদি পরিচায়ক নাম না জানিলেও, সংখ্যার তারতম্য বিষয়ক জ্ঞানেব পরিচয় দিয়া থাকে । একটা শিশুকে একটা সন্দেশ দিয়া, আব একজনকে দুইটা সন্দেশ দিলে, যাহাব একটা সে দুইটার দিকে মৌলুপ দৃষ্টি করিয়া থাকে । অনেক জীবজন্তুরও এইরূপ সংখ্যাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । যে বিড়ালী নিজের ছানা কি অপরের ছানা তাহা চিনিতে পারে না, তাহার যদি ৪টা ছানার স্থানে ৩টা হইয়া থাকে, তবে সে ৪র্থটা খুজিয়া বেড়ায় । এইরূপ নানা কারণে পরিমাণ-বোধ স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় ।

রোমান অঙ্ক ।—শতকিয়া শিক্ষাই ধারাপাতের আরম্ভ । দ্রব্যাদিব সাহায্যে কিরূপে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা (কিণ্ডার-গার্টেন ওয় খেলনা) বর্ণিত হইয়াছে । দ্রব্যের মধ্যে হস্তের অঙ্গুলীর দ্বারা সংখ্যা শিক্ষাদানের প্রণালী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । দশ দশ করিয়া গণনার প্রথা এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ঘড়ির উপর যে অঙ্ক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও প্রকারান্তরে অঙ্গুলী চিহ্ন মাত্র ; I II III IV যথাক্রমে একটা, দুইটা, তিনটা ও চারিটা অঙ্গুলী প্রাপক । পাঁচ লিখিতে যে V চিহ্ন দেওয়া হয় তাহাও পাঁচটা অঙ্গুলীর

চিহ্ন মাত্র; কনিষ্ঠা হাতে ওজ্জ্বলী পর্য্যন্ত অঙ্গুলীগুলি একত্র করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী পৃথক রাখিলেই ঠিক V চিহ্ন হইল। বালকগণকে এই V চিহ্ন এইরূপে বুঝাইতে হইবে : বোর্ডের উপর হাত রাখিয়া চকের দ্বারা হাতের চারিদিকে দাগ দিলেই হাত অঙ্কন হইবে। সেই হাতের উপর একটা V লিখিয়া হাতের চিহ্ন পুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ (একহাত আর এক অঙ্গুলী) VI; মাত্র আট প্রভৃতিও তদ্রূপ। নয় লিখিতে প্রথমে VIIII এইরূপে লিখিবে। দুই হাত ক্রসের আকারে রাখিলেই দশ X হইল। এই রূপ X X পর্য্যন্ত রোমান অঙ্ক শিক্ষা দিলেই চলিবে। অঙ্ক বিষয়ক একটু জ্ঞান জন্মিলে, X এইরূপ নয় শিক্ষা দিবে — বামের অঙ্গ অঙ্ক বাদ দিতে হয় বলিয়া দিবে। এইরূপ দাগের দ্বারা এক দুই শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বিশেষ ঘড়ির ব্যবহার যখন আবাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই অঙ্ক শিক্ষা দেওয়াও কর্তব্য।



৪৫ চিত্র। পাঁচ পরিচয়।

শতকিয়া শিক্ষা।—৩ কি ৪ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি বাঁশের কাঠি (দেশলাই বা কাঁটার কাঠির মত সরু) সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। বালকগণকে টেবিলের চারিদিকে দাঁড় করাইয়া—বা শিক্ষক তাহ সকলে মাছুরে বসিয়া—প্রত্যেক বালকের ডান হাতের দিকে কতকগুলি কাঠি গুছাইয়া রাখ। শিক্ষক নিজের ডান হাতের দিকেও কতকগুলি কাঠি রাখিবেন। তার পর একটা, দুটা, তিনটা কনিয়া কাঠি বামের দিকে সরাত, তার সঙ্গে সঙ্গে এক, দুই, তিন ইত্যাদি গণিতে থাক। বালকগণ শিক্ষকের সঙ্গে তদ্রূপ করিবে। এইরূপে দশ পর্য্যন্ত গণনা অভ্যাস হইলে, দশটা কাঠি একত্র করিয়া, স্ক্রু দ্বারা বাঁধিয়া একটা আটা কর। তার পর এই আটার ডান দিকে আবার পূর্ববৎ

এক একটা কাঠী বাথ আর এগায় বার ইত্যাদি গণনা শিখাও । ২০ পর্যন্ত গণনা হইলে, এই দশ কাঠীর দ্বারা আবার আর একটা আঁটি কর । এই প্রণালীতে ১০০ পর্যন্ত গণনা শিখাইয়া, ১০টা দশের আঁটি একত্র বাঁধিয়া একটা এক শতের আঁটি কর । তার পর ১০১, ১০২ ইত্যাদি ঐ প্রণালী মত শিখাও । বালকদিগকেও কাঠী সাজাইয়া সংখ্যা প্রকাশ শিক্ষা দিতে হইবে । প্রণয় কর—কাঠীব দ্বারা ৮৩ সাজাও ।

উত্তর :—



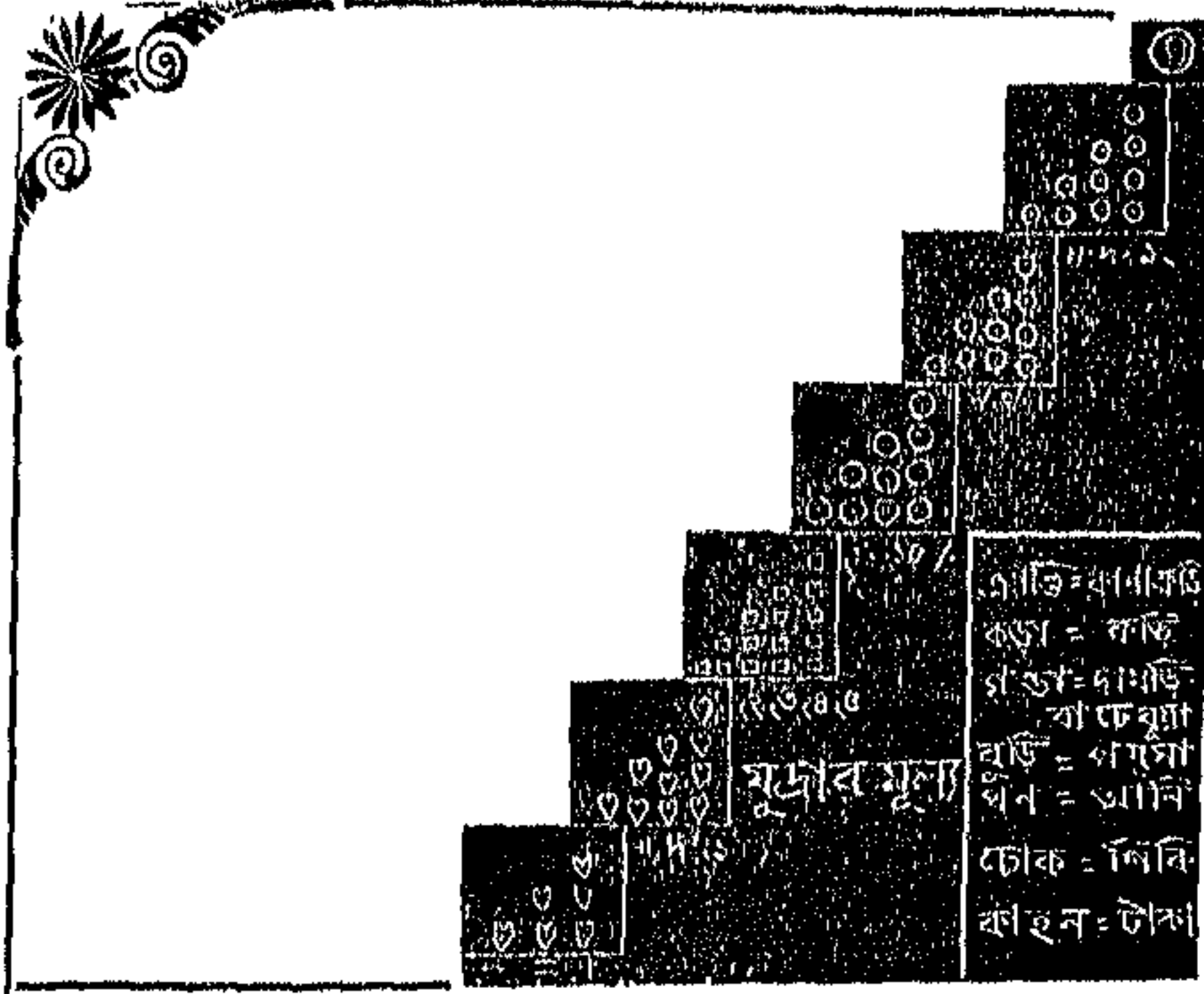
৪৬ চিত্র । ৮৩ সাজান ।

এই সমস্ত কার্য্যেব জন্ত কতকগুলি দশের আঁটি ও একটা শতের আঁটি বাঁধিয়া রাখিবে ও কতকগুলি আল্গা কাঠীও সংগ্রহ রাখিবে । এই কাঠীগুলি একটা খালি কাগজের বাক্সের ভিতর গুছাইয়া রাখিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে । কেবল কাঠির দ্বারা এইরূপ গণনা শিক্ষা দিলে বালকগণের হয়ত এমন একটা ধারণা হইতে পারে যে সংখ্যা বুঝি কেবল কাঠী গণনাতেই লাগে । এইজন্য ফুল, পাতা, ফল, কড়ি, ছুড়ি, তেঁতুলের বীজ, পয়সা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যিক । দশের সংখ্যার জন্ত, ১০টা ফুল স্তায় গাঁথিয়া, ১০টা পাতা বাঁশের শলাকায় বিদ্ধ করিয়া, ১০টা কড়ি একটা একটা কাপড়ের খলির ভিতর পুরিয়া, ১০টা ছুড়ি এক একটা খালি দেশলাইর বাক্সে রাখিয়া, ১০টা পয়সা কাগজে গুড়িয়া রাখিলেই বেশ হইবে । এক কাঠির দ্বারা প্রত্যহ শিক্ষা দিলে বালকগণের বিরক্তিও জন্মাষ্টতে পারে ; সেজন্যও নানারূপ দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যিক । শতকিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির সংখ্যা বোধ হইলে, দ্রব্য উপলক্ষ ব্যতীত শতকিয়া পড়িতে শিক্ষা দিবে । সকলে একসঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অতি

উত্তম প্রথা । এইরূপ পড়াকেই ‘ডাকপড়া’ বনে । সাধারণ শতকিয়া অভ্যাস হইলে, ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি ক্রমে এক এক বাদ দিয়া ও ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি ক্রমে দুই দুই বাদ দিয়া পড়া শিক্ষা দিবে । এই সময়ে ‘জোড়, বিজোড়’ কথা ছুইটী শিখাইবে । কড়ি বা তেঁতুলের বীজ লইয়া বালকগণকে জোড়, বিজোড় খেলা শিখাইবে ; আগোদের সঙ্গে অনেক শিখাইতে পারা যাইবে ।

কড়া, গণ্ডা প্রভৃতি ।—বার বৎসর পর্য্যন্ত মুখস্থ করিবার উপযুক্ত কাল । কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ, চোক প্রভৃতি এই সময়ের মধ্যেই মুখস্থ করাইয়া দিতে হইবে । এই সময়ে অন্ততঃ কুড়ির ঘর পর্য্যন্ত নামতাও শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । বালকেরা এই সমস্ত গণনা ‘ডাক পড়ার’ নিয়মে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে । পাঠশালার প্রত্যহ কি একদিন পর একদিন, এইরূপে ডাকপড়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য । টাকা পয়সা বিষয়ে কড়া গণ্ডার যে ব্যবহার, বালকগণকে প্রথমে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে । কাস্তি=কাণা কড়ি, কড়া=কড়ি, গণ্ডা=ডেবুয়া বা দামড়ী (উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এখনও চল আছে, তবে দামের তারতম্য হইয়াছে । তেঁতুলের বীজের মত তামখণ্ড বিশেষ), বুড়ি=পয়সা, পণ=আণী, চোক=গিকি, এবং কাহণ=টাকা । নিম্নের চিত্রানুরূপ একখানা কাগজে টাকা, পয়সা, কড়ি প্রভৃতি উত্তম আটার দ্বারা আঁটিয়া রাখিলে বালকগণের বুদ্ধিব্যবস্থার সুবিধা হইবে । একখণ্ড তাম শলাকা, তেঁতুলের বীজের আকারে কাটিয়া লইলেই ‘ডেবুয়ার’ কাজ চলিবে ।

যদি কাগজখানি চুরি যাইবার ভয় থাকে তবে সঙ্গে করিয়া বাঁড়ী লইয়া যাইতে হইবে বা বাক্সে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে । মধ্যে মধ্যে যে সকল মেকী টাকা, গিকি পাওয়া যায়, সেইগুলির এইরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে ।



৪৭ চিত্র ।—মুদ্রা পরিচয় ।

বিদেশীকে শতকিয়া শিখান ।—অনেক সাহেব যেন বাচ্চারা শিখিবার জন্য বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন । একপ ছাত্র হইলে কেবল শতকিয়ার পড়া মাত্র শিক্ষা দিতে হইবে । অথমে এক দুই করিয়া দশ পর্য্যন্ত শিখাইয়া লও । তারপর অন্যান্য সংখ্যার নাম শিক্ষায় অন্য প্রণালী অবলম্বন করিলে কাজ কিছু সহজ হইতে পারে । এইরূপে বুঝাইয়া দাও ; এগার=এক+আরও অর্থাৎ দশের পর আরও এক, তের=তিন আরও ইত্যাদি । বার, বাইশ, বত্রিশ প্রভৃতি শব্দে, 'ত্রি' কথার 'ব' মাত্র আছে, বার=ব+আরও । 'উন' শব্দের দ্বারা পরবর্তী সংখ্যার এক কম বুঝায় । উনত্রিশ=ত্রিশ অপেক্ষা এক উন বা কম । শূণ্যের 'শ', ব তে লাগিয়া বিশ, তিনে লাগিয়া ত্রিশ ইত্যাদি । একুশ, বাইশ প্রভৃতি শব্দে 'বিশের' ইশ মাত্র আছে ; এক+ইশ=একুশ । কোন সংখ্যা বাচক শব্দের পূর্বে এ থাকিলে এক, ব থাকিলে দুই (দ্বি) ত থাকিলে তিন, চ থাকিলে চার, প থাকিলে পাঁচ, ছ থাকিলে ছয়, স্য থাকিলে সাত ও আ থাকিলে আট সংশ্লিষ্ট সংখ্যা বুঝাইবে ; যথা বত্রিশ=ব (দুই) আর ত্রিশ, চৌরান্ন=চৌ (চার) আর আন্ন আধ+গণ্য, অর্থাৎ যতদূর গণনা করিতে হইবে তাহার অঙ্কেক=গণ্য), সাতাশী,=

সাত-আশী ইত্যাদি । তবে চৌদ্দ, যোল শব্দগুলি চার-আরও, কি ছয়-আরও করিয়া বুঝান যাইবে না ; আর ষাট, সত্তর, নব্বই প্রভৃতি শব্দেও শূন্যের 'শ' যুক্ত নাই । এইরূপ দুই চারিটা বাস্তবিক বলিয়া দিতে হইবে ।

মৌখিক যোগ, বিয়োগ ।—নামতা মুখস্থ করাইবার প্রণালীতে যোগ, বিয়োগের ধারাও কিছু মুখস্থ করান উচিত । যথা চারে তিনে সাত, চারে চারে আট, চারে পাঁচে নয় ইত্যাদি । এইরূপ নয়ে নয়ে আঠার পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলে যোগ, বিয়োগ উভয় কার্যেরই সাহায্য হইবে । তারপর বালকগণকে দুই অঙ্কযুক্ত সংখ্যার যোগ শিখাইবে । যথা ৩৫ আর ৬৭ কত হয় ?—এইরূপ অঙ্কে প্রথমে একক যোগ না করিয়া, দশক দুইটা যোগ করা সুবিধাজনক ; ৩ আর ৬এ নয় দশ, ৩ ৫ আর ৭এ বার অর্থাৎ এক দশ দুই ; সর্বসমেত দশ দশ আর ২, অর্থাৎ ১০২ । বিয়োগেও এই প্রণালী অবলম্বন করিবে । ইচ্ছা করিলে মনে মনে এককের ঘর হইতেও যোগ বিয়োগ আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু বালকেরা মৌখিক যোগ, বিয়োগে দশকের ঘর হইতে কার্য আরম্ভ করাই সুবিধাজনক মনে করে । শিক্ষক এ বিষয় নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ।

৪ । হস্তাক্ষর ।

আরম্ভ ।—লেখা শিখাইবার প্রণালী 'কিঞ্জারগার্টেন' ১০ম খেলনার বিবৃত হইয়াছে । প্রথমে বালককে কয়লা বা চক দিয়া মাটির উপরে, বা পেনসিল দিয়া স্লেটের উপরে তাহার স্নেহসম্পন্ন হিজিবিজি লিখিতে দিবে । ইহাতে তাহার কতকটা হাত ঠিক হইবে । কি পরিমাণ জোরে লিখিলে মোটা দাগ পড়ে ও কি পরিমাণ জোর লিখিলে সরু দাগ পড়ে, তাহা সে আপনা আপনি বুঝিতে পারিবে । ইহার পরে পূর্বের উপদেশমত (১০ম খেলনা) খাড়া, পড়া, তেড়া, এবং বঁকা ও ঐক্য বঁকা রেখা শিক্ষা দিতে হইবে । লেখা শিখাইবার সময় ব, র, ক

প্রভৃতি সহজ সহজ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইংরাজীতে যেমন ছাপার অক্ষর ও লেখার অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন, বাঙ্গালায় তাহা নহে বলিয়া এক সঙ্গে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া সমগ্রিক সুবিধাজনক। যাহার অক্ষর যতদূর ছাপার অক্ষরের সদৃশ, তাহার অক্ষর তত সুন্দর। সেইজন্য লিখিবার সময় বালকেরা বাহাতে ছাপার অক্ষরের অনুরূপ করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

আজ কাল বাঙ্গালা কাপিবুক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন কাপিবুক একটা বাঙ্গালা জড়া লেখারও আদর্শ আছে। এরাপ আদর্শ না থাকাই ভাল। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় সুবিধার জন্য ছাপার অক্ষরগুলিকে ডান্সিয়া-চুরিয়া একটা জড়া লেখা করা হইয়া থাকে; তাই বলিয়া সে লেখা আদর্শ হইতে পারে না। ছাপার লেখাই আদর্শ থাকিবে। কাজের সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি যাহা লেখা হয় তাহাকে উত্তম লেখা বলে না। যে ছাপার মত লিখিতে পারে ও তাড়াতাড়ি লিখিতে পারে সেই সর্বোত্তম লেখক। ইংরাজী 'স্ক্রীপ্ট' (জড়া) অক্ষরেরও একটা আদর্শ আছে। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় কয়জনের লেখা সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে? তাই বলিয়া ইংরাজী কাপিবুক একটা বিস্তীর্ণ জড়া লেখার আদর্শ দেওয়া হয় না।

শিক্ষাদানের নিয়ম।—(১) লেখার সময় বালকগণ সহজ ও সরল ভাবে বসিবে। ঘাড় বাঁকাইয়া, মাথা একদিকে হেলাইয়া, জিব বাহির করিয়া, জু কুঞ্চিত করিয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, পিঠ কুজ করিয়া লিখিবার অভ্যাস প্রথম হইতেই নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। মস্তক যেন কাগজের উপর অত্যধিক ঝুঁকিয়া না পড়ে।

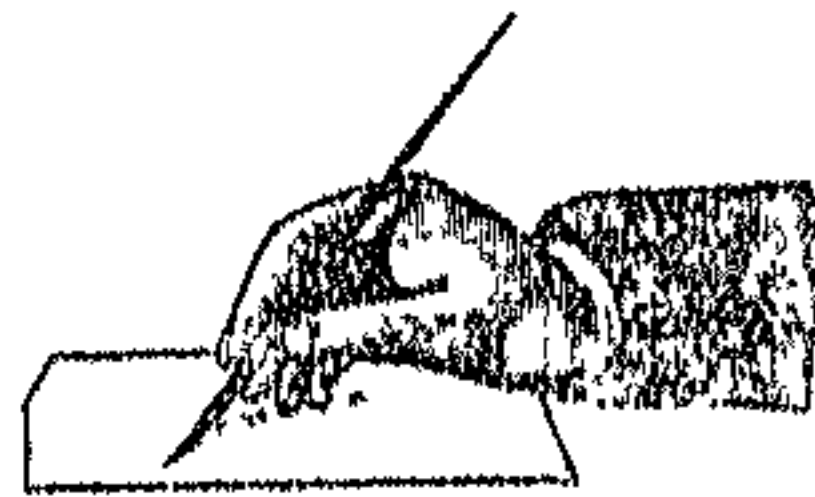
(২) লিখিবার উপকরণ উত্তম হওয়া আবশ্যিক। ভাল কাগজ, ভাল কলম, ও ভাল কালি না হইলে লেখা ভাল হইবে না। কাগজের উপর কালকালির দাগগুলি যত উজ্জ্বল দেখাইবে, লেখাও তত সুন্দর দেখাইবে। পাতলা ও ময়লা রঙের কাগজ, ফ্যাড়ফেড়ে কলম, ও জলো কালিতে ভাল লেখাও বিস্তীর্ণ হইয়া যায়। বালকের স্লেট বেশ পরিষ্কার হওয়া আবশ্যিক। মধ্যে মধ্যে জল ও কয়লা দ্বারা ঘসিয়া তেলের দাগ

তুলিয়া ফেলা আবশ্যিক । যেটে ভাল দাগ না পসিলে বাগক লিখিয়া আনন্দ পাঠবে না । নিম্ন শ্রেণীতে কাল কাটা যেট ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

(৩) লিখিবার পূর্বে, হাত বেশ করিয়া কাপড়ে মুছিয়া লইতে হইবে । হাতের তেল কাগজে লাগিলে লেখা চপসিয়া যাইবে আর কাগজও ময়লা দেখাইবে । পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সর্ব্ব প্রধান সহায় ।

(৪) পেন্সিল বা কলাম ধরিবার প্রণালী বাগকগণকে প্রথম হইতেই শিখাইতে হইবে । একবার অভ্যাস থারাপ হইয়া গেলে শেষে আর বদলাইতে পারা যাইবে না । তবে অঙ্গুলির আভাবিক জড়তাবশতঃ কেহ কেহ ভিন্ন প্রকারে কলাম ধরিতে সুরবিধা মনে করে । সে পৃথক কথা ।

মধ্যমান অগ্রভাগের উপর কলাম রাখিবে, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা কলাম ধরিবে । কাগজের সহিত কলামের অগ্রভাগের ১৫°২০° ডিগ্রি মত কোণ হইবে । কলামের উদ্ধাংশ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধার সংযোগস্থলে রাখিবে । কনিষ্ঠা কাগজের উপরে থাকিবে । অনামিকার অগ্রভাগ কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্য হইতে হাতের তালুর দিকে বাহির হইয়া থাকিবে ।



৪৮ চিত্র ।—কলাম ধরা ।

(৫) আদর্শ সুন্দর হওয়া আবশ্যিক । সুন্দর বড় বড় অক্ষরে নীতি-বাक্য লিখিয়া দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলে ভাল হয় । শিক্ষকের নিজের

হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষককে সম্মুখে লিখিতে দেখিলে বালকগণ অক্ষরের আকৃতি যে পরিমাণ অনুধাবন করিতে পারে, মুদ্রিত কাপিবুকের সাহায্যে তাহা পারে না।

(৬) অক্ষরগুলি লিখিবার ক্ষম বোর্ডের উপর বুঝাইয়া দিতে হইবে। ব লিখিতে হইলে কোন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন দিক দিয়া কোথায় গিয়া শেষ করিতে হইবে, তাহা না দেখাইয়া দিলে বালকেরা ধরিতে পারিবে না। শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দেখাইবেন।

(৭) প্রথমে এক একটা করিয়া অক্ষর লিখিতে শিখাইবে। কোন অক্ষর লিখিতে ভুল করিলে, বোর্ডে সেই ভুল অক্ষর ও শুদ্ধ অক্ষর লিখিয়া তাহাদিগের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবে। বালকের লেখার খাতায় তাহার ভুল অক্ষরগুলি লাল কালির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দিবে।

(৮) লেখা শিখাইবার সময়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালকগণের লেখা পরীক্ষা করিবে। একটা লাল পেন্সিল হাতে রাখিবে; যখন যাহার যে ভুল দেখিতে পাইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ লাল পেন্সিল দিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে।

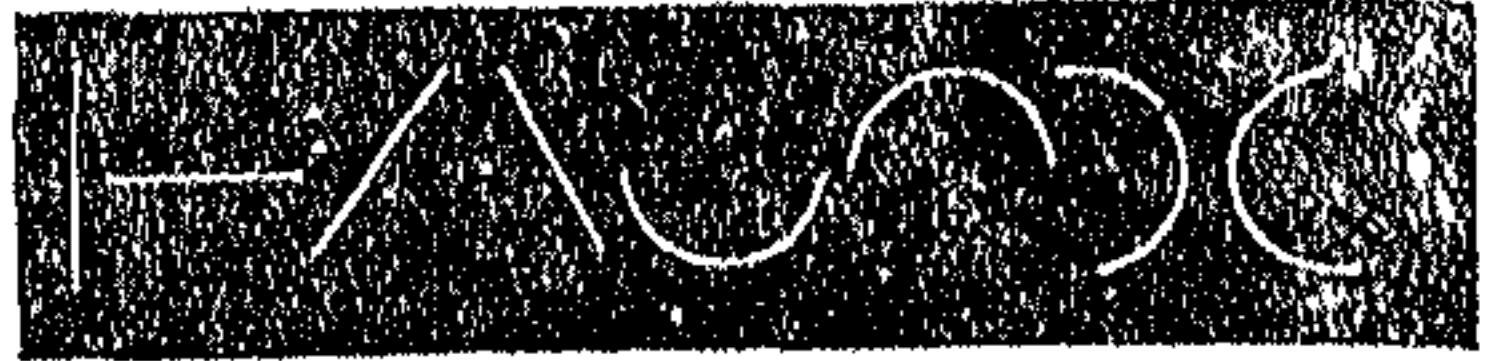
(৯) শ্রেণীতে বালকেরা যদি এক সময়ে একটা অক্ষর বা একটা বাক্যের অনুশীলন করে, তবে শিক্ষকের পক্ষে লেখা শিখান সুবিধা হয়। ভুল হইলে তখনই বোর্ডে লিখিয়া দেখান যাইতে পারে।

(১০) উত্তম হস্তাক্ষর কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যাহাতে প্রচুর পরিমাণে লেখার আলোচনা হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবে।

অনেক সময় বালকেরা, যেমন তেমন করিয়া, তাড়াতাড়ি কলম চালাইয়া, কতকগুলি চাই মাথা মুণ্ড লিখিয়া আনিয়া হাতের লেখার বুঝ দিয়া থাকে; আর শিক্ষকও অর্ধ নিম্নলিখিতেন্ত্রে একটা নাম দস্তখত করিয়া তাহার দায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ উভয় পক্ষের অবহেলায় বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। লেখা ভালত হয়ই না, পরন্তু

বালকগণের বিদ্যাভ্যাসের সকল কার্যেও অবহেলায় প্রযুক্তি জন্মিয়া যায় ।

অক্ষরের অংশ ।—প্রথমে নিম্নলিখিত ৯ বেখাগুলির অক্ষর শিক্ষা দিলে, লেখা শিখান সহজ হইতে পারে :



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

৪৯ চিত্র ।—অক্ষরের প্রাথমিক অংশ ।

(১) এই বেখা বামকেবা নীচের দিক হইতে টানিয়া উপরের দিকে উপরের দিক হইতে টানিয়া নীচের দিকে আঁকিবে (২) বাম হইতে নীচের দিকে (৩, ৪) উপর হইতে নীচের দিকে (৫) ডান হইতে বাম দিকে (৬) বাম হইতে ডান দিকে (৭) নীচ হইতে উপর দিকে (৮) উপর হইতে নীচে (৯) ডান হইতে বামেব দিকে ঘুরাইয়া শূন্য দিবে ।

প্রথম প্রথম বোর্ডের উপর বা মাটির উপর চক্ দিয়া মক্স করা অর্থাৎ শিক্ষকের দেখান উপর হাত বুলাইন উত্তম প্রথা ।

মুদ্রিত অক্ষর গুলিতে স্থল স্থান নানারূপ দাগ থাকে । লিখিবার সময় দাগ গুলি স্ক্র মোটা না করিলেও চলিতে পারে ।

অক্ষর লিখন ।—অ, আ, ক, খ শব্দের অংশ মাত্র । একাধিক বর্ণ একত্র না হইলে কোন অর্থ প্রকাশিত হয় না । কিন্তু ১, ২ প্রভৃতি অর্থযুক্ত চিহ্ন । প্রত্যেক চিহ্নে এক একটা বিশেষ সংখ্যা বোধ হয় । সুতরাং এই সমস্ত সংখ্যা লিখন শিক্ষায় তৎতৎ সংখ্যার জ্ঞান দানও আবশ্যিক । এইজন্য প্রথম অক্ষর লিখন শিক্ষা দিতে হইলে, বোর্ডে কাঠের চিত্র আঁকিয়া তাহার উপর অক্ষর লিখিতে হইবে যথা ;—



৫০ চিত্র ।—অর্থ লেখা ।

তারপর অঙ্কে অঙ্কে দাগ গুলি পুঁছিয়া ফেলায়া কেবল অঙ্কের চিহ্নই রাখিতে হইবে। এইরূপে ৯ পর্য্যন্ত শিখান হইলে, দশের বেলা ঘোড়ে একটা ‘দশের আটা’ আকিয়া তাহার গায়ে বড় কনিয়া একটা ১ দিখিয়া দিবে। দশের আটা বড় বনিয়া তাহার গায়ে লিখিত একও বড়। এই আটির পর আর আলাগা কাঠী নাই বলিয়া, সেখানে একটা শূন্য দিবে। বুঝিয়া দাও, আলাগা কাঠী না থাকিলেই সেখানে এইরূপ একটা ০ চিহ্ন দেওয়া হয়। ‘দশের আটা’ ডাহিনে একটা আলাগা কাঠী আকিয়া তার উপর একটা ছোট কনিয়া ১ লেখ। শেষে আটা কাঠী পুঁছিয়া ফেলিলে ‘১১’ এইরূপ এগাব থাকিবে। এইরূপে ১২, ১৩, প্রভৃতি শিখাইবে। তাব পর অভ্যাস হইয়া গেলে এককেব ও দশকেব অঙ্ক এক আকারেই লিখিবে। বামে থাকিলেই যে দশকেব অঙ্ক বুঝায় ইহা বালকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবে।

৫। শ্রুতলিপি ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ।—বালকেরা অঙ্কের আকৃতি না দেখিয়া লিখিতে পারে কি না তাহার পরীক্ষা হয়। শুদ্ধ বানান মনে আছে কি না, তাহার পরীক্ষা হয়। আর ক্রম লিখিবার অভ্যাস হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এসকল ব্যতীত শ্রুতলিপি শিক্ষায় বালকের মনোযোগ শক্তি ও স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি সাধন হয়।

শিক্ষাদিবার নিয়ম ।—(১) বালকের বয়স ও জ্ঞান বিবেচনায় শ্রুতলিপির অংশ নির্ধারণ করিবে। ছোট ছোট বালকগণকে

২।৩টি শব্দ লেখাইদেওঁ যথেষ্ট হইয়া থাকে । নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে ৪।৫, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ৭।৮ ও ছাত্রশিক্ষিত ১০।১২ লাইন লেখাইলেই চলিতে পারে ।

(২) বালকগণকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দযুক্ত প্রবন্ধাংশ দাড়াইয়া লয়েন ; এতদূর করা অনিষ্টকর । বালকের পাঠ্য পুস্তক হইতে অথবা সেট বইয়ের অন্ত কোন পুস্তক হইতে প্রতিনিধি দেওয়া কর্তব্য । অনেক শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দগুলি প্রথমে একবার বোঝে লেখাইয়া লয়েন । এ নিয়মও বেশ—কাবণ লিখান উদ্দেশ্য, ঠকান নয় ।

(৩) যে অংশের প্রতিনিধি দিতে হইবে, প্রতিনিধি লেখাইবার পূর্বে, তাহা একবার পড়িয়া শুনাইবে । কারণ বিষয় জানিলে লিখিবার সুবিধা হয়, বাক্য বা বাক্যাংশ সহজেই মনে থাকে ।

(৪) বাক্যাংশ বা বাক্য, একবারের অধিক ডাকিয়া দিবে না । কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি করিবে না । বালকেরা সাধারণতঃ যত সময়ে সেই অংশ লিখিতে পারে মনে কর, তত সময় থামিয়া, তবে অপরাংশ ডাকিয়া দিবে । শিক্ষকের বলা শেষ না হইলে বালকগণ লিখিতে আরম্ভ করিবে না । যে সকল বালক বাক্যাংশ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে লিখিতে আবদ্ধ করে, তাহারা বাক্যাংশের প্রথম ২।১টি কথাই শুনে, কিন্তু শেষাংশের প্রতি মনোযোগ থাকে না বলিয়া ‘তারপর কি, তারপর কি’ করিয়া চীৎকার করে । একবারের বেশী না বলিলেই, বালকগণ বাধ্য হইয়া মনোযোগী হইবে ও একবার শুনিয়াই সমস্ত বাক্যাংশ মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে । ইহাতে মনোযোগ ও শ্রুতিশক্তি দুয়েরই অনুশীলন হয় । তবে বাক্যাংশের পরিমাণ, ছাত্রের বয়স বা জ্ঞান বিবেচনায় নির্ধারণ করিতে হইবে । নিম্ন প্রাথমিকের বালকগণের জন্য একসঙ্গে ৩।৪টি, উচ্চ প্রাথমিকের

বালকের জন্ম ৪।৫, ও ছাত্রবৃত্তির বালকের জন্ম ৫।৬টী কথার বাক্য বা বাক্যাংশ ডাকিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অসংলগ্ন বাক্যাংশ ডাকিতে নাই। “রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন”—এই অংশের শ্রুতলিপি লেখাইতে হইবে। এখন নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে ৩৭ কথার অংশ একসঙ্গে ডাকিয়া দিতে হইবে বলিয়া, “রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ॥ হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ॥” ইত্যাদি প্রকারে পড়িতে হইবে না। শ্রুতলিপি ডাকা শেষ হইলে, সমস্ত অংশ আর পুনরায় পড়িয়া শুনাইবে না। প্রথমেইত পড়িয়া শুনাষ্টয়াছে।

(৫) বালকেরা প্রায়ই যুক্ত অক্ষরগুলি লিখিতে জানে না। ‘পুষ্প’ লিখিতে হয়ত একটা আশু ‘ব’এব নীচে একটা ‘প’ লিখিয়া রাখিল। শ্রুতলিপিতে এগুলি শিখাইতে হইবে।

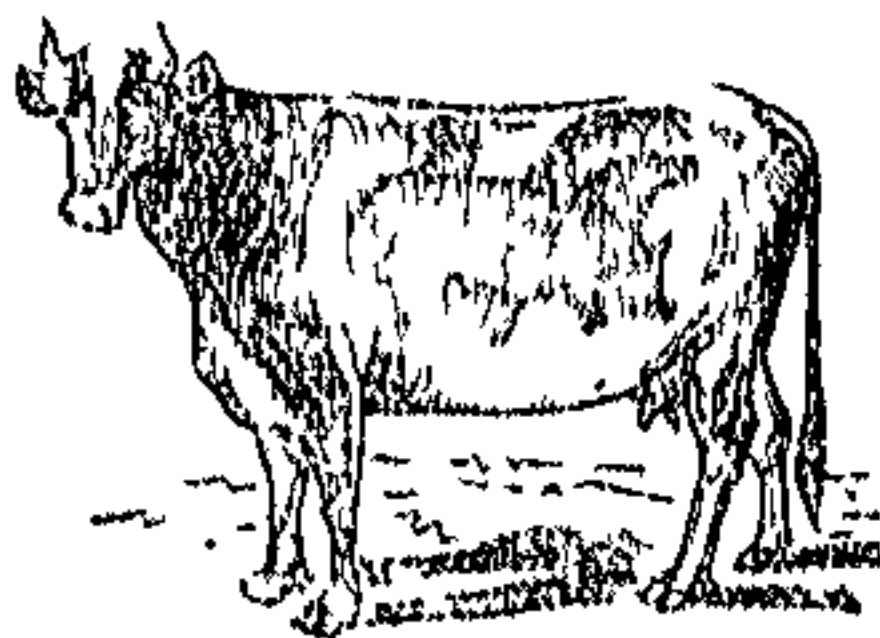
(৬) শ্রুতলিপি পরীক্ষার সময়, অশুদ্ধ বর্ণবিচ্ছাসের নীচে একটা দাগ দিয়া দিবে। বালক পুস্তক দেখিয়া নিজেই শুদ্ধ বানান লিখিবে। যে বানানগুলি প্রায় বালকেই লিখিতে ভুল করে, সেগুলি বোর্ডে লেখাইয়া দিবে। অনেক শিক্ষক অশুদ্ধ বর্ণবিচ্ছাসগুলির শুদ্ধ বানান ৩৪ বার করিয়া দেখাইয়া দরেন। এ প্রথা মন্দ নয়।

(৭) সকল সময় নিজে শ্রুতলিপি পরীক্ষা না করিয়া মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইবে। এর স্লেট তাকে, তার স্লেট ওকে, এইরূপে বালকেরা পরস্পরের স্লেট বদল করিয়া লইবে। বালকেরা স্লেট পরীক্ষার সময় অশুদ্ধ বানানগুলির নীচে দাগ দিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে যার স্লেট তাহাকে দিয়াও পরীক্ষা করান মন্দ নহে।

(৮) কোন কোন শিক্ষক বোর্ডে কতকগুলি অশুদ্ধ বানান লিখিয়া দিয়া, বালকগণকে শুদ্ধ করিতে বলিয়া থাকেন। এরূপ করা

ଅ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଦୋଷେ । ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଧାର ବାମାନ । ଅଥ—ଗାଥିବାର ସମୟ
ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିର ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତର ଚୋଖେ ଭାଗିତେ ଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାମାନ
ଦେଖାଯିବା କଥାଟି ବାମାନେ ଚୋଖ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିବେ ନା ।

(୯) ଠିକ୍ ଏକ ଶ୍ରୋତାଦେ ଶ୍ରୋତାଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାମକଗ୍ନେ
ଶ୍ରୋତାଦେ ହେବେ ନା । ମନ୍ଦୋ ମନ୍ଦୋ ଶ୍ରୋତାଗିରିତେ ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦିଆ
ଦାକିଆ ଦିବେ । ବାମକେରା ମେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ପୁରଣ କରିବା ଦିବେ ।
ଯଥା :—ପାନୋସ ଜଗା—ନା ହେବେ—ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ପାରେ ।
ଓଳାଉଠାର—ଜଳ ଓ ଛୁଙ୍କେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମନ୍ଦେ—ମାବମାନ ହେବେ—





তৃতীয় প্রকরণ—ভাষাবিষয়ক ।

১। সাহিত্য ।



দৈশ্য—(১) ভাষাবোধ অর্থাৎ লিখিত ভাষা পাঠ করিয়া নেথকেব উদ্দিষ্ট ভাব বুঝিবার ক্ষমতা লাভ। (২) বচনা শক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাষাতে নিজের মনেব ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ। (৩) বিষয় জ্ঞান অর্থাৎ নানাবিষয় সম্পর্কীয় বিবরণ পাঠ ও সেই সমুদয় বিষয়

প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, আলোচনা বা বিশ্লেষণ দ্বারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। (৪) মনোবৃত্তিব বিকাশ অর্থাৎ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুমিতি, কার্য কারণাদি সম্বন্ধ বোধ, বুদ্ধিপ্রয়োগ শক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি। (৫) জ্ঞান তৃষ্ণার উদ্রেক অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় সমুদায়ের পাঠ ও আলোচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধে কুতূহল বা অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার স্পৃহা বর্দ্ধন। (দীননাথ সেন—শিক্ষাদান প্রণালী)

সাহিত্যের শিক্ষকতা ।—যে শিক্ষকের সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকেই সীমাবদ্ধ, সে শিক্ষক সাহিত্য শিক্ষা দানের উপ

যোগী হইতে পারেন না । হেমচন্দ্রের কবিতাবলী পড়াঠিতে হইলে, অল্পতঃ হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী উত্তমরূপে পাঠ করা আবশ্যিক । যে গাথুকারের পুস্তক পড়াইতে হইবে তাঁহার নিখিত অনেক পুস্তক না পড়িলে, তাঁহার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না । সাহিত্য ভাবের বাজ্য । সাহিত্য বিদ্যালয় পাঠ্যের প্রাণ-স্বরূপ । দর্শন, বিজ্ঞান গণিতাদি পাঠ-জনিও শ্রান্তি, সাহিত্য পাঠে বিদূরিত হয় । শিক্ষক যোগ্য হইলে, সাহিত্য পাঠের ঘণ্টায়, বালকগণকে বিদ্যালয়ের প্রাচীরাবদ্ধ কক্ষ হইতে কল্পনা ও বর্ণনার সাহায্যে মদন মোহনের 'প্রভাত সঙ্গীত', মধুসূদনের 'অশোক কাননে', হেমচন্দ্রের 'নিবীড় অরণ্য', নবীন চন্দ্রের 'আত্মবনে' ও রবীন্দ্রনাথের 'গির্জাশায়িত নির্ঝরনের স্বপনে' পর্য্যন্ত লাইয়া যাইতে পারেন । শিক্ষকের ভাবের আবেগ চাই, কল্পনার ক্ষমতা চাই, ও বর্ণনার চাতুর্য্য এবং মাধুর্য্য চাই । এ সমস্ত কেবল উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠের উপর নির্ভর করে । সাহিত্য কেবল বালকের বুদ্ধি বৃত্তির উপর নহে, তাঁহার সমস্ত প্রকৃতির উপর কার্য্য করিয়া থাকে । মানব-চরিত্রের বিচিত্র খেলা ও প্রকৃতির প্রহেলিকাময়ী লীলা, বালক সাহিত্য পুস্তকের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারে । তেমন অচতুর পরিচালক হইলে, বিদ্যালয় গৃহেই কেশবচন্দ্র, কুমারদাস, বিদ্যা-মাগর প্রভৃতির বীজ বপন করিতে পারেন । কুৎ, তুচ্ছিত, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি লাইয়া অপরিমিত অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়—সুন্দর রসশূন্য হইয়া পড়ে । বিদ্যালয়ে এ সকলের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু তাঁহার পরিমাণ আছে । সাহিত্য গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট উন্নত ভাব সমূহ উপলব্ধি করাই, সাহিত্য পাঠের পৌনেষোল আনা উদ্দেশ্য । ব্যাকরণাদির আলোচনা সামান্য মাত্রই আবশ্যিক । আমি পরীক্ষার কথা বলিতেছি না—সেরূপ কোন প্রয়োজন থাকিলে, পরীক্ষা ও পরীক্ষকের নীতি বুঝিয়া পৌনেষোল আনা ব্যাকরণ পড়ানও আব-

শ্রুত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সাহিত্য পাঠের প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। উপরন্তু ব্যাকরণগত নীরস খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে করিতে একপা কু অভ্যাস হইয়া যায় যে, সাহিত্যের প্রকৃত মাদুর্য্যের প্রতি তেমন আশ্রয় থাকে না। নিম্নে সাহিত্য শিক্ষাদানের সাধারণ নিয়মাদি উল্লিখিত হইল। বিদ্যালয়ের এণী অনুরাগে এই সকল প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হইতে পারে।

সাহিত্য শিক্ষায় লক্ষ্য।—সাহিত্য শিক্ষায় আমরা তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকি :—পাঠ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা। এই তিনটির মধ্যে উত্তমরূপ পাঠ বা আবৃত্তি সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। সাহিত্য পাঠের অন্ততম উদ্দেশ্য—শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া, সভ্য সমাজে নিজের উচ্চ উচ্চ মনোভাব উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়া। এই প্রকাশের ক্ষমতা কেবল শব্দ যোজনার উপর নির্ভর করে না, কথনের প্রণালী ও ভঙ্গীর উপরও যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকে। শব্দের ও বাক্যের আবশ্যকতা বিবেচনায় আমরা বাক্য কথনের সময়, শব্দ বিশেষ বা বাক্যের অংশ বিশেষ অপেক্ষাকৃত জোরে উচ্চারণ করিয়া থাকি। ইহা ভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ভাবের সহিত যোগ দিয়া, আমরা আশাদিগের কথার সুরও নিয়মিত করিয়া থাকি। খেদসূচক বিষয় হইলে গম্ভীর সুরে, আনন্দের বিষয় হইলে মধুর সুরে, বীরত্বের বিষয় হইলে তেজসূচক সুরে বক্তব্য বিষয় বাক্য করিয়া থাকি। ইহাতেই বক্তব্য বিষয়ের কথন দ্বারা আমরা আশাদিগের বাঞ্ছিত ফল লাভ করি। ভিক্ষুক দ্বারে আসিয়া তেজসূচক সুরে প্রার্থনা করিলে সে ভিক্ষা পায় না; কিম্বা করণ সুরে কাহাকেও তিরস্কার করিলে কোন ফলোদয় হয় না। সেইজন্য উত্তমরূপ পাঠ করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যকীয়।

পাঠ।—বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পাঠ শিক্ষা দিতে এই সকল

নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক । (১) ছোট ছোট বাক্যেরা যখন বাক্য পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হঠাৎই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে । কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি বিরাম বোধক চিহ্ন ব্যতীত, পাঠ কালে বাক্যের অংশে অংশে, অর্থবোধে, অনেক বিরাম প্রয়োগ করিতে হয় । বিশেষণ জ্ঞাপি বিশেষ্যের সঙ্গে, ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার সঙ্গে, সম্বন্ধ কারক তাহার সম্বন্ধীর সঙ্গে, কন্ম কারক তাহার ক্রিয়ার সঙ্গে একত্র পঠিত হইয়া থাকে । (বালকদিগকে যে ব্যাকরণ শিখাইয়া লইয়া, পাঠ শিখা দিতে হইবে তাহা নহে, শিক্ষকদিগের সাহায্যার্থে এই সকল সম্বন্ধ নির্দেশ করা হইতেছে) । বালকদিগকে প্রথমে পড়িয়া শুনাইতে হইবে, —তাহারা অনুকরণ করিবে । কোন কোন শিক্ষককে পেন্সিল দিয়া এইরূপ দাগ দিতেও দেখিয়াছি । যথা :—

একদা । দুইটি ছোট বালক । একটা বড় পুকুরের ধারে । অতি অসাবধানে ছুটছুটি করিতেছিল ।

এইরূপ করিয়া না পড়িয়া যদি নিম্নের বিরাম লক্ষ্য করিয়া পড়া যায় তবে অর্থবোধ হইবে না :—

একদা দুইটি । দুই বালক একটা । বড় পুকুরের । ধারে অতি । অসাবধানে ছুটা । ছুটি করিতেছিল ।

দাগ দিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখি না । শিক্ষক নিজে উত্তম করিয়া পড়িয়া দিলেই বালকেরা সহজেই অনুকরণ করিতে পারিবে । তবে বিশেষ আবশ্যক হইলে, অতি নিবেদন বালকের পক্ষে, এইরূপ দাগের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে । তারপর বিশেষণাদি গুণবাচক শব্দের ও ভাবের যোগ রাখিয়া, কোন কোন শব্দ একটু অপেক্ষাকৃত অধিক জোর দিয়া পড়িতে হয় । যেমন এখানে ‘দুই’, ‘বড়’ ও ‘অতি অসাবধানে’—এই সকল শব্দের প্রতি একটু অধিক জোর দেওয়া আবশ্যিক ।

(২) কমা, সেমিকোলান, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া বাগকেরা থামিবে। কতক্ষণ থামিতে হইবে তাহা শিক্ষকের পাঠ শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে। কমার নিকট এক, সেমিকোলানের নিকট দুই, ও দাঁড়ির নিকট তিন গণনা করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ থা মবে—এই নিয়মানুসারে থামিতে শিক্ষা দিলে, সহজ বিষয় কঠিন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কোন কোন বালক আবার কমা দেখিলে হয়ত বড় করিয়া ‘এক’ বলিয়াও ফেলিবে। নিয়ম ইহাই বটে, কিন্তু বালককে নিয়ম না শিখাইয়া সেই নিয়মের কার্য্য অর্থাৎ পড়া শিখাইয়া দাও। প্রথম বোধক চিহ্ন বিশিষ্ট বাক্য কল্পণ সুরে পড়িতে হয়, তাহা অনেক বালক জানে না। এ বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষ উপদেশ দিতে হইবে, অর্থাৎ উত্তম করিয়া পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আর বালকগণের নিকট তজ্জপ পাঠ আদায় করিতে হইবে। আশ্চর্য্য বোধক চিহ্ন সম্বন্ধেও কিছু কিছু উপদেশ আবশ্যক।

(৩) পড়ার স্বর অত্যধিক উচ্চ বা নীচ ভাল নহে। আমরা সাধারণতঃ যে স্বরে কথা বলি, তাহাই পাঠের পক্ষে উত্তম স্বর। অনেক বালক সুর করিয়া বা ঘ্যাঙাইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই শিক্ষক এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিবেন। খেদ সূচক অংশ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে ও ধীরে পড়িতে হয়। বীরত্ববাক্যক অংশ একটু উচ্চ ও দ্রুত পড়া রীতি। যাঁহারা উত্তমরূপ অভিনয় বা বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অভিনয় বা বক্তৃতা শ্রবণ করিলে, এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা হয়। তবে অভিনয়ে বেরূপ ক্রন্দন, হাস্য, রোষ প্রভৃতি ভাবের প্রকৃত অনুকরণ করা হইয়া থাকে, শ্রেণীস্থ পাঠে ততদূর করার রীতি নাই। কেবল ভাব বুঝিয়া পাঠের স্বর উচ্চ, নীচ, ধীর, দ্রুত বা গভীর করিতে হইবে মাত্র।

(৪) পাঠের কালে ভাব অনুসারে চোখ, মুখ ও হস্তের কিঞ্চিৎ

ভঙ্গির আবশ্যক । চিহ্ন পুনরিত্যকান গ্রাম নিশ্চয় নিম্পন্দ ভাবে পাঠ করিলে ভাবের উদয় হয় না । তাঁহা বলিয়া যাতার দেনেব ছোকবার মত অস্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালনও বাঞ্ছনীয় নহে ।

(৫) উচ্চারণের জড়তা পনিভাগ করাষ্টতে হইবে । যাহারা বাণ্যকান হইতে খুব তাড়াগাড়ি কিম্বা অস্পষ্ট শব্দে পড়িতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ জড়তাযুক্ত হইয়া থাকে । শব্দ একবারে উচ্চারণ করিতে না পারিলে, শব্দের অংশ অংশ উচ্চারণ করিবে । “প্রাকৃতিক” কথা একবারে উচ্চারণ করিতে যদি জড়তা আসিয়া পড়ে, তবে ‘প্রা’, ‘কু’, ‘তিক’ এইরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চারণ করাইয়া লইতে হইবে । বোডে’ এইরূপ কঠিন শব্দগুলি লিখিয়া, পাঠের পূর্বে বালকগণকে অভ্যাস করান মন্দ নহে ।

(৬) কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ দেশজ দোষে বিকৃত হইয়া থাকে । “ভালবাসা” স্থানে ‘বানবাসা’, ‘দত্তবাদ’ স্থানে ‘দত্তবাদ’, ‘ঘর’ স্থানে ‘গর,’—এইরূপ বর্ণের চতুর্থ বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । এই দোষ ছাড়াইতে হইলে, চতুর্থবর্ণযুক্ত শব্দগুলি উচ্চারণের সময়, ঐ চতুর্থবর্ণে বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবে । তাহা হইলে ধীরে ধীরে এই দোষ পরিত্যক্ত হইবে । ‘বড়’ স্থানে বর, ও ‘টান’ স্থানে চান গুনিতে পাওয়া যায় । এরূপ স্থানেও, যে বর্ণের ভুল উচ্চারণ হয়, পাঠকানো সেইটীর প্রতি সমধিক জোর দেওয়া আবশ্যক । যেথা আছে ‘শোক’ কিন্তু পড়িবার সময় পড়ে ‘গোক’ ; ‘মাছে আলো দাও’ আর ‘ঘরে আলু দাও’—অর্থাৎ ওকান স্থানে উকার ও উকারের স্থানে ওকার—ইহাও কোন কোন জেগার দোষ । তাহাও কতকগুলি উচ্চারণের বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক যথা :—অনন্ত, অভন্ন, অঘোদ, অন্ধ, প্রভৃতি শব্দে অ কারের প্রকৃত উচ্চারণ হয়, কিন্তু অখিল, অধীন, প্রভৃতি

অধিকারী, প্রভৃতি শব্দে 'অ'কারের উচ্চারণ একটু 'ও' সংযুক্ত * । এইরূপ ব্রজেশ্বর, ব্রজরাজ পড়িতে 'ব্র' অকার যুক্ত না হইয়া একটু 'ও'কার যুক্ত হইবে । বক্ষ, বক্ষা, অজ্ঞ, অজ্ঞতা প্রভৃতির অ ওকারযুক্ত । আবার বেদা, তেল, বেত, দেড়, পেট, এবং, দেশ, মেঘ, কেবল, একদা, ছেঁড়া, দেড়া, এখানে প্রভৃতি শব্দে 'এ' কারের প্রকৃত উচ্চারণ ; কিন্তু কেন, এত, দেখ, হেব, এক, কেমন, যেমন, তেমন, এখন, বেড়া, তেড়া, ভেড়া, বৈকা, বেঙ, প্রভৃতি শব্দে 'এ' কারের উচ্চারণ কতকটা 'বক্ষা আকার' তুল্য । 'বায়ু' উচ্চারণে 'বায়ু' হইবেনা, 'বায়উ' হইবে, 'ময়ূর' উচ্চারণে 'মোয়উর' হইবে ।

(৭) কি বাড়িতে, কি স্কুলে, কি পাঠ মুখস্থের সময়, কি আবৃত্তির সময়, কোন সময়েই যেন বালক ভাড়াভাড়ি ও অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে । তবে একবার পাঠের বীতি উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, আর কোনরূপ বিধির আবশ্যক থাকিবে না । তখন বালকের অর্ধক্ষুণ্ট স্বরে বা গুণ গুণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করাতেও কোনরূপ ক্ষতির কারণ হইবে না । কিন্তু প্রথম অবস্থায়, বালকগণকে কোন সময়েই অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে দিবে না ।

(৮) কোন কোন বালক স্বভাবতঃ একটু লজ্জাশীল । এই লজ্জাবশতই অস্পষ্টরূপে ও মৃদুস্বরে পাঠ করিয়া থাকে । নিয়ম শ্রেনীতেই এইরূপ দোষ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । মধ্যে মধ্যে সকল

* যদি অকারের পরস্থিত ব্যঞ্জনান্ত্বর অ অ আ উ ঐ ও ঔ হয় তবে অকারের উচ্চারণ সম্পূর্ণ অকারের মতই হইয়া থাকে, যথা অভয়, সকল ; অনাদি, সখা ; অপূর্ব, সম্পূর্ণ ; অশেষ, নরেন্দ্র ; অঘোর, মহোৎসব ; অদৈর্ঘ্য, শটমঃ ; অগৌণ, জলৌকা ; ইত্যাদি । কিন্তু যদি অকারের পরস্থিত ব্যঞ্জনান্ত্বর ই ঈ উ ঋ হয় তবে অকারের উচ্চারণ একটু ওকার যুক্ত হয়, যথা অধিকারী, যদি ; অগ্নি, নদী ; অরণ, বন্ধু ; অমৃত, নম্র ইত্যাদি । তবে ব্যতিক্রম আছে । (রবীন্দ্র বাবুর 'শব্দতত্ত্ব' পাঠ কর) ।

বালককে দণ্ডায়মান কবাস্থা সমস্তবে পাঠ কবাস্থা এম বাজুক বালক-
গণের বাজা ভাঙ্গিয়া যায়। বাজুক বাজকেবা এতরূপ সমস্তবে পাঠেব
সমগ উপন্যাসকে ও উচ্চস্বরা সকলো মতি ও আবৃত্তি কবিত্তেছে কি
না, এ বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কখন অনেক বালক
সমস্তবে পাঠেব সমগ ও ভাঙ্গিয়াগো লজ্জাশীল হইব বশে, মুহূর্ত্তবে ও
অস্পষ্টরূপে আবৃত্তি কবিতা থাকে।

(৯) বিদ্যালয়েব জন্মদিনে বা পূজার বিভবণ দিনে বা গ্রীষ্মেব
বন্ধ কি পূজার দুটীব পূর্ব দিনে, কোন কোন বিদ্যালয়ে সভা
হইয়া থাকে। এই সভায় সাধারণের সম্মুখে আবৃত্তি কবিত্তে বালক-
গণেব লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায় ও উত্তমরূপে আবৃত্তি কবিত্তেব একটা আকাঙ্ক্ষা
জন্মে।

সুজ সুজ “কণোপকথনের” অভিনয় করা যাইতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ বসুকৃত
‘ভারতের মানচিত্র দর্শন’ ও শীঘ্রতঃ কামিনী রায় কৃত “একলব্যের গুরদক্ষিণা”
বিদ্যালয় অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। (কিডনবার্টেন পরিচ্ছেদে আবৃত্তি ও অভিনয়ের
অংশ দেখ) উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ “সেমনাদ বধের” বা “পলাশীর যুদ্ধের” কোন অংশ অভিনয়
কিতে পারে। সুজ সুজ কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মানকুমারী, গিরীন্দ্র মোহিনী,
গোবিন্দ চন্দ্র দাস কৃত প্রস্তাবণীতে যথেষ্ট আবৃত্তির উপযুক্ত কবিতা আছে। কলিকাতার
নীতি বিদ্যালয় কর্তৃক প্রচারিত ‘সম্মত মুকুল’ নামক পুস্তকে বালকগণের আবৃত্তির
উপযোগী অনেকগুলি কবিতা ও সম্মত সংগ্রহিত হইয়াছে। উত্তমরূপে ভঙ্গীর সহিত এগুলি
আবৃত্তি করিতে পারিলে বিশেষ ঐতিহাস হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত শিক্ষকের কর্তব্য যে,
তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন সম্ভব বালকগণকে পড়িয়া শুধান।
শিক্ষককে উত্তমরূপে পাঠক হইতে হইবে।

(১০) শ্রেণীতে পর পর পাঠের যে রীতি আছে, তাহা
ফলপ্রসূ নহে। প্রথম বালক যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন দ্বিতীয়
বালক প্রথম বালকের পড়া না শুনিয়া নিজের বে অংশ পড়িতে হইবে,
তাহাই আন্দাজ কবিতা মনে মনে অভ্যাস করিতে থাকে। এইরূপ

তৃতীয়, চতুর্থ হইতে শেষ বালক পর্য্যন্ত সকলোই একটা আন্দাজ কবিতা নিজ নিজ অংশ এইমanner বাস্তব থাকে । সুতরাং কে কিরূপ পড়িল তাহার দিকে মনোযোগ থাকে না । এক জনের পাঠের দর অল্প কাহাকে যে পড়িতে হইবে, তাহা যেন বালকেরা পূর্ক হইতে না জানিতে পারে । শিক্ষক যে কোন বালককে পড়িতে বসিতে পানেন । তারপর উপবিস্ত বালকের ভূমি ধরিয়া নিম্নেব বালক উপবে উঠিতে পারে, বিদ্যালয়েম এইরূপ রীতি আছে । ইহাতে শ্রেণীব বালকগণ নিবিষ্টচিত্তে কেবল ভুল ধরিবার জন্তই বাস্তব থাকে । বালক পড়িল

একাকিনী শোকাকুল, অশোক কাননে
কাদেন বাঘের বাচ্চা অঁধার কুটীরে
বিবরে, ইত্যাদি ।

নিম্নেব বালক বসিয়া উঠিল ‘বাঘের বাচ্চা’ নয় ‘বাঘব বাচ্চা’ আব উপবে গিয়া বসিল । শিক্ষকও ইহাতেই তুষ্ট হইলেন । দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা বা অর্থবোধের অভাবে কোন বালকের পক্ষে এরূপ পড়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘বাঘব বাচ্চা’ হইলেই বিগত পাঠ হইয়া গেল না । আমরা কেবল বালকগণকে ভুল ধরিতেই শিক্ষা দিয়া থাকি, কিন্তু গুণের সুখ্যাতি করিতে শিক্ষা দিয়া থাকি না । বালকেরা পুস্তক বন্ধ কবিতা চক্ষু বুঁধিয়া বসিয়া থাকুক—আর কাহাব পড়া কেমন মধুর ও ভাব-ব্যঞ্জক হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করুক—দোষ অপেক্ষা গুণ দেখিতে অভ্যাস করুক । এইরূপে গুণের আলোচনা করিতে করিতে নিজের দোষ অল-ক্ষিতে সংশোধিত হইয়া যাইবে । শব্দ পাঠের ভুল সংশোধনের কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা আছে বটে ; কিন্তু প্রকৃত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ, স্বর অবস্থানুগামী ব্রহ্ম, দীর্ঘ করিয়া যে পাঠ করা হয় তাহাই উত্তম পাঠ । পাঠের এই সর্ব প্রাধান্য বিষয় বালক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কি না দেখিতে হইবে । শিক্ষকের নিজেরও উচিত, পাঠ্য পুস্তকেব লাইনের প্রতি চক্ষু

না রাখিয়া, বাগকগণের পড়ার দিকে কাণ রাখা। তাহা হইলে কাহার পড়া বিরূপ সুন্দর হইতেছে, তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

শব্দার্থ।—অভিধানের সাহায্যে শব্দার্থ শিক্ষা করা উত্তম পদ্ধতি বটে। কিন্তু ছোট ছোট বাগকেরা একে অভিধানে খুঁজিয়া শব্দ বাহির করিতে জানেন না, আর তাহা জানিলেও, অভিধান লিখিত শব্দের বহু অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি পাঠ্য অংশের উপযোগী তাহা স্থির করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই শ্রেণীর বাগকদিগকে শব্দের অর্থ শিখাইয়া দিতে হয়। শব্দার্থ শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে :—

(১) যে সকল শব্দ বাগকেরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে ও যাহার অর্থ বা ভাব তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার অর্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই। অনেক অর্থ পুস্তকে এইরূপে সমস্ত শব্দের অর্থ লেখা, বার পয়সার পুস্তকের ‘অর্থপুস্তকের’ দাম বার আনা হইয়া থাকে। কোন অর্থ পুস্তকে দেখিয়াছি, আমি=নিজে, তুমি=যাহার সহিত কথা বলা হইতেছে, কাঁদিতেছে=অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, এইরূপ প্রায় সকল কথাই অর্থ লেখা হইয়াছে। অনেক শিক্ষক এইরূপ অর্থপুস্তক কিনিতে প্রয়াস দিয়া থাকেন। আবার তিনি নিজেও এইরূপ অর্থ পুস্তক খুলিয়া, নির্দিষ্ট পাঠের অর্থগুলি বাগকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের অর্থ-শিক্ষা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনাবশ্যকীয় কার্যে সময় নষ্ট করাতেই বাগকগণ নিম্নশ্রেণীতে সমস্ত দিন রাজ খাটিয়াও পড়া মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না।

(২) বাগকেরা যে অংশ পাঠ করিতেছে সেই অংশের ভাব বুঝিতে পারিতেছে কি না ইহাই দেখিতে হইবে। সেই ভাব বুঝিতে যে সকল শব্দের অর্থের প্রয়োজন, কেবল তাহাই শিখাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ শব্দার্থ শিক্ষা দিবার প্রণালী সাধারণতঃ পাঠ্য :

(ক) ভঙ্গীর দ্বারা ; (খ) স্রব্য বা তাহার আদর্শ ও চিত্রের দ্বারা ;
(গ) দৃষ্টান্ত দ্বারা (ঘ) প্রতিশব্দের দ্বারা (ঙ) শব্দ ব্যাখ্যা দ্বারা ।
কিন্তু প্রত্যেক নূতন শব্দ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য রচনার দ্বারা সেই
শব্দের ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে ।

(ক) “তাহারা তখন আহার করিতেছিলেন”—হাতের দ্বারা আহারের মত ভঙ্গী
করিলেই বালক ‘আহারের’ অর্থ বুঝিয়া লইবে । এইরূপ চক্ষুর সাহায্যে বালকেরা
যাহা শিক্ষা করে, তাহা তাহাদিগের মনে বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে । জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
মধ্যে চক্ষুই শিক্ষাকার্যে সর্বাঙ্গাঙ্গী অধিক সাহায্য করে । (খ) “ঈগল পক্ষী ছাগল
ধরিয়া লইয়া গেল”—এখানে ‘ঈগল=পক্ষী বিশেষ’ বলিলে বালকদিগের ঈগল বিষয়ক
কোন জ্ঞান হইবে না । একখানি ঈগলের ছবি দেখাইয়া তাহার সম্বন্ধে দুচারিটা কথা
বলিয়া দিলে বালক ঈগল পাখীর কথা বেশ আনন্দের সহিত মনে করিয়া রাখিবে ।
“কাঠের দ্বারা খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়”—খাট অনেক বালক দেখিয়া থাকিতে
পারে, পালঙ্ক অনেকেই দেখে নাই । বোর্ডের উপর পালঙ্কের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতে
হইবে । (গ) “আটাল, বালি ও গলি মাটির মধ্যে, কোন্ ফসলের পক্ষে কোন্টী উপযোগী
ইত্যাদি”—তিন রকমের মাটি পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে । পাঠের সময়
বালকদিগকে ঐ সকল দেখাইতে হইবে । (ঘ) যে সকল স্রব্য বা বিষয় সম্বন্ধে
বালকগণের পূর্বজ্ঞান আছে সে সকল স্রব্যাদি-প্রকাশক-শব্দের প্রচলিত প্রতিশব্দ শিক্ষা
দেওয়া যাইতে পারে যথা—“মাতঙ্গ, কুম্ববর্ণ, প্রণয়” প্রভৃতির পরিবর্তে ‘হাতী’, ‘কালরং’ ও
‘ভালবাসা’ বলিলে চলিতে পারে । অথবা কেবল বালকের শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার
অভিপ্রায়ে “কলা, কাজ, কুমাসার” পরিবর্তে ‘কদলী, কার্য্য, কুজবাটিকা’ শব্দ শিক্ষা
দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু এক কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কঠিন প্রতিশব্দ যেন
একদিনে বেশী শিক্ষা দেওয়া না হয়, আর যে সকল শব্দের প্রতিশব্দ বালকগণের
ব্যবহারে আসিতে পারে, কেবল তাহাই যেন শিক্ষা দেওয়া হয় । নিম্ন প্রাথমিক
শ্রেণীতে দৈনিক এইরূপ প্রতিশব্দ ২৩টি, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ৩৪টি ও মধ্য বাঙ্গালা
শ্রেণীতে ৪৫টির অধিক শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে । প্রতিশব্দ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে
তাহার ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে । “বানর কলা খাইতেছে, বানর রঙা বড় ভাল-
বাসে ;—শীতকালে কুমাসা হয়, কুজবাটিকার আধার হয়”—ইত্যাদি রূপ বাক্য রচনা
করিয়া বালকগণ শব্দ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহার শিক্ষা করিবে । শিক্ষক

প্রথমে ছুই একটা বাক্য রচনা করিয়া আদর্শ দেখাইয়া দিবে। মধ্য বাজালা শ্রেণীতে প্রতিশব্দ শিক্ষা দিবার সময় মধো মধো অমরকোষ প্রভৃতি হইতে এক আধটা শ্লোক বা শ্লোকংশ বলিয়া দিখে শাসকেরা আগ্রহের সহিত মনে করিয়া রাখিবে। এইরূপে প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দের (যথা—চন্দ্র, সূর্য্য, বিজ্ঞান, জল, বায়ু ইত্যাদি) প্রতিশব্দ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যকও বটে। উত্তম পদা রচনায় ও পদা রচনায় এ সকলের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। (৩) "বায়ু অতি স্বচ্ছ পদার্থ"—এখানে স্বচ্ছ কথার প্রতিশব্দ বলিয়া দিলে বালক কিছুই বুঝিতে পারিবে না। 'প্রাকৃতিকবাদ' অভিধানে স্বচ্ছ কথার এই সকল অর্থ লিখিত আছে—“স্বচ্ছ, নির্মল, শুভ্র, পরিষ্কার” কিন্তু এখানে এই সকল প্রতিশব্দের কোন কথার দ্বারাই গ্রন্থকারের ভাব পরিষ্কার হইবে না। “সাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়” বলিলেও বালক উত্তমরূপে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায়, ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখা যায়, তবে কি জানালা ও ছিদ্র ‘স্বচ্ছ’? এই সকল শব্দ শিক্ষায় শিক্ষকের নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে সর্বোত্তম সাহায্যো বালকের মনে স্বচ্ছের ভাব অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। একটু জলের ভিতর একটা পয়সা ফেলিয়া দেখাও পয়সা দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুধের বাটির ভিতর পয়সা ফেলিলে দেখা গেল না। জল স্বচ্ছ। একখানা কাচের অপার পার্শ্বে একটা কলম রাখিয়া দেখাও যে কলম বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু স্টেটের অপার পার্শ্বে রাখিলে দেখা গেল না। কাচ স্বচ্ছ। কাচ অপরিষ্কৃত হইলে কি জল ঘোলা হইলে তেমন স্বচ্ছ থাকে না। ধোঁয়া কি কুয়াসা মুক্ত হইলে বায়ুও তেমন স্বচ্ছ থাকে না। পূর্ব কুয়াসা হইলে অঙ্গ মূলের লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিষ্কার বায়ু স্বচ্ছ বলিয়া আমরা অনেক দূরের পদার্থও দেখিতে পাই। ভাববাচক ও গুণবাচক শব্দগুলি, সেই গুণ বা ভাবযুক্ত বস্তুর সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। “কৃষ্ণবর্ণ” শব্দের অর্থে, বর্ণের অভাব বলিলে বালকের কালবর্ণের বোধ হইবে না। কাল বস্তু দেখাইয়া ‘কাল’ বুঝাইতে হইবে।

(৩) উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য বাজালা শ্রেণীতে সন্ধি, সমাসযুক্ত শব্দ গুলির বিভাগ করিয়া অর্থ শিক্ষা দিতে হইবে। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়া দিলে শব্দ বুঝিতে বালকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। বালকগণের মোটামুটি রকমের তত্ত্বিত ক্রুতের জ্ঞান

থাকা বাঞ্ছনীয় । অনেক স্থলে কেবল মৌখিক আলোচনায় বালকগণকে এগুলি বেশ শিখিতে দেখা যায় । শিক্ষক যদি অভিধান দেখিয়া প্রস্তুত হইতে না পারেন তবে তিনি অর্থ পুস্তক ক্রয় করিবেন । যেসকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

পুত্র = পুং নরকবিশেষ, তৈ জ্ঞান করা—যে জ্ঞানাদির দ্বারা পুং নামক নরক হইতে পিতাকে জ্ঞান করে, সেই পুত্র ।—(পুন্সায়ো নরকাৎ যস্মাৎ জায়তে পিতরং স্ততঃ)

শ্মশান = 'শ্ম' শব, 'শান' শয়নস্থান । শব অর্থাৎ মৃত দেহের শয়নের স্থান । (শ্ম শব্দের শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়ন মুচ্যতে)

হুর্ভিক্ষ = 'হুর' অভাব, 'ভিক্ষা' ভিক্ষার পদার্থ ।—যে সময়ে ভিক্ষার পর্যাপ্ত অভাব অর্থাৎ পাওয়া যায় না । (ভিক্ষায়াঃ প্রায়ো হুস্ত্রাপাত্তং)

(৪) নূতন শব্দগুলি শিক্ষা দিবার সময় বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া কর্তব্য । পরে পুনরালোচনার সময়, সেই শব্দগুলির প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যাভাগ পুঁছিয়া ফেলিয়া, কেবল শব্দ কয়েকটি রাখিতে হইবে । পরে একটি একটি শব্দ (দর্শনার বা পয়েন্টার দ্বারা) নির্দেশ করিয়া বালকগণের নিকট সেই সকল শব্দের প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা আদায় করিতে হইবে ।

(৫) অর্থ পুস্তকের কোন আবশ্যকতা নাই । শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া দিলেই বালকগণের বেশ মনে থাকিবে । পুরাতন পাঠ মধ্যে মধ্যে পুনরালোচনা করিলে, বালকগণ শব্দার্থ আর কখনই ভুলিবে না । কেবল নূতন নূতন কথারই প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, সদা ব্যবহৃত বা পূর্বে পরিচিত শব্দের কোনরূপ অর্থাদি শিক্ষার আবশ্যকতা নাই । প্রত্যহ ৩৪টি নূতন শব্দ শিক্ষা করিতে বালকগণ কোনই ক্লান্তি বোধ করিবে না, কিন্তু অর্থ পুস্তকে লিখিত হুরি ভুরি অনাবশ্যকীয় কথার অর্থ মুখস্থ করিতে গেলে, বালকগণের

যথেষ্ট কষ্ট হইবে ও ততোধিক খরচ হইবে । কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, “যদি বালকগণ সেই ৩৪টা শব্দের অর্থ খাতায় লিখিয়া রাখে তাহা হইলে কেমন হয় ?” মন্দ হয় না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে অর্থাৎ নিম্ন প্রাইমারী হইতে উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত একপ খাতা না করিলেও ক্ষতি নাই । এই সমস্ত শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকাদি কম । সুতরাং শিক্ষক যথেষ্ট পুনরালোচনার দ্বারা বালকগণকে সমস্ত বিষয়ে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন । বালকের কাজ বাড়াইয়া তাহার খেলার সময় কুর্জন করা যুক্তিযুক্ত নয় ।

ব্যাখ্যা ।—বালকগণ, পাঠ্য পুস্তক লিখিত প্রবন্ধ বা আখ্যায়িকার কোন কঠিন অংশের ভাব বুঝিতে না পারিলে ব্যাখ্যার আবশ্যক হইতে পারে । কিন্তু যে সকল প্রবন্ধে এইরূপ কঠিন (বালকের পক্ষে) অংশের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, সে প্রবন্ধ, সে শ্রেণীর বা সে বালকের পক্ষে উপযোগী নহে । প্রতি পৃষ্ঠায় একটা কঠিন অংশ, বিশেষ দোষজনক নহে । কিন্তু ইহার অধিক হইলে বালকগণ পাঠের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে ।

(১) বিশেষ কঠিন ভাবযুক্ত কোন প্রবন্ধ পড়াইবার পূর্বে সরল ভাষায় সেই প্রবন্ধের ভাব বালকগণকে বলিয়া দিলে, তাহারা প্রবন্ধ পাঠে তত কষ্টবোধ করিবেনা । কোন আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ (যেমন অনেক গ্রন্থে রাণারণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে) পড়াইতে হইলে তাহার পূর্বভাগ বালকগণকে পাঠের পূর্বে বলিয়া দিতে হইবে । তাহা হইলে বালকগণ সহজে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে । কিন্তু পূর্ণ আখ্যায়িকার আভাস পূর্বে দিলে গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, কেহ কেহ গল্পের আভাস পূর্বে বলা যুক্তি যুক্ত মনে করেন না । এবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় । আখ্যায়িকার কাঠিন্য, বালকগণের বুদ্ধিযুক্তি ও শিক্ষকের শিক্ষা

কৌশলের উপর এ সমস্তই নির্ভর করে। শিক্ষক এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, পূর্ণ গল্পের আভাস পূর্বে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এ বিষয় কোনরূপ বাধাবানি নিয়ম নাই।

(২) বালকগণ গল্পের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি না তাহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বা পাঠের শেষে দারাবাহিক প্রশ্নের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষক এরূপ প্রশ্নাদির প্রণালী বুঝিতে পারিবেন :—

“রাজা দশরথের চার পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাম ইত্যাদি”—প্রশ্ন, কাহার চার পুত্র ছিল? রাজা দশরথের কয় পুত্র ছিল? জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি? রাজা দশরথের বড় ছেলের নাম কি? ইত্যাদি।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বালকগণ পাঠের বিষয় বুঝিয়াছে। বালকগণের নিকট উত্তরগুলি পূর্ণ বাক্যে আদায় করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীতে ইহাই যথেষ্ট ব্যাখ্যা।

(৩) উচ্চ শ্রেণীতে (উঃ প্রাঃ হইতে) বালকেরা গল্পের বা প্রবন্ধের সারাংশ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিবে। সম্পূর্ণ গল্প বা প্রবন্ধ বৃহৎ হইলে শিক্ষক তাহার অংশবিশেষ লিখিতে বা বলিতে আদেশ করিতে পারেন। বালকেরা বলিতে বা লিখিতে না পারিলে, তাহাদিগের স্মরণশক্তির সাহায্যার্থ, বোর্ডে সূচিপত্রানুযায়ী বিষয়ের অংশসমূহ লিখিয়া দিবে। সেই সূচিপত্র অনুসরণ করিয়া বালকেরা গল্প বা প্রবন্ধ রচনা করিবে। প্রবন্ধের অন্তর্গত উত্তম উত্তম শব্দ বা বাক্যাংশ বোর্ডে লিখিয়া, সেগুলি বালকগণকে নিজ রচনায় ব্যবহার করিতে আদেশ করিলে, নূতন শব্দ শিঙ্গার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

(৪) কোন প্রবন্ধাদিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা কোন প্রসিদ্ধ গল্প বা আখ্যায়িকার বিবরণ ঘটিত কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে, শিক্ষক

সেই বিষয়টি সংক্ষেপে ছাত্রগণকে বলিয়া দিবেন ও বালকগণ যাহাতে শ্রীম রচনাতে এই বিবরণ বিনুত করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন ।

(৫) কোন আংশ বালকগণের পক্ষে কঠিন ভাববিশিষ্ট হইলে, শিক্ষক তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন বা উক্ত কৌশল-সম্পন্ন প্রশ্নের দ্বারা বালকগণের দ্বারাষ্ট সেই ভাব উদ্ধার করাইয়া লইবেন । যথাঃ—

“জীবন মরণের সমষ্টি মাত্ৰ,”—এই আংশের ভাব বুঝাইয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রকার প্রশ্নের দ্বারা বালকগণকে ভাব-উপলব্ধি বিষয়ে সাহায্য করা যাইতে পারেঃ—

প্রঃ । মানুষের আয়ু কতদিন ?

উঃ । ৬০।৬৫ বৎসর ।

প্রঃ । এ ৬০।৬৫ বৎসর পরে কি হয় ?

উঃ । মানুষের আয়ু শেষ হইয়া যায় ।

প্রঃ । আয়ু শেষ হইলে কি হয় ?

উঃ । মানুষ মরিয়া যায় ।

প্রঃ । তোমার বয়স কত ?

উঃ । ১৪ বৎসর ।

প্রঃ । মনে কর তোমার যদি ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু থাকে, তবে তোমার আর কতদিন আয়ু আছে ?

উঃ । ৫১ বৎসর ।

প্রঃ । তাহ'লে তোমার আয়ু ১৪ বৎসর শেষ হইয়াছে ? আয়ু শেষ হওয়ার নামই যদি মৃত্যু হয়, তবে তোমার সম্পূর্ণ মৃত্যু না হউক ১৪ বৎসরের মত মৃত্যু হইয়াছে । আগামী বৎসর আর এক বৎসরের মৃত্যু হইবে বা আয়ু শেষ হইবে । এইরূপ এক এক বৎসরের আয়ু শেষ হইতে হইতে, একে একে সমস্ত আয়ুই ফুরাইয়া যাইবে । তা হলেই এই একটু একটু মৃত্যু সমষ্টিকেই, আমরা জীবন বলিয়া থাকি ইত্যাদি । (ছাত্রদিগের বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইতে পারে বা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝান আবশ্যক হইতে পারে ।)

(৬) পরীক্ষার সময় প্রোগ্রামের অন্তর্গত উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হয়। এইরূপ লিখিত ব্যাখ্যা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। গ্রন্থকারের উহা ভাব পরিস্ফুট করাই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। শব্দ পরিবর্তনের নাম ব্যাখ্যা নহে। এমন কি অনেক সময় ব্যাখ্যায় শব্দ পরিবর্তনেরও আবশ্যক হয় না। শব্দ পরিবর্তন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক সময় বালকেরা লেখকের সুনির্বাচিত শব্দের পরিবর্তে কতকগুলি বিস্তীর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা কদর্যা ভাষার সৃষ্টি করিয়া বসে। ইহাতে ব্যাখ্যা না হইয়া বরং ব্যাভিচার হয়।

“প্রকাশ্য শব্দ অপেক্ষা ছদ্মবেশী বন্ধু অধিকতর ভয়ঙ্কর।” এই অংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে, ছদ্মবেশী বন্ধু যে কেন অধিকতর ভয়ঙ্কর তাহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে। ‘প্রকাশ্য’ শব্দ, ‘ছদ্মবেশী’ বন্ধু’ প্রভৃতি কথা পরিবর্তন না করিলেও চলিতে পারে। যথা—“প্রকাশ্য শব্দ প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করে, স্বতরাং পূর্বে হইতেই তাহার হস্ত হইতে নিজকে রক্ষা করিবার উপায় নির্ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি বন্ধুর ভাণ করিয়া প্রথমে বিশ্বাসী হয় ও পরে গোপনে শত্রুতা সাধন করে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কোনই উপায় নাই। এই জন্য ছদ্মবেশী বন্ধু অধিকতর বিপদজনক।”

পরীক্ষার কাগজে সাধারণতঃ এই পরিমাণ ব্যাখ্যা লিখিলেই চলিতে পারে। কোন কোন পরীক্ষক বলেন যে তাঁহারা মুদ্রিত এক লাইনের ব্যাখ্যায়, পরীক্ষা-কাগজে লিখিত ৫ লাইনের অধিক লম্বা ব্যাখ্যা পছন্দ করেন না। তবে যে অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহাতে তাবের সংক্ষেপত্ব অধিক হইলে, কোন লাইনের ব্যাখ্যায় ৭৮ লাইনও লেখা যাইতে পারে। ফলকথা খুব লম্বা ব্যাখ্যা পরীক্ষা কাগজে বর্জনীয়।

সময় সময় পাঠ্যপুস্তকান্তর্গত কোন কোন অংশ বালকদিগের নিকট ব্যাখ্যা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। যথা—“ঈশ্বর চৈতন্যরূপ” বা “আমরা বাহ্যিক ও ভাবি ঈশ্বর তাহা জানিতে পারেন”। এইরূপ অংশ, বস্তু বা সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইবার উপায় নাই। এখানে বালকদিগের মনে একটা অন্ধবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে

হইবে । ‘ভাষান্যাসী’ হইবে “সমাজের পোস্তভাগে, তাপিত অন্তরে
জাগে, মেঘে ঢাকা” ‘ভাষাদিক্রম’ অংশের ভাবও চাকরুনি শ্রেণীর ১২।১৪
বৎসরের বাঁধকেব মজ্ঞ বোধগম্য নহে । এখন উপন উপন ভাব গ্রহণ
কবিতা মাউক, বয়ঃবুদ্ধির সঙ্গে ‘মজ্ঞ এ সমস্ত ভাবের মধ্যে আপনা
ঠেঠেঠে নিগড় ভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে । বালকদিগকে যতদূর
সম্ভব বুঝাইয়া দিবে হইবে, আর যাহা তাহারা বুঝিতে অক্ষম, তাহা
জানিবার জন্য ভাষাদিগের বাহ্যিক বুদ্ধি কবিতা দিতে হইবে ।

সাহিত্যে ব্যাকরণ ।—ছোটরাটো ব্যাকরণের কথা মধ্যে মধ্যে
জিজ্ঞাসা করা মন্দ নহে । যে সকল শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়ান হয় না, সে
সকল শ্রেণীতে (যথা নিঃ শ্রোঃ শ্রেণী) বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, কর্তা,
কর্ম, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য ।
এ সকল বিষয়ের সূত্র শিক্ষা দিবার আবশ্যিকতা নাই, কেবল দৃষ্টান্ত
দ্বারা বিষয় বোধ করাইয়া দেওয়াই আবশ্যিক । নিম্নলিখিত পাঠ্যের তালিকায়
ব্যাকরণের কথা উল্লিখিত না থাকিলেও, ব্যাকরণের ঐ সকল সূত্র বিষয়
শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । কারণ ইহাতে উত্তম ভাষার কতকগুলি প্রধান
লক্ষণের পরিচয় হইয়া থাকে । আর ঐ সকল বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা
দেওয়াও কঠিন ব্যাপার নহে । উচ্চ শ্রেণীতে সময় মত সমাস, তদ্ধিত,
কুৎ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগকে অভিধান দেখিতে শিক্ষা দেওয়া আব-
শ্যিক । একটা কঠিন কথা পাইলেই শিক্ষক যে কোন বালককে সেই
শব্দের অর্থ বাহির করিতে আদেশ করিবেন । শব্দের বহু অর্থ লেখা
থাকে । কোন অর্থ পাঠের সহিত মিলিবে, তাহা বালকেরাই প্রথমে
নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবে । অভিধানে কেমন অকারাদি ক্রমে
কথাগুলি সাজান থাকে, তারপর আকার, ইকার, ও ককারাদি ক্রমে
ফলাগুলিই বা কোনটার পর কোনটা লিখিত থাকে, তাহা ছটার দিন

বালকগণকে শিক্ষা দিগেত তাহা বা বেশ বুঝিতে পারিবে । না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন । এতদ্ব্যতীত কিছুদিন অভ্যাস করাইলেই বালকেরা অভিধান ব্যবহার করিতে শিখিবে । শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, বালকগণকে অন্যান্য পুস্তক পড়িতেও উৎসাহিত করিতে হইবে । স্বদেশী বা বিদেশী যে কোন ভাষায়ই হউক অনেক গ্রন্থাদি পাঠ না করিলে, সে ভাষায় কখনই অধিকার জন্মে না । কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়িয়া কেহ কখন কোন ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন নাই ।

যে বিষয় পড়াইতে হইবে সেই বিষয় সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি, অন্যান্য পুস্তক হইতে পড়িয়া রাখিলে শিক্ষকের শিক্ষাদান শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে । অভিধানাদি দেখিয়া, অন্যান্য পুস্তক হইতে বিষয়ান্তর্গত বিবরণাদির সারাংশ সংকলন করিয়া, পাঠ্য পুস্তকের বিষয় উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া আসিলে, শিক্ষক বালকগণের যথেষ্টরূপে মনোবশীকরণ করিতে সমর্থ হইবেন ও বালকগণেরও প্রভূত উপকার সাধিত হইবে । ‘পাঠনারনোট’ পরিচ্ছেদে সাহিত্য শিক্ষাদানের পদ্ধতির আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রেণীর উপযোগিতা অনুসারে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া নোট প্রস্তুত করিতে হইবে । তবে এ কথা মনে রাখা আবশ্যিক যে, কোন বিশেষ প্রণালীর দাম হওয়া কখনই কর্তব্য নহে । মধ্যে মধ্যে প্রণালীর পরিবর্তন করিয়া লইলে বালকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে ।

সাহিত্য পাঠনার আদর্শ ।—সাধারণতঃ সাহিত্য পাঠনায় বিদ্যালয়ে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে :—(১) পাঠ (২) শব্দার্থ (৩) ব্যাখ্যা (৪) পাঠ সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণাদি । কোন কোন শিক্ষক প্রথমে শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা দিয়া শিক্ষা দিয়া পরে পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন । তাহারা বলেন যে প্রবন্ধের অর্থ বোধ হইলে পাঠ সহজেই সুন্দর হয় । কেহ কেহ প্রথমেই পাঠ শিক্ষা দেওয়া সুবিধাজনক মনে করেন । বাহা হউক কিসেই পাঠ শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা যখন

বা । হাঁ, তাহাকেও জাতি ভেদ বলে ।

শি । হিন্দু, ইংরাজ, মোগল, পাঠান—ইহাদিগের মধ্যে যে আভেদ ?

বা । তাহাকেও জাতিভেদ বলে ।

শি । তবে যখন সমুদায় মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায়, তখন মনুষ্যের সহিত কাহার আভেদ করিয়া বর্ণনা করা যায় ?

বা । তখন যাহা জাতি অন্তর্গত সহিত আভেদ করিয়া মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায় ।

শি । অতএব জাতির সহিত ভেদ করিয়া সমুদায় মনুষ্যকে এক জাতি বহে ; মনুষ্যের মধ্যেও পারস্পর আভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাম হয় ; আর আমরা এক বংশাবলম্বী এবং এক ভাষা ভাষী, আমাদের মধ্যেও যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আভেদ তাহার নামও জাতিভেদ । কিন্তু ইহার আর একটা নাম আছে, জান ?

বা । (নিঃশব্দ)

শি । ইহাকে বর্ণ ভেদও বলে । আচ্ছা, অপকার শব্দের অর্থ কি ?

বা । অপকার অর্থ অনিষ্ট, ক্ষতি, হানি । (বোর্ডে লিখন)

শি । অপকারেব বিপরীত কি ?

বা । উপকার । (বোর্ডে লিখন)

শি । আচ্ছা, তুমি পড়িলে—“আমাদিগের কখন কোন অপকার করেনা, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনেক আছে”—‘কখন’ অপকার করে না কি ?

বা । কখন অপকার করেনা—অর্থাৎ কোন সময়ে একটুও হানি করেনা ।

শি । তবে কখন কখন অনুপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু আছে ? তাহার ছই একটাব নাম বল ।

বা । বিছা—বোলাতা—ভিসকাল ।

শি । হাঁ, বাস্কক, বরটা, ভুজ (বোর্ডে লিখন) । ইহারা কোন সময়ে আমাদিগের অপকার করে ?—ইহারা কখন হানিকর হয় ?

বা । উহাদের গায়ে হাত দিলেই উহারা কামড়ায় ।

শি । গায়ে হাত দিলে উহারা কামড়ায় কেন, বলিতে পার ?

বা । উহারা ভয় পায় । উহাদের লাগে ।

শি । ভয় পায় অথবা ক্রোধ হয় এই জন্যই উহারা দংশন করে ; আর উহাদিগকে ভয় বা ব্যথা না দিলে উহারা দংশন করেনা । তবে গোবিন্দ, তোমার নিকট

সে দিন যে গোপাটী আমাদিগের গাছকে কি ক্ষয় মানিতে উদ্যত হইয়াছিলো ?

বা । পাছে আমাকে কামড়ায় যত জখম নাহিত্তে নিম্নাভিমান ।

শি । তাহাও যে সকল যক্ষ কখন কখন আমাদিগের গম্বুজ দ্বার করিতে পারে, আমবা আগেই তোমাদিগকে মানিতে ॥ স্থানান্তর করিতে উদ্যত হই । পাচ্চা,—“কখন কোন অপকার করেনা?”—“কোন অপকার” কি ?

বা । একটুও অপকার করেনা ।

শি । অর্থাৎ অমি আমাদিগে অপকার করেনা । তা হ'লে অমি গর অপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু আছে ?—কমেকটা নাম করত ?

বা । মশা, মাছি, ডকুণ ।

শি । হাঁ, মশক, মশিকো, ময়ূণ (বোর্ডে পিঁপড়)—ততানী বায়ুগের উৎপাদ করে—এইজখাই ময়ূধোরা হাদিগকে নষ্ট করে । পাচ্চা, কখন কখন অপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু নাম করিয়াত, আর অমি আমাদিগে অনিষ্ট করে এমন কতকগুলি নাম করিলে, এখন কখন কোন অপকার করেনা এমন ছুই একটা ক্ষুদ্র জন্তু নাম করত ?

বা । এমন অনেক আছে, নান আনিবা ।

শি । আণো-নিদ্যা বহিয়া একটা শাপ আছে, তাহা পাঠ করিলে নানারূপ জীব জন্তু আকাশ পকার, নাম, ব্যবহার জানিতে পারিবে । আমাদিগের সর্বতোভাবে অপকারী এমন ছুই একটিন নাম তোমাদিগের জানা আছে—এইক্ষণে আরও হুইতেছেন—একটীর নাম প্রজাপতি—প্রজাপতি কখন আমাদিগের কোন অপকার করেনা—আর উহার কি মনোহর দৃশ্য—কি কোমল শব্দ । বাহানা উহাদের পক্ষভেদ করিয়া চুদ্রশা করে তাহারা কি নিষ্ঠুর ।

বা । গজাকড়িও, কখন কাহারও মদ করেনা ।

শি । প্রজাপতি এবং গজাকড়িও—দুইটী হইল ।

বা । আন্তর্জা ।

শি । (একটা বাজক আন্তর্জায় গজল হয় বাজিলে, এবং হাত সহকারে) তবে তিনটী হইলনা ।

বা । টিকটিকি ।

শি । এই তিনটী হইল ।—এইরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ আছে । ভাল, ভিজানা

করি, যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী কখন কখন মনুষ্যের অপকারী হয়, মনুষ্যেরা ভয় প্রমুখে তাহাদিগকে বিনাশ করে; আর যাহারা মনুষ্যের অমঙ্গল বিনষ্ট করে, মস্তা করিতে না পারিয়া তাহাদিগকেও আমরা মাঝিয়া ফেলি; কিন্তু প্রজাপতি প্রভৃতি যেগুলি কোন অনিষ্ট করে না, বাজকেবা তাহাদিগকে কেন মনুষ্য দেয় আর বিনাশ করে?—এই নিষ্ঠুরতা বাজকদিগের কিমের দোষ?

বা। উহা তাহাদিগের স্বভাবের দোষ।

শি। ঠিক বোধোক্ত; ইহার পর আর কি আছে পড়।

বা। “কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে মেরে দেয় এবং তাহাদিগের প্রাণ বধ করে ”

শি। এই স্থানে ‘স্বভাবতঃ’ এমন নিষ্ঠুর, কেন বলিয়াছে বুঝিতে পারিলে? ইত্যাদি।

“এমন করিয়া পড়াইতে গেলে এক পাঠেই সমুদায় দিন শেষ হয়, আর এক বৎসরেও একখানি বহি সমাপ্ত হয় না”—যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে একপ একটা পাঠ পড়াইলে একশত-পাঠের কাণ্ডাবাদী হয় এবং শীঘ্র অপঠিত অংশ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে। এই প্রণালী মতে পুস্তকের প্রথম দুই তিনটি প্রবন্ধ পড়াইতে যদি ৪ মাস সময় লাগে, তবে পুস্তকের অবশিষ্ট নয় দশটি (মনে কর) প্রবন্ধ পড়াইতে এক মাস সময় লাগিবে। কাজেই সময়ের অভাব হইবার আশঙ্কা নাই। অপরন্তু পড়ার মত পড়া হইবে।

২। ব্যাকরণ।

আবশ্যকতা।—ভাষা শিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ বিশেষ আবশ্যকীয় নহে। ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনেক লোকে শুদ্ধ ভাষায় বা সামান্য ভুল ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। অনেক লোক ব্যাকরণ না পড়িয়া উত্তম ভাষায় প্রবন্ধাদিও রচনা করিতে পারেন। তবে ব্যাকরণ শিক্ষা কোন কোন কারণে বাঞ্ছনীয় বটে। ব্যাকরণ শিক্ষা

কল্পিলে বসিলে বা লিখিলে ভূমি হইবার সম্ভাবনা কম হয়, নূতন নূতন শব্দ গঠনে শক্তি অনেক এবং রচনা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ।

শিক্ষাদানের কথা ।—ভোট ভোট বাচকগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া একটু শক্ত কাজ, অনেক নাট । কিন্তু শিক্ষক তেমন বিচক্ষণ ও নৈরস্যশীল হইলে কাহা তত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না । তবে খুব নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া সুভাবুক নহে । নিম্ন শ্রাথমিকের প্রথম শ্রেণীতে ব্যাকরণের শিক্ষা আনন্ত করা যাইতে পারে ।

“ব্যাকরণের” সূত্র, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ, কণ্ঠ্যবর্ণ, নাসিক্য বর্ণ—প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাট, কি প্রথমে পদে। সূত্রাদিও শিক্ষা দিবার আবশ্যক তা নাট । কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পদ পরিচয় করানট প্রথমে আবশ্যক । মধ্য প্রাণে ‘বিশেষ্য পদ’ দৃষ্টান্ত দ্বারা কেবল বস্তু, ব্যক্তি ও জাতিবাচক বিশেষ্যই শিক্ষা দিতে হইবে ।

বিশেষ্য ও ক্রিয়া ।—জগৎ বাচক ও ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যাদি নিঃশব্দ শ্রেণীতে শিক্ষা না দিলেও চালাতে পারে । অতি সহজেই বালকদিগের বস্তুবাচক বিশেষ্যের পরিচয় হইয়া যাইবে । বালকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে যে বস্তু ‘বিশেষ্য’ নহে,—বস্তুর ‘নাম’ বিশেষ্য । বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দিতে হইবে । বিশেষ্য বোধ হইলেই নামান্ত্র সাংগাত্য ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে ; ‘বাচক পড়িতেছে’—বাচক কি কহিতেছে ? ‘পড়িতেছে’ । এখানে ‘পড়িতেছে’কে ক্রিয়াপদ বলা । ‘যত লিখিতেছে’—যত কি করিতেছে ? ‘লিখিতেছে’ । এখানে ‘লিখিতেছে’ ক্রিয়াপদ । এষ্টরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ২৪ দিন বিশেষ্য ও তাহার ক্রিয়া পদ শিক্ষা দিতে হইবে । তার পর দুই শব্দ যুক্ত (ভুক্ত যোগে) ক্রিয়াপদের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে । যথা—

বকু গান করিতেছে ; 'বকু কি করিতেছে ?' 'গান করিতেছে' এখানে 'গান করিতেছে' ক্রিয়া পদ । এইরূপ ব্রাহ্মণ ঘান করিতেছে, মিস্ত্রি রং করিতেছে, ফজা বাতাস করিতেছে, দর্জী সেলাই করিতেছে, টুছু খেলা করিতেছে, খোকা প্রস্রাব করিয়াছে, বাঘ হানুম হানুম করিতেছে, বানর কিচির মিচির করিতেছে, গক হাথা হাথা করিতেছে ইত্যাদি । 'কে করিতেছে' ? 'ব্রাহ্মণ, মিস্ত্রি, ফজা, দর্জী করিতেছে ।' এখানে ব্রাহ্মণ, মিস্ত্রি, ফজা, দর্জী, কঙা—যে করে তাহাকে কর্তা বলে । এইরূপে কঙা কথাটা শিখান যাইতে পারে । এসমস্ত অবস্থা এক দিনে শিখাইতে বসিতেছি না । কেবল পদ্ধতি নির্দেশ করিয়া যাইতেছি । বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তির পরিমাণ বুঝিয়া যতদিন আবশ্যক, ততদিনে শিক্ষা দিতে হইবে । নিয় শ্রেণীতে (নিঃ প্রাঃ প্রভৃতি) প্রতিদিন একসঙ্গে ১০ মিনিটের অধিক কাল ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে । উক্তরূপে—রান্না হইয়াছে, খাওয়া হইয়াছে, বিছানা হইয়াছে, ইত্যাদি ভূ ধাতুর ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে । বাঙ্গালায় ভূ, কু নিম্পন্ন ক্রিয়াপদই অধিক, সুতরাং বালকগণের ক্রিয়াপদের পরিচয় পাঠিতে বিশেষ কষ্ট বা বিলম্ব হইবে না । এই সমস্ত ক্রিয়ার কেবল মৌখিক আলোচনা করিলে হইবে না । বোর্ডে লিখিয়া দিয়া, বালকগণের দ্বারা ক্রিয়া পদগুলি চিহ্নিত করাইয়া লইতে হইবে । কিন্তু এক কথা মনে রাখা উচিত যে, কখনই কঠিন বা জটিল প্রশ্ন করিয়া বালকগণকে ভীত বা বিরক্ত করিতে হইবে না—শিক্ষার প্রারম্ভে এই কথা মনে রাখা কর্তব্য ।

ক্রিয়া পদের অন্যান্য আকার গুলিও এই সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারা যায় । করিয়াছিগ, হইয়াছিগ, হইবে, করিবে ইত্যাদি ভূ কু যুক্ত ক্রিয়া দেখিলেই বালকগণ অতি সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবে । তবে কালের বিষয় এসময়ে বলিবার আবশ্যকতা নাই ।

কর্মপদ ।—তখন পরে অগ্রে বিশেষণ ।ক অগ্রে কর্মকানকেব
পদ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে । যাহা ঠিক
শিক্ষক নিজে। সুবিধা বুঝিয়া অগ্রে যাহা পঠনা কনেন তাহাষ্ট শিক্ষা
দিবেন । আমি নিজে কর্মপদ শিক্ষা দিয়া কন নাও কার্য্যটি বলিয়া,
অগ্রে কর্মপদ শিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি । ‘খোদা’র ভাও
খাইতেছে’—এখানে বিশেষ্যপদ কমটী আছে ? ‘খোদা’র ভাও
ভাও’ । কে খাইতেছে ? ‘খোদা’র খাইতেছে’—তবে কর্তা কে ?
‘খোদাই’ কর্তা । কি ‘খাইতেছে’—‘ভাও খাইতেছে’—ভাও কর্ম ।
‘যাহা কন নাম তাহাষ্ট কর্ম,’ একপদ স্বরাদি বিনিবার বিশেষ আবশ্যক
নাই । তবে যদি বাগকরণ বুঝিতে পারে বনিয়া বিধান হয়, তবে
আপণ্যবও কোন কার্য্য নাই । কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টান্ত
দিতে হইবে । ‘খোদাই’ বহু পড়িতেছে’—কে পড়িতেছে—ক পড়ি-
তেছে এইরূপ প্রশ্ন কবিয়া কর্তা আর কর্মপদ পরিচয় কান যাহতে
পারে । কোন্ ক্রিয়াব কর্তা বা কোন্ ক্রিয়ার কর্ম, আপাততঃ সে
সমস্ত বিনিবার আবশ্যক নাই । কেবল কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া পদের
পরিচয় হওয়াই আবশ্যক ।

বিশেষণ ।—বিশেষণ শিক্ষায় প্রথমে কেবল বিশেষ্যের
বিশেষণই শিক্ষা দিতে হইবে । গুণবাচক বিশেষণ গুণি অপেক্ষাকৃত
সহজ । দুইটী বাক্যের নিকট তহঁতে দুখানি ছোট বড় স্লেট বা
পুস্তক বা পেনসিল রাখিয়া টেবিলের উপর রাখ । এখন জিজ্ঞাসাকর
‘কপূর কোন গোট, আর পাখুর কোন গোট ?’ হয়ত বাক্যকেরা কেহ এ
প্রশ্নের উত্তরে বানবে “কপূর নাম দেখা স্লেট, কি পাখুর স্লেটের এক
কোণ ভাঙ্গা”—কিন্তু শিক্ষক যদি পূর্বে হইতে সাবধান হন, তবে তাহাব
মনোমত উত্তর পাওতে পাবেন । স্লেট কি পেনসিল দুইটী পাশাপাশি
রাখিয়া, ২৩ বার অক্ষর দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে মাপের ভঙ্গি

দেখাইবেন, বানাকেনা বুঝিয়ে দে শিশুক মহাশয় ছোট বড় মাপ
করিতেছেন। এখন নাহা। কোন মেট জিজ্ঞাসা করিবেন — “কপূর
বড় মেট, পাণ্ডা ছোট মেট” — এইরূপ উত্তর পাঠবার সম্ভাবনা।
এইরূপ ছুটী বানাককে আড়া কন্যা — “কে নখা, কে খাট” জিজ্ঞাসা
করিলে — “শান্ত নখা, মাদন খাট” এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে।
“কে কান, কে ফণা ; কে শান্ত, কে ছট” ইত্যাদি — প্রস্তুত জিজ্ঞাসা
করা যাইতে পারে। পোষের উত্তর শুনি বোঝে নিরালিখিত প্রকারে
লেখা আবশ্যক :-

বড় মেট	ছোট মেট
নখা ভেদে	খাট ভেদে
কান ১।১।	মাদন ছাড়া
শান্ত কাগজ	মদন কাগজ

বালাকগণ ইহা মনে প্রথমে বিশেষ্য পদগুলি নির্দেশ করিবে। তা-
পর যে সকল কথায় ছুটী বিশেষ্যকে পূরক করিয়া দিতেছে, সে কথা-
গুলি লক্ষ্য করিবে। এই সমস্ত কথাকে ‘বিশেষণ’ কহে। এইরূপ
বহুতর দৃষ্টান্ত দিবেন সহজে গুলবাচক বিশেষণের বোঝাইবে। বান-
কেরাও যাহাতে এইরূপ কর্তৃত্বীয়াক্ত, বিশেষ্যবিশেষণযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
বাণ্য রচনা করিতে পারে এবিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে
হইবে। তাহাপর মংখ্যা বাচক বিশেষণ শিক্ষা দিতে হইবে। “একটা
কলম, দুইখানা পুস্তক, পাঁচটি গরু ইত্যাদি।” প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতির
ব্যবহার এইরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। শ্রেণীতে “প্রথম বাণ্যক, দ্বিতীয়
বাণ্যক, তৃতীয় বাণ্যক, বা ক্ষুদ্র প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় মান,
তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। সুতরাং বালাকগণের পক্ষে ইহা ব্যবহার শিক্ষা শক্ত হইবেন।
তবে যে সকল কথা তাহারা জানেন বা সাধারণতঃ ব্যবহার করেন,

যেমন পঞ্চদশ, বিংশ ইত্যাদি, মেরুপ শব্দের ব্যবহার শিক্ষা দিবার আপাততঃ আবশ্যকতা নাই ।

ইহার পর ক্রিয়ার বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । “সুরেন তাড়াতাড়ি লিখিতেছে” সুরেন কেমন করিয়া লিখিতেছে ? হয়ত এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিবে “কদম দিয়া লিখিতেছে” । কিন্তু যদি শিক্ষক ‘তাড়াতাড়ি লিখিতেছে’ এই বাক্যাংশ বলিবার সময়, হাতের দ্বারা—তাড়াতাড়ি লিখিবার ভঙ্গি প্রদর্শন করেন, তবে বালকগণ উত্তরে সম্ভবতঃ ‘তাড়াতাড়ি লিখিতেছে’ এই কথাই বলিবে ।—“ধীরেন্ ধীরে ধীরে লিখিতেছে”—কেমন করিয়া লিখিতেছে ? ধীরে ধীরে লিখিতেছে । “বুলু জোরে দৌড়াইতেছে”—কেমন করিয়া দৌড়াইতেছে ? জোরে দৌড়াইতেছে ।—এইরূপ কৃষ্ণ খুব ছোট, কাঁমিনী খুব সুন্দর, সাগরের মেয়ে খুব কাঁদ, মিথ্যা বলা অতি অন্যায় কার্য, উপেন বাবুবড় ভাল মানুষ, ইত্যাদি রূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশেষণের বিশেষণও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু যদি একরূপ বুঝিতে পারা যায় যে বালকগণ ক্রিয়ার বিশেষণ কি বিশেষণের বিশেষণ উত্তম রূপ ধারণা করিতে পারিতেছে না, তবে এ সকল উচ্চ প্রাইমারীর প্রথম বর্ষে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে ।

সর্বনাম ।—‘আমি, তুমি, সে’ এই তিনটি সর্বনাম ও এই সকল সর্বনামের কৰ্ম্ম কারক ও সম্বন্ধ পদগুলি বামকদিগকে সহজেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । শ্রেণীতে মত বালক আছে সকলকেই ‘তুমি’ বলিয়া ডাকিতে পারি, কিন্তু ‘হরি’ বলিয়া কেবল হরিকেই ডাকিতে পারি ; হরি বলিলে অন্য আর কোন বালকই উত্তর দিবে না । ‘হরি’ এক জনের নাম, কিন্তু ‘তুমি’ সকলেরই নাম । এই জন্য ‘তুমি’ এই কথাকে ‘সর্বনাম’ বলে । এইরূপে ‘আমি, সে’ কথা দুটি বুঝাইয়া দিতে হইবে । তার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিয়া ক্রমে সর্বনামের

কর্ম ও সম্বন্ধ পদ শিক্ষা দিতে হইবে । ‘আমি তোমাকে মারিব, মে
আমাকে দেখিতেছে ইত্যাদি’ দৃষ্টান্তের দ্বারা (বিশেষ্যের কর্মপদ শিক্ষা
দ্বিবার পদ্ধতিতে) মর্ক্সনামের কর্ম পদ শিখাইতে হইবে । মর্ক্সনামের
সম্বন্ধপদ শিক্ষাদিবার সময়ে প্রথমে বিশেষ্যের সম্বন্ধ পদ বুঝাইতে হইবে ।
“রামের পুস্তক, খোকার লাঠী, ছলুর জামা” ইত্যাদি দৃষ্টান্তের সাহায্যে
সম্বন্ধের ভাব বুঝাইতে পারা যায় । এ পুস্তক কার ? রামের । এই
পুস্তকের মধ্যে কেবল রামেরই সম্বন্ধ, অন্য কাহারও নহে । এ জামাটা
কার ? ছলুর । এ জামার মধ্যে কেবল ছলুরই সম্বন্ধ । এই প্রকারে
ইত্যাদি । ‘সম্বন্ধ’ কথাটির অর্থ উত্তমরূপে বুঝিয়া দিলে বালকেরা
সহজে সম্বন্ধ বুঝিবে । তার পর সম্বন্ধ পদের শেষ বর্ণ ‘র’ হইয়া থাকে,
এইরূপ একটা মোটাগুটি সংক্ষেপে বুঝিতে পারিবে । এখন “আমার,
তোমার, তাহার, আমাদিগের, তোমাদিগের, তাহাদিগের” প্রভৃতি শব্দ ।
এই সকল শব্দের ব্যবহার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ।
মর্ক্সনামের কর্মকারকে শেষ বর্ণ ‘কে’ থাকে, ইহা বুঝিলে কর্মকারকের
একটা আন্দাজ করিতে পারিবে । এই সমস্ত মর্ক্সনামের পদ নিম্ন
প্রাইমারীর উচ্চ শ্রেণীতেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় ।

কাল ।—ইহার পর ত্রিয়ার তিন কাল শিক্ষা দিলেই, নিয়-
প্রাথমিকের ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে । বোর্ডের উপর নিম্নলিখিত
বাক্য ৩টা লিখিয়া দাও :—

দাদা পাঠশালায় পড়িয়াছিল ।

আমি পাঠশালায় পড়ি ।

খোকা পাঠশালায় পড়িবে ।

“আমি এখন পড়ি ; দাদা আগে পড়িত, এখন আর পড়েনা ; খোকা
বড় হইলে, পরে পড়িবে—এখন সে পড়িতে পারেনা ।” এই প্রকারে
ক্রিয়াপদগুলির অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইতে হইবে । তিন চারিদিন

এইরূপ নানা দৃষ্টান্তেব সাহায্যে ক্রিয়ার বিভিন্ন অর্থ বুঝাইতে পারিলে, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের একটির জ্ঞান জন্মবে। প্রথমে বর্তমান, অতীত, কথাজ্ঞান না শিখাওয়া ‘এ কাজটা এখন হইতেছে, এ কাজটা পূর্বে হইয়া গিয়াছে, আর এ কাজটা পরে হইবে, এইভাবে ‘এখন’ ‘পূর্বে’ ও ‘পরে’ এই সকল কথা দ্বারা ক্রিয়াপদগুলি ভিন্ন করিতে শিক্ষা দিলে ভাল হয়। পরে বেশ অভ্যাস হইয়া গেলে, ‘বর্তমান অতীত, ভবিষ্যৎ’ কথা তিনটির অর্থ বুঝাইয়া দিয়া, শিখাইয়া দিলেই চলিবে।

যদি কো। শিক্ষক নিয় প্রাথমিক শ্রেণীতে এতদূর শিখাইতে না পারেন, তবে তিনি কিছু কিছু বাদ দিতে পারেন। কিন্তু নাম জাতি ও বস্তুবাচক বিশেষ্য, গুণ ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ, সামান্য ক্রিয়া পদ ও কর্তা কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া নিতাস্তই কর্তব্য—নিদিষ্ট পাঠ্য তালিকায় ব্যাকরণ শিক্ষার কথা থাকুক আর না থাকুক। নিয় প্রাথমিক শ্রেণীতে যাহা শিক্ষা দিবার বাবস্থা হইল, যদি উক্ত শ্রেণীতে যাহার কোন কোন অংশের শিক্ষা না হইয়া থাকে, তবে প্রথমে উক্ত প্রাথমিকের প্রথম বর্ষে সেই সকলের আলোচনা করিতে হইবে।

কারক ।—তার পর করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ কারক শিক্ষা দিতে হইবে। “ফটিক ছুরি দিয়া হাত কাটিয়াছে”—কে কাটিয়াছে? ফটিক। ‘ফটিক’ কর্ত্তা—যে করে সেট কর্ত্তা। কি কাটিয়াছে? হাত কাটিয়াছে। ‘হাত’ কর্ম্মকারক—যাহাতে কর্ম্ম ঘটে তাহাট কর্ম্মকারক। এখানে হাতের উপরই কাটার কর্ম্মটি—হইয়াছে (ঘটিয়াছে)। অতরাং হাতই কর্ম্মকারক। ফটিক কি করিয়াছে? কাটিয়াছে। ‘কাটিয়াছে’—ক্রিয়া। সে কথার দ্বারা কিছু করা বুঝায় তাহাট ক্রিয়া—এখানে ‘কাটিয়াছে’ কথায় কাটার কাজ করা বুঝাইতেছে যেইজন্য ‘কাটিয়াছে’ ক্রিয়া। এইরূপে পূর্বের জ্ঞানের পুনরাবোচনা করিয়া, তার পর ‘করণ’ বুঝাইতে

হইবে । শিলা কেবল আনোচনার উপর নির্ভর করে ।—‘ছায়াগগকে
ইহা একবার বলিয়া দিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই,—ইহাই
মনে করিয়া যে সকল শিক্ষক নিশ্চিত হইয়া থাকেন, তাহারা কখনই
কৃতকার্য হইতে পারেন না । পুনরাবোচনার আনোপার্জনের প্রকৃষ্ট
পন্থা । তার পর, কি দিয়া হাত কাটিয়াছে?—ছুরি দিয়া । যা দিয়া
কোন কাজ করা যায় তাহাকে করণ বা করণকারক বলে ।—এখানে ছুরি
করণ কারক । এইরূপ গগন কবচ দিয়া নিখিঁতেছে, পুঁজী নটি দিয়া
তরকারী কুটিতেছে, শলা মগ্ন দিয়া মাছ পরিতেছে, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের
দ্বারা করণ বুঝাইতে হইবে । ‘দিয়া’ কথার ব্যবহার শিক্ষার পরে, তাহা
ভাষার বাক্য রচনা করিয়া, ‘দ্বারা’ কথার দ্বারাও যে করণ কারক ব্যক্ত
হয় তাহা বুঝাইবে । সম্প্রদান বুঝাইতেও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন
করিতে হইবে । “হিন্দু ভিক্ষুককে পয়সা দিয়াছে”—কে দিয়াছে, কি
দিয়াছে প্রভৃতির আনোচনা করিয়া তাহাকে দিয়াছে জিজ্ঞাসা কর ।
‘ভিক্ষুককে’ দিয়াছে—তাহাকে কিছু দেওয়া অর্থাৎ দান করা যায়
‘তাহাকে’ ‘সম্প্রদান’ বলে । সম্প্রদান কথাটির অর্থও উত্তমরূপে বুঝাইতে
হইবে । কথাটির অর্থ বুঝিলে “অধিকা বাবু বরকে কন্যা সম্প্রদান
করিলেন”—এইরূপ হই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । তাহার
পর অপাদান কারকের শিক্ষা দিতে হইবে । কারক শব্দ উত্তম রূপে
বুঝাইয়া দিতে হইবে—বালকগগকে মূত্র মুখস্থ করাইবার প্রয়োজন
নাই । কেবল তাহারা কারকের ব্যবহার শিক্ষা করবে । “গাছ থেকে
আম পড়িল”—কি পড়িল ? আম । ‘আম’ কথার ইত্যাদির আনো-
চনা করিয়া “কোথা থেকে পড়িল” জিজ্ঞাসা কর । “গাছ থেকে” ।
আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে । “পূর্ণের মা নদী থেকে জল আনি-
তেছে, মছ বাজার হইতে মাছ আনিয়াছে” ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্তে
‘থেকে ও হইতে’ ব্যবহার করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, যে সকল শব্দের

সঙ্গে ‘থেকে বা হঠাৎ’ থাকে তাহাদিগকে অপাদান বলাও বলা । শেষে অপাদানের অর্থ বুঝাটুকু পাবিলে ভাল হয় । কেবল অপাদানের নহে প্রত্যেক দৃষ্টান্তের সমস্ত পদগুলিরই পরিচয় করাওঁবে । এতদূর অধিকরণও বুঝাওঁতে হইবে । “বিলা বিলাসায় পুনাহি আছে” — কোথায় যুগাইতেছে? বিলাসায় । “পুকুরে মাছ আছে” — কোথায় মাছ আছে? পুকুরে । “শিক্ষক চেয়ারে বসিয়া আছেন, খাটায় পাখা আছে” ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাওঁতে হইবে যে যাহাওঁ কোন জিনিষ থাকে, তাহাকে ‘অধিকরণ’ কারক বলা । প্রথমে কেবল স্থান বাচক অধিকরণ শিক্ষা দিতে হইবে । পরে কাবা বাচক । বিষয়, ব্যাপ্তি, ভাব, দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । “ও ভাতি এদিকে এস ; মতি, তুমি পড় ; হরি, আমাকে ভাল কর” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্বোধন পদ বুঝাইতে হইবে । যে কথায় কাহাকেও সম্বোধন করা অর্গাং ডাকা যায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলে । শিক্ষক নিজে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দিবেন, এবং বালকগণের নিকট ততঃপ্রাপ্ত অনুরূপ দৃষ্টান্ত আদায় করিবেন । কেবল স্নসম্পত্ত দৃষ্টান্তের উপরই ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে । ইহার পর বচন শিক্ষা দিয়া ছুই একটা শব্দের রূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । বালকদিগের যখন কারকের জ্ঞান হইয়াছে তখন শব্দরূপ নিখিতে বিলম্ব হইবে না । তবে প্রথমা দ্বিতীয়া প্রভৃতি কথা ব্যবহার না করিয়া কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিবার চেষ্টা হবে । “রাম চামচ দ্বারা ছদ খাইতেছে” এখানে রাম কর্তা, চামচ দ্বারা খাইতেছে—চামচ করণ । ছদ খাইতেছে—ছদ কর্ম । শব্দরূপ শিক্ষার পরে অকর্মক (থুকাই হাঁসিতেছে) সক্রমক (মাদা চাঁদ দেখিতেছে) দ্বিকর্মক (তুমি আমাকে কি কথা বলিলে, মা খোকাকে ভাত খাওয়াইতেছেন, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছাত্রগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন) কথা তিনটি অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে । তার পরে ছুই তিনটা দাতুর রূপ শিক্ষা

দিবে । ‘আমি করিতেছি’ ‘তুমি করিতেছ’ ‘সে করিতেছে’ ; ‘আমি করিয়াছি’, ‘সে করিয়াছে’ ‘তুমি করিয়াছ’, ‘আমি করিব’ ‘তুমি করিবে’ ‘সে করিবে’ ইত্যাদি ।

এখন অবার (সাধারণ বিভক্তি, বচন, বিশ, কারকাদি কিছুই নাহি যেমন শব্দ তেমনিই থাকিবে) নামক অর্থাৎ সাধারণ ব্যাকরণ (শব্দজ্ঞান শিক্ষা দিবে) উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বর্ষের কার্য্য একদাপে শেষ হইল । কিন্তু যদি স্মৃতিশক্তি কম তবে পুঙ্খ বিবেচনা, বিশেষণ, মর্জনা, ক্রিয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিবান সময় যাহা যাহা পরিচয় হইয়াছিল তাহা শিক্ষা দেওয়া যাউক । যথা—গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য । একটি ফুল হাতে করিয়া—“এই ফুলটি বেশ সুন্দর”—এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক জিজ্ঞাসা কর, এই ফুলের কি গুণ আছে ? বালকেরা নানাক্রমে উত্তর দিবে সম্ভব নাহি । কিন্তু মনোমত উত্তর পাইবার জন্য শিক্ষককেই প্রথমে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই উল্লেখ করিতে হইবে । এই ফুলটির কি গুণ আছে ? সুন্দর । সোনা খুব চকচকে । সোনার কি গুণ আছে ? চকচক । আমাকান্ত খুব বলবান । আমাকান্তের কি গুণ আছে ? বল । ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা গুণবাচক বিশেষ্য বুঝাইতে হইবে । এই প্রকার “তাহার আগমনে সকলে সুখী হইল”—তাহার কোন (ক্রিয়ায়) কার্য্যে সকলে সুখী হইল ?—“আগমনে” । ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শিক্ষা দিতে হইবে । ইহার পর, ইহা, তাহা, কে প্রভৃতি মর্জনা এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া শিক্ষা দিলেই প্রথম বর্ষের কার্য্য সূচনা হইল ।

অর ও ব্যঞ্জন ।—উচ্চ প্রাথমিকের দ্বিতীয় বর্ষে বালকগণকে (বিনা সাহায্যে উচ্চারিত) স্বপ্নস্বর, দীর্ঘস্বর, সমানস্বর ও স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝাইয়া দিবে । অ, আ প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে আর কোনরূপ বর্ণের সাহায্য আবশ্যক কবে না ; কিন্তু ক, খ বলিতে

‘অ’কারের মাঠায়া প্রয়োগের অ, ঐ প্রভৃতি পাঁচটীকে স্বল্প স্বল্প (অর্থাৎ উচ্চারণ একটু খাটি বাক্যে) বলা। আন আ, ঈ, উ প্রভৃতি আটটীকে দীর্ঘ (অর্থাৎ উচ্চারণ একটু দীর্ঘ) বলা বলা। শিশুকে দীর্ঘ ও স্বল্পের উচ্চারণ-পার্থক্য দেখানিয়া দিতে হইবে। তাবপা অ আ, ঈ ঈ, উ উ, ঋ ঋ, এ এ, ও ও প্রভৃতি প্রত্যেক ছোড়াক সমান বলা, কারণ তাহারা আকারে ও উচ্চারণে অনেকটা এক রকমের।

তারপর বাঞ্ছনবর্ণের পাঁচটীবর্গ ক খ পাঁচটী কবর্গ, চ ছ পাঁচটী চবর্গ ইত্যাদি এবং ন ব ল ব অন্তঃস্থবর্গ, শ স ম ও উদ্যবর্গ, ঠ ঠা ঠ বলা দিবে। কঠা তালবা প্রভৃতি বর্ণের বিভাগ (আবলোক হইবে) মধ্য বাঁসানা শ্রেণীতে শিক্ষা করিতে পান।

সন্ধি ।—ঠহার পর বর্ণ বিশ্লেষণ (যথা একা = ব + ন + অ + হ + ম + আ) শিক্ষা দিয়া সন্ধি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। এ সন্ধি শিক্ষাতেও সূত্র না বলিয়া প্রথমে কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্ধি বুঝাইতে হইবে। পরে বালকদিগের দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষা দিবে। যথা—

ঘন + অন্তকার = ঘনান্তকার

নীল + অঘর (কাপড়) = নীলাঘর

এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া, অকারের পর অকার (অর্থাৎ নীল শব্দের ল বর্ণে অ আছে) থাকিলে, ছুই শব্দ যোগ করিলে অ উঠিয়া গিয়া, ‘ল’য়ে আকার হইল, ঠহা’ উত্তমরূপে দেখাইয়া দিতে হইবে। বোর্ডে অনেক দৃষ্টান্ত লিখিয়া দিয়া বালকদিগের দ্বারা এইরূপ সংযোগ করাইতে হইবে। তাবপন “কুশ + আগর, মন + আগর” প্রভৃতি অকারের পর অকার, দয়া + অর্ঘব (সমুদ্র), লতা + অগ্র এইরূপ আকারের পর অকার; তাবপন “মহা + আশয়, বিদ্যা + আলয়” প্রভৃতি আকারের পর অকার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিবে। বালকদিগের

কিছু নুৎপাদিত আধানে বোঝে এতরূপ একটা সংক্ষেপ সঙ্কেত
লিখিয়া দিবে -

অ+এ	}	মুঃ আ
অ+আ		
আ+অ		
আ+আ		

এত প্রণালীতে ঠকার, উকার, ঞকার বিষয়ক দৃষ্টান্ত শিক্ষা হইবে,
তাহারও বোঝে সংক্ষেপে উক্ত প্রণালীতে লিখবে। এখন সংক্ষেপ একটা
সূত্র শিক্ষা দাও — “সমান স্বর পরে থাকিলে পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়,
পরের স্বর উঠিয়া যায়।” তারপর অত্যাশ্রয় দৃষ্টান্ত দ্বারা আর কতকগুলি
সদ্বিন বিষয় পূর্ব প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া, তাহারও সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বোঝে
লিখিয়া দিবে হইবে যথা :—

অ+ই	}	}	মুঃ ইতাদি
অ+ঈ			
আ+ই			
আ+ঈ			

এখন একটা সংক্ষেপ সূত্র শিক্ষা দাও “অ কি আকারের পর, ই ঈ
থাকিলে এ, উ উ থাকিলে ও, ঞ ঞ থাকিলে ঞ, এ ঐ থাকিলে ঐ
এবং ও ঔ থাকিলে ঔ হয়।” এইরূপে, কোন উচ্চ প্রাচীনতার
ব্যাকরণ দৃষ্টে সন্ধির বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। যে সকল সন্ধি উচ্চ
প্রাচীনতার ছাত্রদিগের উপযোগী, উঃ প্রাঃ ব্যাকরণে সেই সকল সন্ধি
দেওয়া থাকে। এ বিষয়ে ভারতীয়শাস্ত্রের সাহায্যের ‘প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা
ব্যাকরণ’ বা তদ্রূপ অন্য কোন পুস্তকের অনুসরণ করিলে চলিবে। এক
কথা বলা হয় নাই—সন্ধি শিক্ষায় যে সকল দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইবে,
বাণকেশরী সম্ভবতঃ তাহার অনেক শব্দ সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। এইজন্য সন্ধি

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নুগ্ন নুগ্ন ব্যবস্থাও শব্দের অর্থ শিক্ষা দেওয়া নিত্যস্থ বাঞ্ছনীয় । সাধারণ বাক্যকথন ভাষায় মন্ধি সমাসযুক্ত পদ ব্যবহৃত হয় না । বিশেষ, অশিক্ষিত গ্রাম্য গৃহস্থের ঘরে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শব্দের সংখ্যা নিত্যসুত কম । নিত্য প্রয়োজনীয় আহান বিধানাদির পরিচালনার্থে যে সকল শব্দের ব্যবধান নিত্যসু প্রয়োজন, কেবল মেট-গুলিরই কোনরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় । এত সকল কারণে মন্ধি সমাস একটু উপবেব শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তি । প্রায়ই সংস্কৃত পদেব মন্ধি সমাস হইয়া থাকে । কিছুদিন সাধুভাষার আন্দোলনা না করিলে ও সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি না পাঠিলে, মন্ধি সমাস শিক্ষায় কোন ফল হয় না ।

সমাস ।—মন্ধি শিক্ষার পর, প্রথমে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমাস শিক্ষা দিবে । প্রথমে সমাস কাহাকে বলে তাহার সূত্র মুখস্থ না কবাইয়া কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে । যথা :—

বৃদ্ধ যে পুরুষ = বৃদ্ধপুরুষ	ঠাকুর (পূজনীয়) যে দাদা = ঠাকুরদাদা
মহান যে জন = মহাজন	ডেপুটী (ছোট) যে ম্যাজিস্ট্রেট = ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট
বট যে বৃক্ষ = বটবৃক্ষ	ছোট যে বাট (প্রভু) = ছোটলাট

ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিয়া বলিতে হইবে যে “ছোট পদ একত্র হইয়া একটা অর্থ বুঝাইলেই সেই ছোট পদে সমাস হয় ।” “বৃদ্ধ, মহান, বট, ঠাকুর, ডেপুটী, লাট” এগুলি একটা একটা গুণ বুঝাই-তেছে । এগুলি কি পদ ? বিশেষণ । আর পুরুষ, জন, বৃক্ষ, দাদা, লাট এগুলি কি পদ ? বিশেষ্যপদ । এইরূপ বিশেষ্য বিশেষণে যে সমাস হয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস কহে । কর্মধারয় সমাস শিক্ষা দিবার সময় বালকদিগের স্মরণার্থে জন্য এই একটা সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে কর্মধারয় সমাস ভাষিবার সময় দুই শব্দের মধ্যে একটা, ‘যে’ লাগান যায় । এইরূপ বহুত্রীহি সমাসও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিখাইতে হইবে । যথা :—

শীত অর্থ (কাপড়) যাহার = শীতাবর (কৃষ্ণ)

শূল পাণ্ডক (কাঠ) যাহার = শূলপাণি (শিব)

পদ্ম নাভিক যাহার = পদ্মনাভ (বিষ্ণু)

এখানে 'শীতাবর কাপড়' 'শূল ও পাণি', 'পদ্ম ও নাভিক' না বুঝাঠিয়া ক্রম, শিব ও বিষ্ণুর বৃত্তান্ত আছে । যে যে পদে সমাস করা যায়, সেগুলি সেসব পদের অর্থ না বুঝাঠিয়া, যাহাদেও অন্য কোন একটা বিশেষ অর্থ বুঝায়, তাহাকে 'বহুব্রীহি' সমাস কহে । এতদ্ব্যতীত উপপদ শিক্ষা দিতে হইবে । যথা :—

পক্ষে অগ্নে যে = পক্ষজ (পক্ষ ; শৈবালাদি নয়)

জলে চরে যে = জলচর (জলচর জীব ; নৌকা প্রভৃতি নয়)

ঘর পোড়ায় যে = ঘরপোড়া (হুম্মান ; কেহ ঘর পোড়াইলে তাহাকে ঘরপোড়া বলে ; পোড়া ঘর নয় ।)

যে সমাস বহুব্রীহির মত, কিন্তু একটা দাতুর সহিত যুক্ত হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে । উপপদ শব্দের অর্থ বুঝাঠিয়া দিবে । বালাকেবা কম্পানয়, বহুব্রীহি ও উপপদ সমাসে প্রায়ই গোলমাল করিয়া থাকে । এই তিনটির পার্থক্য দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিবে । কারকের বোম হইলে ওৎপুরুষ সমাস বুঝিতে কষ্ট হইবে না । বন্দ সমাস সহজ । অব্যয়ীভাব প্রভৃতির আপাততঃ আবশ্যকতা নাই ।

তার পর শ্রী প্রায়, তজ্জিত ও কৃত কিছু কিছু শিক্ষা দিলেই উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর ব্যাকরণ শিক্ষা শেষ হইল । আত্মকাল হইলেই অল্প-করণে পদ পরিচয় বা পদব্যাখ্যা অর্থাৎ পার্শ্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে । চচ্চা করিলে শিক্ষকেরা ইহাও শিক্ষা দিতে পারেন । ইহাতে ব্যাকরণ শিক্ষার উৎকর্ষপ পরীক্ষা হইয়া থাকে । গল্পবিধান, যত্নবিধান ও চিত্রকরণ প্রভৃতি পির সঙ্গে শিক্ষণীয় । মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীদ্বয়ে এই সমস্ত বিষয়ই অধিক মাত্রায় শিক্ষা করিবে । মধ্য বাঙ্গালার উপযুক্ত কোন

বড় ব্যাকরণ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে । কিন্তু বেক কেক এমন যে উচ্চপ্রাণীমানব জন্ত বাহা নির্দিষ্ট করণা এই মকনা বিষয়েই প্ৰাণানোচনা করিবোই মন্য বাঙ্গালান বালকগণের পক্ষে যোগ্য হইবে । যাহা হউক এ বিষয় শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তক-নিৰ্মাণ-কমিটীর বিবেচ্য । তবে এক কথা বলা আবশ্যক যে মন্য বাঙ্গালান দ্বিতীয় বর্ষে একটু উচ্চ অক্ষার শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল হয় । উচ্চ অক্ষারের মধ্যে আছে, কেবল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র । উচ্চের মধ্যে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর দুই ভাগ কবিয়া নিম্নলিখিত উচ্চগুলির দৃষ্টান্ত দিলেই চলেবে :

মিতাক্ষর—(মিতাক্ষরী) পদ্মাব, পর্যায়, সমানম, মালতী, একাদশী, অমৃতগড়ক, দীর্ঘ-তোটক, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ; (অমিতাক্ষরী) গান, ভড়া ।

অমিতাক্ষর—(মিতাক্ষরী)—মাইকেলের মেঘনাদ বধ ; (অমিতাক্ষরী) রাজকুমার ও গিরীশচন্দ্রের নাটকাদি ।

অলঙ্কারের মধ্যে, নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলি মন্যবাঙ্গালা শ্রেণীতে শিক্ষণীয় :—

শব্দালঙ্কার—ধ্বনিপ্রাণ ও যমক ।

অর্থালঙ্কার—উপমা, রূপক, উৎপেক্ষা, অর্থাস্থল্যাস, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, অপকৃতি, ব্যতিরেক, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি এবং বিশেষোক্তি ।

ব্যাকরণ শিক্ষা দানে আর এক কথা মনে রাখা উচিত । প্রথম প্রথম ব্যাকরণে ব্যবহৃত (বিশেষ) শব্দগুলি ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত । বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দ সামান্য ভাষায় প্রচলিত । সেষ্টজন্ত বস্তু বাচক শব্দ, নাম বাচক, গুণ বাচক, কার্য বাচক ইত্যাদি রূপ (শিক্ষকের সুবিধামত) কথা প্রস্তুত করিয়া লেখেন বালকগণের বুঝিতে কষ্ট হইবে না । 'মদ্রি' না বলিয়া 'শব্দ জুড়িবার বীতি' এইরূপ বলাই সুবিধাজনক । তাৎপৰ্য্য এখন একটি বিষয় বোঝ হইয়া যাইবে, তখন বিশুদ্ধ শব্দ শিক্ষাইয়া দিতে হইবে ।

৩ । রচনা

বাঁক বা শিখান মজ্জিত রচনা শিক্ষা আবশ্যক হইয়া থাকে । যখন ভাষা-শিক্ষা রচনা শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হয় না, তখন রচনা শিক্ষার জন্য পৃথক সময়ে বাবস্থা থাকা উচিত ।

বাক্যরচনা ।—পথনে বাক্যবোধে প্ৰবাসী অল্পমাত্র কনিয়া কেবল কণা ক্রিয়া যুক্ত বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা দিবে । বোর্ডে কণকণ্ডি বিশেষ্য পদ লিখিয়া দিবে, বাঁককেরা একে একে গিয়া, গাহিতে ক্রিয়া পদ বুঝ কনিয়া আসিবে :—

মোড়া মোড়াইতেছে
গাছ
পাখী
ঘর

বালকেরা ‘মোড়াইতেছে’, ‘গাড়াইতেছে’, ‘উড়াইতেছে’, ‘খেলিতেছে’, ইত্যাদিরূপ ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া আসিবে । তাবপন বিশেষ্যের সহিত বিশেষণ যোগ শিক্ষা দাও । পূর্ববৎ বোর্ডে লিখিয়া দাও :—হাতি, ফুল, বাড়ী, পুস্তক । বালকেরা ‘কাল’, ‘লাল’, ‘বড়’, ‘উত্তম’ প্রভৃতি বকনের বিশেষণ যোগ করিল । এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস হইলে কেবল বিশেষ্য লিখিয়া দিয়া গাহার সহিত বিশেষণ ও ক্রিয়া যোগ করিতে শিক্ষা দাও । যথা—

হায়ে পাখী উড়াইতেছে
হাতি
ফুল

বালকেরা ‘হাতির’ সহিত ‘ছোট ও মোড়াইতেছে’, ‘ফুলের’ সহিত ‘লাল ও ফুটিয়াছে’ যোগ করিয়া দিল । কিন্তু এক বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হইবে । বাক্য রচনাকালে বালকেরা অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া,

অনেক সময় কেবল ব্যাকরণের দিকের লক্ষ্য রাখে । হয় . কেহ লিখিয়া বলিল ‘লাগ হাতি হাসিতেছে’ ; ব্যাকরণ গত কোন ভুল নাহি বটে, কিন্তু এইরূপ বাক্যের ভাব অসম্ভব বলিয়া, সম্পূর্ণ বাক্যই অশুদ্ধ । সাধারণতঃ বাক্য রচনা করিতে বলিলেই, হয় ‘রাম’ না হয় ‘শ্যাম’, এই দুই জনের একজনকে কর্তা ঠিক করিয়া, যত ক্রিয়া পদ আছে, সমস্তই ইহাদের সহিত যুক্ত করিয়া দেয় । ‘গান করিতেছে’, ‘মেলাই করিতেছে’, ‘দৌড়াইতেছে’ ‘শুইয়া আছে’—এইরূপ ক্রিয়াপদে অবশ্য ‘রাম,’ ‘শ্যাম’ দিলে অর্থ উদ্ভ্রম না হউক, এক রকম কাজ চলা যত হয়, কিন্তু ‘হাসা হাসা ডাকিতেছে’ এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্গে ও ‘রাম শ্যামকে’ যুক্ত করিতে ছাড়ে না । বালকদিগকে সুন্দর ও সমস্ত উত্তর দিতে শিক্ষা দিতে হইবে । ইহাতে আর এক উপকার এই হইবে যে, তাহাদের চিন্তাশক্তি ও যুক্তশক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হইবে । ‘রাম গান করিতেছে’ না বলিয়া, ‘পাখী গান করিতেছে’ বলিলে বাক্যটির দ্বারা কেমন একটা সাধারণ সত্য ঘটনা বিবৃত হইল । ‘রাম গান করিতেছে’ বলিলে সেরূপ কিছু বুঝিতে পারা যায় না । ‘রাম’ কে ? সে কি গান করিতে গানে ? কেন গান করিতেছে ? যদি রামের সম্বন্ধে আমরা পূর্বে এত বিষয় জানিতাম, তবে ‘রাম গান করিতেছে’ বলিলে কিছু বুঝিতে পারিতাম । কিন্তু কেবল রাম গান করিতেছে বলিলে সেরূপ কিছুই বোধ হয় না । সেইরূপ ‘বালিকা (কি দর্জি) মেলাই করিতেছে’, ‘ঘোড়া দৌড়াইতেছে’, ‘রোগী শুইয়া আছে’, এইরূপ সমস্ত উত্তর হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে বালকেরা প্রথমে এতদূর পারিয়া উঠিলে না, কিন্তু এই আদর্শের দিকে তাহাদিগের লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দিবে ।

ইহার পর একটা একটা বিশেষ্য পদ বলিয়া দাত ও সেগুলিকে একে একে কর্ম করিয়া, এক একটা বাক্য রচনা করিতে বল । মনে কর ‘বাঘ’ লিখিয়া দিলে । এক বালক উত্তর করিল ‘রাম বাঘ খাইয়াছে’ ।

ইহাতে ব্যাকরণগত কোন ভুল নাই, কিন্তু এরাপ উক্তর মূলেই ভুল। এই বাক্য সমস্ত ভাবযুক্ত নহে। ভাব লভ্যবাক্য বাক্য। যেখানে ভাব হইল না, সেখানে বাক্যও হইলনা। যদি বাক্যই না হইল, তবে তাহার ব্যাকরণ লভ্য কি হইলেন? অন্য আর এক বাক্য লিখিল 'শ্রাম বাঘ ধরিবে' ; তারপর 'যদি বাঘ দেখিতেও' , পুঙ্খানুপুঙ্খ এরাপ বাক্য কিছু ভুল। তবে পরীক্ষায় ইহাতেও পূর্ণ নন্দর যায় না। 'শিকারী বাঘ ধরিবে' এরাপ বাক্যই, পরীক্ষকেরা পূর্ণ নন্দরের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। তবে ঘটনা বিশেষের সহিত যুক্ত হইলে সমস্ত বাক্যই সমস্ত হইতে পারে। ছুটিফের সময় মধ্যপ্রদেশের লোক এক-বার বাঘ খাইয়াছিল। সেই ঘটনার উপলক্ষে 'রামদীন বাঘ খাইয়া-ছিল' একথা সমস্ত। 'শ্রাম' অর্থে যদি আমরা সেই সার্কাসের শ্রাম-কাজ চটোপাদায়কে বুঝি, তবে তাঁহার পক্ষে বাঘ ধরা অসম্ভব নয়। বাঘ দেখাটা অনেক সময়ই সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু শিকারীর পক্ষে বাঘ মারা একটা সাধারণ রীতিসম্মত কার্য্য বলিয়া, এই শেষ বাক্যই উত্তম।

ব্যাকরণের সাধারণ দৃষ্টান্ত দিবার সময় ব্যাকরণের নিয়মের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখায় ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না। কিন্তু রচনার সময় ভাব ও ব্যাকরণ উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইরূপে ক্রিয়ার বিশেষণ ও তিনকাল-প্রকাশক-ক্রিয়া-পদগুলির ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ বাক্য রচনা শিক্ষার পর ছোট ছোট গল্পের রচনা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

গল্পরচনা।—কোন পুস্তক হইতে এইরূপ আনন্দজনক একটি গল্প পাঠ কর বা নিজে এইরূপ সরল একটি গল্প রচনা করিয়া বালকগণকে শুনাও (ত্রীযুক্ত আসান উল্লাহুত কিওরগার্টেন প্রাইমার) :—

“একটি ছেলে ভারি পেটুক । পেট ভরিয়া গেলেও সে থাইতে চাড়ে না । এইরূপে থাইতে থাইতে তার খুব পেটের অস্থখ হইল । একদিন কবিরাজের নিকট ঔষদ আনিতে গেল । কবিরাজ মহাশয়, তাহার খাওয়ার কথা শুনিয়া, তাহাকে শুইতে বসিলেন । সে শুইলে পর, কবিরাজ মহাশয় তাহার চোখে ঔষদ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন । বালক বলিল “আমার পেটের অস্থখ, চোখের নয়” । কিন্তু কবিরাজ মহাশয় বলিলেন “না তোমার চোখের অস্থখ, পেটের নয় । আমি তোমার চোখ ভাল করিয়া দিজেছি, তোমার পেট মারিবে ।”

এই গল্পটি বলা হইলো শিক্ষক বালকদিগের নিকট হইতে দ্বারা বালিক প্রশ্ন করিয়া গল্পের সমস্ত বিষয় আদায় করিয়া লইবেন । যথা —

প্রঃ । পেটুক বালক পেট ভরিয়া গেলেও কি করিত ?

উঃ । পেটুক বালক পেট ভরিয়া গেলেও থাইত ।

বালকেরা পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিবে । শিক্ষক আংশিক উত্তর, বা গ্রাম্য কি অসম্পূর্ণ ভাষায় উত্তর গ্রহণ করিবেন না । মেরামত উত্তর করিলে, তিনি শুদ্ধ করিয়া দিবেন ও মের বালকের নিকট হইতে পুনরায় শুদ্ধ উত্তর আদায় করিবেন ।

প্রঃ । থাইতে থাইতে তাহার কি হইল ?

উঃ । এইরূপে থাইতে থাইতে তাব পেটের অস্থখ হইল ।

প্রঃ । পেটের অস্থখ হইলে সে কি করিল ?

উঃ । পেটের অস্থখ হইলে সে কবিরাজের নিকট ঔষদ আনিতে গেল ।

প্রঃ । কবিরাজ মহাশয় তাহার কথা শুনিয়া কি করিলেন ? ইত্যাদি ।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরগুলি শেষে মেটে বা কাগজে লিখিত হইয়া দ্বারা বালিক গল্প হইয়া যাইবে । প্রথমে কিছু দিন যুগে যুগে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । বেশ অভ্যাস হইয়া গেলে শেষে মেটে বা কাগজে লিখিত শিক্ষা দিবে । হাজার পর কেবল গল্প পাড়িয়া শুনাওবে, তার প্রশ্ন করিবার আবশ্যক নাই । বালকেরা গল্পের বিষয় মনে রাখিয়া নিজের ভাষায় রচনা করিবে । পুস্তকস্থিত গল্পে বালকগণের অনুকরণের উপযুক্ত কোন সুন্দর শব্দ বা বাক্যাংশ থাকিলে সে গুলি (বেশী নয়) ।

বোডে লিখিয়া দিবে, ও সেই শব্দগুলি বাগকগণকে নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করিতে বলিবে । গদ্য রচনায় 'কণামালা, ঈমপের গল্প' প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য লভবে । যেতদূর গদ্য রচনা অভ্যাস হইয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোবনী (প্রথমে দেশীয় লোকের) গড়িয়া শুনাইবে । কাব্য-ময় ঘটকল্প চরিত্রাদিক ও শব্দভঙ্গ্য বিদ্যাবদ্ধ কল্প চরিত্রমালায় সাহায্য লভবে । বাগকগণ নিজেদের ভাষায় সে শুনি বর্ণনা করিবে । তাঁর পর অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ শিখাইতে আরম্ভ করিবে ।

প্রবন্ধ রচনা ।—বর্ণনাত্মক রচনা মতজ, কিন্তু ভাবাত্মক রচনা শব্দজ । সেই জন্য প্রথমে কেবল বর্ণনাত্মক রচনাষ্ট শিক্ষা দিবে । বালক-দ্বন্দ্বকে (নদা যাজ্ঞানার ২য় লেখী চতুঃ) কল্পনা করিয়া কোন স্থানের বর্ণনা লিখিতে বলিবে । “গোমার গাঁও বা কোন বাজার, কি এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাবার পথ, কি কোন উৎসব বর্ণনা করিয়া রচনা লেখ” —এতদূর পথ করিবে । কিন্তু প্রথমে দ্বিখিবার দ্বারা ও উপকরণ বলিয়া না দিলে বালক পারিবে না । সেই জন্য কিছুদিন নিয়মিত ও পুনরাবৃত্ত বোডে রচনার পাত্র লিখিয়া দিবে :—

বিষয়—নিজ গ্রামের বর্ণনা ।

১ । গ্রামের নাম—সেই নাম হইবার যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে, তবে সে কারণ ।

২ । কোন খোলায়—মহর হইতে কতদূরে—কোন নদী বা রেলের ধারে । চতুঃ-সীমা ।

৩ । গ্রামে পাহাড়, বন, বিল, নদী প্রভৃতি যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকে তাহার বর্ণনা । স্বাস্থ্য ।

৪ । গ্রামের চাষবাসের অবস্থা, আমি কি পরিমাণে উৎসাহ, কি কি ফসল আছে ।

৫ । লোক সংখ্যা—কোন জাতি ভাষা, লোকের অবস্থা, ব্যবসায় বাণিজ্য ।

৬ । ডাকঘর, কাছারি, স্কুল, হাসপাতাল, মন্দির, মসজিদ, বাজার, হাট প্রভৃতির বর্ণনা ।

৭। গ্রাম ক্রমশঃ উন্নত না অবনত হইতেছে ? তাহার কারণ ।

বর্ণনাত্মক রচনার অভ্যাস করিয়া গেহো (মদ্য ১ম শ্রেণীতে) মধ্যে মধ্যে সহজ ভাষাত্মক রচনা অভ্যাস করাইবে । কিন্তু ৩০৫ ও প্রথম প্রথম রচনার ধারা বোর্ডে লিখিয়া দিও হওবে । যথা—

স্বাস্থ্যরক্ষা ।

১। কিস্তি ব্যক্তিকে স্বস্থ ব্যক্তি বলা যায় ? স্বাস্থ্যের স্থগ ও স্বাস্থ্যভঞ্জে স্থগ ।

২। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম :—

(ক) নির্মল বায়ু সেবন ।

(খ) লঘুপাক জবা ভক্ষণ ও আহারের নিয়ম করণ । (আহারের অব্যবহিত পরে পাঠ না করা)

(গ) পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকা ।

(ঘ) পরিশ্রম ও ব্যায়াম । দিবানিদ্রা ও অধিক নিদ্রা না যাওয়া ।

(ঙ) নির্দোষ আশ্রয় উপভোগ ।

(চ) ছুর্ভাবনার বশ না হওয়া । সকল সময়েই সৎকার্যে ব্যাপ্ত থাকা ।

৩। স্বাস্থ্যরক্ষা না করিতে পারিলে সাময়িক স্থগ লাভের পক্ষে কি বাধ্য হইবে ?

রচনার নিয়ম ।—এইরূপ রচনা লিখিতে বালকগণকে নিম্ন-লিখিত নিয়ম গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিবে :—

১। যে বিষয়ে রচনা লিখিতে হইবে, সে বিষয় সম্বন্ধে মাতা বাহা লিখিবে মনে করিয়াছ, তাহা প্রথমে পৃথক কাগজে ধারাবাহিক রূপে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখ (উপরোক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ) ও সেই ধারা অবলম্বন করিয়া রচনা লেখ ।

রচনা লিখবার সংক্ষিপ্ত ধারা এইরূপ :—

(১) প্রথমে বিষয়টী কি তাহার বর্ণনা করিবে (২) পরে তাহার ভালমন্দ ছই দিক দেখাইবে । (৩) তারপর সে সম্বন্ধে কি কি করা কর্তব্য, তাহা সম্ভব আকারে প্রকাশ করিবে ।

২। রচনার ভাষা সরল ও স্নায় বাঙালীয়। বাক্য দীর্ঘ না হওয়াই ভাল। সরল ভাষায় রচনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য বেশ মধুর। অল্প কথায় অধিক ভাব লেখন করিতে চেষ্টা করিবে। বাগ্‌কেলা অনেক সময় সুদীর্ঘ সমাসযুক্ত কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য চেষ্টা করিবার থাকে। সেজন্য চেষ্টাও আবশ্যিক মনেহ নাহি কিন্তু তাহার একটা সময় আছে। এন্ট্রান্স স্কুলের পঞ্চম, দ্বিতীয় শ্রেণীর ও মাধ্যম স্কুলের ছাত্রগণ এক্ষণে চেষ্টা করিলে বিশেষ অগ্রাগ হয় না। কিন্তু তাহাদের পক্ষেও সরল ভাষায় রচনা যোগ্য বাঙালীয়। আজ কা'ল সরল ভাষাই পণ্ডিতগণের পছন্দ। কঠিন ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে, কঠিন ভাষায়ুক্ত অনেকগুলি গ্রন্থ পড়া আবশ্যিক। তাহা না হইলে ভাষা অস্বস্ত হয় না। “ঝড়ে কলাগাছগুলি, পুকুরের ভিতর পড়িয়া গিয়া, পচিয়া উঠিয়াছে।” এই বাগ্যের বর্ণনায় এক বালক লিখিতেছে—“বাতাভিহত কদলী বৃক্ষ সকল (মো'তার বনবাসে পড়া) জলে পড়ে পড়ে পড়ে গেছে”।

৩। রচনায় উদাহরণ দিতে হইলে, লোক প্রসিদ্ধ ঘটনা, গল্প বা উপাখ্যানের উল্লেখই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই উদাহরণ স্বল্প কথায়ও বিষয়ের উপযোগী করিয়া বিবৃত করিবে। একটা দৃষ্টান্তে ৪৫ লাইনের অধিক লেখা উচিত নহে। মনে কর ‘পরোপকার’ সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে। ক্ষুদ্রের দ্বারাও যে মহতের উপকার হইয়া থাকে, ইহাই দেখাইবার জন্য, রামায়ণ হইতে দৃষ্টান্ত দিবে মনে করিয়াছ। এইরূপ লেখা :—“বনের পশু বানরের সহায়তায় রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র কাঠ বিড়ালীরাও সমুদ্রে সেতু বন্ধন রূপ কার্যে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল”। ইহাই যথেষ্ট। রামচন্দ্র কেন বনে আসিলেন, কোন্ রাস্তায় গেলেন—পঞ্চাষটী বনে কি হইল—কিরূপে বালীবধ হইল প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। ঐ বিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত :—“ক্ষুদ্র ইন্দুরও একদিন জাল কাটিয়া দিয়া, সিংহকে ব্যাধের হস্ত হইতে

রক্ষা কবিতাছিল” (ঈমপের প্রসিদ্ধ উপকথা হঠতে প্রচলিত) । অনেক বালক রচনার কদোবর বৃদ্ধি করিবার জন্য দৃষ্টান্তগুলি অমথা লম্বা করিয়া ফেলেন । রচনায় লেখার পরিমাণ দেখা হয়না, লেখার ভাব ও ভাষা দেখা হয় ।

৪ । পরীক্ষার কাগজে লিখিত রচনায়, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বচন বা পদ্যাংশ উদ্ধৃত করা বিশেষ আবশ্যিক বোধ করিলে, ১ লাইন কি ২ লাইনের অধিক উদ্ধৃত করিবে না । আর এক রচনায়, অতি গুরুত্ব বাক্য, উদ্ধৃত সংখ্যা ২টির অধিকও উদ্ধৃত করিবে না ।

৫ । রচনায় “হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আর আনন্দে থাকিও না” বা “আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন—আমার রচনা দেখা যুট্টা” —ইত্যাদি রূপ বাক্য লেখা নিষেধ । কোন সভায় বক্তৃতা করিতে বা রচনা পাঠ করিতে হইলে, এ সমস্তের ব্যবহার চলিতে পারে ; কিন্তু বিদ্যালয়ের রচনায় এরূপ লিখিতে নাই ।

৬ । রচনায় শৃঙ্গার অবলম্বন করা কর্তব্য । বিষয়ের এক একটি ভাগ পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (প্যারাগ্রাফ) লিখিতে হইবে ।

৭ । এক কি দেড় ঘণ্টার পরিমাণ সময়ে যে রচনা লিখিতে হয় তাহাতে ৫০৬০ লাইনের অধিক লেখা সম্ভব নহে । পরীক্ষার কাগজে এইরূপ দীর্ঘ রচনাই যথেষ্ট । ২ ঘণ্টার রচনার পক্ষে ২০২৫ লাইন লিখিলেই চলিতে পারে । পরীক্ষা কাগজে যে রূপ রচনা লিখিতে হইবে নিম্নে তাহার একটি আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

অধ্যবসায় ।

অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত কোন কর্ম নির্বাহ করিবার জন্য যে যত্ন ও চেষ্টা তাহাকে অধ্যবসায় বলে । অযত্নমিত-কার্য-সাধন-তৎপর ব্যক্তিকেই অধ্যবসায়ী কহে । অধ্যবসায়ী ব্যক্তি কোন কার্য অসম্পন্ন বা অর্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখিতে পারেন না । প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কার্যের প্রত্যেক অংশ সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাহার

মন স্থির হয় না । অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে সময়নিষ্ঠ হইতে হইবে, আলস্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । অল্পম নাজিও যত্ন চেষ্টা করিলে অধ্যবসায়শীল হইতে পারে, অধ্যবসায় অভাবের ফল । অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সম্বন্ধে কামা নিবাহের জন্য অনিচ্ছিত যত্ন করিয়া ব্যক্তি ফল লাভ করেন । 'যতনে রতন মিলে'—এবং পণ্ডিত মতা । সংসার সুখের উপকরণ ধন, মান ও যশ, অধ্যবসায়ী লাভ ।

সুই বেলা সীতামত রক্ষণ ও গৃহসংস্কার কাৰ্য্য নিবাহ করিয়াও, অবিত্রাঙ্ক যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন । কয়েকজনেও তিনি অধ্যবসায় স্বপ্নে যেকোন ধন, মান ও যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয় । অধ্যবসায়ী রূপ স্বপ্ন থাকিলে জীবনের সকল ব্যবসায়েরই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট কং কয়েক বার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন । এমন সময় একদিন দেখিলেন যে একটা উর্বনাশ ছয়বার চেষ্টাও গুচ আচীরে সূত্র সংলগ্ন করিতে পারিল না বলিয়া, সপ্তম বার চেষ্টায় বিরত হইল না । তিনি এই ক্ষুদ্র কীটের নিকট অধ্যবসায় শিক্ষা করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও শেষে জয়যুক্ত হইলেন ।

কায়ের প্রারম্ভ দেখিয়াই আমাদের নিঃসঙ্গ হওয়া কর্তব্য নহে । এমন অনেক বর্জক আছে, যাহা দেখিতে ভয়ানক বোধ হয় বটে, কিন্তু আঁটিয়া ধরিলে ভাঙ্গিয়া যায় । সংসারের পথ মরল নহে—গাছাড় পর্বত ও গর্ত গহ্বর পরিপূর্ণ । উৎসাহ, পতন জীবনের সহচর । কেবল অধ্যবসায়ের স্বপ্নেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় । এই জন্ত কি বিদ্যালয়ে, কি সংসার ক্ষেত্রে, সর্বত্রই অধ্যবসায়ের অনুশীলন আবশ্যক ।

প্রশ্ন । শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটা ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ) লিখ ।

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ ১৫২০ লাইনের অধিক লিখিবার আবশ্যকতা হয় না । কিন্তু এরূপ রচনা বালকেরা কঠিন মনে করে । কারণ এই ১৫ লাইনের মধ্যে অতি আবশ্যকীয় কথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে পূরিয়া দিতে হইবে । উদাহরণাদি বা উদ্ধৃত বাক্য একবারেই থাকিবে না । উপরন্তু ভাষা আড়ম্বর শূন্য ও সংযত হইবে । নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইল :—

“শিক্ষা বাজক বাণিকাদিগকে কার্যোপযোগী করে । সুশিক্ষা, নিজের কার্য বা অপরের কার্য সুচারুৰূপে সম্পন্ন করিবার শক্তি বিধান করে । এইজন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণই রাজকার্য্যে বা অপারকার্য্যে অধিকতর আদৃত । সাধারণ শিক্ষা যতদূর উন্নত তাঁহার পদোন্নতি তদনুযায়ী হইয়া থাকে । কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে শিক্ষিত লোকই বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন, কাৰণ তাঁহারা শিক্ষারদ্বারা অসমর্থিত বাধমায়ে উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন । শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি বহু স্থানের অধিকারী, যথা উত্তম পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠ, সম্মতচর্চা, চিকিৎসাশীলন ইত্যাদি । শিক্ষিত ব্যক্তিগণই ভ্রমসমাজে অবশেষ লাভ করিতে পারেন । শিক্ষাই মানুষকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করে । এই শিক্ষার দ্বারা একজন আর একজন আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ শিক্ষার দ্বারা এক জাতি অপার জাতির শাসন-কর্ত্তা । সুশিক্ষা মনের সম্বীর্ণতা বিনষ্ট করে, কুসংস্কার দূরীভূত করে ও মানুষকে ধর্মপরায়ণ করে ।”

পত্র রচনা ।—পত্রের ভাষা সনল হইবে । পত্রে কঠিন ভাষা কখনই ব্যবহৃত হয় না । চীচী ছাড়া পত্রে একজনকে সম্বোধন করিয়া বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনায় কোন ব্যক্তি বিশেষকে সেক্রপ সম্বোধন করা হয় না । পত্রে এইজন্য সম্বোধন সূচক কতকগুলি পদেরও ব্যবহার হইয়া থাকে ।

নিম্নে একখানি পত্রের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

শ্রীহরি ।

বরিশাল ।

৬ই আষাঢ় ১৩১৪ বাং

শ্রীশ্রীচরণকমলেম্—

বাবা, আমি কা'ল সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিয়াছি । গাড়ীতে অনেক লোক হইয়াছিল । রাত্রে একটুকুও ঘুমাইতে পারি নাই । শীমারে সকালবেলা বেশ ঘুমাইয়া-ছিলাম । আমাদের সহযাত্রী এক ভদ্র লোকের একটা শীশ টাফ শীমার হইতে চুরি হইয়া গেল । একজন ভদ্রবেশধারী লোক নাকি রাত্রে শীমারে তাঁহার পাশে শুইয়াছিল । শেষ রাত্রে সেই লোকটী বাতন লইয়া পলাইয়াছে । ভদ্রলোকটী কিছুই টের পান নাই । শীমার রাত্রে চাঁদপুর ঘাটেই বাধা ছিল । এই কথা শুনিয়া আমি ট্রাকের সঙ্গে এক দড়ি

দাঁড়িয়া সেই দড়ি বিচানার নীচে রাখিয়া ঘুমাফলান । মাসীমা আমার এষ্টরূপ দাড়ি বঁধার কথা শুনিয়া বলিলেন যে, চোলেরা যেমন নুঁজা, তাহাতে আমার দড়ি কাটিয়াও নাকি বাকুস লইয়া যাইতে পারিত । পুলিশের এত মোলমাল সন্দেশে চোরে কেমন চুরি করিতেছে ।

আজ স্নানে গিয়াছিলাম । ভর্ষি হইতে ৭০ টাকা লাগিয়াছে । হেড্‌ মাস্টার বাবু খুব ভাল লোক । তিনি আমাকে চেনেন । মিনি গণিত শিক্ষা দেন, তিনি অঙ্কগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন । ষ্টক আরম্ভ হইয়াছে । ভিন্‌কাউন্ট পয়ালু পাবনাতেই পড়িয়া আসিয়াছি । সুতরাং আমার কোন অস্থাবর হইবে না ।

মাসীমার নিকট যা যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানিলাম সাধন, ঋণ, পাণ্ডু, জিলি ভাল আছে । টুঙ্গ কোলাঘাটে দিমিয়ার কাছে আছে—সেও ভাল আছে । ইহাদের সঙ্গে আর পুজার পুন্দের দেণা হইবার সম্ভাবনা নাই । এই অক্টোবর পুজার দুটি আরম্ভ হইবে । এখনও অনেক দেরী । আমরা সকলে ভাল আছি । ইতি

সেবক

প্রী—

দলিলাদির রচনা শিক্ষা দিবার আবশ্যিকতা—কেহ কেহ বলেন, বালকগণকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহাদিগকে কেহ সাংসারিক কাজকর্মে ঠকাইতে পারিবে না । একথা কতক সত্য হইতে পারে, কিন্তু আবার দলিলাদির নানারূপ ঘোর ফের শিখাইয়া অল্পকে ঠকাইবার একটা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াও অসম্ভব নহে । দলিলের ভাষার প্রতি অঙ্গর মানবের চাতুরীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । দৃষ্টান্ত—“আমি, কি আমার ওয়ারিগ কি স্থলাভিষিক্তগণ যদি অস্বীকার করি বা করে তাহা না গল্প” । এর অর্থ কি ? অর্থাৎ একটা কাজ করিয়া তাহা অস্বীকার করাও রীতি আছে । কিন্তু “আমি এই ক্ষেত্রে তাহা করিব না” এই দলিলে তাহাই প্রতিজ্ঞা করিতেছি । দলিলের ছত্রে ছত্রে এই কথা যে “আমি এইরূপ ছলনা করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না ।” সুতরাং দলিল শিখাইতে গিয়া যাহাতে ছলচাতুরী শিক্ষা দেওয়া না হয় সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় দলিল ।—জামদগকে বিক্রয় কবান্না, পাট্টা, কবুলিয়াত, ছাওনোট, কর্জপত্র, রেহানী তমঃস্কক, ওকালতনামা প্রভৃতি ৬৭ রকমের দলিল লেখা শিখান যাঠিতে পারে । তবে এই সকল দলিলের বিষয় ও ভাষা মথ্য সম্ভব মরল হওয়া আবশ্যক । নানারূপ ঘোরফেরবুত্র বা অনেকরূপ মত যুক্ত জটিল দলিল শিখাইতে চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করিও না ।

শিক্ষা দানের ধারা—এক বালককে জন্ম বাধকের নিকট তাহার স্লেট, কি ছাতা, কি পুস্তক বিক্রয় করিতে বলা । মনে কর রামচন্দ্র দাস, যছনাথ সেনের নিকট তাহার স্লেট বিক্রয় করিল । যছ, রামকে ১২টা পয়সা দিল । এখন যছকে বল, “এই স্লেট যে রামের, তাহা মধু ইয়াসিন ও প্রিয়নাথ জানে ; কিন্তু ইহারা আজ জুলে আসে নাই । কাজেই এই স্লেট বিক্রয়ের কথা জানিল না । তাহারা যদি কাগজ ভোগাকে চোর বলিয়া ধরে, তবে তুমি কি করিবে ?—তুমি যে কিনিয়া লইয়াছ, একথা যদি তাহারা বিশ্বাস না করে ? তাই রামের কাছ থেকে এক খানা কাগজ লিখে লও ।” রামের দ্বারা একখানা কাগজ লিখাইয়া লও । মনে কর রাম এইরূপ লিখিয়া দিল, “আমি যছর কাছে স্লেট বিক্রয় করিলাম । (দস্তখত) রাম ।” “এ কাগজ দেখিয়া লোকের বিশ্বাস নাও করিতে পারে । অনেক যছ আছে, এ স্লেট দে, এই যছর কাছে বিক্রয় করিয়াছে, তার প্রমাণ কি ? তাই ভোগার নামটি পুরা করিয়া লিখিয়া লও ।” রাম আবার লিখিল “আমি যছনাথ সেনের নিকট স্লেট বিক্রয় করিলাম (দস্তখত) রাম” । “এ কোন রাম বিক্রয় করিয়াছে ?” দস্তখতও পুরা করিয়া লেখাও । “রাম চন্দ্র দাস” । “আচ্ছা এই গ্রামেইত আর এক যছনাথ সেন আছে, এখন এই স্লেট যে সেই যছনাথের নিকট বিক্রয় করা হয় নাই, তার প্রমাণ কি ? কাজেই যছর পিতার নাম লেখ ।” রাম পুনরায় লিখিল “আমি এই স্লেট প্রযুক্ত দৈশান চন্দ্র সেনের পুত্র যছনাথ

সেনের নিকট বিক্রয় করিলাম । (দস্তখত) শ্রী রামচন্দ্র দাস । “দেশব-
পূরের ঈশান চন্দ্র সেনের পুত্রের নামও মহনাথ সেন । কাজেই গ্রামের
কথাও উল্লেখ কর ।” এইরূপে জেলা, থানা প্রভৃতির আবশ্যিকতা শিক্ষা
দিতে হইবে । আবার এইরূপ কোন রামচন্দ্র দাসের নিকট হইতে ক্রয়
করা হইল, তাহারও পরিচয় থাকা আবশ্যিক । কাজেই শেষে রসিদখানা
এইরূপ দাড়াইবে :—

শ্রীমুখ মহনাথ সেন, পিতার নাম প্রশান চন্দ্র সেন, জাতি বৈদ্য, মাকিন চণ্ডীপুর, জেলা
মদীয়া বরাবর—

আমি শ্রীরাম চন্দ্র দাস, পিতার নাম মদন চন্দ্র দাস, জাতি কায়স্থ, মাকিন হরিপুর,
জেলা পাবনা, এই স্বীকার করিতেছি যে আমি আপনার নিকট তিন আনা পাইয়া আমার
দেউ বিক্রয় করিলাম । তারিখ ১৫ই পৌষ ১৩১৪ বাং

• শ্রীরামচন্দ্র দাস ।

এই প্রমাণীতে দলিলের পাঠ শিখাইতে হইবে । দলিল লিখিত উৎরেজী
ও পার্শ্ব কথাগুলির অর্থ শিখাইয়া দেওয়া উচিত । নিম্নলিখিত শব্দগুলি
আবশ্যিক মত শিখাইলেই চলিবে :—

অমিদারী, আশুচ, পশুদী, ইজারা, পরগণা, প্রজা, খাজানা, প্রোত, লাখিরাজ, ব্রহ্মোত্তর,
দেবোত্তর, পীরোত্তর, কিস্তি, বাস্ত, খামার, মাঠান, শাসিগ্রামি, সুনামি, আউল, সুরেল, ছুরেল,
চাহারেম, পতিতগ্রামি, জলকর, দীকস্তি, পয়স্তি, পাট্টা, কবুলিয়ত, কবালা, খত, তমঃস্ক,
রেহান, বখাফ, মোরসী, ফায়েরী, জরিপ, জমাবন্দি, চৌহদ্দি, নকসা, উত্তরামিকারী, বকলম,
সোকাগ, মাকিন, গ্রাম, পরগণা, থানা, জেলা, ডিনটিউ, রেজিষ্টারী, ষ্টাম্প । পার্শ্ব শব্দ জমাই
বাদ দেওয়া হইতেছে । পোতরে ও মওজে প্রভৃতি কথার চলন উঠিয়া যাইতেছে । ওয়ারি-
মান কথার পরিবর্তে ‘উত্তরামিকারী’ ও পেশার পরিবর্তে ‘ব্যবসায়’ লেখা হইয়া থাকে । বাহাল
তবিসাদ, কচায়েন, দরনজহক্ক প্রভৃতি অনেক কথা একবারেই উঠিয়া গিয়াছে ।

নিম্নে সরল দলিলের একখানি আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

মহামহিম শ্রীমুখ বাবু রামচন্দ্র সিংহ, পিতার নাম মৃত গোলক চন্দ্র সিংহ, জাতি কায়স্থ,
ব্যবসায় চাকুরী, মাকিন রঘুনাথপুর, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বীরভূম, বরাবর—

লিখিতঃ শ্রীরাজীব লোচন রায়, পিতার নাম মৃত গৌর গোবিন্দ রায়, জাতি বৈদ্য, ব্যবসায়

চিকিৎসা, মাঝিন বেলাতলা, থানা নান্দীগাঁও, জেলা নীলভূম, জমি বিক্রয় কবাবা পত্রসিদ্ধ
কার্যকারণ, আমার কল্যাণ নিবাহের জন্য টাকাট বিদেশে প্রয়োজন হওয়াতে আমি আমার
নিজ গ্রামের অন্তর্গত নিম্নের চৌহিদিহিত অল্পমান ২৪ বিঘামত এক গাও মৌরগী জমি মহা-
শয়ের নিকট ৫০০-২ পাঁচশত টাকা জইয়া বিক্রয় করিলাম । অন্য চইতে মহাশয় আমার স্বত্ব
স্বত্বান হইয়া, ঐ জমি পল পৌজারি ক্ষমে ভোগ দণ্ডন করিতে থা কন । আমি কি আমার
উত্তরাধিকারীগণ ঐ জমিতে কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিব না ।
মুজোব সমস্ত টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া, সুস্থ শরীনে ও মরজমনে এক বিক্রয় কবাবা
লিখিয়া দিলাম । ইতি তারিখ ২৭শে চৈত্র মন ১৩১৪ মাল ।

চৌহিদি ।

পূর্বে রামকুমার চক্রবর্তীর বশত বাড়ী, দক্ষিণে বছনাথ দেব বাগান, পশ্চিমে হনিকাল
ঘোষ ও কেশব লাল ঘোষের মাঠান জমি, এবং উত্তরে মনাই নদী । এই চৌহিদির বন্দো
অল্পমান ২৪ বিঘা জমি ।

লেখক

শ্রীচৌহিদি লাল অধিকারী

মাং দুর্গাপুর

মাফী

শ্রীচৈয়ামিন জাখী

মাং নাজিরা

শ্রীবাসনদাস রায়

মাং হনুদবাড়ী ।

কথোপকথন ।—বালকগণ যদি নিজ নিজ জেলার প্রচলিত
বাক্যকথনের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার ভাষা অঙ্গুরণ করে,
তবে বাক্য কথনের সঙ্গে সঙ্গে রচনারও বথেষ্ট মাঠানা হইতে পারে,
কারণ পুস্তকাদি সমস্তই কলিকাতার ভাষায় রচিত । শিক্ষক নিজে কলি-
কাতার ভাষায় কথা বলিবেন, আর ছাত্রগণকেও মোহ ভাষায় কথা
বলিতে অভ্যাস করাইবেন । আর এক কথাও মনে রাখা কর্তব্য, যে ভিন্ন
ভিন্ন জেলার শিক্ষিত সম্রাদায় একত্র হইলে, তাঁহারা মকল্লেখ কলিকাতার
ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকেন । সুতরাং শিক্ষিত সমাজে মিশিতে

হইলেন্ত কলিকাতার ভাষায় কথা বলিতে অভ্যাস করা কর্তব্য ।
বক্তৃতা, কথকতা, অভিনয় প্রভৃতিতে কলিকাতার ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া
থাকে ।

যাঁহারা এত মতের বিবক্ষ, তাঁহাদিগের চিন্তার জন্ত শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ
বসু লিখিল “বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি” নামক পুস্তক ১৯০৬ নিম্নলিখিত
অংশ উদ্ধৃত করিলেন :—

“কলিকাতা শহরের ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালীর আদর্শ ভাষা হওয়া উচিত । মহারাজ যুগ
চন্দ্রের সময় নদীয়ার ভাষাই বঙ্গের আদর্শ ভাষা বলিয়া গণ্য হইত । অতএব কলিকাতার
ভাষাকে এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা জ্ঞান করিলে, আমাদের রীতি ও ইতিহাসমত কার্যাই
করা হইবে । সুতরাং পূর্ণাঙ্গ যদি কলিকাতার ভাষাকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন এবং
তাঁহারই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌরবহানি বা হীনতা ঘটিল ভাবিয়া
তাঁহার অন্তঃকষ্ট পাইবার কারণ থাকিলে না । রাজধানীর সম্মান সকল দেশেই আছে, সকল
লোকেই করে । বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, উহাকে সমস্ত
বাঙ্গালী জাতির একতাসাদক শক্তি করিয়া তুলিতে হইলে, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ,
সমস্ত বঙ্গকে এক ভাষায় কথা কহিতে হইবে । এক জাতির যথো ভাষার প্রভেদ, সাংঘা-
তিক প্রভেদ । এ প্রভেদ তুলিয়া দিতে সময় আবশ্যক, অনেককে অনেক কষ্টও পাইতে
হইবে । তথাপি এ প্রভেদ আমাদিগকে তুলিয়া দিতেই হইবে ।”





চতুর্থ প্রকরণ—গণিতবিষয়ক।

১। পাটীগণিত।



টীগণিত শিক্ষার উপকারিতা।—(১)

বিচার শক্তিকে বলবতী করে। 'এক আর এক দুই', 'দুই আর এক তিন', 'সমান সংখ্যার সহিত সমান সংখ্যা যোগ করিলে ফলও সমান হয়' ইত্যাদি কুঙ্গ ক্ষুদ্র অল্লাঙ বিচার মনকে বৃহৎ বিচারের পথ প্রদর্শন করে। (২) সত্য

নির্ধারণের সহায়তা করে। অমতোর এতপ প্রবল শক্ত আর কিছুই নাই। চারি হইতে দুই বাদ দিলে দুই ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, $৩ \times ৫ = ১৫$ ভিন্ন আর কিছুই চতুঃ পারে না। এ সমস্ত সত্য সর্বদোশে সর্ব সময়ে এবং সর্ব বিষয়েই সন্ম ভাবে প্রযোজ্য। এ সত্যের পরীক্ষাও অতি সহজ, অমবুদ্ধি বাগককেও সহজে পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণ কারতে পারে। (৩) মনোযোগ বুদ্ধির বিশেষ সাহায্য করে। একটু অমনোযোগী হইলেই প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। (৪) আত্মশক্তির বোধ

জন্মায়। একটু কঠিন অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইলেই বালকের কেসন একটু আনন্দ হয়; সে বুঝিতে পারে যে তাহারও বুদ্ধিশক্তি কঠিন বিষয় নির্ধারণে সক্ষম। (৫) সাংসারিক কাজ কর্ত্ত্ব ইহার যে প্রকার আবশ্যক ন, তাহার বর্ণনা করা বাছ্য মাত্র। প্রত্যহই প্রতি সংসারে সামান্য বাজার খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব এত পাটীগণিতের সাহায্যেই পরিচালিত হইতেছে। আবার ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আলোচনায়, জটিল শিল্পে পাটীগণিতই প্রমিত সহায়।

পাটীগণিত শিক্ষাদানে কয়েকটি কথা। —নূতন শিক্ষক প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশায় কঠিন অঙ্কদ্বারা বালকগণকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। বালকেরা না পারিলে, তিনি নিজে কসিয়া দিয়া বাহাদুরী লাভ করিয়া থাকেন। এই রোগ মধ্যে মধ্যে পুরাতন শিক্ষকেও দেখিতে পাওয়া যায়। বালককে কঠিন অঙ্ক কসিতে দিয়া, তাহার অক্ষমতাপ্রমাণের প্রতীক নষ্ট করিয়া দিতে নাই। আবার অনেক শিক্ষক ও পরীক্ষকের, ডেলে-ঠকান একটা রোগ আছে। বালককে শিখাইতে হইবে, ঠকাইতে হইবে না; সে কি জানে তাহারই পরীক্ষা করিতে হইবে, সে কি জানে না তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে না। অনেক বালক শিক্ষকের দোষে অক্ষমতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। সকল বালক জটিল অঙ্ক কসিতে সক্ষম হয় না বটে, তবে সুবিবেচক পরীক্ষকগণ পরীক্ষায় যেরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে শতকরা ৯৯ জন ছাত্রকে যে সহজেই উত্তীর্ণ করান যাইতে পারে, ইহাতে আর ভুল নাই। আবার সময় সময় শিক্ষকগণ বালকগণকে কেবল নিযুক্ত রাখিবার জন্তই একটী স্থূহুৎ গুণ বা ভাগের অঙ্ক দিয়া কায়া,তুরে গমন করেন। ইহাতেও বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বালকেরা স্বেচ্ছাকৃত চঞ্চল প্রকৃতি, অধিকক্ষণ এককায়ো মনোনিবেশ করিয়া রাখিতে পারে না; সুতরাং অঙ্কের প্রতি একটা বিরক্তি জন্মে। এই জন্ত কঠিন ও জটিল অঙ্ক পূর্ব সাবধানে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তারপর শিক্ষকের অসাধ্যসাধ্য আর একটা দোষ ঘটিয়া থাকে। এক বালক অপর এক বালকের অঙ্ক নকল করিয়া শিক্ষককে ঠকাইতে চেষ্টা করে। তাহাতে এক বালক অল্প বালকের কোনরূপ সাহায্য না পায়, সে রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বালকগণকে একটা অঙ্ক, ও দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি বালকগণকে ত্রয়োদশ অপর

একটি অঙ্ক কসিতে দিলে গন্যস্বরে নকল করিতে পারে না । অথবা এক বেধের উপরেই প্রথম এক জনকে এক মুখে ও দ্বিতীয় জনকে অপর মুখে (প্রথম জনকে ড্র এর মুখ করিয়া দ্বিতীয়কে দক্ষিণ মুখ করিয়া ইত্যাদি) বসাইলেও নকল নিবারণ করা যায় ; বা যদি মোটে অঙ্ক কথার ব্যবস্থা হয়, তবে একটু ফাকে ফাকে দাঁড়া করাইয়া দিলেও বেশ হয় । কোন প্রকারে যাহাতে নকলের সুবিধা না পায়, সে বিষয়ে মতক থাকিতে হইবে । “নকল করিও না” বলিয়া উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নকলের সুবিধা না দেওয়াই শ্রেয় । নকলে বালকের আত্মশক্তি নষ্ট হইয়া যায় । তবে আবশ্যক হইলে এক বালক অপর বালককে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে পাবে । বালকেরা বালকের নিকট মন গুলিয়া নিজের অভাব জানাইতে পারে ও বালকেরাও বালকের অভাব সহজে বুঝিতে পারে । এইজন্য অনেক সময় শিক্ষকের বাথা । অপেক্ষা বালকের সহপাঠী অপর বালকের বাথা তাহার মনঃপূতা হইয়া থাকে ।

একটি নুতন নিয়ম শিখাইয়া বালকগণকে সেই নিয়মের সহজ সহজ যথেষ্ট অঙ্ক কমান আবশ্যক । প্রথম অবস্থায় জটিল অঙ্ক সর্বথা পরিত্যজ্য । প্রথম চার নিয়ম শিক্ষার পরে যখন ভগ্নাংশাদি কসিতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রথম চারি নিয়মের জটিল অঙ্ক মধ্যে মধ্যে কমান যাইতে পারে । জটিল অঙ্কের জন্য পরিপক্ব বুদ্ধির আবশ্যক । তারপর জটিল অঙ্ক কসাইবার সময়ও, সহজ বাছিয়া লইতে হইবে । একেবারে বিষম জটিল অঙ্ক দিয়া বালকের বুদ্ধিজন্য জ্ঞান উচিত নহে । আবার জটিল অঙ্কে, অধিক পরিমাণ কঠিন গুণ ভাগ থাকা অস্থায় । যেখানে বুদ্ধির অধিক আবশ্যক সেখানে পরিশ্রমের মাত্রা কম হওয়া যুক্তি সঙ্গত । “রাম যত্নর নিকট হইতে ৫৩৮৮/৩০ কড়া কর্জ করিয়া দিন ১৫৮৮ গুণা করিয়া ও আর একদিন ৫০০৮/১১ শোধ করিল । তাহার আর কত বাকী রহিল ।” এই অঙ্কে বুদ্ধি ও পরিশ্রম দুইই আবশ্যক । এই অঙ্কে পণ, কড়া, গুণা বাদ দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত । অন্ততঃ পক্ষে কড়া ও গুণা বাদ দেওয়াত নিতান্তই আবশ্যক ।

বালকদিগের বয়স দৃষ্টে অঙ্কের ব্যবস্থা করিতে হইবে । নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে হাজার, উচ্চ প্রাথমিক লক্ষ ও দ্ব্যন্তরিত্তিতে কোটীর অধিক সংখ্যা দ্বারা গুণ ভাগ করাইবে না । এইরূপ অত্যাশ্র অঙ্ক সবদিকেও ব্যবস্থা করিয়া লইবে ।

পাটীগণিতের পুস্তকে যেকোন ধারাবাহিক রূপে বসিত হইতে বসিতের অঙ্ক সামান্য থাকে বা প্রতিপরিচ্ছদে যতগুলি অঙ্ক থাকে তাহার যে সমস্তই, সেই শৃঙ্খলাক্রমে কসাইতে হইবে তাহার কোন আবশ্যকতা নাই । অঙ্কগুলি শ্রোতার উপযোগী দেখিয়া

বাছিয়া লইবে ও নিয়াজমেন সময় নিবেচনায় কতগুলি অঙ্ক কসাইতে পারিবে তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবে ।

কি চাটিল কি সরল—অনেক গুলি অঙ্ক কসাইয়া বাজকগণকেও তদুপ অঙ্ক প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । একদিনে নামা রকমের অঙ্ক নয় কসাইয়া এক রকমের অনেক-গুলি অঙ্ক কমান আবশ্যক । নিয়াজামিকে পত্যাহ অঙ্কদণ্টা, উচ্চ জামিক ৪৫ মিনিট ও ছাত্রগণি স্কুলে ১ ঘণ্টা অঙ্ক কসাইয়েই যথেষ্ট হইবে ।

বাড়ীতে অঙ্ক-কমিতে দিলে নিয়াজামিকের ছাত্রগণকে ১টী, উচ্চ জামিকের ছাত্রগণকে ২টী ও ছাত্রগণির ছাত্রগণকে ৩টী অধিক দেওয়া উচিত নহে । বাড়ীতে কঠিন অঙ্ক কমিতে দিবে না । যাচাতে খল সময়ে হৃদয়ঙ্গার সহিত পরিকার পরিচ্ছন্ন করিয়া একবারেই সঠিক উত্তর সমাধান করিতে পারে সেইরূপ ভাবে বাজকগণকে উৎসাহিত করিবে । (বাজকগণের অঙ্কের খাতার নমুনা পরিদ্রষ্টব্য)

সংখ্যা লিখন ও পঠন ।—সংখ্যা শিক্ষা দিবার পদ্ধতি কিওয়ারগার্টেন ও দারাপাও প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে । লিখন ও পঠনের কথাও উক্ত পরিচ্ছদে বর্ণিত হইয়াছে । কাঠি, বীজ, ফুল, পাতা প্রভৃতির দ্বারা শিখাইলে যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ফলপ্রসূ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই । শিক্ষক কাঠি ও ফুল পাতার সাহায্যেই বাজকগণকে এক শতকের অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দিবে । যথা

কাঠির দ্বারা



২০ লেখ

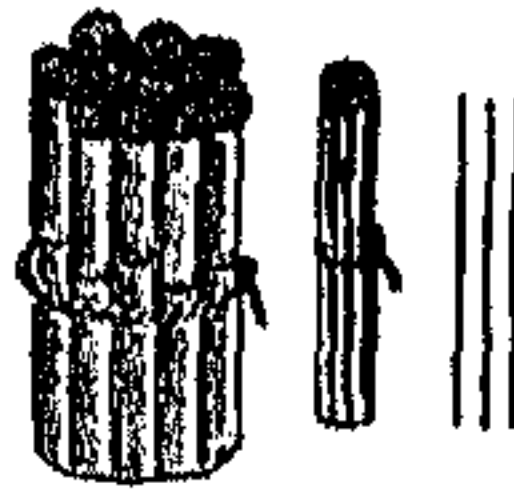


অঙ্কের দ্বারা

৩২

২৭

১১৩ লেখা



১১৩

৫১, ৫২, ৫৩ চিত্র।—কঠোর দ্বারা অক্ষ লেখা ।

তারপর শিক্ষক এইরূপ কাঠের বা পাথর খুন্সির দ্বারা সংখ্যা সাজাইয়া বালকগণকে পড়িতে বলিবেন ও অক্ষের দ্বারা লিখিতে বলিবেন। এই প্রণালীতে শতকের সংখ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার পর বস্ত্র ছাড়িয়া সংখ্যার সাহায্যেই শিক্ষাদান চলিতে পারে।

গ্রাব সাহেবের প্রণালী।—গ্রাব সাহেবের প্রণালী অবলম্বনে সংখ্যা শিক্ষা দিলে, প্রথম হইতেই যোগবিয়োগ ও গুণভাগের কতকটা আভাস দিতে পারা যায়। অনেক শিক্ষক এই প্রণালীকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। তবে সকল প্রণালীর প্রয়োগই শিক্ষকের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। যাহা হউক নিম্নে গ্রাব সাহেবের প্রণালী বিবৃত হইল :—

‘এক’ শিক্ষা দিবার প্রণালী

১। একটা কাঠী হাতে লও, এক হাত তোল, একটা আঙ্গুল দেখাও, একখান স্নেট রাখ ইত্যাদি।

স্নেটের উপর একটা দাগ কাট, একটা বিন্দু আঁক, একটা ঘোমের চিহ্ন দাও ইত্যাদি।
দ্ব্যাক বোর্ডেও ঠিক স্নেটের অনুরূপ চিহ্নাদি কর।

২। তোমার টেবিলের উপর একটা কাঠী রাখ; তুলিয়া লও কয়টা থাকিল?
স্নেটে একটা দাগ কাট সুছিয়া ফেল, কয়টা দাগ থাকিল?

৩। বামকণ্ঠকে স্নানক বোর্ডের নিকট রাইতে বস। একটা দাগ কাটিতে বস।
যা; তারপর '১' লেখা মেগাইয়া দাও ও মেগাইয়া খও (মেগা শিক্ষা দিবার প্রণালী
২৪০ পৃষ্ঠায় দেখ)

‘ছই’ শিক্ষার প্রণালী ।

১। প্রত্যেকেই একটা করিয়া কাঠী খও—ডেস্কের উপরে রাখ, আর একটা খও,
আগের কাঠীর পাশে রাখ। কয়টা কাঠী ?

গোটে একটা দাগ কাট; পাশে আর একটা দাগ কাট, কয়টা দাগ কাটিলে ?

স্নানক বোর্ডে একটা দাগ কাট; আর একটা দাগ কাট—কয়টা দাগ ?

একবার হাততালি দাও, আর একবার হাততালি দাও,—কয়বার হাততালি দিলে ?

২। গণনা—ডেস্কের উপর একটা কাঠী রাখ, একটু দূরে এক সঙ্গে আর ছইটা কাঠী
রাখ। এখন গণ (বাম হইতে ডান দিকে) ‘এক’, ছই’ (ডান হইতে বাম দিকে) ছই, এক।

গোটে এইরূপ দাগ কাট । | |, পড়।

বোর্ডেও এইরূপ দাগ কাট, আর পড়।

যোগ—ডেস্কের উপর পাশাপাশি ছইখান কাঠী রাখিয়া জিজ্ঞাসা কর, কয়খান কাঠী
রাখা হইয়াছে ? একখান কাঠী, আর একখান কাঠীতে কয় খান কাঠী হয় ? উত্তর—‘একখান
কাঠী আর একখান কাঠীতে ছই খান কাঠী হয়।’ ছই খান পুস্তক, গ্রেট পেন্সিল প্রভৃতির
দ্বারা ও এইরূপ অঙ্কন করিবে। গোটে ও স্নানক বোর্ডে পাশাপাশি ছইটা দাগ কাট। এই
একটা দাগ আর এই একটা দাগ, কয়টা দাগ হইল ? বিন্দু ও অখ্যাত চিহ্নের দ্বারাও
এইরূপ পরীক্ষা করিবে।

৪। বিয়োগ—ডেস্কের উপর ছইটা পয়সা রাখ, একটা তুলে খও, কয়টা পয়সা
থাকিল ? উত্তর—একটা পয়সা থাকিল ? ছইটা পয়সা থেকে একটা পয়সা তুলে নিলে, কয়টা
পয়সা থাকে ? উত্তর, ছইটা পয়সা থেকে একটা পয়সা গেলে, একটা পয়সা থাকে। এইরূপ
অখ্যাত প্রযোজ্য দ্বারা। গ্রেটের উপর ছইটা দাগ কাট; একটা মুদ্রিয়া ফেল, কয়টা থাকিল ?
ছইটাই মুদ্রিয়া ফেল; কয়টা থাকিল ? উত্তর ‘একটাও থাকিল না’।

৫। গুণ—একটা পয়সা রাখ, আর একটা পয়সা রাখ। একটা পয়সা কবার রাখিলে ?
‘একটা পয়সা ছবার রাখিলাম’। গ্রেট ও বোর্ডে দাগ কাটিয়া ইত্যাদি রূপে প্রদ্ব করিবে।
১কে ছইবার লইলে, ২ হয়।

৬। ভাগ—উনুকের উপর দুইটা পয়সা রাখ। দুইটা বাসন্তকে ডাকিয়া দুইজনকে দুইটা পয়সা দাও। বাস কয়টা পয়সা পাইয়াছে ? যত কয়টা পয়সা পাইয়াছে ? দুইটা পয়সা যদি দুইজন বাসক ভাগ করিয়া লয়, তবে এক একজনকে কয়টা কয়সা পায় ?

৭। তুফান—গানকে একটা পয়সা দাও, আর যত্নকে দুইটা পয়সা দাও। গানকে কয়টা পয়সা ? যত্ন ? গানের চেয়ে যত্ন কয়টা বেশী ? দুই, একের চেয়ে কত বেশী যত্ন চেয়ে গানের কয়টা কম ? এইকপ দাগ কাটিয়া য়েও ও বোঝে দেখাও।

৮। কাজের হিসাবে যোগ—বাস কবার একটা সন্দেশ খায়। সন্দেশবেলা একটা সন্দেশ খায়, আর সন্দেশবেলা একটা। সে কয়টা সন্দেশ খায় ?

বিয়োগ—গানের দুইটা সন্দেশ ছিল—একটা পুণ্ডোর মধ্যে পড়িয়া গেল—আর কয়টা রহিল ?

গুণ—যত্ন যাহ ধরতে গেল—দুইবারই এক পুঁটীমাত্রই পাইল—সে কয়টা পুঁটী ধরেছিল ?

ভাগ—দুই জন বাসক যদি দুইটা কুল ভাগ করিয়া নেয়, তবে এক এক জনের ভাগে কয়টা কয়সা কুল পড়ে ?

এই প্রকার প্রত্যেক রকমের অঙ্কতঃ ১০টা করিয়া দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করিয়া বাসকগণকে শিক্ষা দান কর।

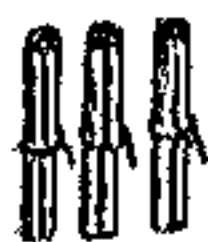
৯। দুই অঙ্কের লেখা শিখাও। প্রথমে এইরূপ ১, দুই খণ্ড করিয়া, তারপর একত্রে ২।

১০। $+$ $-$ $\times$ $\div$ $=$ চিহ্নগুলির অর্থ সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া, বোর্ডে ও স্টেটে এইরূপ অঙ্কাদি কসাও :—

দাগের দ্বারা	অঙ্কের দ্বারা
$ + = $	$১ + ১ = ২$
$ - = $	$২ - ১ = ১$
$ \times = $	$১ \times ২ = ২$
$ \div = $	$২ \div ২ = ১$

বুদ্ধিমান শিক্ষকগণ এই দুই অঙ্কের প্রণালী দৃষ্টেই অস্বাভাবিক অঙ্ক শিক্ষার প্রণালী নির্ধারণ করিয়া লইতে পারিবেন।

কাঠির সাহায্যে যোগ নিয়োগ শিক্ষণ।—টেবিলের উপর



কতগুলি কাঠি ছড়াইয়া রাখ। বালকগণকে
একটি একটি করিয়া গণনা করিতে বল।
দশটি হইলেই একটি করিয়া আঁচি বাঁধিতে
বল। কতগুলি হইল? (মনে কর) ৫ আঁচি,
আর ৩টি;—৫ আঁচিতে ৫০, আর ৩টি, ৫৩।
তারপর পানের চিএ অক্ষরে কাঠি সাজাইয়া
দাও ও যোগ করিতে বল।

আগা কাঠিগুলি ক্রমে ক্রমে গণিয়া আঁচি
বান। এক আঁচি হইল ও ৩ খান আঁচি
থাকিল। এখন এই আঁচির সহিত আর
আঁচিগুলি একত্রিত করিলে, আঁচি আঁচি

৪৪ চিত্র।—কাঠির দ্বারা যোগ।

হইল। আঁচি আঁচি আর তিনটি, ৮৩ হইল।

তার পর বোড়ে ঐরূপ চিএ দ্বারা আঁচি আর কাঠি সাজাইয়া দাও এবং
যোগ করিতে বল। এবার বোড়ে যোগ-শেষ-রেখার নীচে, যোগফল
লিখিতে বল, যথা—



৪৫ চিত্র।—কাঠির দ্বারা যোগফল।

অক্ষ দ্বারাও ৮৩ লিখিতে বল। বিরোধ শিক্ষণও এইরূপে দেওয়া
যাইতে পারে। টেবিলের উপর কাঠি ছড়াইয়া রাখ, কতগুলি কাঠি
আছে গণ—১২টি কাঠি লইলাম, কয়টা থাকিল? নিম্নের চিত্রাঙ্কপ
কাঠি সাজাও।



৫৬ চিত্র ।—কাঠীর দ্বারা অঙ্ক সাজান ।

৩টা কাঠী সরাও—কয়টা কাঠী থাকিল ? ১৩টা কাঠী সরাও, কয়টা কাঠী থাকিল ? ৬টা কাঠী সরাও—কয়টা কাঠী থাকিল ? ৮টা কাঠী সরাও—কয়টা কাঠী থাকিল (এবার একটি দশের আট খুলিতে হইবে) ? বোর্ডে কাঠী ও আটের চিত্র কর । যথা—



৫৭ চিত্র :—কাঠীর চিত্রে নিয়োগ ।

ইহা হইতে ১৩টা কাঠী লইলে কয়টা থাকিবে দেখাও ? ৭কাঠী লইলে কত থাকিবে ইত্যাদি । তারপর বোর্ডে নিম্নলিখিতরূপ চিত্র অঙ্কিত কর, যথা—



৫৮ চিত্র ।—কাঠীর দ্বারা নিয়োগ ।

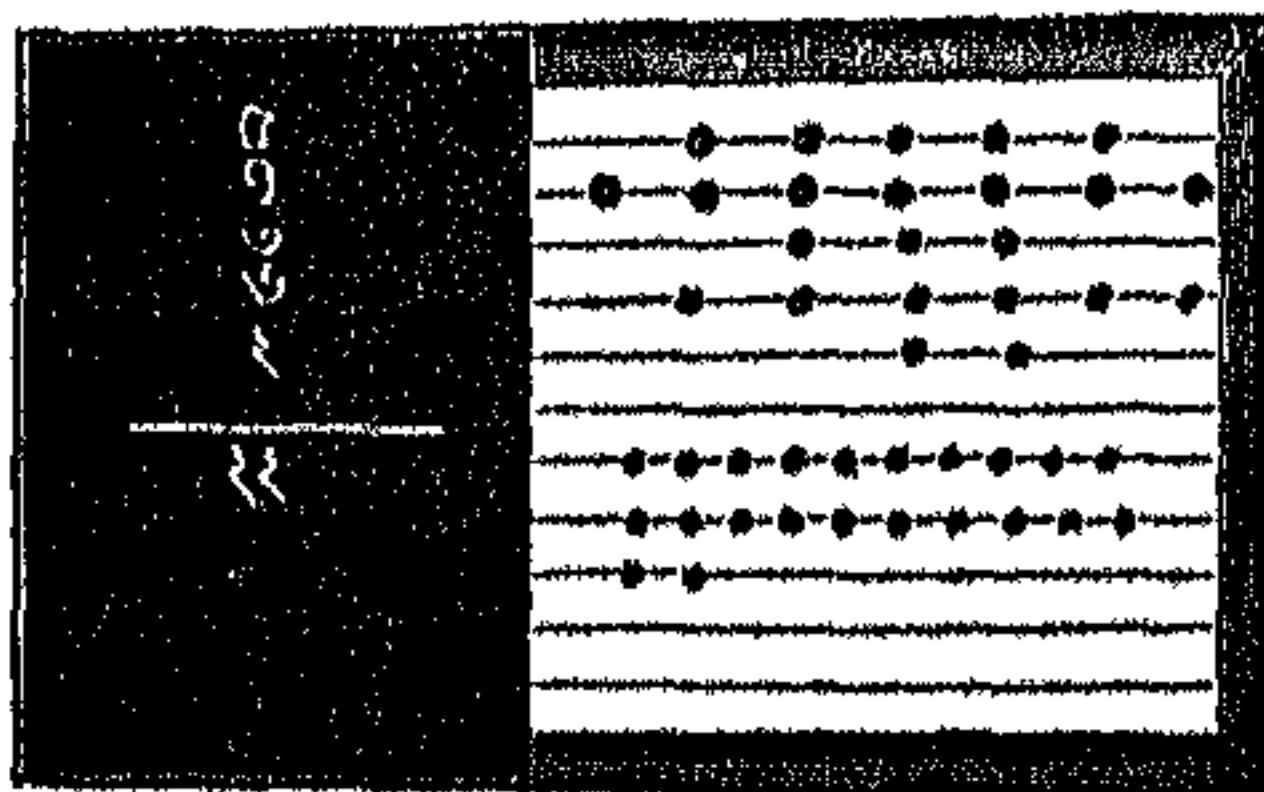
নীচের লাইনে যত কাঠী আছে, উপরের লাইনে হইতে তত কাঠী বাদ দিতে হইবে । উপরের ৪টা আঙ্গা কাঠী ও নীচের ৪টা আঙ্গা কাঠী মুছিয়া ফেল । ৪টা কাঠী বাদ গেল । নীচে ২টা আঙ্গা কাঠী থাকিল । নীচের দুইটা দশের আট ও উপরের দুইটা দশের আট মুছিয়া ফেল । উপরে দুইটা দশের আট থাকিল । যথা—



৫৯ চিত্র ।—বিয়োগ যন্ত্র ।

এখন উপর ছুঁতে আরও ছুঁটা আগুণ কাঠী সরাইতে হইলেই একটা আঁটা খুলিতে হইবে । নীচের, দুইটা ও উপরের দুইটা পুঁছিয়া ফেল । এক আঁটা ও আঁটকাঠী অবশিষ্ট রহিল । এইরূপে নানা প্রকারে কাঠী সাজাইয়া ও চিত্রাঙ্কন করিয়া যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ।

বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্রের সাহায্যে যোগ বিয়োগ শিক্ষা ।—বল ফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্র নিম্নলিখিত রূপে একটি কাঠের আসবাব :—



৬০ চিত্র ।—বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্র ।

এক অংশে তুল্য সাগান ও কাল রং করা । তার উপর চকের দ্বারা অঙ্ক লিখিতে পারা যায় । অপর অংশে তার সাগান—তাহার মধ্যে কতকগুলি কাঠের গুঁটী পরান ।

এই ছুঁটী ঞ্জি সরাইয়া বাম দিকের তত্ত্ব-সাগান-অংশের পশ্চাতে রাখিতে পারা যায়। পশ্চাৎ হইতে সরাইয়া, ইচ্ছামত ছুঁটীগুলিকে সম্মুখে আনিতে পারা যায়। চিত্রে প্রথম লাইনে পাঁচটি, দ্বিতীয় লাইনে সাতটি, তৃতীয় লাইনে তিনটি, চতুর্থ লাইনে চয়টি ও পঞ্চম লাইনে দুইটি ছুঁটীকা সরাইয়া আনা হইয়াছে। কতগুলি ছুঁটী হইল বামদিকে গণিতে বল। অপর অংশে, অঙ্কের দ্বারা সেইরূপ লিখিত হইয়াছে। ডান দিকে ছুঁটীর দ্বারা ও বাম দিকে অঙ্কের দ্বারা যোগ ফল দেখান হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে, এক সঙ্গে জবোর ও অঙ্কের দ্বারা যোগ শিখাইতে পারা যায়। এইরূপেই বিয়োগ শিক্ষা দিতে হইবে।

যোগ, বিয়োগ শিক্ষাদানের সাধারণ রীতি।—কর গণনা করিয়া হিসাব করা ভাল অভ্যাস নহে। যোগের নামতা, অন্ততঃ দশের ঘর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। ৭ আর ৫ এ বার, ৯ আর ৬ এ পুনর—এই রকম মুখে মুখেই বলিয়া ফেলিবে। যোগের নামতা শিখাইলে বিয়োগ শিক্ষারও সুবিধা হয়। ৬ আর ৪ এ দশ—দশ হইতে ৪ গেলে যে ৬ থাকিবে তাহা আর পৃথক করিয়া শিখাইতে হইবে না।

কাঠির সাহায্যে যে যোগ শিক্ষার প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতেই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে। কেবল “হাতে থাকুল ছুই”—এই ‘ছুই’ কি তাহা বলা হয় নাই। ‘ছুই’ অর্থাৎ দুইটি দশের আট বা দুই দশ ; সেইরূপ শতকের ঘরের হইলে দুইটি শতকের আট বা দুইশ ইত্যাদি ও কাঠির সাহায্যে বেশ বুঝান যাইতে পারে।

যে সকল বিয়োগে উপরে বড় রাশি ও নীচে ছোট রাশি থাকে তাহা শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন নয়।

যথা	(১)	৯	(২)	৭৪	৭০	৪	৭	৪
		৬		৩২	৩০	২	৩	২
		৩		৪২	৪০	২	৪	২

কেবল দ্বিতীয় অঙ্কে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যিক যে ৭৪, ৭০ আর ৪ ; এবং ৩২, ৩০ আর ২ ; ৭০ হইতে ৩০, ও ৩৪ হইতে ২ বাদ

দিয়া এঁও অঙ্কের ফল পাওয়া যাইবে। ৭৪ হইতে ৩২ বাদ দিয়া যে ৪ লেখা যায় তাহা ৪০ এর ৪।

মেথানে উপরের স্থানে দুই ও নোটে বড় রাশি থাকে, সেই স্থানে বিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া একটু কঠিন। ৭৫ হইতে ৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে। কাঠীর দ্বারা ৭৫ মাজাও, তাহা হইতে দশকের ৪টী আঁটী সরাত। ৪০ বাদ দেওয়া হইল। এখন আলুনা ৫টী কাঠী হইবে, ৮টী কাঠী দেওয়া যায় না। কাজেই একটা দশের আঁটী খুলিয়া লও। আলুনা ১৫টী কাঠী চাইল। ইহা হইতে ৮টী সরাত। ২টী দশের আঁটী আর ৭টী কাঠী অর্থাৎ ২৭ থাকিল। এইরূপ অঙ্কের দ্বারা শিক্ষা দিবার সময়ও বামের ঘর হইতে একটা দশ সরাইয়া লওয়া হইল, ইহাই মনে রাখিতে হইবে, যথা—

$$\begin{array}{r|l} 74 & 6 \\ 88 & 8 \\ \hline 29 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} 15 \\ 8 \\ 9 \end{array}$$

৭ হইতে এক দশ সরাইয়া যে ৫ এর সহিত যোগ করিতে হইল তাহা বুঝাইয়া দিবে। এইরূপ উপরে ছোট অঙ্ক থাকিলে তাহাতে ১০ যোগ করিয়া নোটের অঙ্ক অপেক্ষা বড় করিয়া দাঁড়িতে হয়। ৫ থাকিলে পনের, ৬ থাকিলে ষোল, ৭ থাকিলে সতর ইত্যাদি, অঙ্কের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যখন বামের অঙ্কের এক দশক সরাইয়া লইলাম, তখন সে অঙ্কেরও এক কমিয়া গেল। সুতরাং ৭কে ৬ মনে করিয়া, তাহা হইতে ৪ বিয়োগ দিয়া, ২ নাগাইলাম। এ প্রণালীতে ২।১ দিন অঙ্ক কমান যাইতে

পারে । এ প্রণালী * বুঝিবার পক্ষে সহজ ও বুঝাইবার পক্ষে সহজ ; কিন্তু সকল সময় কাজের পক্ষে সুবিধাজনক নহে । যথা—

৪০০২
৩৬৪৭

৩৯৩১২
৩৬৪৭
৩ ৪ ৫

এই সমস্ত শূন্যের স্থান পূরণ করিয়া লিখিতে হইলে ৪ হইতে ১০০০ সরাইয়া, তাহা হইতে ১০০ সরাইয়া, তাহা হইতে আবার ১০ সরাইতে হইবে । অনেক হিসাব বাধিয়া গেল । সেইজন্য উপরের অঙ্কে এক বাদ না দিয়া নীচের অঙ্কে এক যোগ করিয়া লওয়াই সুবিধা । ইহাও বালকগণকে এক রকমে বুঝাইতে পারা যায় । সেই পূর্বের অঙ্কে, ৭কে ৬ মনে করিয়া, তাহা হইতে ৪ বাদ দিয়া, ২ রাখিয়াছিলাম । আর ৭কে ৭ই রাখিয়া, ৪কে ৫ মনে করিয়া, ৭ হইতে বাদ দিলেও ২ থাকে । সুতরাং উপর হইতে ১ বাদ দেওয়াতে যে ফল, নীচের অঙ্কে ১ যোগ করাতেও সেই ফল । কাজেই যোগ করিয়া করাই সুবিধা । বালকেরা সহজে না বুঝিলে, বুঝাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিও না—কেবল এই প্রণালীতে অঙ্ক কসাইয়া যাও । আগে কৌশল অভ্যস্ত হইয়া যাউক, শেষে কারণ আপনিই বুঝিবে ।

গুণন ।—নামতাই গুণনের প্রাণ । বালকগণকে উত্তমরূপে নামতা শিখাইতে হইবে । নিম্ন প্রাইমারীতে ১০এর ঘর পর্য্যন্ত, উচ্চ প্রাইমারীতে ১৬এর ঘর পর্য্যন্ত এবং ছাত্রবৃত্তিতে ২০এর ঘর পর্য্যন্ত । নামতা শেখা নিতান্তই দরকার । অনেক পাঠশালায় নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতেই ২০এর ঘর পর্য্যন্ত নামতা শেখান হইয়া থাকে । ডাক পড়িয়া নামতা শেখা উত্তম পদ্ধতি ।

* সে কাজের পাঠশালার গুরু সহায়েরা, উপরের লাইনের দশকটির অঙ্ক হইতে, এক দশক সরানকে 'উপর টাঁটা' ও নীচের লাইনে ১ যোগ করাকে 'নীচে অঁটা' নিয়ম বলিতেন ।

এক অঙ্কের দ্বারা, এক অঙ্কের গুণন শিখান সহজ । এক অঙ্ক দ্বারা
একাদিক অঙ্কের গুণন শিখানও সহজ, তবে একটু বুঝাইয়া দিতে হয় ।
যথা—

$$\begin{array}{r} ৩৭ \\ ৫ \\ \hline ১৮৫ \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} ৩০ & ৭ \\ ৫ & ৫ \\ \hline ১৫০ + ৩৫ \end{array}$$

উপরের অঙ্কের স্থানীয় মান লিখিয়া ৫ এর দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে
গুণ করিয়া গুণফল যোগ করতঃ বুঝাইয়া দিবে । দশের দ্বারা অনেকগুলি
অঙ্কে গুণ করিয়া দেখাইয়া দিবে যে সেই সেই অঙ্কের গীঠে একটা শূন্য
দিলেই, দশের দ্বারা গুণের কাজ শেষ হয় । তারপর ২০ ও ৩০ এর দ্বারা
কতকগুলি সংখ্যাকে গুণ করিয়া শিখাইতে হইবে । যথা

$$\begin{array}{r} ৪৬৭ \\ ২০ \\ \hline ৯৩৪০ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৪৬৭ \\ ১০ \\ \hline ৪৬৭০ \\ ২ \\ \hline ৯৩৪০ \end{array}$$

এখানে ২০কে তাহার উৎপাদক সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া গুণ করা
হইল । সুতরাং ২০, ৩০ প্রভৃতি দ্বারা গুণ করিতে হইলে ২, ৩ ইত্যাদি
দ্বারা গুণ করিয়া—ডান দিকে একটা শূন্য বসাইয়া দিলেই হইল । ইহার
পর ছুই সংখ্যা দ্বারা গুণ শিখাইতে হইবে ।

$$\begin{array}{r} ৩২৭ \\ ৪৬ \\ \hline ১৪৬২ \\ ১৩১৮০ \\ \hline ১৫০৪২ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩২৭ \\ ৪৬ \\ \hline ১৪৬২ \\ ১৩১৮ \\ \hline ১৫০৪২ \end{array}$$

৬ এর দ্বারা গুণ করিয়া পরে ৪০ এর দ্বারা গুণ করা হইল । দশকের
সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবার সময় যে আমরা কেন ডাহিনের এক ঘর
সরাইয়া অঙ্ক লিখিতে আরম্ভ করি তাহা এইরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে ।
এখানে ৪ এর দ্বারা গুণ করার অর্থ—৪০এর দ্বারা গুণ । সুতরাং এককের

ঘরে যে শূন্য পড়িবে তাহা না লিখিলেও চলিবে, কারণ কোন সংখ্যাকে শূন্যের সহিত যোগ করিলে বা না করিলে ফলের কোন পরিবর্তন হয় না । আর এক কথা, যে রানি দ্বারা গুণ করা যায় তাহাকে ‘গুণক’, আর যে রানিকে গুণ করা যায় তাহাকে ‘গুণ্য’ কহে—ইহা বালকদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে ।

ভাগ ১—গুণ যেমন যোগের সহজ উপায়, ভাগ তেমন বিয়োগের সহজ উপায়, তাহাই প্রথমে বুঝাইয়া দিতে হইবে ।

উদাহরণ—৮এর মধ্যে ২ কত বার আছে ?

$$\begin{array}{r} ৮ \\ ২ \\ \hline ৬ \\ ২ \\ \hline ৪ \\ ২ \\ \hline ২ \\ ২ \\ \hline ০ \end{array}$$

৮ এর মধ্যে ২ চারি বার আছে ।
এইরূপ আরও কয়টা সহজ সহজ অঙ্ক
কসাইতে হইবে ।

বিয়োগের ফল সহজে বাহির করার নাম ভাগ—ইহাই দেখাইয়া দিবে ও বুঝাইয়া দিবে । ভাগ অঙ্ক সহজে লিখিবার ধারা—

$$\begin{array}{r} ২)৮(৪ \\ ৮ \\ \hline \end{array}$$

প্রথমে অবশ্য এক অঙ্কের দ্বারা ভাগ শিখাইবে । আবার যে সকল অঙ্কে অবশিষ্ট থাকে সে গুলি দিবে না । তারপর দুই অঙ্কের কথা—

$$\begin{array}{r} ৩) ৬৯ (২৩ \\ ৬ \\ \hline ৯ \\ ৯ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩) ৬০ (২০ \\ ৬০ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৩) ৯ (৩ \\ ৯ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ২০ \\ ৬ \\ \hline ২৬ \end{array}$$

এই বারে ৬৯কে, ৬০ আর ৯এ (স্থানীয় মান) বিভক্ত করিয়া, ৩ এর দ্বারা পৃথক পৃথক ভাগ দিয়া দেখাইবে । তারপর অবশিষ্টের

কথা। এবারও প্রথমে বিয়োগের পোকার বাখান আরম্ভ করিবে।

যথা ৯ এর মধ্যে ২ কতবার আছে?

৯	৯ এর মধ্যে ২ চারি বার আছে, কিন্তু তবুও এক থাকিয়া যায়। ৯টা
২	পয়সা ৪ জন বালককে ভাগ করিয়া দাও। একটা পয়সা থাকিয়া যায়।
১	এর নাম অবশিষ্ট। এখন ৯কে ২ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট লিখিবার
২	রীতি দেখাও
৪	
২	
৩	
২	
১	

$$\begin{array}{r} ২) ৯ (৪ \\ \underline{৮} \\ ১ \end{array}$$

এইরূপ কতকগুলি অঙ্ক কমান্বিত, পরে দুই অঙ্কের যে সকল ভাগে অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অঙ্ক আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহারও প্রথমে দশকে যেন অবশিষ্ট না থাকে। প্রথম এককে অবশিষ্ট, পরে দশকাদিতে ; যথা—

(১)	৩) ৬৮ (২২	(২)	৩) ৭৯ (২৬
	৬		৬
	৮		১৯
	৬		১৮
	২		১

দ্বিতীয় অঙ্কে দশকের ৭, ৩ দ্বারা ভাগে মিলিল না। ১০ অবশিষ্ট থাকিলে, তাহার সহিত ৯ যোগে ১৯ হইল। এরূপ বুঝাইতে গেলে বালকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে ১০ অবশিষ্ট রাখিবার কারণ কি, ১০ কেত ৩ দ্বারা বেশ ভাগ করা যায়। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, আমরা ৭কে ভাগ করি নাই, ৭০কে ভাগ করিয়াছি। ৩ দ্বারা ভাগ করিলে এক এক ভাগে ২০ করিয়া পড়ে। অবশিষ্ট ১০কে, আর দশ দশ করিয়া ভাগ করা যায় না। কাজেই সেই দশের সঙ্গে ৯ যোগ করিয়া যে ১৯ হইল, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া, প্রত্যেক ভাগে ৬ অঙ্ক হইল ১ অবশিষ্ট রহিল। যদি শিক্ষক ৭ খান দশ টাকার নোট ও ৯টা

টাকা আনিয়া বালকগণকে ভাগ করিতে বসেন, তবে তাঁহারা এ অঙ্ক বেশ বুঝিবে । অর্থাৎ পক্ষে দশের আটের দ্বারাও বেশ বুঝান যাইবে । ৩ ভাগ করিতে গেলেই, এক এক ভাগে প্রথমে দুইটি করিয়া দশের আট পড়িবে । আর যে আট থাকিবে, তাহা না গুলিয়া ভাগ করা যাইবে না ।

এক কথা বালকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা সবাকে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি । দশটি হাতীকে ৫ দিয়া ভাগ করা যায়, কিন্তু ১০টা হাতীকে ৫টা হাতী দিয়া ভাগ করা যায় না । ভাঙ্গা ও ভাঙ্গক কাহাকে বলে তাহাও বলিয়া দিবে ।

মিশ্র নিয়ম ।—টাকা আনা প্রভৃতির অঙ্কগুলি শিখাঠিতে হইলে প্রথমে বালকগণকে যুজ্জাগুলি দেখান দরকার । আর তাহার ব্যবহার শিখানও দরকার । ধারাপাতের অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । যাহা হউক ইংরাজী মিশ্রনিয়ম শিক্ষা করা অপেক্ষা, আমাদের দেশী নিয়ম শিক্ষা করা সহজ । আমাদিগের ধারাপাতের অঙ্কগুলি বেশ বুদ্ধি বিবেচনা ও কোশলে গঠিত । কিন্তু সকল ধারা অপেক্ষা, ফরাসীস মেট্রিক ধারাই সর্বোৎকৃষ্ট । অনেক সভ্যদেশে এই মেট্রিক ধারা প্রচলিত হইয়াছে । কেবল ইংরাজ জাতি কুসংস্কারবশতঃ তাঁহাদিগের পুরাতন ধারা ধরিয়া আছেন বলিয়া, আমাদের দেশেও ইংরাজী ও আমাদের পুরাতন ধারা চলিতেছে । কিন্তু বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে যেরূপ মেট্রিক ধারা গৃহীত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ জাতি যে আর অধিক কাল তাঁহাদিগের সেই পুরাতন জটিল ধারা ধরিয়া থাকিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না ।

টাকাপয়সা বিয়য়ক মিশ্র নিয়মই প্রথম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে ১ টাকায় কয় শিকি, কয় আনা, কয় পয়সা ইত্যাদি ভাগ করিয়া দেখান আবশ্যক । তারপর ২ টাকায় কত শিকি হয়, কত আনা হয়, কত পয়সা হয় ইত্যাদি ।

এই সমস্ত অঙ্ক, গালকেরা গুণ করিয়া কসিতে শিখিবে । আর ঐরূপ, এত পয়সায় কত আনা, শিকি, টাকা ; এত আনায় কত শিকি ও টাকা ; এত শিকিতে কত টাকা ইত্যাদি ভাগ করিয়া কসিতে শিখিবে । এইরূপে মন, মের, বিঘা, কাঠা বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে ।

যোগের প্রথমে কেবল টাকা আনা দিয়া আরম্ভ করিবে, তারপর গড়া ও কড়া । দুই চারিটা অঙ্ক পাঠ দিয়াও কমাষ্টবে, কারণ এখন কড়া উঠিয়া গিয়াছে । কতগুলি আনা একত্র করিয়া কত শিকি (চোক) হইল আর কতগুলি শিকি একত্র হইলে কত টাকা হইল, ইহা বুঝিতে পারিলেই যোগশিক্ষা হইল । বিয়োগে একটু কষ্ট আছে, যথা নিম্নলিখিত অঙ্ক :—

$$\begin{array}{r} ১১/০ \\ ২৫/০ \\ \hline ২৫/০ \end{array}$$

এখানে এক আনা আর দুই আনা হইলেই তিন আনা গিলে, তাহা সহজেই বুঝা গেল । কিন্তু দুই শিকি থেকে কেমন করে তিন শিকি বাদ দেওয়া যায় ? সেই যেমন অমিশ্র বিয়োগের সময় এক দশ সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ ৫ হইতে ১ টাকা বা চারি শিকি সরাইতে হইয়াছে । তাহা হইলে উপরে ৬ শিকি হইল, তাহা হইতে এখন তিন শিকি বাদে, তিন শিকি নাগিল । এর স্থানে ৪ থাকিল, তাহা হইতে ২ বিয়োগ করিলে ২ নাগিল । এ হইল “উপর চাঁটা” নিয়ম । কিন্তু এ সকল অঙ্ক “নীচে জাঁটার” নিয়মে কমাষ্ট সুবিধা । এই ‘নীচে জাঁটার’ নিয়ম অমিশ্র বিয়োগে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এখানেও তাহাই প্রযুক্ত্য । তারপর গুণের কথা । ৫৮/৬ কে ৫ দিয়া গুণ করিবার পূর্বে, ৫৮/৬কে ৫ বার লিখিয়া যোগ করিয়া দেখান কর্তব্য । দুই অঙ্ক দ্বারা গুণ করিতে হইলে, সেই

অঙ্কটাকে ভাগভাগ করিয়া নিম্নে অনেক সময় হিসাবের সুবিধা হয়। মনে কর $৫৮/৬$ গুণকে ৪২ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এখন $৫৮/৬$ কে প্রথমে ৬ দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণফলকে ৭ দিয়া গুণ করিলেই ৪২ দ্বারা গুণ করার ফল হয়। যদি ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হয়, তবে প্রথমে ৫ দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণফলকে ৯ দিয়া গুণ করিলে ৪৫ দ্বারা গুণ করার কাজ হইল। তারপর $৫৮/৬$ কে ২ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফল, ৪৫ দ্বারা গুণ করিয়া যে ফল হইয়াছে তাহান মত্রে মোগ কর। ৪৭ দ্বারা গুণের কাজ হইল। যথা :—

$$\begin{array}{r} ৫৮/৬ \\ ৫ \\ \hline ২৯৮/১০ \\ ৯ \\ \hline ২৬৮৮/১০ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৫৮/৬ \\ ২ \\ \hline ১১৬/১২ \\ ২৬৮৮/১০ \\ ১১৬/১২ \\ \hline ২৭৬/১২ \end{array}$$

একেবারে ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হইলে, ৬ কে ৪৭ দিয়া গুণ করিয়া বহু গুণ হইল, তাহাকে ২০ দিয়া ভাগ করিয়া আনা বাহির করিতে হইবে ইত্যাদিরূপ প্রণালী সময় সময় কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। আর ৫ , ৯ , ২ দিয়া বেশ মুখে মুখে গুণ করা যায়। যাহা হউক, ছই রকম প্রণালীই শিক্ষা করিতে হইবে। মিশ্র পুরণের আর একটা রীতি প্রচলিত আছে। $৫৮/৬$ কে ১০ দিয়া গুণ করিলে এবং উহার ডানদিকে $৫৮/৬$ কে ৭ দিয়া, এবং ১০ দ্বারা পুরণের ফলকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া, মোগ করিলেই ফল নির্ণীত হয়। যথা :—

$$\begin{array}{r} ৫৮/৬ \times ৭ = ৪০৮/১২ \\ ১০ \\ \hline ৪০৮/১২ \times ৪ = ২৬৮৮/১২ \\ ২৭৬/১২ \end{array}$$

৭এর গুণফল

৪০এর গুণফল

৪৭এর গুণফল

ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাহি।

জমা খরচ ।—পঞ্চম কিস্তিতে সংসারের বাসার খরচ লিখিত হয়, তাহাও লিখাওতে হইবে । বাণককে একটা টাকা বা এক টাকার পয়সা দাও । পয়সা দাও বা পয়সার পরিবর্তে ডেড়ুনের বোজ দিয়া বল, মে জমিও মেম পয়সা । তুমি নিজে দোকানো মাজ । বাণকের নিকট (মনে কর) ৮৫ পয়সার মাছ, ৮১০ পয়সার চাউন, ৮১০ পয়সার পান, ৮০ ডানার লক্ষা, ৮৫ পয়সার আলু ও তাদি বিক্রয় করিলে । এখন বাণককে হিসাব লিখিয়া দিতে বল । কেমন কয়িয়া লিখিয়া দিবে বলিয়া দিও না ।—বাণক কি করে তাহাও দেখ । বাণক অবশ্য তাব মত একটা লিখিয়া আনিবে । সেত সময় তুমি বোর্ডে বা বাণকের স্মৃতিতে হিসাব লিখিবার একটা সহজ ধারা দেখাইয়া দিবে । এইরূপে ধীরে ধীরে কঠিন বিষয় লিখাওতে হইবে । জমিদারী ও মহাজনী কাগজ পত্রের মধ্যে অনেকগুলি এমন কঠিন আছে যে তাহা বাণকগণকে সহজে বুঝাইতে পারা যায় না । এ সকল নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য না করিলে বুঝিতে পারা যায় না । তবে সহজ সহজ কাগজগুলি বুঝাইয়া দিতে পারা যায় । বাসার খরচ লেখা, মোপার হিসাব লেখা, জমির খানের হিসাব লেখা ও মজুর খাটাইবার হিসাব লেখা প্রত্যেক বাণক বাণিকারই জানা উচিত ।

জমিদারী কাগজের মধ্যে দাখিলা, চিঠা, জমাবন্দি ও মহাজনী কাগজের মধ্যে জমাখরচ (রোকড়) ও খতিয়ান শিক্ষা দিবেই চলে ।

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. ।—গুণনীয়ক ও গুণিতক কথা দুইটী উল্লম্বরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে । ১৬ কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে কিছুই থাকে না ; ৪, ১৬ এর গুণনীয়ক আর ১৬, ৪ এর গুণিতক । তার পর “সাধারণ” কথার তাৎপর্য্য কি তাহা বলা আবশ্যক । ১৮ আর ১২ এই দুই রাশির সাধারণ গুণনীয়ক ২ ; ২ দ্বারা উক্ত দুই রাশিকেই ভাগ করা যায় । ৩ ও ৫ ইহাদের সাধারণ গুণনীয়ক । কারণ ৩ দ্বারাও দুইটী রাশিকে ভাগ করা যায় । সেইরূপ ৬ ও ৩ একটা সাধারণ গুণনীয়ক । আর

কোন সাধারণ রাশি দ্বারা ১৮ ও ১২ উভয় অঙ্কেই ভাগ করিয়া মিলান যায় না। ৯ দিয়া ১৮ কে, ভাগ করা যায় বটে, কিন্তু ১২ কে ভাগ করা যায় না। সুতরাং ৯ সাধারণ গুণনীয়ক হইল না। এখন ২, ৩, ৬ কেবল এই তিনটা রাশিই সাধারণ গুণনীয়ক হইল। ইহাদের মধ্যে ৬ই সকলের অপেক্ষা বড়। ভাল কথায় ‘বড়’কে ‘গরিষ্ঠ’ বলে। অতএব ৬, ১২ ও ১৮ এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। আবার ৩ ও ৪ এই দুই রাশির দ্বারা ২৪কে ভাগ করিলে মিলিয়া যায়। অতএব ২৪, ৩ ও ৪ এই দুই রাশির সাধারণ গুণিতক। এইরূপ, এই দুই রাশি দ্বারা ৩৬ কে ভাগ করিলে মিলিয়া যায়। ১২কে ভাগ করিলেও মিলিয়া যায়। সুতরাং ১২, ২৪, ৩৬ সকল রাশিই ৩ ও ৪ এর সাধারণ গুণিতক। ১৮ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৪ দ্বারা ভাগ করিলে মিলে না। অতএব ১৮ সাধারণ গুণিতক হইল না। তাহা হইলে ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ প্রভৃতিই সাধারণ গুণিতক। এখন ইহার মধ্যে ১২ সকলের ছোট। ১২ এর ছোট এমন আর কোন রাশিই নাই যাকে ৩ ও ৪ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ শেষ থাকিবে না; ৯কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলে না। আর ৮কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে না। সুতরাং ১২ই সকলের ছোট সাধারণ গুণিতক। ছোটকে ভাল কথায় ‘লঘিষ্ঠ’ বলে। ১২, ৩ ও ৪ এর ‘লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক’।

এই সময়ে বালকগণকে কতকগুলি সাধারণ ভাগের নিয়ম শিখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। যথা যুগ্ম রাশিকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, যে রাশির শেষে ৫ বা ০ থাকে তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, রাশির অঙ্কগুলির যোগ ফলকে যদি ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় তবে সে রাশিকেও ৩ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যাইবে ইত্যাদি।

গ. মা. ও. ও. গ. মা. ও. অক্ষ কসিবার যে কোশল পাটীগণিতে লিখিত আছে, তাহা ছাড়া আর কোন সুবিধাজনক কোশলই নাই। তবে সেই কোশলে অক্ষ কসিলে কেন যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার যুক্তি বালকেরা এমনভাবে বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং সে চেষ্টা করা যুথ। কেবল অক্ষ কসিবার কোশল মিথাইয়াই আশু হইতে হইবে।

ভগ্নাংশ।—কোন ইনস্পেক্টর একটা নূতন স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া শিক্ষককে ভগ্নাংশ শিক্ষাদিতে আদেশ করেন। শিক্ষক ২ খান সমান কাঠী আনিয়া, এক খানিকে অসমান ও অংশ বিভক্ত করতঃ, তাহার এক খণ্ড হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন “এই একখান আশু কাঠী; আর এই এক এক খণ্ড উহার ভগ্ন অংশ বা ভগ্নাংশ।” তারপর তিনি বোর্ডে এইরূপ লিখিলেন “একটা পূর্ণ জব্যের যে কোন অংশকে ভগ্নাংশ কহে।” ইনস্পেক্টর পরিদর্শন পুস্তকে লিখিয়া গেলেন “অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত না করিলে সাহায্য দেওয়া যাইবে না।” অনেক শিক্ষকেরই এরূপ ভুল বিশ্বাস আছে। ভগ্নাংশ, ভগ্ন অংশ বটে, কিন্তু সমান সমান ভগ্ন অংশ, অসমান নহে। ৩ খান সমান কাঠী লও। প্রত্যেক খানি যেন ২ ফুট করিয়া লম্বা। এক খানি আশু রাখ, এক খানিকে সমান তিন ভাগে (৮ ইঞ্চি করিয়া) ভাগ কর, আর এক খানিকে অসমান ৩ অংশে ভাগ কর। যথা—

(১) 

(২) 

(৩) 

প্রথম খানি সমস্ত কাঠী; দ্বিতীয় চিত্রে সমস্ত কাঠীর “ভগ্নাংশ”; ৩য় চিত্রে সমস্ত কাঠীর “খণ্ডাংশ” সূচিত হইয়াছে।

ভগ্নাংশ শিক্ষা দানের পক্ষে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ যথাপ্রদ—

একটা আলুকে (গোমাকার হইলেই ভাল) সমান ২ ভাগে কাট ।

এখন এহ প্রণালীতে বুঝাইতে আরম্ভ কর :—

১। আমার বাম হাতে আলুর অর্ধেক, ডান হাতে আলুর অপর অর্ধেক ।

২। এখন দুই হাতের দুই অর্ধেক একত্র করিলাম, কি হইল ? উঃ আস্ত একটা আলু হইল ।

৩। এই আস্ত আলু হইতে অর্ধেক সরাইলাম, হাতে কি থাকিল ? উঃ অর্ধেক থাকিল ।

৪। তাহা হইলে একটা জিনিষের অর্ধ বাদ দিলে (অর্ধ খণ্ড সরাইলে) কত থাকে ? উঃ অর্ধেক থাকে ।

৫। আবার দুই অর্ধেক একত্র করিয়া যোগ করিলে কত হয় ?—এক হয় ।

আবার প্রত্যেক অর্ধ অংশকে দুই ভাগ কর । সম্পূর্ণ আলুই চার অংশে বিভক্ত হইল । বালকদিগকে এখন দেখাও

১। এখন আলুর কয় ভাগ হইল ? উঃ—এখন আলুর চার সমান ভাগ হইয়াছে ।

২। এখন চার ভাগ এক সঙ্গে করিলাম, কি হইল ? এখন আবার একটা আলু হইল ।

৩। এখন এই আলু থেকে চার ভাগের ১ ভাগ সরাইলে, কি থাকিল ? চার ভাগের তিন ভাগ থাকিল ।

৪। এখন চার ভাগের দুই ভাগ সরাইলে, কত থাকিল ? চারভাগের ২ ভাগ থাকিল ।

৫। অর্ধেক সরাইলে যে রূপ হইয়াছিল, এখনও তাহাই হইল কিনা ? তবে অর্ধেক যা, চার ভাগের ২ ভাগও তাই ।

৬। এচ চার ভাগের তিন ভাগ সরাইলে কত থাকিল ?

৭। এইবার, এই ১ ভাগের সঙ্গে, আর এক ভাগ যোগ করিলাম কত হইল ? এবারে ৪ ভাগের দুই ভাগ বা অর্ধেক হইল ।

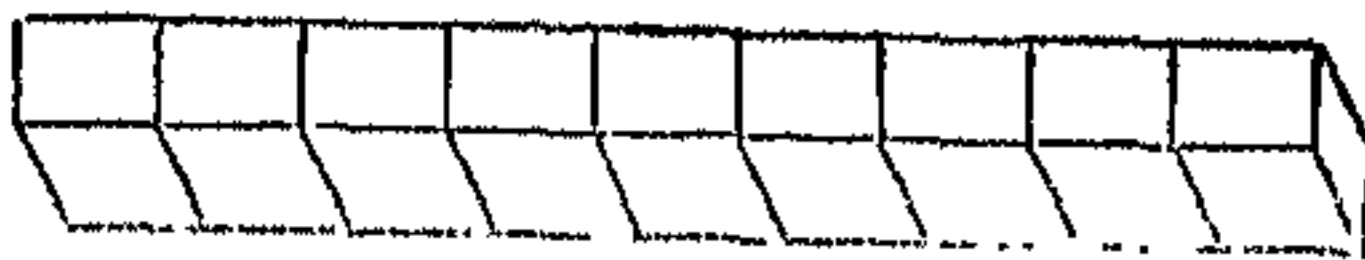
৮। এই বারে, চার ভাগের দুই ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগ যোগ দিলে কত হইল ? চার ভাগের তিন ভাগ ।

৯। এইবারে চার ভাগের তিন ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগ যোগ দিলাম ইত্যাদি ।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ মুখে মুখে শিখাইতে পারা যায় । এইরূপ শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি অঙ্ক লেখা শিক্ষা দিতে হইবে ও যখন প্রশ্ন করিবে যে 'আলুর চার ভাগের তিন ভাগ ও চার ভাগের এক ভাগ যোগ করিলাম, কত হইল ?'—তখন বোর্ডেও লিখিতে হইবে

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = ?$$

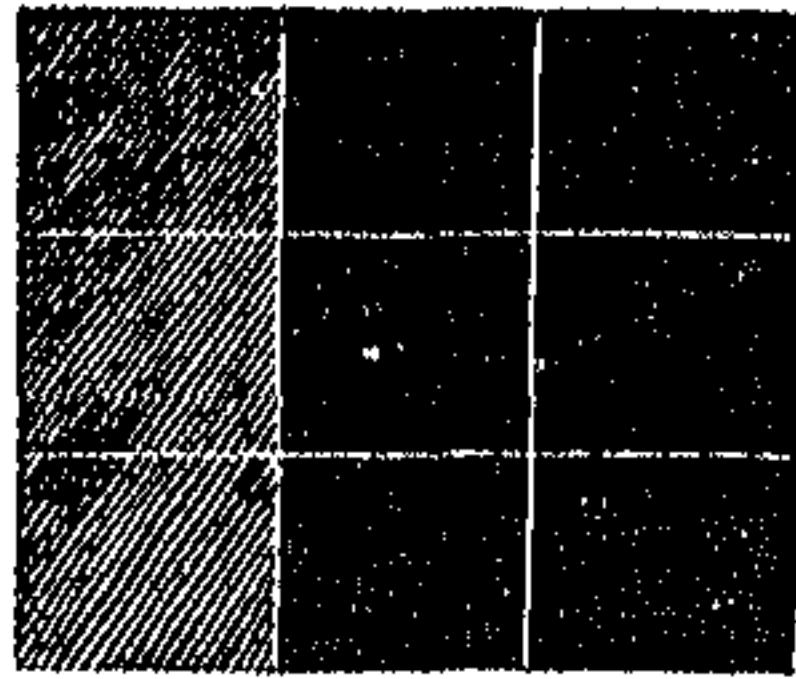
বালকেরা উত্তরের স্থান পূর্ণ করিবে । কাঠী বা কাগজের টুকরা ভাগ করিয়াও এইরূপ শিক্ষা দেওয়া চলে । এই প্রণালীতে অন্ততঃ ৫ এর ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । স্কুলে যদি কিণ্ডারগার্টেন বাক্স থাকে তবে নিম্ন লিখিত রূপে ছক সাজাইয়া ভগ্নাংশ শিক্ষা দেওয়া যায় ।



৬১ চিত্র ।—ছকের সাহায্যে ভগ্নাংশ ।

এইরূপে ৯টা ছক সাজান হইল । এই সমস্তটাকে একটা অর্থাৎ একখান বেঞ্চ মনে করা হইল । এই বেঞ্চকে ৯ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । এখন ইহা হইতে ১টা বা ২টা করিয়া ছক তুলিয়া লও বা যোগ কর আর বালকগণকে প্রশ্ন কর । সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের উপর লিখিয়াও দেখাও । 'কিণ্ডারগার্টেন বাক্স না থাকিলে, এই রূপ কতকগুলি মাটির ছক করিয়া লইলেও চলে ।

লব ও হর কথা দুইটির অর্থ বুঝাইবে ও কোনটিকে লব বলে
আব কোনটিকে হর বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিবে। বোর্ডে নিম্নে
চিত্রানুরূপ চিত্র করিয়া বুঝাইবে :—



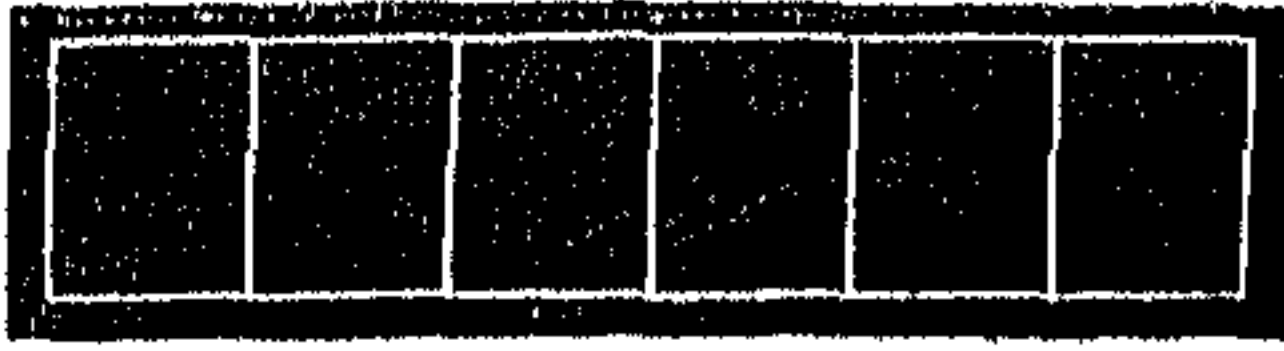
৬২ চিত্র।—চিত্রের সাহায্যে লব হর শিক্ষা।

এই ক্ষেত্রটিকে ৯ সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক
অংশ $\frac{1}{9}$ । সাদা অংশ $\frac{2}{9}$ । কাল অংশ $\frac{1}{9}$ । এইরূপ বোর্ডের উপর
অন্যান্য অংশ চকের দ্বারা রঙ করিয়া বালকগণকে $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}$ প্রভৃতি
বুঝাইতে ও শিখাইতে হইবে।

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ শিক্ষা দিতে হইলে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন
করা যাইতে পারে : ৬১ চিত্রের মত ৯টি ছক সাজাও। মনে কব
১ খানা আন্তর বেঞ্চকে ৯ সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত
জিনিষটা $\frac{1}{9}$ অর্থাৎ ৯ ভাগের ১। এখন আরও দুইটি সমান ছক
আনিয়া এই কল্পিত বেঞ্চের উপর রাখ। এখন $\frac{2}{9}$ এইরূপ ভগ্নাংশ
দাঁড়াইল অর্থাৎ সম্পূর্ণ একখান বেঞ্চ, আর $\frac{1}{9}$ ভাগ বেঞ্চ, ইহাই
লিখিবার সময় $\frac{2}{9}$ বা $\frac{1}{9}$ লেখা হইয়া থাকে। প্রকৃত ও অপ্রকৃত
ভগ্নাংশ কাহাকে বলে, এখন শিখাইয়া দাও। তারপর ভগ্নাংশের সামান্য
সামান্য বিষয় নিম্নের অনুরূপ চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

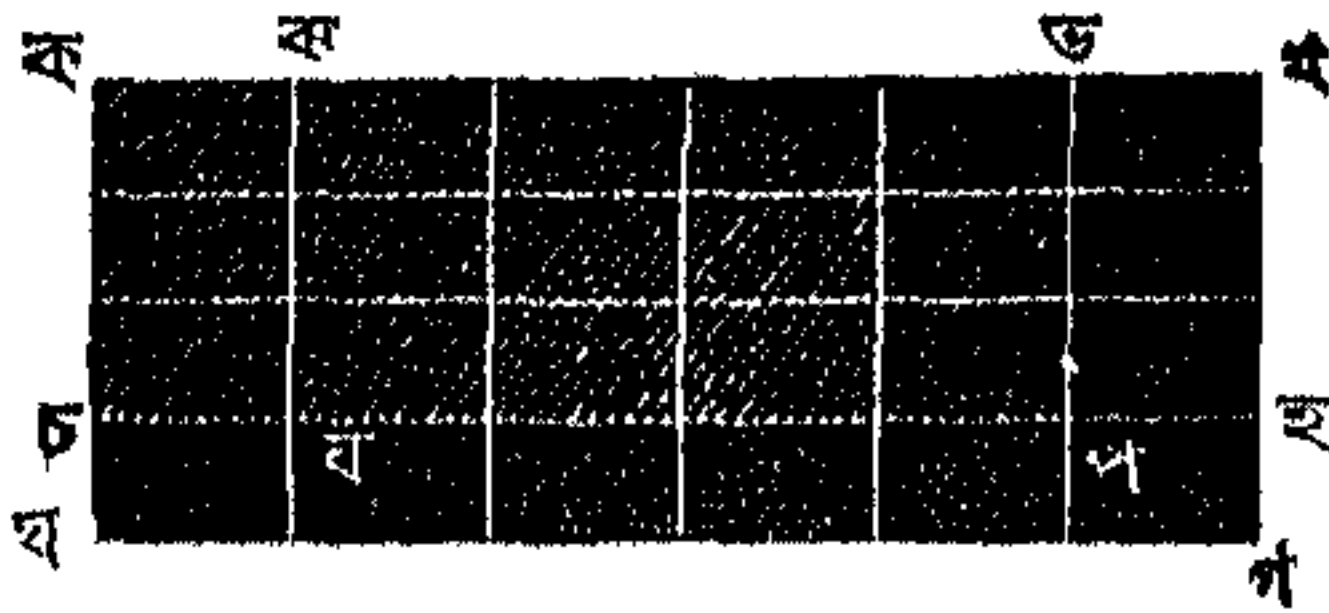
৬×২ কত ?

নিম্নের চিত্রে একটা আঁশু ত্রিভুজকে (মনে কর একখণ্ড কাগজকে) ৬ সমান ভাগ করা হইয়াছে । এক একটি অংশ ক্ষেত্রের ৬, আর দুইটি অংশ ক্ষেত্রের ৬ । এইরূপ দুই অংশকে আবার ২ বার নিতে হইবে । তাহা হইলে ২টা ২টা করিয়া ৪টা অংশ হইল । সুতরাং ৪টা ঘর, সমস্ত ক্ষেত্রের ৬ । আবার ক্ষেত্রকে ৩ ভাগ করিলে, এই ৩ ভাগের ২ ভাগে, পূর্বে ৬ ভাগের ৪ ভাগ থাকে । কাজেই ৬ ক্ষেত্রের যে অংশ, ৬ ও তাই । $\therefore \frac{৬}{৬} = ৬$ ।



৬৩ চিত্র ।—ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ ।

২ এর $\frac{৬}{৬} =$ কত ? সমান দুইটি ক্ষেত্রকে ৬ ভাগ করিয়া বুঝান যাইতে পারে ।



৬৪ চিত্র ।—ক্ষেত্রের সাহায্যে ভগ্নাংশের গুণ ।

৩ এর $\frac{৬}{৬} =$ কত ?

কথগধ যেন আর একখণ্ড কাগজ । এবারে লম্বালম্বী ৬ ভাগে ৩ আড়াআড়ি ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (৪ ও ৬ আমাদের অঙ্কের হর বলিয়া ৪ আর ৬ ভাগে ভাগ করা হইল) । এখন দেখ কচহখ সমস্ত ক্ষেত্রের ৪ ভাগের ৩ । আবার কচবখ, কচহখ এর ৬ অর্থাৎ $\frac{৬}{৬}$ ক্ষেত্রের

৬; এইরূপে কচপভ ক্ষেত্রাংশ (সাদা দাগ চিহ্নিত অংশ) ৬ ক্ষেত্রের ৬, এই অংশই আমাদের অঙ্কের উত্তর। সমস্ত ক্ষেত্র ২৪ অংশে বিভক্ত হইয়াছে; কচপভ অংশে ১৫ ভাগ আছে। তাহা হইলে কচপভ অংশ ২৪ ভাগের ১৫ ভাগ। সুতরাং

$$\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{৫}{৬} = \frac{১৫}{২৪} = \frac{৫}{৮}$$

ভগ্নাংশের বড় বড় অঙ্ক কসিবার প্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ প্রদর্শিত যে প্রণালী, তাহাই উত্তম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বড় অঙ্ক হইলে একেবারে ধারাবাহিক রূপে সমস্ত অংশ এক সঙ্গে না কসিয়া, অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কসিয়া তাহাদের ফল একত্র করিলেই চলিতে পারে। এই প্রণালীতে একটী অঙ্ক পরিশিষ্টে (খাতার নমুনায়) কসিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দশমিক ভগ্নাংশ।—এও ভগ্নাংশ, তবে এই পার্থক্য যে দশমিক ভগ্নাংশে দ্রব্য গুলিকে ১০ সমান ভাগে (বা দশের কোন শক্তির) ভাগ করা হয়। ঐ সাধারণ ভগ্নাংশ, দশমিক নহে। ঐ সাধারণ ভগ্নাংশও বটে, দশমিক ভগ্নাংশও বটে। নিম্ন লিখিতরূপ ছ চারটী অঙ্কের দ্বারা অথবা সংখ্যা ও দশমিক, ভগ্নাংশের ভাব বুঝাইতে পারা যায় :—

$$৬৬৬৬.৬৬৬৬ = ৬০০০ + ৬০০ + ৬০ + ৬ + .৬ + .০৬ + .০০৬ + .০০০৬।$$

দশমিকের যোগ, বিয়োগ ও গুণ শিক্ষা দেওয়া সহজ। ভাগ শিক্ষা দেওয়াও যে কঠিন তাহা নহে, তবে বাগকেরা অনেক সময় ভাগফলে দশমিক স্থান নির্দেশ করিতে গোলমাল করিয়া থাকে। যখন দশমিকের স্থান বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তখন ভাগক ও ভাগফলে গুণ করিয়া পরীক্ষা করিবে। গুণ্য ও গুণকের দশমিক স্থান যোগ

করিয়া, গুণফলে দশমিক স্থাপন করিতে হয়, ইহা জানা আছে । এখন যদি ভাগফলে চিহ্নিত দশমিক স্থান ও ভাজকের দশমিকের স্থানের সংখ্যা যোগ করিয়া দশমিক চিহ্ন দিলে, ভাজ্যের দশমিক স্থান না গিলে; তবেই বুঝিতে হইবে ভাগফলে দশমিকের স্থান ঠিক হয় নাই । এখন যাহাতে গিলে ভাগফলে এরূপ স্থানে দশমিকের চিহ্ন ঠিক করিয়া দিতে হইবে । ইহা ছাড়া ভাজ্য বা ভাজকে আবশ্যিক মত শূন্য বসাইয়া দশমিক অংশ সমান করিয়া নিলেও অনেক সময় জ্বিমা হইয়া থাকে ।

অসীম ও সমীম দশমিক ।—কতকগুলি অঙ্ক করিয়া দেখাও যে সকল দশমিকই সমীম হয় না যথা :—

$\frac{1}{2} = .5$	$\frac{1}{3} = .333333...$
$\frac{1}{4} = .25$	$\frac{1}{5} = .200000...$
$\frac{1}{6} = .166666...$	$\frac{1}{7} = .142857...$

এখন দেখা যাইতেছে, যে সকল রাশির হর ২ কি ৫ বা ইহাদের কোন গুণিতক, কেবল সেই সকল রাশিকেই সমীম দশমিকে পরিবর্তিত করা যায় ।

অসীম বা পৌনঃপুনিক দশমিকের নোটে ৯ লেখে কেন এইরূপে বুঝান যাইতে পারে :—

একবার $3 = 3.000000...$

দশবার $3 = 3.000000...$

এই দশবার ৩ হইতে একবার ৩ বাদ দিলে থাকে ৯ বার ৩

আবার অপর দিকে ৩.৩৩৩৩... হইতে ৩.৩৩৩, ৭ দ দিলে থাকে কেবল ৩ । অন্তরাৎ

$$9 \times 3 = 27$$

ছই দিক ৯ দিয়া ভাগ করিলে

$$3 = 3$$

সাক্ষেতিক ।—দোকানদারেরা গুণ করিয়া জিনিষের দাম হিসাব করেন। তাহারা যেকোন সঙ্কেতে জিনিষের দাম হিসাব করে, তাহাকেই সাক্ষেতিক কহে। সাক্ষেতিক হিসাব সহজ ও অনেক সময় মুখে মুখে করা যায়। সরল অবস্থায় যে ভগ্নাংশের লব 'এক', তাহাকেই সাক্ষেতিকের সমাংশক কহে। $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৫}{৬}$ সমাংশক, কিন্তু $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৫}{৬}$ সমাংশক নয়। সমাংশকের সাহায্যে আমরা কেবল মাত্র ভাগ করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিয়া লই। কিন্তু অন্তরূপ ভগ্নাংশ হইলে কেবল ভাগে কুলায় না। ভাগের পরে আবার গুণ করিতে হয়। আবার সমাংশকের হর যত ছোট হয়, ততই কাজের সুবিধা হইয়া থাকে। যে কোন ভগ্নাংশকে আবশ্যিক মত সমাংশকে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) $\frac{১}{২}$ এই ভগ্নাংশকে 'সমাংশকে' পরিবর্তিত করিতে হইলে, প্রথমে ইহার হরের উৎপাদক নির্ণয় করা আবশ্যিক। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১০, ২০—এই সংখ্যাগুলিই ২০ এর উৎপাদক। এই সকল উৎপাদকের মধ্যে $১+২+৪$ যোগ করিয়া ৭ (লব) মিলান যায়। আবার $৫+২$ করিলেও ৭ মিলে। এখন $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{২}$ হইলে, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৩}{২}$ এইরূপ সমাংশক হয় ও $\frac{৩}{২}$, $\frac{৩}{২}$ লইলে $\frac{৯}{২}$, $\frac{৯}{২}$ এইরূপ সমাংশক হয় ; তবে কোন্ সমাংশক লইতে হইবে ? $\frac{৩}{২}$ ও $\frac{৯}{২}$ লওয়াই সুবিধা জনক, কারণ তাহা হইলে, কেবল দুইটিমাত্র ভাগেই কাজ হইয়া গেল। অপরটি হইলে ৩টি ভাগ করিতে হয়।

(২) $\frac{৩}{৪}$ এই ভগ্নাংশকে সমাংশক ভাগে লইতে হইবে। ৩২ এর উৎপাদক ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২। এখন ১৩ মিল করিতে হইলে $৮+৪+১$ আবশ্যিক। $\frac{৩}{৪} = \frac{৩৬}{৩২}$, $\frac{৩৬}{৩২} = \frac{৯}{৮}$, $\frac{৯}{৮} = \frac{৯}{৮}$ ।

যদি ভগ্নাংশের মূল্য $\frac{১}{২}$ এর অনেক বেশী হয়, তবে সাধারণ ভাবে সমাংশক নির্ণয় না করিয়া, ১ হইতে সেই ভগ্নাংশের অন্তর কত তাহাই

নির্ণয় করিয়া লইলে, অনেক স্থলে অঙ্ক কমিবার সুবিধা হয় । মনে কর
কোন দ্রব্যের মূল্য ৩ টাকা ; এখন ১ টাকার হিসাবে সেই জিনিষের মূল্য
কত বাহির করিয়া, সেই মূল্য হইতে অষ্টগাংশ বাদ দিলেই প্রকৃত মূল্য
পাওয়া গেল ।

দৃষ্টান্ত, ৫৮০ মনে ২৪০ মনের মূল্য কত ?

৫৮০ = ৫৩ = ৬ — ৩

সুতরাং ৬ হিসাবে দাম বাহির করিয়া তাহা হইতে ৮০ হিসাবে যে দাম হয় তাহা বাদ
দিলেই হইল :—

(বাদ দিয়া)	৮০, এক টাকার ৩	২৪০ এক টাকা হিসাবে দাম
		৬
		১৪৪০, ৬ হিসাবে দাম
		৩৩, ৮০ হিসাবে দাম
		১৪১০, ৫৮০ হিসাবে দাম

আর একটা দৃষ্টান্ত—২৮০ হিসাবে ৫৮৭ মনের দাম কত ?

১২, ১/ মনের ২	২৮০ এক মনের দাম
	৬
	১৪১০ ৬ মনের দাম
১১, ১/২ মনের ৩	১০ পাই ১/২ মনের দাম
	১১ পাই ১/১ মনের দাম
	১৪/১ পাই ৫৮৭ এর দাম

দোকানদারেরা হিসাবের সময় ভগ্নাংশকে আশ্রয় পাই বা পরমা
ধরিয়া লয় । সুতরাং হিসাবের সময়ও ভগ্নাংশকে আশ্রয় পাই বা পরমা
ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে । এইজন্য উক্তের পাইএর ভগ্নাংশ ধরা হয়
নাই । মিশ্র সাক্ষতিকের অঙ্ক সরল সাক্ষতিকের নিয়মে করা বাইতে
পারে :—

দৃষ্টান্ত—৪ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ টনের দাম হইলে, ২৫ টন ৭ হঃ ৩ কোঃ এর দাম কত ?

এখানে বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে ১ টনের মূল্য ১ পাউণ্ড হইলে, ১ হম্পরের মূল্য
১ শিলিং, ১ কোঃ এর মূল্য ৩ পেন্স ।

১০ শিঃ, ১ পাঃ এর ৩	পাঃ ২৫	শিঃ ৭	পেঃ ৯	১ পাঃ টন দরে সমস্ত জিনিষের দাম
			৪	
	১০১	১১	০	৪ পাঃ দরে সমস্ত জিনিষের দাম
২ শিঃ ৬ পেঃ, ১০ শিঃ এর ৩	১২	১৩	১০৩	১০ শিঃ
	৩	৩	৫৬	২ শিঃ ৬ পেঃ দরে " "
১১৭—৮—৪৬ ৪ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ দরে সমস্ত জিনিষের দাম				

ঐকিক নিয়ম ।—ঐকিক নিয়ম লিখাইতে হইলে প্রথমে নিম্ন-লিখিত রূপ অঙ্ক দ্বারা আরম্ভ করিবে :—

১। (মুখে মুখে)

১টা গজের দাম ১০, ১২টার দাম কত ?

১টা পাঠার দাম ২৫, ৫টার দাম কত ?

এইরূপ কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া বোর্ডে নিয়ম লিখ ;—

কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিষের দাম বাহির করিতে হইলে, ১টা জিনিষের যে দাম, তাহাকে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করিতে হইবে ।

২। (মুখে মুখে)

১০ গজ বনাতির দাম ৩০ টাকা, ১ গজের দাম কত ?

১২ সের সন্দেশের দাম ২৫০, ১ সেরের দাম কত ?

বোর্ডে এইরূপ লিখ :—যত জিনিষ কেনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যার দ্বারা সমস্ত জিনিষের দাম ভাগ করিলেই ১টা জিনিষের দাম পাওয়া যায় ।

৩। উক্ত ২ প্রশ্নালীর সংযোগ—যদি ১০ গজ বনাতির দাম ৩০ হয়, তবে ১ গজ বনাতির দাম ৩,—ইহা জান । এখন ৫ গজ বনাতির দাম কত ?

১২ সের সন্দেশের দাম ২৫০ হইলে ৯ সেরের দাম কত ?

হার পরেই বোর্ডে অঙ্ক কসিবার দ্বারা লিখিয়া দাও ।

২ সের সন্দেশের দাম ২৫০

১ " " " ২৫০ ÷ ১২ = ২০/৬

৯ " " " ২০ × ৯ = ১৮০

কেবল এই ঐকিক নিয়মের অঙ্কেই নহে, সকল রূপ অঙ্কেই প্রথম খুব সরল সবল অঙ্ক কসাইবে ।

অনুপাত ও সমানুপাত ।—খুব সনদ অঙ্কের দ্বারা আরম্ভ

কর :—

১, টাকার মধ্যে ২, টাকার সম্পর্ক কত ? ১ টাকা ২, টাকার অর্ধেক, ২, টাকা ১, টাকার দ্বিগুণ ।

২, টাকার মধ্যে ৪, টাকার সম্পর্ক কি ? উত্তর পূর্বসূত ।

১০, টাকার মধ্যে ২০, টাকার সম্পর্ক কত ? ইত্যাদি

বোর্ডে লিখ $২:৪ = ১:২$ ইত্যাদি কপ উল্লিখের দ্বারাও এই সম্পর্ক প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

বলিয়া দাও যে $২ \div ১, ৪ \div ২, ২০ \div ১০$ ইত্যাদির দ্বারাও এই সকল ফলই পাওয়া যায় ।

তদ্বৎসর বুঝাইয়া দাও $৪ \div ২$ এই অঙ্ক, সংক্ষেপে $৪:২$ এইরূপেও লেখা হয় । : এইরূপ চিহ্নের দ্বারা, চিহ্নের উত্তর পাপ্রস্থ অঙ্কের যে কি সম্পর্ক তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, ইহাষ্ট বুঝায় । ইহাকেই অনুপাত বলে । এখন বুঝাইয়া দাও যে

$২ : ৪$ যে সম্পর্ক, $৩ : ৬$ এ ও সেই সম্পর্ক, ইহাকেই সমানুপাত বলে ।

$২ : ৪$ যে সম্পর্ক, $৩ : ৯$ সেই সম্পর্ক নহে, ইহা সমানুপাত নহে ।

তদ্বৎসর দেখাইয়া দাও যে সমান সম্পর্ক বিশিষ্ট অনুপাতগুলি এইরূপে লিখিত হইয়া থাকে :—

$$২ : ৪ :: ৩ : ৬$$

(অর্থাৎ, $২ + ৪ = ৩ + ৬$)

:: চিহ্নের অর্থ—মুদ্র চারিটি বিন্দু দ্বারা দুইটি রেখার (সমান বোধক =) চারিটি প্রান্ত বিন্দুমাত্র সংক্ষেপে চিহ্নিত হইয়া থাকে । এখন বুঝাইতে পারা যাইবে যে সমান সম্পর্ক বিশিষ্ট দুইটি অনুপাতের ১ম ও ৪র্থ এবং ২য় ও ৩য় রাশি গুণ করিলে ফল সমান হয়, যথা—

$$২ \times ৬ = ৪ \times ৩$$

ত্রৈরাশিক ।—এখন ত্রৈরাশিক বুঝাইতে আরম্ভ কর । যে সমানুপাতের তিনটি রাশি মাত্র জানা আছে, তাহাকেই ত্রৈরাশিক কহে । তিনটি রাশি জানা থাকিলে আগের চতুর্থ রাশি বাহির করিয়া লই

পারি। কারণ আমরা জানি যে সমগ্রপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশি গুণ করিলে যে ফল হয়, ২য় ও ৩য় রাশি গুণ করিলেও তাহাই হইবে।

দৃষ্টান্ত—২টা গরুর দাম ৪, টাকা, ৩টার দাম কত ?

২ : ৪ :: ৩ : কত ?

অর্থাৎ ২ এর সহিত ৪ এর যে সম্পর্ক, ৩এর সহিত কোন রাশির সেই সম্পর্ক ?

$২ \times কত = ৪ \times ৩ = ১২$?

৩×৪ হইল ১২, এখন ১২এর সহিত কত গুণ করিলে ১২ হইবে ? ১২কে ২ দ্বারা ভাগ করিলেই জানিতে পারি। $১২ \div ২ = ৬$, তাহা হইলে

২ : ৪ :: ৩ : ৬

কাজেই আমরা ২ : ৪ :: ৩ : কত ?—এই অঙ্ক কসিতে হইলে প্রথমে ৪ এর সহিত ৩ এর (অর্থাৎ মধ্যের ২ রাশির) গুণ করিয়া যে ফল হয় তাহাকে প্রথম রাশি দ্বারা ভাগ দিয়া থাকি। যথা—

$$কত = \frac{৩ \times ৪}{২} = ৬$$

তারপর ত্রৈরাশিকের রাশিগুলি সাজান সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া আবশ্যিক। কতকগুলি সহজ সহজ অঙ্ক কমান হইলে, নিম্নলিখিত-রূপ আরও কতকগুলি অঙ্ক কমাঠিতে হইবে। তাহা হইলে বালকেরা রাশি সাজান বুঝিতে পারিবে।

ত্রৈরাশিক অঙ্কে সমান সমান বিষয় জ্ঞাপক রাশিগুলি পাশে পাশে বসাইতে হয়।

গরু	গরু	টাকা	টাকা
২ :	৩ ::	৪ :	ক

ইহাতেও মধ্যের ২ রাশি যথোই থাকিল ও পার্শ্বের দুই রাশি পাঠ্যেই থাকিল। মধ্যের ২ রাশি ৪×৩ হইলে যে ফল হয় ৩×৪ হইলেও তাহাই হয়। সুতরাং এইরূপ সাজাইলে ফলের কোন পরিবর্তন হয় না।

তারপর এইরূপ দৃষ্টান্ত।—৫ জন লোকে ৩ বিঘা জমির ধান কাটিতে পারে, ১০ জন লোকে কত বিঘা জমির ধান কাটিবে ? একেবারে অঙ্ক না কসিয়া আগে ফলের আন্দাজ

করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । ৫ জনে যে কাজ করে ১০ জনে তাহার দ্বিগুণ কাজ করিলে ।
সুতরাং অঙ্কের ফল বড় হইবে ।

জন	জন	বিধা	বিধা
৫ :	১০ ::	৩ :	ক

$$ক = \frac{১০ \times ৩}{৫} = ৬ \text{ বিধা}$$

আবার অন্তরূপ দৃষ্টান্ত—৫ জন লোকে ১২ দিনে একটা কাজ করে ১০ জন লোকে কত দিনে সেই কাজটা করিবে? ৫ জন লোকের যতদিন লাগিবে ১০ জনের নিম্নতমই তার চেয়ে কম দিন লাগিবে, সুতরাং ফল কম হইবে । ১০ অপেক্ষা ৫ ছোট, ১২ অপেক্ষাও ফল ছোট হইবে । ১০ এর সহিত ৫ এর যে সম্পর্ক ১২ দিনের সহিত ফলেরও সেই সম্পর্ক হইবে ।

জন	জন	দিন	দিন
১০ :	৫ ::	১২ :	ক

$$ক = \frac{৫ \times ১২}{১০} = ৬ \text{ দিন}$$

৫ : ১০ :: ১২ : ক এইরূপ লিখা হইলে ভুল হইত । কারণ ৫ জনের দ্বিগুণ ১০ জন, কিন্তু ১২ দিনের দ্বিগুণত আর ফল হইতে পারে না ইত্যাদিরূপ বুঝাইয়া দিবে ।

ফল বেশী হইলে কিরূপে সাজাইতে হইবে আর কম হইলেই বা কিরূপে সাজাইতে হইবে, তাহা উক্ত দুই প্রকারের কতকগুলি অঙ্ক কসাইলেই বুঝিতে পারিবে ।

সুদকষা ।—সুদকষা, ডিসকাউন্ট ও কোম্পানির কাগজের অঙ্ক বালকেরা সাধারণতঃ ভীষণ শক্ত বলিয়া মনে করে । ইহার কারণ এই—অনেক শিক্ষক এই সকল অঙ্ক সম্বন্ধীয় ব্যাপার বালকগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া না দিয়া, একেবারেই অঙ্ক কসিতে দিয়া থাকেন । বালকেরা ইহার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না । কেহ কেহ কৌশল মাত্র অবলম্বন করিয়া ২।৪টা অঙ্ক কসিয়া থাকে । কিন্তু অনেক বালকই এ সকল অঙ্ক শক্ত বলিয়া চেষ্টাও করে না । উত্তমরূপে বুঝা-

ইয়া দিনে শতকরা ৯৫ জন ছাত্র যে অনায়াসে এই সকল অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইবে তাহাতে ভুল নাই ।

ঘরের যেমন ভাড়া আছে, টাকারও তেমনি ভাড়া আছে । যত্নব বাড়ীতে রাম বাবু থাকেন ; তিনি যত্নকে মাসে ২০৷ করিয়া ভাড়া দেন । হরি মাইতীব বাড়ীতে ইন্দু বাবু চড়েন ; ইন্দু বাবু হরি মাইতীকে মাসে ১৫৷ করিয়া ভাড়া দেন । তেমনি চুনী পোন্দারের টাকা কালী বাবু নিয়া, চুনীকে মাসে মাসে সেই টাকার ভাড়া দেন । ১৷ টাকার ভাড়া মাসে ২১০ পয়সা । কালীবাবু চুনীর কাছ হইতে ১০৷ নিয়াছেন, মাসে কত ভাড়া দিয়া থাকেন ? ৫ মাসে কত ভাড়া হইল ? ১৫ দিনে কত ভাড়া হইল ? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিবে । এই টাকার ভাড়াকেই সুদ বলে । জিনিষপত্র ভাড়া করিয়া আনিলে, যেমন সেই জিনিষ ফেরৎ দিতে হয়, টাকা কর্ত্ত করিলেও সেই টাকা ফেরৎ দিতে হয় এবং সেই টাকার সুদ বা ভাড়াও দিতে হয় ।

তারপর দৃষ্টান্ত—মাসে ১৷ টাকার সুদ ২১০, ১০৷ টাকার এক মাসের সুদ কত ? ৮ মাসের সুদ কত ? এক বৎসরের সুদ কত ? মাসে ২১০ হিসাবে ১০৷ টাকার সুদ কত ? ২০৷ টাকার সুদ কত ? ৫০৷ টাকার সুদ কত ? ১০০৷ টাকার সুদ কত ? ঐ হিসাবে ১০০৷ টাকার এক মাসের সুদ কত ? ৩ মাসের সুদ কত ? ১ বৎসরের সুদ কত ?

সাধারণতঃ এই এক বৎসরের ১০০৷ টাকার সুদকেই সুদেব ‘হার’ বলে । (শতকরা শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দাও)

ছোট ছোট অনেক জুলি সহজ অঙ্ক কসাইলেই বালকগণের বোধ জন্মিবে । একবার বিয়য়টী বুঝিতে পারিলেই আর কঠিন অঙ্ক কসিতে কষ্ট বোধ করিবে না । তাড়াতাড়ি করিয়া বালকগণকে এক দিনেই পণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিও না । অন্ততঃ ৫।৭ দিন কেবল সহজ অঙ্কই কসাইবে, তবে তাহাদের বুদ্ধি খুলিবে ।

ডিস্কাউন্ট ।—ব্যবসায় বাণিজ্যে বালকগণ সকল সময় নগদ টাকা দিয়া জিনিষ ক্রয় করিতে পারে না । মনে কর মথুর কুণ্ডুর পাটের কারবার আছে ; মথুর পাট কিনিয়া শুদাম বোঝাই করিতেছে ; কিনিতে কিনিতে তাহার তত্বিলে টাকা খুবাইয়া গিয়াছে । কিন্তু আরও পাট ক্রয় করা দরকার । এমন সময় শিবু সা এক নৌকা পাট নিয়া উপস্থিত । মথুর শিবু নিকট হঠতে বাকী করিয়া সেই পাট কিনিয়া রাখিল । দাম ৬ মাস পরে পরিশোধ করিবে বলিয়া স্বীকার করিল । পাটের দাম ৩০০ স্থির হইল ; মথুর দামের টাকা ৬ মাস পরে দিবে স্বীকার করিল ; শিবু এই ৬ মাসের সুদের দাবী করিল । তখন বাজারের অন্যান্য কারবারিগণ শতকরা তিন টাকা করিয়া সুদ দেয় । সুতরাং সেই হিসাবে ৩০০ টাকার ৬ মাসের সুদ ৪৮০ হইল । এখন মথুর শিবুকে এই সম্মো একখানা হাতচিঠা লিখিয়া দিল যে, ৬ মাস পরে সে শিবুকে ৩৪৮০ দিবে । এই যে ৪৮০ টাকা বেশী দিতে হইতেছে ইহাকেই ডিস্কাউন্ট বলে । এও সুদ বিশেষ । কিন্তু যদি মথুর শিবুকে এখনই টাকা দিতে পারে, তবে আর সুদ দিতে হইবে না । সুতরাং ৬ মাস পরে যে দাম বাবদ ৩৪৮০ দিতে হইত, এখন (বর্তমান কালে) সে মূল্য ৩০০ টাকাতৈ হইয়া যায় । অতএব ৬ মাস পরে দেয় ৩৪৮০ টাকার (শতকরা ৩ হিসাবে) বর্তমান মূল্য ৩০০ । গ্রামের বা সহরের পরিচিত ব্যবসায়ীগণের কারবারের দৃষ্টান্ত দিতে পারিলে, বালকগণের নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে । ফল কথা এখানে অঙ্ক কসাইবার জন্য বিশেষ তাড়াতাড়ি না করিয়া, পূর্বে বালকগণকে বিষয়টা উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সহজ সহজ অঙ্ক কসাইবে ।

কোম্পানীর কাগজ ।—গভর্ণমেন্টেরও যে টাকা কর্ত্ত করিবার আবশ্যক হয় তাহা বালকেরা জানে না । তাহাদের

বিশ্বাস, যখন গভর্ণমেন্টের টাকা কল আছে, তখন ইচ্ছামত প্রাপ্ত করিয়া লইলেই হইল। বাণকগণকে বুঝাইতে হইবে যে গভর্ণমেন্টের আয়ের একটা সীমা আছে। প্রজারা যে বাৎসরিক খাজানা দেয় ও গভর্ণমেন্টের যে অন্যান্য রূপ কারবারে বাজে আয় হয়, তাহাই গভর্ণমেন্টের বাৎসরিক আয়। আর সোণা, রূপা, তামা প্রভৃতি, গভর্ণমেন্টকেও অর্থ দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এখন কি অবস্থায় গভর্ণমেন্টকে কর্জ করিতে হয় তাহা বলা দরকার। যখন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় বা বহুদূর বিস্তৃত বেল পথ বা সেতু নিৰ্ম্মাণ করিতে হয় বা ভীষণ দুর্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়, তখন গভর্ণমেন্টের বাধা আয়ে কুদায় না। কাজেই টাকা কর্জ করিবার আবশ্যক হয়। গভর্ণমেন্ট, গেজেটে বিজ্ঞাপন দেন যে ৫০০০০০০ (মনে কর) টাকা কর্জ করা আবশ্যক। শতকরা ৩ হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে। প্রজাদের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা গভর্ণমেন্টকে টাকা কর্জ দেয়। দুর্গানাথ বাবু ৫০০০ দিলেন, হায়দারজান চৌধুরি ২০০০০ টাকা দিলেন ইত্যাদি। ইহারা ৬ মাস পর পর, স্থানীয় খাজাঞ্চীখানা হইতে তাহাদের টাকার সুদ লইয়া আসেন। বাজে লোককে টাকা কর্জ দিলে, গভর্ণমেন্টের সুদ অপেক্ষা বেশী সুদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু টাকা একেবারে মারা যাইবারও সম্ভাবনা থাকে। গভর্ণমেন্টকে কর্জ দিলে টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর এক কথা, বাজে লোককে টাকা কর্জ দিলে সে টাকা যেমন ইচ্ছামত আদায় করা যায়, গভর্ণমেন্টকে টাকা কর্জ দিলে, মূল টাকা ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। আগার যখন টাকা আবশ্যক, তখন গভর্ণমেন্টের নিকট টাকা চাহিলে পাইব না। কিন্তু গভর্ণমেন্ট যখন ইচ্ছা করেন তখনই টাকা ফিরাইয়া দিতে পারেন। তবে আমার টাকার আবশ্যক হইলে গভর্ণমেন্ট-গচ্ছিত-টাকা (কাগজ) বিক্রয় করিতে পারি।

কিন্তু কে আমার কাগজ কিনিবে, কাহার আবশ্যক আছে, তাহাও আমি জানি না। এই জন্য দালালের দোকান আছে। তাহার একজনের নিকট হইতে কাগজ কিনিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করে। তাহার প্রতি ১০০ টাকায় ৯০ আনা করিয়া কমিশন (পারিশ্রমিক), ব্রোকারেজ বা দালালি কাটিয়া রাখে। দৃষ্টান্ত—যদি ১০০ টাকার কাগজ বিক্রয় করিবে। সে দালালের নিকট গেল। দালাল তাহাকে ৯৯৮/১০ দিল; ৯৯ আনা কাটিয়া রাখিল। আবার হরিবাবু দালালের দোকানে ১০০ টাকার কাগজ কিনিতে গেলেন। দালাল হরিবাবুর নিকট হইতে ১০০৮/১০ লইয়া কাগজ বিক্রয় করিল। এই যে ৯৯ আনা, ইহার নামই ব্রোকারেজ বা দালালী। দালাল, কাগজ কিনিবার সময় ৯৯ পাইল ও বিক্রয়ের সময়ও ৯৯ পাইল। সুতরাং ১০০ টাকার কাগজ কেনা বেচায়, তাহার ১০ লাভ হইল। কোম্পানির কাগজ কেন নাম হইল তাহা ও বুঝান আবশ্যক। পূর্বে ভারতরাজ্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। তাহারাই প্রথমে প্রজার নিকট হইতে কর্জ আরম্ভ করেন। টাকা কর্জ করিয়া কোম্পানি উত্তমর্গকে একখানি হাতচিঠা (খতের মত) দিতেন। সেই হাতচিঠাতে লেখা থাকিত—কোম্পানী অমুকের নিকট হইতে এত টাকা কর্জ করিলেন, ঐ টাকার সুদ শতকরা এত হিসাবে দিবেন ইত্যাদি। এই কাগজের নামই লোকে কোম্পানীর কাগজ (কোম্পানী প্রদত্ত হাওনোট কাগজ) বলিত। এখন যদিও কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাগজের সেই নামই আছে। এখন কোম্পানীর পরিবর্তে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই হাতচিঠা দেওয়া হয়। এই কাগজ ১০০ টাকার নোটের মত, একখানি হাওনোট।

তারপর, কাগজের দাম কম ও বেশী হয় কেন তাহা বলা আবশ্যক। এখন কোম্পানী বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রজা সাধারণের নিকট

টাকা কর্জ প্রার্থী হইয়া থাকেন, তখন প্রজারা সহজে টাকা দিতে চাহে না বলিয়া, গভর্ণমেন্টকে ১০০ টাকার কাগজ ১০০ টাকার কমে বিক্রয় করিতে হয়। রয় জাপান যুদ্ধের সময়, কয়েক বিপন্ন বুঝিয়া কেহ তাহাকে টাকা কর্জ দিতে অগ্রসর হইয়া না ; রয় গভর্ণমেন্ট কাগজের দাম খুব কমাইয়াছিলেন। আগাদের দেশেও সিপাহী বিজোহের সময় কাগজের দাম খুব কমিয়াছিল। ১০০ টাকার কাগজ ৭০ ৭৫ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু কাগজে '১০০ কর্জ করিলাম' বলিয়াই লেখা হইয়া থাকে এবং তাহার সুদও ১০০ টাকার হিসাবেই পাওয়া যায়। আবার গভর্ণমেন্টের যখন খুব স্বচ্ছন্দ অবস্থা থাকে, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যাদির জন্য টাকার দরকার হয়, তখন আবার প্রজারা চোর ডাকাইতেব হাত হইতে ধন সম্পত্তি বাচাইবার জন্য গভর্ণমেন্টকে টাকা কর্জ দিয়া থাকেন। ১০০ টাকার দাম এ সময়ে বেশী হয়। ১০০ টাকার কাগজ কিনিতে ১১০ ১১৫ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু কাগজে ১০০ লেখা থাকে ও সুদও ১০০ টাকার হিসাবেই দেওয়া হয়। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে ১০০ টাকার কাগজ ১১৫ টাকায় কিনিয়া কি লাভ হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাইতে হইবে। মনে কর ১০০ টাকার সুদ ৩ টাকা। ১০০ টাকার কাগজ ১১৫ দিয়া কিনিলাম। ৫ বৎসরে ১৫ সুদ পাইলাম। যে ১৫ টাকা বেশী দিয়াছিলাম, তাহা ৫ বৎসরে উঠিয়া গেল। তারপর হইতে যে সুদ পাওয়া যাইবে, তাহা লাভ। আর টাকাও নিরাপদে থাকিল। এইরূপে এক এক অংশ বুঝাইতে হইবে আর সরল সরল অঙ্ক কসাইতে হইবে।

বিবিধ প্রশ্ন।—জড়িত অঙ্ক গুলি শিক্ষা দিবার সময়ও প্রথমে খুব সরল (অথচ জড়িত) অঙ্ক শিখাইতে আরম্ভ করিবে। ছোট ছোট সংখ্যা দিয়া এমন অঙ্ক প্রস্তুত করিয়া লইবে, যাহার উত্তর বালকেরা এক রকম মুখে মুখে দিতে পারে। আবার একটা অঙ্ক না পারিলেই যে

তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝাওয়া দিবে, তাহাও উদ্ভিন্ন নহে । বালককে অঙ্ক কনিবার দ্বারা নির্ধারণ করিবার উপায় শিক্ষা দিবে ।

দৃষ্টান্ত—এমন একটি সংখ্যা নির্ণয় কর, যাহা হইতে ৫ বার দিয়া, অবশিষ্টের সহিত ৭ গুণ করিলে, ৭০ হয় ।

মনে কর বালক কমিতে পারিতেছে না । তাকে একটা ছোট রাশি ধরিয়া দিও—মনে ১০ । তাহা হইতে একটি ছোট রাশি বাদ দিতে বল—মনে ৪ ; অবশিষ্ট থাকিবে ৬ ; এই ৬কে ৩ দিয়া গুণ কর ; হইল ১৮ । এখন বালককে বল যে এন ৪, ৩ ও ১৮ বসিয়া দেওয়া হইল ; সেই ১০ কেমন করিয়া বাতিল করিবে ? একটা অঙ্কের দ্বারা বুঝিবে না বা একেবারেও বুঝিবে না । নিবৃত্ত হইলেও চানিবে না, শিক্ষকের খুব ধৈর্য্য গুণ চাই ।

এক রকমের কতকগুলি অঙ্ক কমাটীরা বালকদিগকেও সেইরূপ অঙ্ক রচনা করিতে বলিবে ও তাহাদিগকে সেই স্বরচিত অঙ্ক কমিতে দিবে ।

২ । জ্যামিতি ।

জ্যামিতি শিক্ষায় লাভ ।—জ্যামিতি শিক্ষায় লাভ দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও মানসিক । (১) ব্যবহারিক—আমরা গোলাক, চোলা, সমঘন, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ প্রভৃতি নানাবিধ আকারের চিত্রাদি আঁকিতে শিক্ষা করি । ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কারিকরগণের পক্ষে এই সমস্ত চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করা যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই, অন্যের পক্ষেও এই শিক্ষার আবশ্যকতা আছে । যে সমতা, সৌন্দর্য্যের প্রদান উপকরণ, জ্যামিতি শিক্ষায় সেই সমতার বোধ জন্মে । আর (২) মানসিক—জ্যামিতির সাহায্যে আমরা নানাবিধ ক্ষেত্রের বাহু, কোণ, ক্ষেত্রফল প্রভৃতির সম্বন্ধ অসম্বন্ধ যজ্ঞাদির দ্বারা পরিমাণ

না করিয়াও, কেবল স্মৃতি নিচােরের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আমরা উত্তমতর এই ফল লাভ করি যে, জ্যামিতির আলোচনায় আমরা শৃঙ্খলাক্রমে তর্ক ক্রমিতে শিক্ষা করি এবং নির্ভর্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ বুঝিতে পারি।

জ্যামিতি শিক্ষার ধারা।—স্বল্প শ্রুত করাইবার আবশ্যকতা নাই। একেবারেই প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতে শিক্ষা দান আরম্ভ করা যাইতে পারে। তবে কয়েকটী স্বল্পের বিষয় মাত্র শিখাইয়া লওয়া আবশ্যক। বিন্দুর কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। বোর্ডে এইরূপে কয়েকটী বিন্দু দাও—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
•	•	•	•	•	•	•

৬৫ চিত্র—বিন্দু শিক্ষা।

১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত বিন্দুগুলি কেমন বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট হইতে হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই যে সর্বাপেক্ষা ছোট অদৃশ্য বিন্দু ইহাই জ্যামিতির বিন্দু। এই রূপে স্থল দাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত কয়েকটা রেখা টান। যে রেখারটীর সূত্র একেবারেই নাই, উহাই জ্যামিতির রেখা।

তবে আপাততঃ একটা সাধারণ বিন্দুর দ্বারা ‘বিন্দুর’ বিষয় এবং সাধারণ রেখা দ্বারা ‘রেখার’ বিষয় বুঝাইলেও চলিতে পারে। তারপর ‘সরল রেখা’ ও ‘বক্ররেখা’ অঙ্কন করিয়া দেখাও ও বালকদিগের দ্বারা অঙ্কন করাও। ইহার পর ত্রিভুজ—দুই বাহু সমান হইলে সমদ্বিবাহু, তিন বাহু সমান হইলে সমবাহু ইত্যাদি চিত্রগুলি কেবল অঙ্কনের দ্বারা বুঝাইয়া দিবে। বালকেরা প্রথম হইতেই একখানা স্কেল ও একটা কম্পাস পেনসিল ব্যবহার করিতে শিখিবে। শিক্ষক বা ছাত্রকে

ব্লাকবোর্ডে যে সকল ক্ষেত্র অঙ্কন করিতে হইবে, তাহা ব্লাকবোর্ডের ও
কম্পাসের সাহায্যে করিবে । যেমন তেমন করিয়া চিত্রাঙ্কন নিত্যই
দোষের । প্রথম প্রকৃতি শিখাইতে উপনোক্ত বৃত্ত ছাড়া, বৃত্তের
বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক । আর জ্যামিতিতে বৃত্তই অস্বাভাবিক
আবশ্যকীয় ক্ষেত্র । তাহা দ্বারা জ্যামিতির সমস্ত মাপের কার্য নিষ্পত্তি
হইয়া থাকে । বালকগণকে কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তাঙ্কন শিক্ষা দাও
এবং নিজেও বোর্ডে কম্পাসের সাহায্যে বৃত্ত আঁক । কোন্ বিন্দুকে
কেন্দ্র বনে, তাহা দেখাইয়া দাও । কোন্ অংশের নাম পরিধি, তাহা
বলিয়া দাও । এখন বৃত্তের দ্বারা, মাপিয়া, দেখাও, বৃত্তের কেন্দ্র
হইতে পরিধি পর্যন্ত যত রেখা টানা যায় সকল গুণিত সমান ।
বালকেরা নিজেই নিজেই বৃত্তে এই রেখাগুলি মাপিয়া দেখিবে । বৃত্তের
মধ্যে ছোট্টটা ব্যাসার্ধ টানিয়া, তাহা দ্বারা পরিধি মাপিয়া ছোট্ট প্রান্ত, সংযুক্ত
কর । একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হইবে । এইরূপে (বৃত্তের সাহায্যে)
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন শিক্ষা দাও । তারপর বোর্ডে একটি রেখা
টানিয়া দাও । সেইটী যেন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের, সমান বাহুদ্বয়ের,
একটি বাহু । এখন এটী বাহুটী অঙ্কন করিয়া, একটি সমদ্বিবাহু
ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল । এইরূপে রেখাগুলি ক্রমান্বয়ে, ত্রিভুজ-
ভাবে, ভূমি-ভাবে, নানা প্রকারে, আঁকিয়া দাও ও সমদ্বিবাহু
ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল । যেগুলি যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, তাহা না
মাপিয়া প্রমাণ করিতে বল । যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত সব
রেখাই সমান, তখন ত্রিভুজের বাহুদ্বয় যে সমান তাহা বালকেরা না
মাপিয়াই বলিতে পারিবে । এখন '৩ বাহু সমান' একটি ত্রিভুজ অঙ্কন
করিতে বল । একটি বৃত্তের দ্বারা একরূপ ত্রিভুজ অঙ্কন করা যখন
বালকেরা কঠিন বোধ করিবে, তখন আর একটি বৃত্ত অঙ্কনের কথা
বলিয়া দাও । কিন্তু কোথায় কিরূপে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহা

প্রথমে বলিয়া দিওনা । যখন তাহারা একেবারেই না পারিবে তখন একটু একটু করিয়া বলিয়া দিবে । বালকগণকে পুস্তক পড়িতে দিও না, মুখে মুখে শিখাইবে । মাদা-সিদে ভাবে প্রমাণ করিয়া লইবে ; কথ প্রভৃতি অঙ্গরের সাহায্য করিবে না । ‘এই বাহু, এই বাহুর সমান, এই কোণ, এই কোণের সমান’ ইত্যাদিরূপে বাহু ও কোণ দেখাইয়া দেখাইয়া প্রমাণ করিবে ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা প্রমাণের সময়ও এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিবে । রেখার উপর (প্রথম প্রতিজ্ঞানুসারে) সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবার সময়, কেবল প্রথম প্রতিজ্ঞার নাম করিয়া একটা মেমন তেমনি ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে দিও না । কম্পাসের দ্বারা দুইটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবে । তারপর বৃত্ত দুইটী পুঁছিয়া ফেলিবে ।

স্কালের দ্বারা কেবল সরল রেখা টানিতে পারিবে এবং কম্পাসের দ্বারা কেবল বৃত্ত আঁকিতে পারিবে কিন্তু এই দুই যন্ত্রের দ্বারা যে মাপাদি লইতে পারিবে না, তাহা বলিয়া দাও । জ্যামিতি এক রকমের খেলা, কে না মাপিয়া কেবল রেখা টানিয়া ও বৃত্ত আঁকিয়া এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারে—ইহাই পরীক্ষা করা ।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা বুঝাইবার পূর্বে কোণের বিষয় বুঝাইয়া দাও । কম্পাসের দ্বারা বেশ বুঝান যাইতে পারে । একখানি কাঁচা দাঁশের কাঠি ভাঙ্গিয়া লইলেও হয় । কম্পাস বা কাঠি ফাঁক করিয়া ধর । বলিয়া দাও যে কম্পাসের দুইটী ডাল বা বাহুর মধ্যে যে ফাঁক তাহাকেই কোণ বলে । কম্পাস আরও ফাঁক কর, কোণ বড় হইবে ; কম্পাসের দুই বাহু চাপিয়া আন, কোণ ছোট হইয়া আসিবে । দুইটী কম্পাস, বা দুই খানি ভাঙ্গা কাঠি দিয়া দুইটী কোণ কর । একটা কোণের উপর আর একটা কোণ রাখিয়া, দুইটী সমান কি অসমান পরীক্ষা করিতে বল । তার পর বাহুগুলি পরস্পর সমান করিয়া লও । কোণের সহিত

কোণ মিল করিলে, সমান বাহুঃ বাহুঃ যে একবারে সমান হইয়া মিলিয়া গাইবে তাহা দেখাইয়া দাও । কোণ সমান না হইলে এক বাহু এক বাহুঃ মিলিবে, কিন্তু আর এক বাহু মিলিবে না ।

এখন তার বা কাঠীর দ্বারা ২টী সমান ত্রিভুজ করিয়া লও । কোণ ও বাহু মিলিলে ভূমি যে মিলিবে তাহা দেখাও । সুতরাং ত্রিভুজ দুইটী সমান হইবে । এই প্রতিজ্ঞার যে স্থলে ‘দুই সরল রেখায় কেবল বেঞ্জন করিল বসিয়া’ প্রমাণের এক অংশ কথিত হইয়াছে তাহা প্রথম শিক্ষার সময় বাদ দিয়া যাও ।

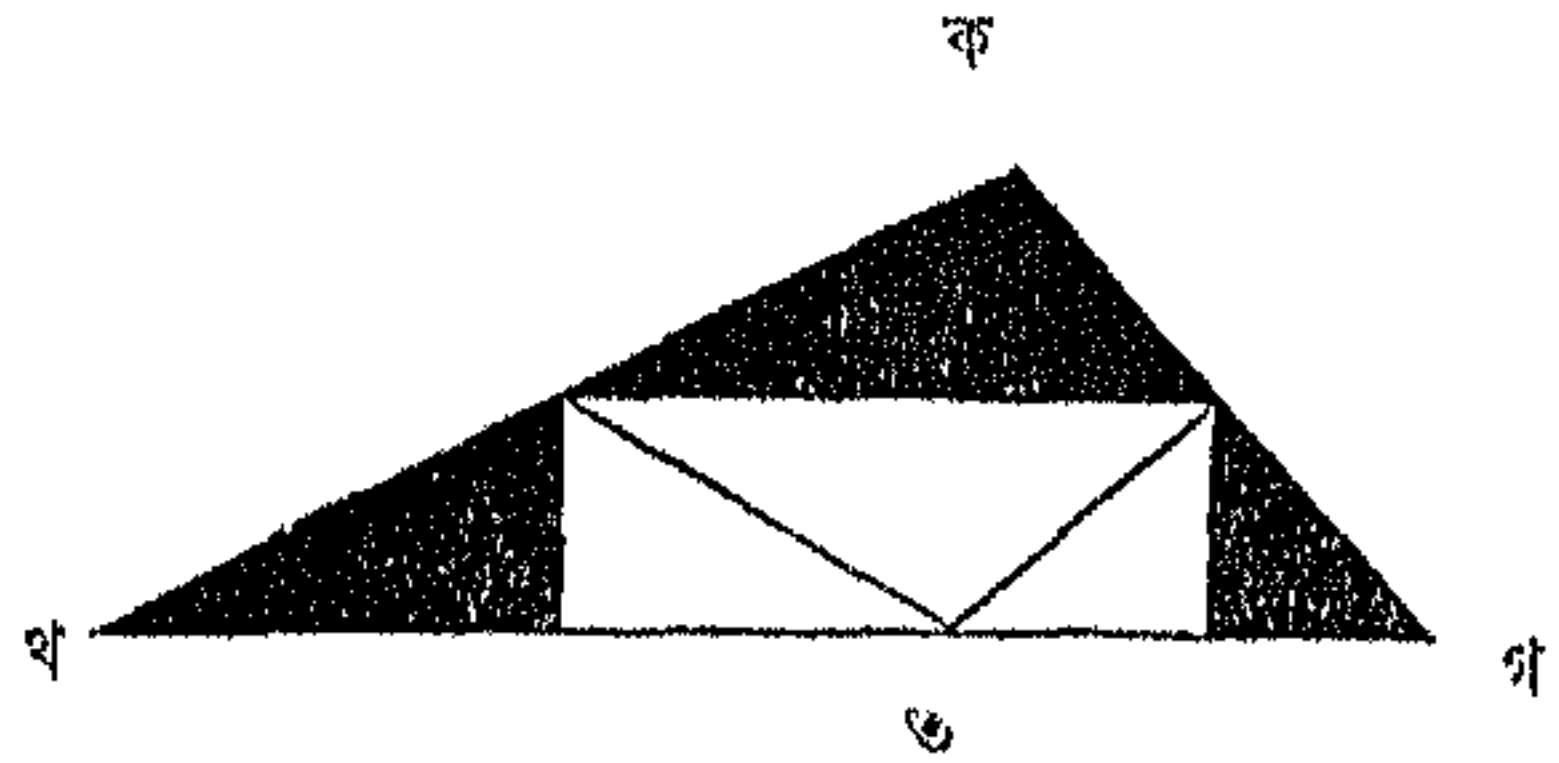
চতুর্থ প্রতিজ্ঞা উত্তম রূপে বুঝিলেই ৫ম প্রতিজ্ঞা সহজ হইয়া আসিবে । কাগজের ত্রিভুজ কাটিয়া বা তার দিয়া ত্রিভুজ তৈয়ার করিয়া একটার উপর আর একটা নানা প্রকারে রাখিয়া (৫ম প্রতিজ্ঞার যেকোন আবশ্যক) ৪র্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করাইয়া লও ।

অন্তঃ ২৬টী প্রতিজ্ঞা এই রূপে মুখে মুখে শিখাইবে । তারপর পুস্তক পড়াইবে ।

যখন যে স্থানের আবশ্যক হইবে তখন তাহা বুঝাইয়া দিবে । স্বতঃ-সিদ্ধের বিষয়গুলি বালাকেরা সহজেই বুঝিতে পারে সুতরাং প্রথমে তাহার পৃথক আলোচনা না করাই ভাল ।

ব্যবহারিক প্রমাণ ।—কতকগুলি প্রতিজ্ঞার উত্তম রূপে ব্যবহারিক প্রমাণ দেখাইতে পারা যায় । নিয়ে ৩২ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ প্রদত্ত হইল । অত্যন্ত প্রতিজ্ঞার ব্যবহারিক প্রমাণ প্রায় জ্যামিতিতেই লিখিত হইয়া থাকে ।

একটা কাগজের ত্রিভুজ কাটিয়া লও । (সমকোণী ত্রিভুজ করিও না) । এখন কাগজ ভাঁজ করিয়া ক কোণ, খগ সরল রেখার উপর পাত কর । বাম হইতে খ কোণ ও ডান হইতে গ কোণ ভাঁজিয়া আনিয়া ত বিন্দুতে ৩টী কোণ একত্র মিলিত কর । ৩টী কোণ এক রেখায়



৬৬ চিত্র—কাগজ ভাঁজ করিয়া ত্রিভুজ আঁকিয়া ।

একেবারে মিলিয়া যাইবে সুতরাং এটি ত্রি কোণ ২ সমকোণের সমান ।

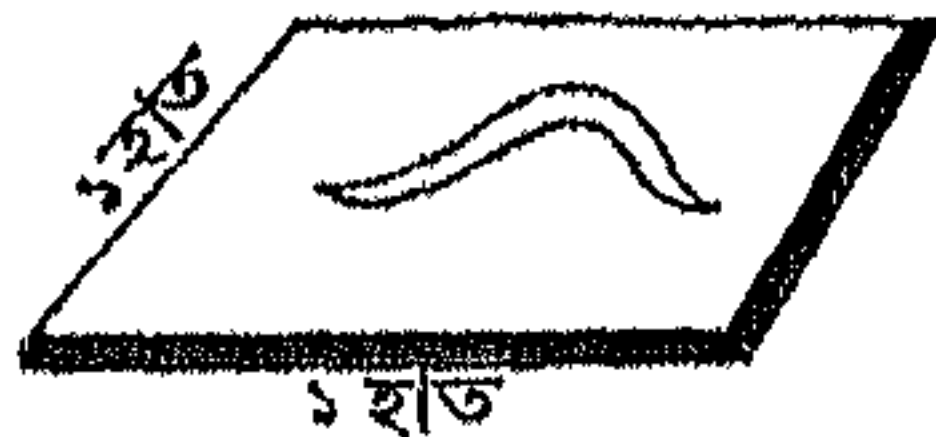
ব্যবহারিক জ্যামিতি ।—ব্যবহারিক জ্যামিতিতে প্রমাণাদি বা অঙ্কনের প্রক্রিয়া লিখিয়া দিতে হয় না । কেবল মাত্র প্রস্তাবিত চিত্রাঙ্কন করিয়া দিলেই হইল । এই চিত্রাঙ্কনের প্রণালী ও চিত্রটি ঠিক হওয়া চাই । চিত্র ভুল হইলেই সমস্ত ভুল হইয়া গেল । দৃষ্টান্ত “কোন একটি নির্দিষ্ট সরল রেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে”—এখন একটা রেখা টানিয়া, তাহা মাপিয়া, ও স্কেলের দ্বারা মধ্যবিন্দু নির্ধারণ করিয়া, কেবল মাত্র সেই মধ্যবিন্দু স্থলে একটা চিহ্ন দিলেই এই প্রণেয় উত্তর হইল না । কারণ এইরূপ মাপের দ্বারা মধ্যবিন্দু নির্ধারণ করা সকল সময় সম্ভবপর হয় না । ৪ ইঞ্চি রেখাকে স্কেলের সাহায্যে ২ সমান ভাগে ভাগ করা যায় ; ৩ ইঞ্চি রেখাকেও ভাগ করা যায় ; কিন্তু যদি রেখাটি ৩.৭ ইঞ্চি হয়, তবে স্কেলের সাহায্যে কেমন করিয়া উহার মধ্যবিন্দু নির্দেশ করিবে ? হলে এত ক্ষুদ্র ভাগ থাকে না । এই জন্য রেখা দ্বিখণ্ডিত করিবার একটা সাধারণ প্রক্রিয়া আবশ্যিক । নির্দিষ্ট অংশের অর্ধেক অপেক্ষা বৃহত্তর একটি অংশ অনুমান করিয়া, তাহাকে ব্যাসার্ধ ধরিয়া লও এবং নির্দিষ্ট রেখার প্রান্তদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া দুইটা

বৃত্ত আঁকিত কর । এত বৃত্ত দুটো যে যে স্থানে ছেদ করিবে তাহা বেষ্টান দ্বারা সংযুক্ত কর । সেখ বেষ্টা যেখানে নির্দিষ্ট বেষ্টাকে ছেদ করিলে সেই বিন্দুই মধ্যবিন্দু । অঙ্কনের সময় সম্পূর্ণ বৃত্ত আঁকিত না করিয়া কেবল মাত্র আবশ্যকীয় চাপ অঙ্কন করিলেই কাজ চলিয়া থাকে বলিয়া চাপ অঙ্কন কবাষ্ট নিয়ম । কোনক্রমে প্রমাণ লিখিতে বা মুখে বলিতে হয় না বটে, কিন্তু মধ্যবিন্দুটী ঠিক হইয়া কিনা তাহা কম্পাসের দ্বারা মাপিয়া দেখিতে হয় । পবাককগণ কম্পাসের দ্বারা মাপিয়া পবীক্ষা করেন । সুতরাং চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় যত্নের সহিত কার্যে হয় । স্কেল, কম্পাস ব্যতীত ব্যবহারিক জ্যামিতির শিক্ষা চলে না ।

৩ । পরিমিতি ।

পরিমিতি শিক্ষার আবশ্যিকতা ।—আগাদিগের দেশ কবি প্রধান । জমি জমা লইয়াই আগাদেব কারবার । সুতরাং জমি মাপ করিবার প্রণালী প্রত্যেকেরই শিক্ষা করা কর্তব্য ।

পরিমিতি শিক্ষার আসবাব ।—যদি চেন, ফিতা না থাকে তবে একটা শক্ত দড়িতে ফুটের চিহ্ন দিয়া লইবে । আর একটা দড়িতে হাতের চিহ্ন দিয়াও লইবে ।



৬৭ চিত্র ।—বর্গহাত মাপিবার কাঠ ।

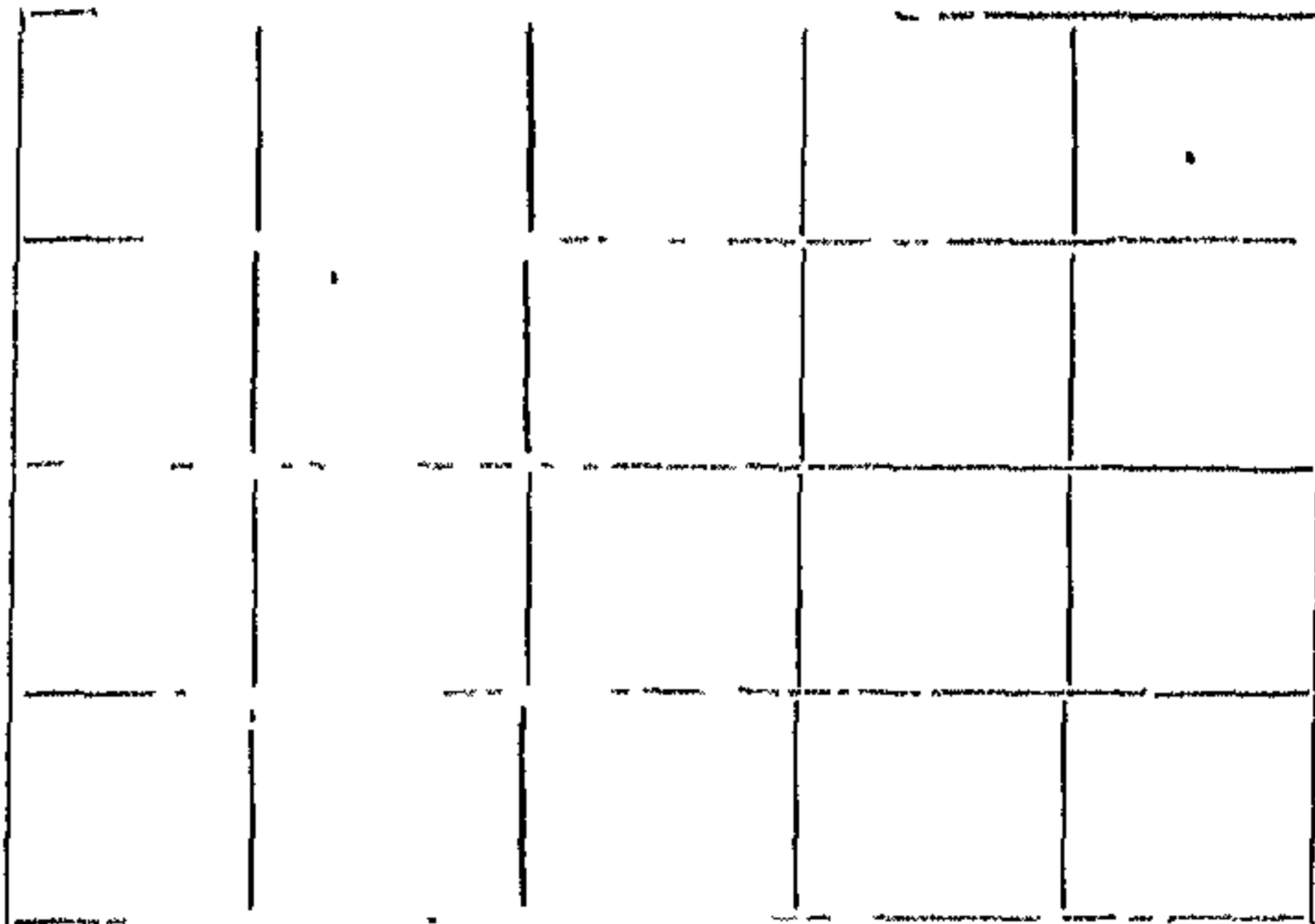
প্রত্যেক হাত বা ফুটের মাথায় কাল রং লাগাইয়া দিবে বা কাল সূতা জড়াইয়া রাখিবে । দড়ি

দুই গাছি ১০০ ফুট ও ১০০ হাত হইলেই যথেষ্ট হইবে । ৪ হাত লম্বা মক বাঁশ বা শক্ত নল, ২৪টি বাঁশ আবশ্যক । ইহাতেও ১ গির দ্বারা ছাটের চিহ্ন কাটিয়া রাখিলে । ১ গান ১ বর্গফুট ও ১ গান ১ বর্গহাত তুল্য ও ১ গাণ্ডা আবশ্যক । ১ বর্গহাত বা ১ বর্গফুট জমি কতটা তাহার একটা দারবা করাটয়া দিতে হইবে । এই কাঠ দুখানির মান থাকে, এক এক খানি চকরা কাঠ দোরেক দিয়া আটয়া দিবে । গনিবার পক্ষে সুবিধা হয় । বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, কোদাগা দ্বারা ২০ হাত দীর্ঘ ১৬ হাত প্রস্থ এক খণ্ড জমির চারিদিকে দাগ কাটিয়া রাখিবে । এক কাঠা অনিতে কতটা স্থান বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে তাহার দাবী জাগিবে ।

শিক্ষাদানের ধারা ।—বানকগণকে শাসিতে শিখাইবে । বেঞ্চখানা কত হাত লম্বা ? এ ধূতি খানি, এ দাড়ি গাছি, এই রাস্তাটা, এই বাঁশটী এত হাত লম্বা বসিবে? আমবা সেই সকল জিনিষের একটা আন্দাজ পাই । কারণ ধূতি, বেঞ্চ, রাস্তা, বাঁশ, দাড়ি প্রভৃতি মানান্তরতঃ যে পরিমাণ প্রশস্ত হইয়া থাকে তাহা আমাদিগের জানা আছে । কিন্তু এক খণ্ড জমি এত হাত লম্বা বসিবে আমাদিগের সে জমির দারবা হয় না । কারণ জমির প্রস্থের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ নাই । পরিমাণ বহু প্রকারের হইয়া থাকে, সেইজন্য জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুইই জানা আবশ্যক । ১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ জমি কতটা, কতটা জমিই ভূমির মাপের ‘একক’ । দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১ হাত করিয়া হইলে তাহাকে ১ বর্গহাত কহে । (১ বর্গহাত তত্ত্বখানি দেখাও ; জমিতে এক হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ জমি মাপিয়া দেখাও) । এখন একখণ্ড জমি দেখাইয়া দাও ও ১ বর্গহাত তত্ত্ব দ্বারা সেই জমিতে কত বর্গহাত জমি আছে তাহা মাপ করিতে বল ।

৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ একখণ্ড জমি মাপিয়া লও । সেই জমিতে কত বর্গহাত জমি আছে তাহা তত্ত্ব দ্বারা মাপিয়া দেখ । পরে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৫ হাত ও ৪ হাতেই চিহ্ন দিয়া চিত্রের অনুরূপ সমান্তর বেখা টান বা জমির উপরে দাগে দাগে কাঠী বা দড়ি সাজাও ।

এই ক্ষেত্রে ২০টা, ১ বর্গহাত ক্ষেত্র হইবে । প্রত্যেকটি যে এক বর্গহাত, তাহাও মাপিয়া দেখাও । তৈয়া পেষ্ট শুণ করিলে এইক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল জানিতে পারা যায় । খুটেন দড়ি দিয়া, জমির তৈর্য্য গ্রন্থ মাপিয়া তাহাব কাণি বাহির করান নিয়ম শিখাও ।



৬৮ চিত্র ।—জমির মাপ শিক্ষা ।

বিধা কাঠা প্রভৃতি মাপের দ্বারা যে মৈথিক মাপ ও ক্ষেত্রফল উভয়ই বুঝিতে পারা যায় তাহা বালকগণকে বুঝাষ্টয়া দিতে হইবে । ‘এই জমি এক বিঘা লম্বা’ বলিলে আমরা বুঝিব যে ঐ জমি ৮০ হাত লম্বা । কিন্তু ‘এই জমি এক বিঘা’ বলিলে বুঝিব যে সেই জমি ৬৪০০ বর্গহাত স্থান অধিকার করিয়া আছে । ১ কাঠা বলিলে ৩২০ বর্গহাত জমি বুঝায় । ৩২০ বর্গহাত অর্থাৎ এক কাঠা জমির পরিমাণ কত রকম হইতে পারে তাহা ক্ষেত্রের সাহায্যে বোর্ডে ৭টা ভিন্ন ভিন্ন

চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও ও এই অঙ্কগুলিও তাহার নিম্নে লিখিয়া দাও :—

৩২	হাত দখা	X	১ হাত প্রস্থ
১৬০	" "	X	২ " "
৮০	" "	X	৪ " "
৪০	" "	X	৮ " "
২০	" "	X	১৬ " "
১০	" প্রস্থ	X	৩২ " দখা
৫	" "	X	৬৪ " "

তারপর বিঘার বিঘায় গুণ করিলে যে 'বিঘা' হয়, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে বর্গ বিঘা ইহা বুঝাইয়া দাও । বিঘায় কাঠায় গুণ করিলে যে কাঠা হয়, তাহা নিম্নের চিত্রানুসারে বুঝাইতে পারা যাইবে । মনে কর দৈর্ঘ্য ২ বিঘা ও প্রস্থ ৫ কাঠা—ফলফল কত ? $২ \times ৫ = ১০$ কাঠা ।

১ বিঘা = ৮০ হাত

১ বিঘা = ৮০ হাত

১ কাঠা = ৪ হাত

" = ৪ "

" = ৪ "

" = ৪ "

" = ৪ "

১ কাঠা

২ "

৩ "

৪ "

৫ "

৬ কাঠা

৭ "

৮ "

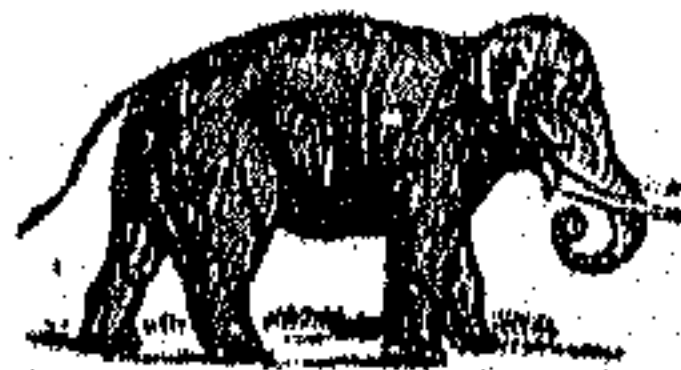
৯ "

১০ "

৬২ চিত্র ।—কাঠা বিঘায় গুণ ।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্র ১ বিঘা বা ৮০ হাত লম্বা ও ১ কাঠা বা ৪ হাত প্রশস্ত ।
সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রের কালি $৮০ \times ৪ = ৩২০$ বর্গ হাত $= ১$ কাঠা ।
বড় ক্ষেত্রে, ১০টা ছোট ছোট এক কাঠার ক্ষেত্র আছে । কাঠেই
বিধায় কাঠায় গুণ করিলে কাঠা হয় । কাঠায় কাঠায় গুণ করিলে যে
বর্গ কাঠা হয় তাহাকে (১৬ বর্গ হাত) মূল বলে । ইহা ১ কাঠা জমির
২০ ভাগের এক ভাগ । চিত্রাঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দাও । এইরূপে
আবার অগ্রাণু অংশও বুঝাইয়া দিবে ।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ।—৬ ইঞ্চি লম্ব ও ৪ ইঞ্চি ভূমিযুক্ত একটি
সমকোণী ত্রিভুজ । এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার সময় আমরা
লম্ব ও ভূমি গুণ করিয়া তাহার অর্ধেক লই কেন ? ক্ষেত্রের সাহায্যে
একখানা কাগজ হইতে ৬×৪ ইঞ্চি এক খণ্ড কাগজ কাটিয়া লও ।
ইহার ক্ষেত্রফল $৬ \times ৪ = ২৪$ বর্গ ইঞ্চি । ক্ষেত্রটিকে কর্ণরেখা ক্রমে দুইটি
সমকোণী ত্রিভুজে ভাগ কর । ত্রিভুজ দুইটি যে সমান তাহা একটার
উপর আর একটা স্থাপন করিয়া দেখাও । প্রত্যেকটি ত্রিভুজের লম্ব
৬ ইঞ্চি ও ভূমি ৪ ইঞ্চি । আর প্রত্যেক ত্রিভুজ এই কাগজের আয়ত
ক্ষেত্রের অর্ধেক । সুতরাং ২৪ বর্গ ইঞ্চির অর্ধেক । সেই অর্ধ সমকোণী
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লইতে ১২ এই প্রণালী অবলম্বন করা হয় । আবার
কয়েক দ্বারা প্রত্যেক ত্রিভুজকেই দুইটি সমকোণী ত্রিভুজে ভাগ করা যায় ।
সুতরাং অগ্রাণু ত্রিভুজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম ।





পঞ্চম প্রকরণ—ভূগোলেতিহাস বিষয়ক ।

১। ভূগোল



ক্ষার আবশ্যিকতা ।—(১) পৃথিবীর নানা স্থানে উৎপন্ন পদার্থাদির বিষয় জানিতে ও পারিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হয় । কোথায়, কিরূপে, কোন্ সহজ পথে যাইতে পারা যায়, গ্রাহ্য ও ভূগোল শিক্ষায় জানিতে পারা যায় । (২) যুদ্ধ বিগ্রহাদি পরিচালনার জন্য ভূগোলের জ্ঞান আবশ্যিক । কোন্ কোন্ পথে শত্রু আসিতে পারে, তাহাকে কোন স্থানে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, পথে নদী পর্বতাদির কিরূপ সহায়তা গ্রহণ করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় ভূগোলের আলোচনায় জানা যাইতে পারে । (৩) বিজ্ঞান চর্চায় ভূগোল সহায়তা করে । নানাদেশে যে সকল অদ্ভুত বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, নদী পর্বতাদি আছে তাহা অবগত হইয়া সেই সকল বিশেষ পদার্থের বিশেষত্ব অনুসন্ধান করা যাইতে পারে । (৪) রাজনৈতিক আলোচনাতেও ভূগোলের যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায় । কোন্ জাতি কিরূপ বলবান, কিরূপ অর্থশালী, কিরূপে রাজকার্য পরিচালনা করে এবং এই সকল বিষয়ে দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টন হইতেই বা তাহারা কি

মহাদেশ পাঠ্য থাকে, তাহা ভূগোল পাঠে বুঝিতে পারা যায় । (৫) মানচিত্র ও নদী বৃক্ষাদি একটা অংশ না জানে । আমাদেব সাংসারিক কার্যে অনেক সময় এত জানের বিশেষ আবশ্যক না হইয়া থাকে । (৬) পত্রিকা ও সাহিত্য পুস্তকাদি দ্বারা অনেক বিনয় ভূগোলেব জ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না । (৭) ভূগোলে বাসকেন্দ্র সৃষ্টিত্বের বৈচিত্র্য মনন করিয়া ভগবত্বক হয় । (৮) তাহাদেব কল্যাণশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, বিচারণশক্তি, পর্যাবেক্ষণশক্তি পোড়তি মানসিক বৃত্তি মতেজ হয় । (৯) অজ্ঞা-জ্ঞানের বিবরণাদি জ্ঞাত হইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ কবে ।

ভূগোল শিক্ষার কথা ।—পূর্বে ভূগোল শিক্ষায় শিক্ষকগণ প্রথমে পৃথিবীর গোলাকের বিষয় সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিয়া, তারপর মহাদেশ দেশ প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দিতেন । এইরূপে একে দেশ হইতে দেশ, বিভাগ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হইত । কিন্তু এখন এ রীতির বিপরীত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে । প্রথমে নিজের গ্রাম, নগরাদির বিষয় ; পরে দেশ, মহাদেশ ও পৃথিবীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় । পূর্বরীতিতে অপরিচিত মহাদেশের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিচিত গ্রাম নগরে অবরোধন করা হইত ; এখন পরিচিত গ্রাম, নগর হইতে আরম্ভ করিয়া, অপরিচিত দেশ মহাদেশে আরোহণ করা হয় । সুতরাং বর্তমান রীতিতে শিক্ষাদানের পক্ষে সুবিধাজনক । তারপর, পূর্বে সাধারণ ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল ভিন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিন্তু প্রায় এক সময়ে শিক্ষা দেওয়া হয় । দেশের প্রাকৃতিক বাহ্য অবস্থান সঙ্গে তাহার আভ্যন্তরিক প্রাকৃতিক অবস্থাও জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় । এই জন্য ভূগোল শিক্ষাদানের প্রাথমিক বা সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষণের দ্বারা (“পদার্থ পরিচয়” শিক্ষাদানের রীতিতে) শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য ।

কঠিন পদার্থ—কঠিন পদার্থে তাপ দিলে ছোট হয় ন, কোমল পদার্থ তাপে ছোট হয়। কঠিন পদার্থে সহজে দগ্ধ বসে না—নরমে দগ্ধ বসে। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার, তরল পদার্থের আকার পাতের অনুরূপ। তাপে কঠিন পদার্থ তরল হয় (নোন ও ছাফা গলাইয়া দেখাও) ঠাণ্ডায় আবার শক্ত হয়, গল ভাসিয়া কঠিন (বরফ) হয়। কঠিন পদার্থের দ্বারা কোমলের উপর দাগ কাটা যায়। হীরক মনোহোমক কঠিন পদার্থ। লৌহ অপেক্ষা কাঁচ কঠিন, কিন্তু কাঁচ (চুনক) ভঙ্গুর, লৌহ (ঠমক) খাত সহ।

তরল পদার্থ তরল পদার্থ গড়াইয়া নাচের দিগে যায়—গোটা গোটা হইয়া পড়ে—নির্দিষ্ট কোন আকার নাই—পা দানুচন আকার—ঠাণ্ডায় কঠিন হয়, তাপে বায়বীয় আকার ধারণ করে।

বায়বীয় পদার্থ—বাতাস সকল স্থানেই আছে—আমরা দেখি না বটে কিন্তু অনুভব করিতে পারি—বাতাসে গাছ পাতা নড়ায়—পখ বায়ুকে ঝড় বলে—তাপে তাপ দিলে পাতলা হইয়া বায়বীয় আকার ধারণ করে—ঠাণ্ডা নিজেই আবার জল হয়।

জুরু ও লঘু।—লৌহ ভার কাঁচ লৌহ অপেক্ষা হালকা—তৈল জলে ভাসে—জলের প্রোতে কাঁচ ভাসিয়া যায়—জল স্থির হইলে কাঁচ নীচে পড়ে—বাপ্প হালকা, উপরে উঠিয়া যায়, ধূও হালকা; বায়ু গরম হইলে পাতলা হইয়া উপরে উঠে—ঠাণ্ডা বসু নীচে নামে।

সচ্ছিন্ন পদার্থ।—প্রায় জিনিষই সচ্ছিন্ন। এক টুকরা ইট বা চক ভলে ভুবাঁইলে ভায় হয়—ওক মাটি সচ্ছিন্ন—ভিগা মাটি তেমনি নয়, বাঁধী মাটি সচ্ছিন্ন—আঠাল মাটি নয়।

মিশ্রণ ও দ্রবণ।—কাঁচা জলে মিশে—জল জলে গলিয়া যায়, জল বা চিনি মিশ্রিত জলে তাপ দিয়া জল বা চিনিকে পৃথক করা যায়, কাঁচা মিশ্রিত জল ফাঁকিয়া নিজেই কাঁচা পৃথক হয়, এক গাম জলে একটু জল বা চিনি গলিতে পারে, কিন্তু বেশী দিলে পড়িয়া থাকে।

শিক্ষাদানের ধারা।—আমাদিগের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতি (১৯০৯) ও বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট পদার্থ পরিচয় শিক্ষার পদ্ধতি (১৯১১) একত্র করিয়া নিম্নলিখিত পদ্ধতি রচিত হইল। শিশুশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে যে রূপে উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হইবে তাহার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্ন

শ্রেণীতে যেকোন কথোপকথন ভাবে বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ভূগোল শিক্ষায়ত্র ঠিক সেই স্থানালো অবলম্বন করিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীর উপযোগী কয়েকটি মাল পাঠ কথোপকথনের আদর্শে লিখিত হইল। অত্যাশ্র শ্রেণীর উপযোগী পাঠ কলিও এইরূপে গড়িয়ালিতে হইবে।

আকাশ । আমরা যখন বাহিরে দাঁড়াই, তখন মাথার উপরে স্থানর আকাশ দেখিতে পাই। মানালার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যায় কিনা, দেখত ? ভোগানের সত অচ মকল পাঠশালার বাজকেরাও আকাশ দেখিতে পায় কিনা ? যাহারা অনেক দূরে থাকে তাহারা আকাশ দেখিতে পায় কিনা ? হাঁ—আমরা যেখানে যাইনা কেন, সব সময়েই মাথার উপরে আকাশ দেখিতে পাই।

আকাশে বাতাস আছে। বাতাস কেনন করিয়া বুঝিতে পারি ? বাতাস কি দেখা যায় ? গাচ পাতা নড়িলে বাতাস জানিতে পারা যায়—হাত নড়িলে ? বাতাস দেখা যায় না বাতাস গায়ে লাগে। এ পরে বাতাস আছে ? আছে। বাতাসের ভিতর দিয়া সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—কাচের ভিতর দিয়াও সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—বাতাস কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। আকাশের আকার কেনন ? চাকনার সত, বাটীর সত। আকাশের কোন ভাগ খুব উঁচু ? যে ভাগ ঠিক মাথার উপরে। (টেনিলের উপর একটা কাচের বাটী উপর করিয়া বুঝাইয়া দাও)। কোন ভাগ খুব নীচু ? যেখানে আকাশ মাটির সঙ্গে লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেখানে আকাশ মাটির সঙ্গে নিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই গোলাকার স্থানকে চক্রবাল বলে।

আকাশের রঙ কেনন ? আকাশের রঙ নীল (আসমানী)। সব সময়েই কি নীল দেখিতে পাও ? মেঘ হইলে নীল দেখায় না। মেঘ হইলে কেনন দেখায় ? সাদা তুলার সত মেঘ হইলে আকাশ সাদা হয় আবার কাল মেঘ হইলে আকাশ কাল হয়। মেঘগুলি ধায়ুর সত স্বচ্ছ নহে। আকাশের রঙ চাকিয়া ফেলে। মেঘ হইলে আকাশের চাঁদ, তারা, সূর্য দেখা যায় না। কাল মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে গাছ পান্সা বঁচে।

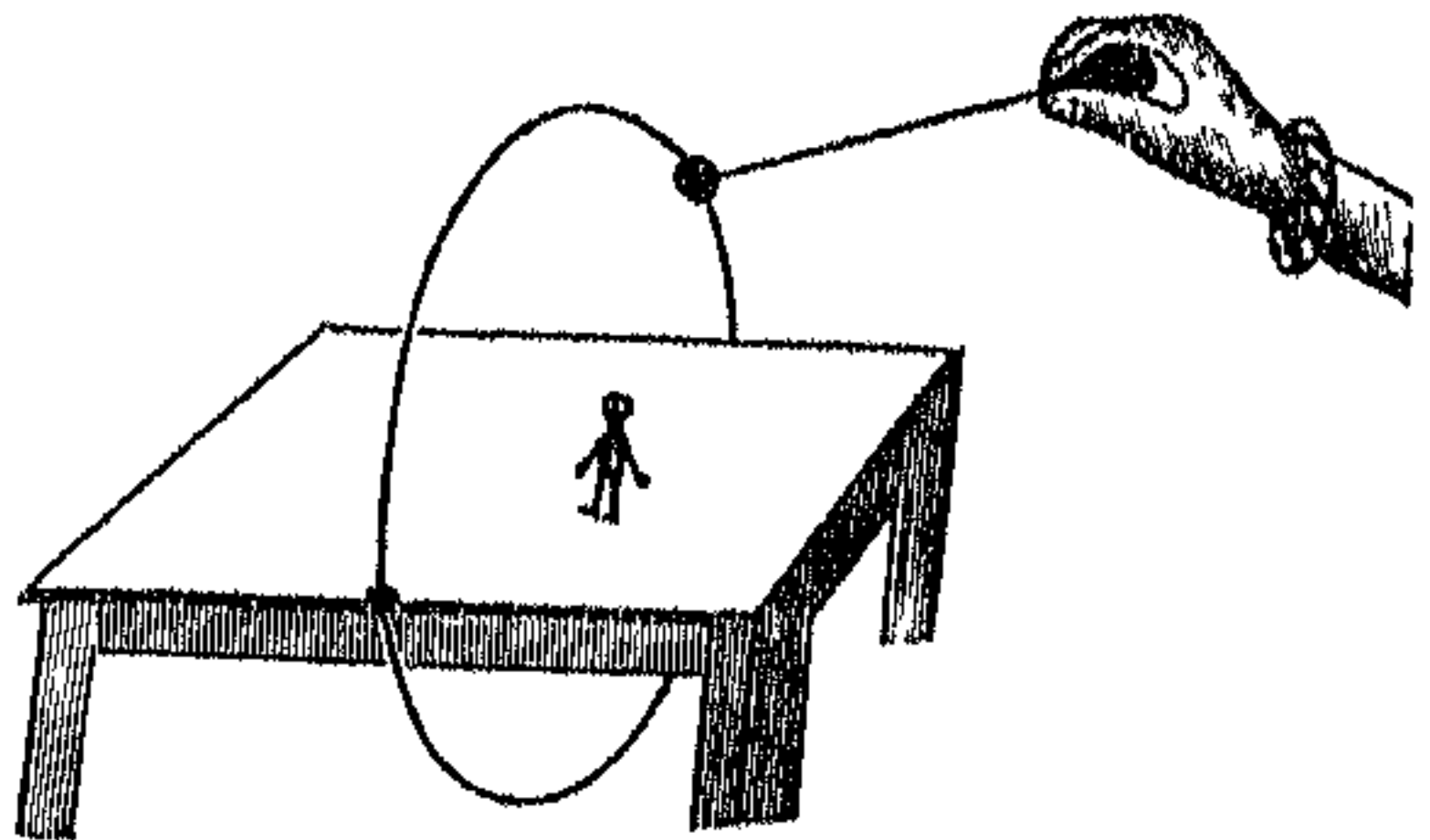
আকাশে মেঘ ছাড়া আর কি কি দেখিতে পাই ? চাঁদ, তারা, সূর্য। সূর্য দিনে আলো দেয়—সূর্য আশ্রমের বলের সত—সূর্য উঠিলে আশ্রম থাকে না—সূর্য না থাকিলে আশ্রম হয়। সূর্য তাপও দেয়—মেঘ হইলে তেমনা আলোও থাকেনা বা তেমন তাপও থাকেনা। সূর্যের রঙ, হলুদে, সোণার সত। সূর্যের দিকে চাইলে চোখে জ্বালা হয়।

চাঁদ বাজিতে দেখা যায়। চাঁদের রঙ, মাদা, নাপার মত। চাঁদের দিকে চাইলে চোখে জালা হয় না। কোন কোন রাতে চাঁদ একেবারেই দেখা যায় না। আবার কখন কখন চাঁদের ছুঁকরা দেয়া যায়। (বোর্ডের উপর দ্বিতীয়ান, অষ্টমাত্র ও পুণিমার চন্দ্র আঁকিয়া দেখাও)

আকাশে অনেক তারা আছে, গণনা করা যায় না। কতকগুলি জোড়, আর কতকগুলি বড়। দিনেও তারা থাকে, সূর্যের বেলা আলোতে দেখা যায় না (একটা বাতি আলিয়া দূরে রাখিলে, দিনের বেলা বাতির আলো দেখা যায় না)

মেঘ আমাদের কাছে—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র অনেক দূরে। তাই মেঘে সূর্য চন্দ্র ঢাকা পড়ে। (একখানা পুস্তক দিয়া চাঁদের কোন জিনিষকে আড়ান করিয়া দেখাও।)

সূর্য—(প্রাতঃকালে বায়কখনকে সূর্যের প্রাঙ্গণে সমবেত কর)। এই দেখ এখানে রৌদ্র আঁসিয়াছে, এই দেখ এখান হইতে রৌদ্র সরিয়া গাছেতেছে। এখন এখানে ছায়া পড়িল, আর যেখানে ছায়া ছিল সেখানে রৌদ্র হইল। সূর্য আকাশের এক খানেই থাকেনা। নীচের দিক থেকে ক্রমেই সূর্য উপরের দিকে উঠিতেছে, সুপর বেলায় (বেলা ১২টার সময়) সূর্য মাথার উপরে আসে। বিকাল বেলায় আবার নীচে নামিয়া যায় (একদিন বৈকালে বায়কখনকে সমবেত করিয়া দেখাও)। যে দিকে উঠে তাহাকে পূর্ব দিক বলে, যে দিকে ডুবিয়া যায় তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। উঠিবার সময় ও ডুবিবার সময় সূর্যের রঙ লাল দেখায় (টেনিসের উপর একটা তার, বেত



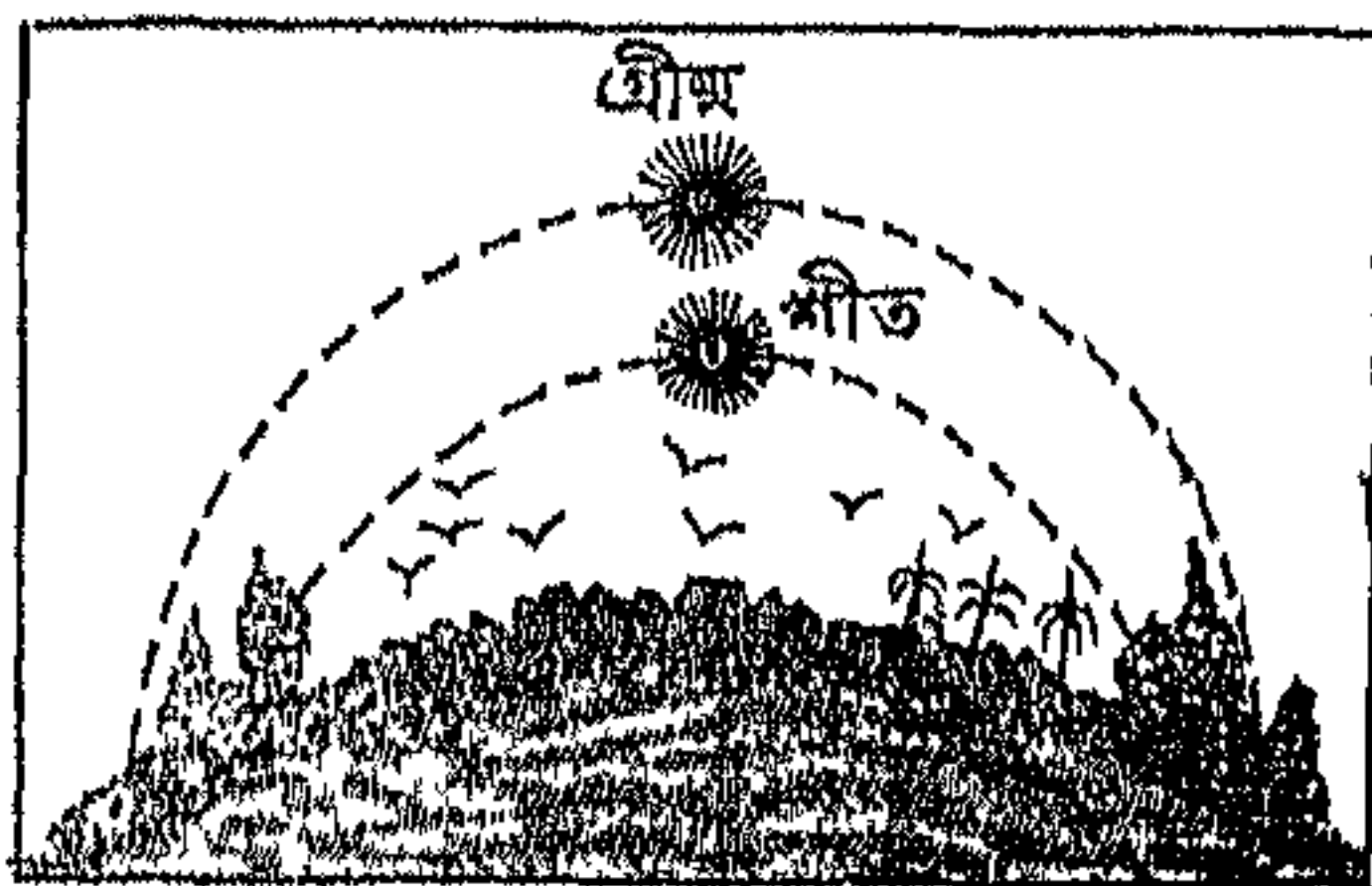
৭০ চিত্র।—সূর্যের উদয়াস্ত।

বা বাঁশের চটা গোল করিয়া বাঁধ ও একটা শলাকার সাপায় একটা ছোট আগু বিদ্ধ করিয়া।

তারের পাশ দিয়া পূর্বাহ্নীয়া সূর্য্যের উদয় জন্ত জ্যোতি বুঝাইয়া দাও । সূর্য্য কেনন করিয়া নীচের দিক দিয়া পূর্ব্বে গাভার পূর্ব দিকে যায় তাহাও বুঝাইতে পারিবে) সূর্য্য পূর্ব্বে যায় না, পূর্ব্বেই পূর্ব্বে থাকে ইহা পরে বুঝাইয়া দিবে । রেখগাড়ীতে বা নৌকাতে কোন স্থানে যাহবার সময় আমরা দেখি যে রাস্তার দ্বারের গাফোলা চলিতেছে । সেইরূপ সূর্য্যও চলিতেছে বলিয়া জানাঙ্গির ভুল হয় ।

ছায়া । --নকশন বালককে গৌর দাড়া কর । মাটিতে ছায়া পাড়িল । কেন ? গৌর বালকের শরীরের অঙ্গ দিয়া যাহতে পারিল না, বালকের শরীর অঙ্গ নহে । বালকের ছায়া বালকের মত, বাটির ছায়া বাটির মত, ছাতার ছায়া ছাতার মত । ঘর অঙ্কন কর, (বা রাজিতে পরীক্ষা দেখাও) একটা বাড়ি আঁক, আলো মাটির উপর রাখ, একটা বালককে দাড়া কর, বালকের ছায়া পূর্ব বড় দেখাইবে । আলো একটু একটু করিয়া উঠ কর—আলো যাবার উপর আন, এবারে, ছায়া সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, বালকের পায়ের নীচে ; আবার অপর দিকে নামাইতে আরম্ভ কর, ছায়া আবার ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে (যখন পায়ের সমস্ত আলো আসিবে) পূর্ব বড় হইল । সূর্য্যের আলোতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়, ছায়া কি জন্ত ছোট বড় হয় তাহা এখন বুঝাইয়া দিতে পারিবে ।

দিন ছোট বড় ।-- (একটু উপর শ্রেণীর জন্ত) শীত কালের ১২ টার সময় ছায়া যত বড় দেখায়, গ্রীষ্মকালের ১২ টার সময় তত বড় দেখায় না । ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, গ্রীষ্মকালে ১২ টার সময় সূর্য্য যত উপরে যায়, শীতকালে তত উপরে যায় না । বোর্ডের উপর নিম্নের অঙ্কন চিত্র অঙ্কিত করিরা, সূর্য্যের গ্রীষ্মকালের ও শীতকালের গতি বুঝাইয়া দাও ।



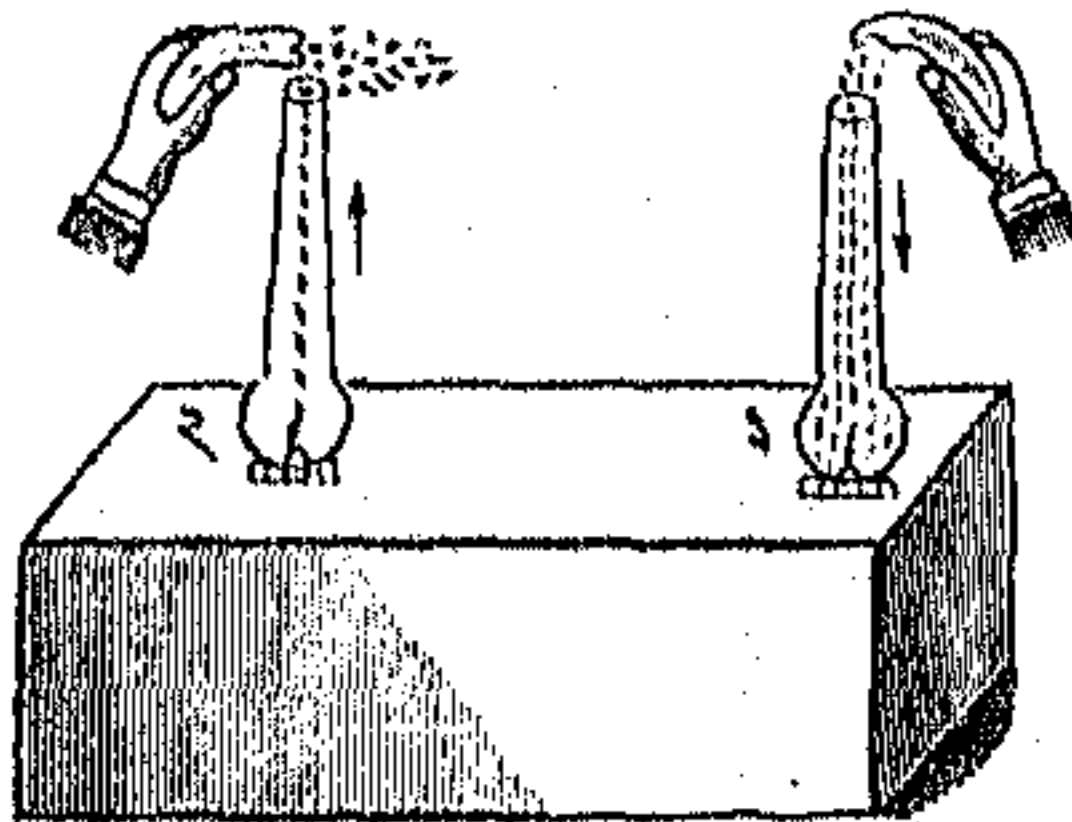
৭১ চিত্র ।--শীত ও গ্রীষ্মের সূর্য্য ।

শীতকালের সূর্যের পথ ছোট, কাজেই দিন ছোট, আর গ্রীষ্মকালের সূর্যের পথ বড়, কাজেই দিন বড় । চিত্রের নির্দেশ মত টেলিস্কোপ উপর দুইটা গোলাকার তার উঠু নীচু করিয়া লাগাইয়া লইলে দিন বড় যাত্রি ছোট বেশ বুঝাইতে পারা যাইবে । কি গ্রীষ্মে কি শীতে বেলা ১২ টার সময় সূর্য্য মন্দিরপেছা উচ্চ স্থানে উঠে । গ্রীষ্মকালে সেই উচ্চ স্থানে আগিতে সময় বেশী লাগে বলিয়া সূর্য্যকে গ্রীষ্মের প্রান্তঃকালেও যুগ্ম আগে উঠিতে হয় । গ্রীষ্মে ৭৮ টার সময় সূর্য্যোদয় হয় । শীতকালে প্রাতে ৬৮ টার সময় সূর্য্য উঠে, কারণ শীতকালের সূর্য্যের রাস্তা ছোট, একটু দেরী করিয়া উঠিলেও ক্ষতি হয় না । সূর্য্য অস্ত মন্দিরও এইরূপ ।

মেঘ বৃষ্টি ।—একটা ছোট খটিতে অগ্নি জল দিয়া, আশ্রমের গামলার উপর রাখ । খটির মুখে একটা ছোট মাটির সরিষা দিয়া ঢাকিয়া দাও, সরিষাতে একটা ছোট ছিঁজ কর । ছিঁজ দিয়া ধূঁয়ার মত যে পদার্থ বাহির হইতেছে তাহাকে বাষ্প বলে । বাষ্পের উপর একখানা ঠাণ্ডা স্লেট ধর । বাষ্প জল হইয়া স্লেটের গায়ে লাগিলে । আবার স্লেটে একটু তাপ দাও, স্লেটের সেই জল আবার বাষ্প হইবে । জল যুক্ত স্লেট রৌদ্রে রাখ, জল শুকাইয়া গেল । সূর্য্যতাপে জল বাষ্প হইবে । বাষ্প, বায়ু, অপেক্ষা হালকা তাই আকাশে উঠে । অদৃশ্য বাষ্প ঠাণ্ডা লাগিলে, তাগে মেঘ হয়, আরও ঠাণ্ডা লাগিলে জল হইয়া পড়ে । সাধারণতঃ আকাশে ৪ প্রকার মেঘ দেখিতে পাই । (১) খুব কাল মেঘ, ইহাকে বোড়ো মেঘ বলে, ভাল কথায় বৃষ্টিপ্রদ মেঘ, ইহাতেই বৃষ্টি হয় । (২) তুলাস্তূপ মেঘ, সাধারণ কথায় তুলা পৌজা মেঘ বলে, মানা মানা পৌজা তুলার মত মেঘ । (৩) স্তরাবলী মেঘ, চক্রবালের কাছে কাছে, প্রাতে সন্ধ্যায় দেখা যায়, লম্বা লম্বা স্তরের মত সমান্তর মেঘাবলী, সাধারণ কথায় ইহাকে টানা মেঘ বলে । (৪) অলফ মেঘ, অনেক উপরে ছাকড়া ছাকড়া (পাকা চুলের মত) ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়, এইজন্য সাধারণ ভাষায় ছাকড়া মেঘ বলে ।

রাসধনু ।—মুখে জল লইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া জোরে ফুৎকার করিলে রাসধনুর মত নানা বর্ণের রঙ দেখায় । মেনে সূর্য্যের আলো পড়িয়া এইরূপে রাসধনু হয় । যে দিকে সূর্য্য থাকে, তার বিপরীত দিকে মেঘ থাকিলে রাসধনু হয় । দ্বিপ্রহরে কখনও রাসধনু দেখা যায় না । সূর্য্য যতই চক্রবালের নিকটবর্তী হইবে, ততই রাসধনু বড় হইবে ও আকাশের সমধিক উচ্চ স্থানে দেখা যাইবে । রাসধনুর রঙ তুলি যেনাপ মাজান থাকে (যে দিন রাসধনু উঠিবে) তাহা দেখাইয়া দাও । নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এইরূপ ভাবে মাজান—বেগুনে, নীল, আমমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল ।

বায়ুর গতি । একটা ছোট কাঠের বায়োর এক পাশ আলগা রাখ । উপরের দিকে দুইটা ছোট ছোট চিস করিয়া দুইটা চিম্বি বসাত । খোলা মুখের দূরে যে চিস, (২নং চিস) তাহার নীচে একটা বাতি জ্বালিয়া রাখ । এক খানা ছাকড়ায় আগুন দিয়া "১" চিম্বির উপর ধর । আর একখানা পোড়া কাগজ "২" চিম্বির উপরে ধর । বায়ুর গতি যেসকল বস্তুতে পারা যাইবে, তাহা তীর চিহ্নের দ্বারা চিহ্ন দেথান হইল । বায়ু গরম হইয়া উপরে উঠিলে, ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া কেনন করিয়া সে স্থান অধিকার করে, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য । পোড়া নেকড়ার ঘূষ নীচের দিকে আসিবে, আর পোড়া কাগজের খুঁড়া উপরের দিকে উঠিবে ।



৭২ চিত্র ।—বায়ুর উর্ধ্ব ও নিম্নগতি ।

দিক শিক্ষা ।—সূর্য্যের গতি শিক্ষা দেওয়ার সময়ই বালক-গণকে পূর্ব ও পশ্চিম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । সেই সময় উত্তর দক্ষিণও শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে, বামে উত্তর ও ডানহিনে দক্ষিণ থাকে । ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষা দানের প্রণালীতেও ছোট ছোট বালক দিগকে দিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ।

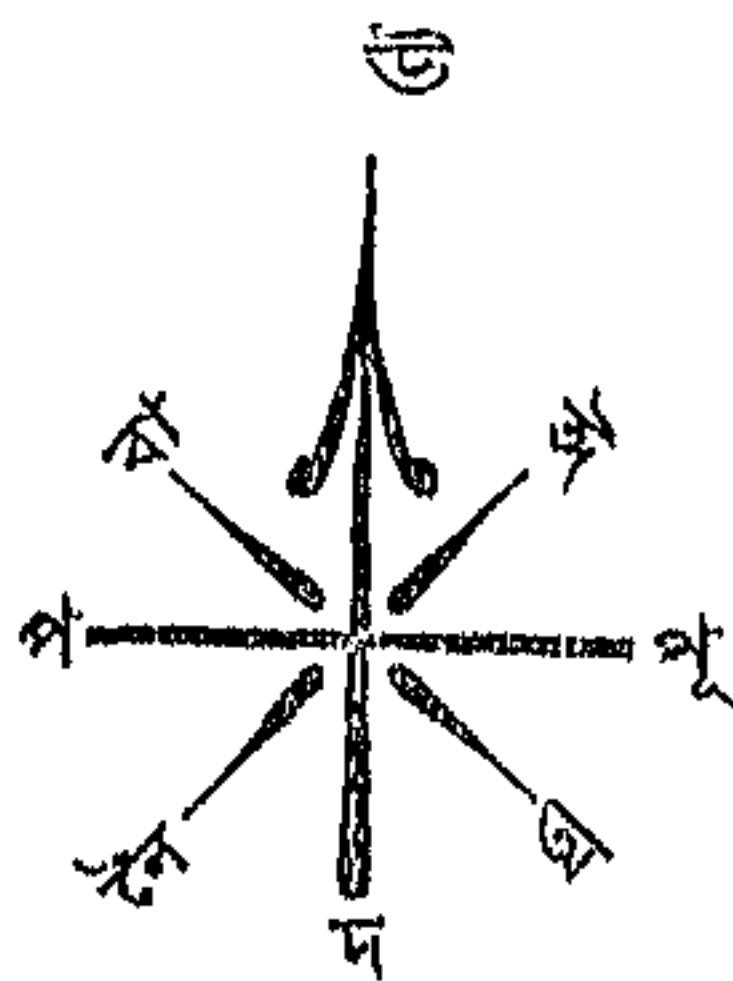
যে দিকেতে সূর্য্য উঠে পূর্ব তাহা বলা । (১)

পশ্চিম দিকেতে সূর্য্য অস্ত যায় চলি । (২)

পূর্ব দিকে মুখ করি দাঁড়াইলে পর । (৩)

ডাঁহনে দক্ষিণ থাকে বামেতে উত্তর । (৪)

(১) সকল বালক পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, ডাঁহন হস্তের তর্জনী দ্বারা পূর্ব দিক দেখাইয়া সম্মুখে বলিলে । (২) সকলে এক সঙ্গে ডাঁহনে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া, পশ্চিম দিকে মুখ করতঃ বাম হস্তের তর্জনী দ্বারা পশ্চিম দিক দেখাইয়া আনুষ্ঠান করিলে । (৩) সম্পূর্ণ বামে ঘুরিয়া পূর্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান (৪) ডাঁহন হস্তের তর্জনী দ্বারা দক্ষিণ দিকে ও বাম হস্তের তর্জনী দ্বারা উত্তর দিক দেখাইয়া ।

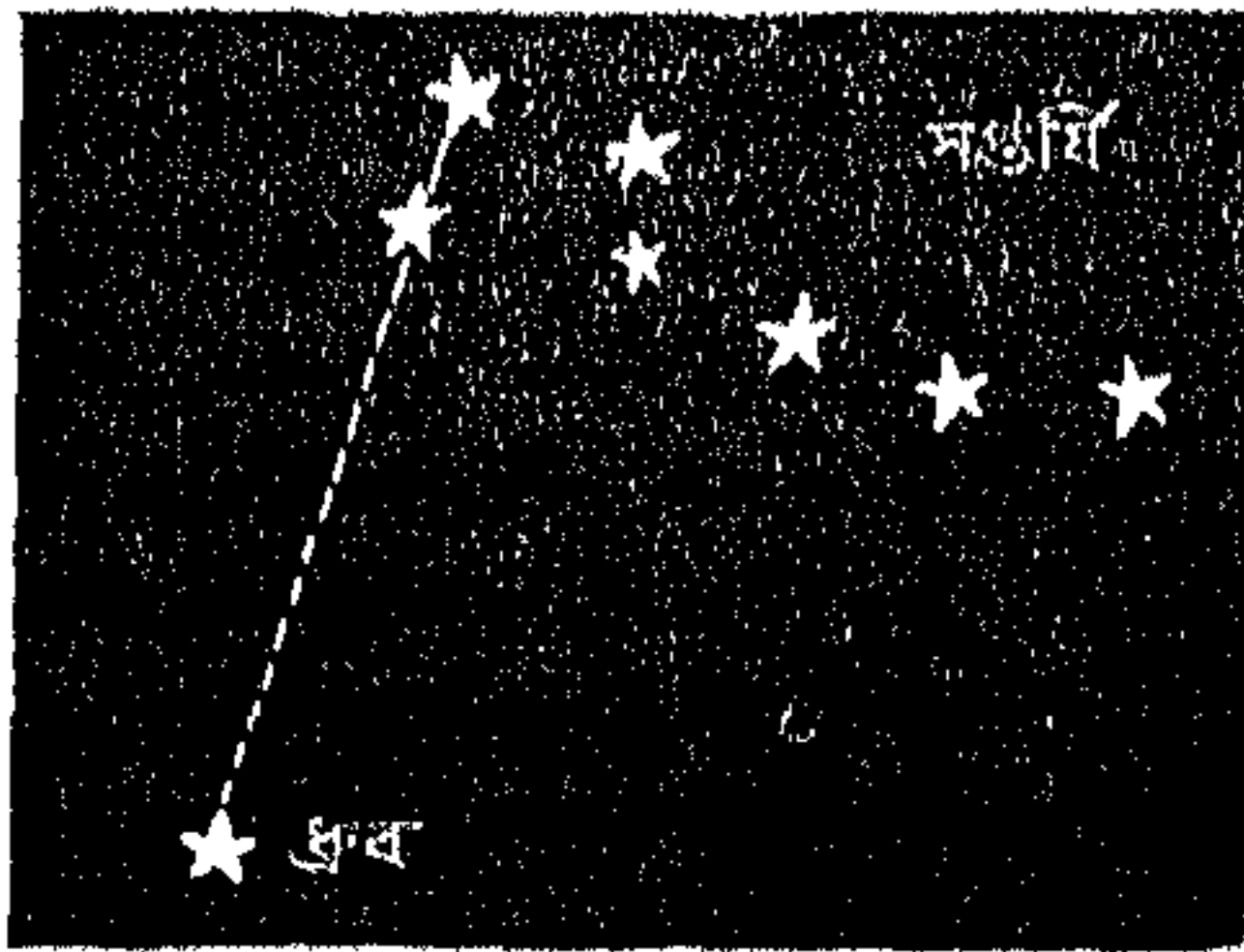


৭৩ চিত্র।—দিক্‌দর্শন ।

এই ৪ দিক বাতীত ৪টা কোণও শিখা দেওয়া আবশ্যিক । বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বা মেজেতে এইরূপ দাগ কাটিয়া রাখিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । দাগ কাটিবার সময় কম্পাসের সাহায্যে দিক ঠিক করিয়া লইতে হইবে । দুই তিন আনা হইলেই একটা ছোট কম্পাস পাওয়া যায় ।

যখন অঙ্ককার রাঁধে চন্দ্র থাকেন তখন কেমন করিয়া দিক ঠিক করিতে

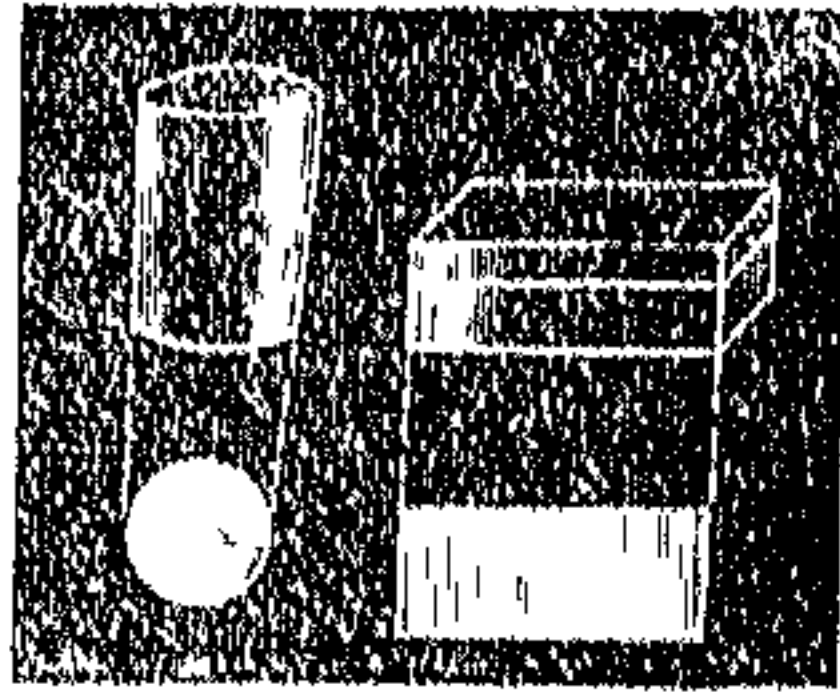
হইবে ? তখন ঐ ব নক্ষত্রের দ্বারা দিক নির্ধারণ করিতে পারা যায় । ঐ ব নক্ষত্র ঠিক করিতে হইলে সপ্তর্ষিমণ্ডল জানা আবশ্যিক । উত্তরের দিকে যে বড় বড় সাতটি নক্ষত্র নিম্নের চিত্রানুরূপ সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সপ্তর্ষিমণ্ডল কহে । এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা এক সঙ্গে এবং এইরূপ ভাবে সর্বদা সজ্জিত থাকে । ইহার প্রথম দুইটি নক্ষত্রকে, এক কল্পিত রেখা দ্বারা যুক্ত করিয়া, সেই বৈধিকে বর্দ্ধিত করিলে, যে একটি বড় নক্ষত্রকে (প্রায়) স্পর্শ করে তাহাকেই ঐ ব নক্ষত্র বলে ।



৭৪ চিত্র ।—একর ও সপ্তর্ষিগণ্ডম ।

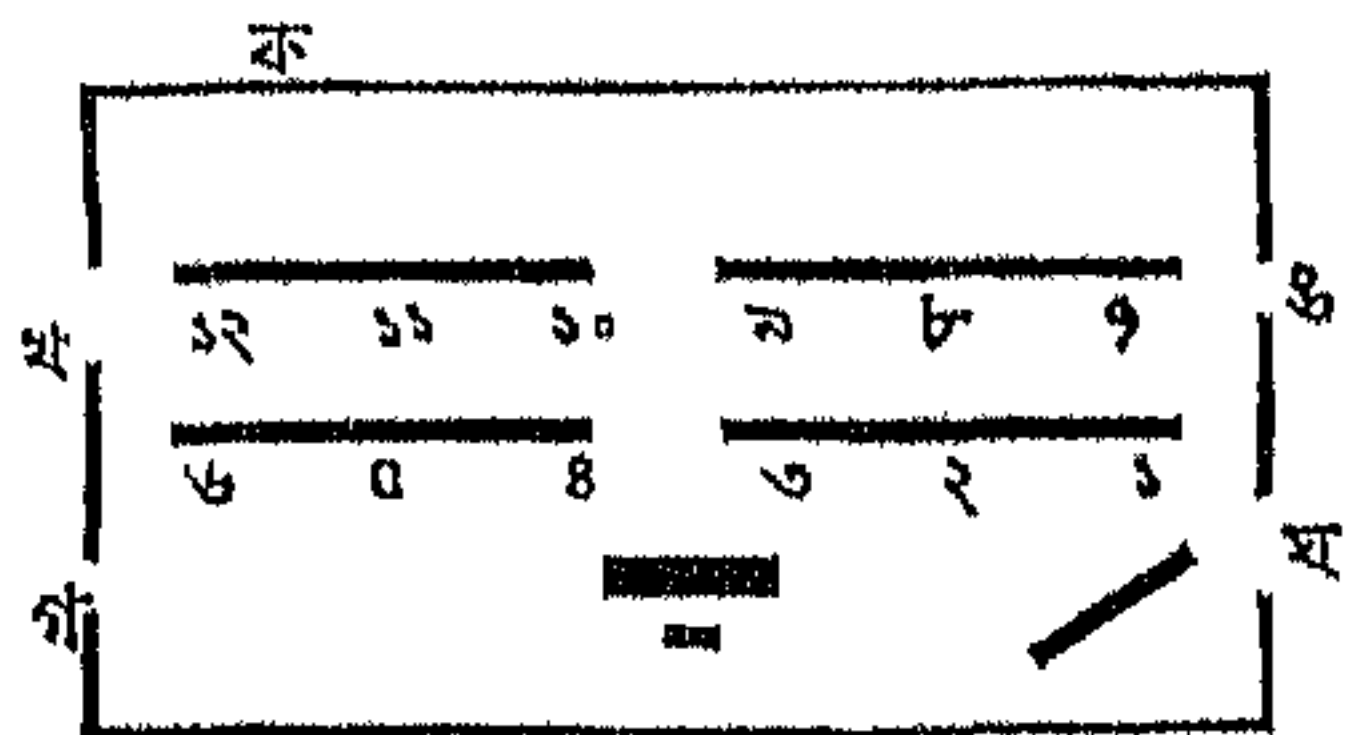
সপ্তর্ষি গণ্ডমকে বৃহৎ খাগ বা বড় ভল্লুকও বলা হইয়া থাকে । ট্রেপিজিয়াম ক্ষেত্রাকারে যে চারিটা নক্ষত্র সজ্জিত, সেইটা ভল্লুকের দেহ, আর তিনটা লেজ । এই সাতটা নক্ষত্রেই একর নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে । কিন্তু চমৎকারিত্ব এই যে, ইহার প্রথম দুইটা নক্ষত্র সংযুক্ত করিয়া, সেই রেখা বর্ধিত করিলে সকল প্রকার অবস্থাতেই একর নক্ষত্রকে (প্রায়) স্পর্শ করিবে ।

নক্সা বা প্লান ।—টেবিলের উপর একটা গেলাস ও একটা বাক্স রাখ । বোর্ডে গেলাসের ও বাক্সের ছবি আঁক । জিজ্ঞাসা কর, এই চিত্র দুইটা কি কি ? একটা গেলাসের ও একটা বাক্সের ছবি । টেবিলের উপর যে গেলাস আছে তাহার পাশ দিয়া, চকের দ্বারা টেবিলের উপর দাগ কাট, আর বাক্সের চারিদিক দিয়াও তদ্রূপ কর । এই দুইটা চিত্র, গেলাসের ও বাক্সের নক্সা । বোর্ডের উপরে ঐ দুই নক্সা আঁক । মাটির উপর একটা বস্তু যে স্থান অধিকার করে, সেই স্থানকেই সেই বস্তুর নক্সা বলে । বালকগণকে টেবিলের চারি ধারে



৭৫ চিত্র ।—বাগ ও গেজারের নমুনা ।

দাঁড়াইতৌ বল । তাহাদেব সম্মুখে টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া ঘরের নক্সা প্রস্তুত কর । যে দেয়াল যে দিকে আছে, যে দরজা যে দিকে, নক্সাতেও ঠিক সেই সেই দিকে, সে সকল দেয়াল দরজা, রেখা দ্বারা চিহ্নিত কর । দরজা, জানাণার স্থান ফাঁক রাখিয়া দাও । বালকগণকে নক্সার পরিচয় কবাও । তুমি “গ” দরজার কাছে যাও, তুমি “ঘ” দরজা দিয়া বাহিরে যাও, তুমি “খ” জানাণা দিয়া কাগজ ফেলিয়া দাও, ইত্যাদি । এই পর্য্যন্ত বোধ হইলে ঐ নক্সার মধ্যে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি, কেবল রেখার দ্বারা অঙ্কন করিয়া পরীক্ষা কর ।



৭৬ চিত্র ।—শ্রেণীর নক্সা ।

ভূমি ২১ চিহ্নে স্থানে গিয়া বস, গোমার বগিবার স্থান দেখাও, বোর্ডের কাছে গাও হওয়াদি । এখন এত কাগজ খানি বোর্ডের মধ্যে লাগাঠিয়া (উকবের দিন উপরে রাখিয়া,) বালকগণকে পুঙ্খবৎ পরীক্ষা কর । এত প্রকারে সমস্ত বিদ্যালয়গ্রহ ও গ্রাহকের নক্সা প্রস্তুত কর । প্রথম শিক্ষার সময় নক্সা কখনও বোর্ডে আঁকিও না । টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া যে দিকে যাহা ঠিক সেই দিকেই তাহা আঁকিবে । প্রথমে স্কেনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই ।

স্কেনের সাহায্যে নক্সা ।—উক্তরূপে বালকগণের নক্সা বিযয়ক সাধারণ জ্ঞান জ্ঞানিলে তাহাদিগের দ্বারাও ঐরূপ নক্সা প্রস্তুত করাইতে চেষ্টা করিবে । বালকেরা সম্ভবতঃ কেবল দৃষ্টির সাহায্য ঘরের দেয়াল ওলির সমানুপাত রক্ষা করিয়া চিত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে না । এই সময়ে স্কেনের আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে ।

বিদ্যালয়ে চেন কি ফিতা থাকিলে ভাল, নচেৎ দড়ির গায় কুটের চিহ্ন দিয়া বাইলেও কাজ চলিতে পারে । বালকেরা এই দড়ি দ্বারা ঘরের দৈর্ঘ্য মাপিবে । মনে কর ১৬ ফুট হইল । এখন এই ১৬ ফুট দেওয়ালের নক্সা কাগজে আঁকিতে হহলে ১৬ ফুট কাগজ চাই । এত বড় কাগজ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না, আর পাইলেও তাহা ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে । কাজেই ১৬ ফুটকে ছোট করিয়া আঁকিয়া লইতে হয় । ১ ফুটকে ১ ইঞ্চির সমান ধরিলে, ১৬ ফুট হ'ল ১৬ ইঞ্চি ; এখন ফুট স্কেল ধরিয়া একটা ১৬ ইঞ্চি রেখা আঁকিত কর । এতরূপে ঘরের প্রস্থ আঁকিয়া লও । মনে কর ১০ ফুট । স্ক্রুটার ১০ ইঞ্চি রেখা টানিলেই, ১০ ফুট রেখা দেখান হইবে । এইরূপে মাপিয়া দরজা জানালার স্থান নির্দেশ কর । ঘরের বিপরীত দিকের দেওয়াল ওলি যে সমান, বালকগণকে তাহা

দেখাইয়া দাও । নক্সায় একটি দৈর্ঘ্যের ও একটি প্রস্থের দেয়ান আকির্গেত তাতা সমান করিয়া পাপর দুটী দেয়ানও আকা বাঁতে পাৰে । যখন তেলীর কমা অক্ষন শিকার দেয়ান পাপ প্রাঙ্গণ সহ সমস্ত বিদ্যালয়েন নক্সা অক্ষন কমা আবশ্যক হইবে, তখন আবার ১ ফুটকে ১ ইঞ্চির সমান করিয়া লভলেও চাহবেনা । কাজে ১ ফুটকে ২ ইঞ্চি বা ৩ ইঞ্চির সমান ধরিয়া লভে হইবে ।

টার পাচ পয়সা করিয়া কাঠে। কেল কিনিতে পাওয়া যায় । বাঁশের কেল করিয়া নিম্নেও বেশ হয় । মোটা কাগজের উপর দাগ কাটিয়াও কাজ চলা মত কেল করা যায় ।

বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে কি তাহার অতি নিকটবর্তী ছুত তিনটী রাস্তা কিংবা হাট বাজার পর্য্যন্ত স্থানের নজা বালাকেরা মাপিয়া প্রস্তুত করিতে পারে । ইহার পর, গ্রামের নক্সা শিক্ষক নিজে প্রস্তুত করিয়া দেখাইবেন বা সার্ভে অফিস হইতে ক্রয় করিয়া লইবেন ।

নক্সায় কেল অঙ্কিত থাকে । ১ ইঞ্চি কত মাইলের সমান তাহা লেখা থাকে । এখন এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামের দূরত্ব বালাকেরা নিজের কেলের দ্বারা মাপিয়াই বলিতে পারিবে । বালাকগণকে এইরূপ মাপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । নদীর দৈর্ঘ্যের মাপ লইতে হইলে নক্সায় নদীর বক্র দাগের উপর সূতা বসাইয়া যাও । পরে সেই সূতা কেল দিয়া মাপিয়া লও ।

একখানা কাগজে ২ ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে কতকগুলি সমান্তর রূল (পেনসিল দিয়া) কাটিয়া লও । ২ ইঞ্চি যদি ১ ফুটের সমান ধরা যায় তবে এইরূপ কাগজে বিনা কেলের সাহায্যেই নক্সা অঙ্কিত করা যায় । একপ কাগজ কিনিতেও পাওয়া যায় । ছেলেদের পক্ষে এইরূপ রূল বাটা (চেক) কাগজ বেশ সুবিধাজনক ।

বন্ধুর-মানচিত্রাদি ।—এক মানচিত্র, ম্যেট, খালি বা কলাপাতার উপরোক্তা বালির দ্বারা আদর্শ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সেখানে পাহাড়াদি আছে, যে সকল স্থান বাধি দিয়া উঁচু কর; হ্রদ, বিনা প্রভৃতির স্থান গর্ত করিয়া রাখ; ছুরির দ্বারা নদীর পথ কাটিয়া দেও। পুটিন দ্বারাও বন্ধুর মানচিত্রাদি বেশ দেখান যায়। আঠাল মাটিতেও উন্নয়ন কাণ্ড করা যায়। কেহ কেহ বাধিব মানচিত্র করিয়া তাহার উপর নানা বর্ণের গুঁড়া দিয়া রঙ, করিয়া থাকেন। পুটিনের উপর পেন্সেল রং বেশ ধরে, মাটির উপর জলের রং (গঁদের আটার সহিত মিশান) দ্বারা কাণ্ড করিতে পারা যায়। পুটিনের কথা পরিশিষ্টে লেখা। বাণি বা কাদাব দ্বারা বালকগণ এইরূপ বন্ধুর মানচিত্রাদি প্রস্তুত করিলে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার স্থল জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

সূত্র শিক্ষণ ।—আঠাল মাটি বা পুটিনের দ্বারা নিম্নের নক্সারূপ একটা আদর্শ প্রস্তুত করিয়া পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ প্রভৃতির অর্থ শিখান যাউতে পারে। একখান চারি ছয় পয়সা দামের টানের খালা আবশ্যক।

খালার উপর জল ঢালিয়া দিলেই সাগর, হ্রদ, নদী প্রভৃতিতে জল যাইবে, স্থল ভাগ উঁচু থাকিবে। সূত্র মুখস্থ করাইবার আবশ্যকতা নাই। বালকেরা কথার অর্থ বুঝিলে ও আদর্শ দেখিতে পাইলে নিজেরাই সূত্র গড়িয়া লইতে পারিবে। না পারিলে অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে। তারপর যে সূত্র যখন আবশ্যক হইবে, সেই সূত্র সেই সময়েই শিখাইয়া লওয়া ভাল। পূর্বে কতকগুলি সূত্র বুঝা মুখস্থ করাইয়া কোন ফল নাই। কেহ কেহ সূত্র মুখস্থ করার আবশ্যকতা একবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। জিনিষের পরিচয় হইলেই হইল।

শিক্ষার ধারা ।—প্রথমে গ্রামের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে ।
গ্রামের বা মহকুমার বা জেলার মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ কর । বোর্ডের



১৬ চিত্র ।—সুত্রাদি শিক্ষাদানের আদর্শ ।

মধ্যস্থানে গ্রাম নির্দেশক একটা বিন্দু দাও । সেখান হইতে বাজারে
যাইবার পথ অঙ্কিত কর । গ্রামে উৎপন্ন কি কি জিনিস বাজারে
বিক্রয় হয়, কি বারে বাজার বসে, কোন্ কোন্ গ্রামের লোক সে
বাজারে আসে, অন্য স্থানে উৎপন্ন কি কি জিনিস বাজারে বিক্রয় হয়,
এ সমস্তের আলোচনা কর । তারপর গ্রামের যে দিকে নদী যেরূপ
ভাবে গিয়াছে তাহা জাঁক । সে নদী দিয়া কোন্ কোন্ প্রধান গ্রামে
যাওয়া যায়, নদীর স্রোত কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে যায়, বর্ষা-
কালে নদীর জল কতদূরে আসে, নদীতে বড় বড় কি মাছ পাওয়া
যায় ইত্যাদির আলোচনা কর । পাহাড় পর্বত নিকটে থাকিলে
তাহাও জাঁকিয়া দেখাও ও সে সকল পাহাড়ে কোন জাতি বাস

করে, কি কি নকশার বড় বড় গাছ আছে, পাহাড় কত উঁচু এ সকল বিষয় বলিয়া দাও। তারপর গ্রামের নিকটে যে সকল বড় বড় গ্রাম আছে সে সকলের স্থান নির্দেশ কর, আর সেই সকল গ্রাম সম্বন্ধেও ছ'চার কথা বলিয়া দাও। গ্রাম হইতে বহুদূর মহকুমায় যাত্রা কর। রাস্তার দু'ধারে যে সকল ঘানের, পাটের বা কলাঠর ক্ষেত্র দেখিতে পাঠবে তাহার বর্ণন কর। মান কখন বোনে, কখন কাটে, পাট ও কলাঠ কখন বোনে ও কখন কাটে তাহাও সংক্ষেপে বলিয়া দাও। তারপর মহকুমায় বা জেলায় গিয়া যাত্রা দেখিবে তাহা বর্ণনা কর। জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকে, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার থাকে, বড় বড় স্কুল থাকে, বড় ডাক ঘর থাকে। আর সেই জেলায় যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের যে ব্যবসায়, যে সকল ভাল জিনিষ তৈয়ারি হয় তাহা বলিয়া দাও। নদী দিয়া জেলায় যাইতে পারা যায় কি না? রেলের রাস্তা আছে কি না? জেলার মহকুমা কয়েকটীও দেখাইয়া দাও। কোন্ মহকুমায় কোন্ ভাল জিনিষ পাওয়া যায় তাহাও বলিয়া দাও। জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মহকুমায় যেক্ষেপে যাইতে হয় তাহা দেখাইয়া দাও। মহকুমার হাকিমেরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন। আবার বিভাগস্থ কয়টি জেলা একজন কমিশনারের অধীন তাহাও দেখাও ও বুঝাও। সেই সেই জেলায় কি কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, তাহাও বলিয়া দাও। আবার কমিশনারের অধীনস্থ জেলা কয়টির মহকুমাও শিখাও। তারপর সেই প্রদেশস্থ ছোটলাটের অধীনে যে সকল ডিভিসন ও সেই সকল ডিভিসনে যে সকল জেলা, কেবল তাহাই শিখাও। প্রত্যেক জেলার সর্বপ্রধান উৎপন্ন পদার্থের নামও শিখাইয়া দাও। নিজের প্রদেশ ভিন্ন অত্যাশ্চর্য প্রদেশের সকল গুলি জেলা শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। কেবল অত্যাশ্চর্য প্রদেশের প্রসিদ্ধ ছ'চারটি জেলার নাম অভ্যাস

করাও এবং গবর্ণর জেনারেলের অধীনে যে সকল প্রদেশ আছে তাহাদের নাম শেখাও । নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, প্রদেশের বড় বড় নদী, দেশের অতিবৃহৎ নদীগুলি শিখাইবে । পাঠ্য, পত্র, ইদ বিদ্যেও এইরূপ মত ।

নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশের একটা ছুটি তিনটা বা চারিটা করিয়া প্রধান নগর ও সেই সকল নগরী জাত সম্প্রদায়াদি বা আশ্চর্য্য পদার্থ জানিয়া রাখিতে হইবে । কলিকাতা হইতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান নগর যাইতে হইলে কোন পথে যাওয়া আবশ্যক তাহা দেখাইয়া দিবে । ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য এ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক । দেশ বিদেশ মধ্যস্থে যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে তাহার শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ কতক সময় সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

পৃথিবীর আকার ও গোলক ।—গানচিহ্নাদির শিক্ষার পর গোলকের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । পৃথিবীর আকার গোল । অনন্ত শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে । চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিও আকাশে ভাসিতেছে । আকাশের উপর, নীচ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ নাই । জামালকোট বা এরুং গাঁড়ের (স্থান বিশেষে ভেরেঙাও বলে) ডাল ভাঙ্গিয়া, একটা কাচুর পাতায় তাহার রস সংগ্রহ কর, একটা খড়ের অঙ্গুরী করিয়া, সেই অঙ্গুরীর মধ্যে এই রস লাগাইয়া ধীরে ফুঁ দাও । আকাশে গোল গোল অনেক ফুঁপড়ি উড়িতে থাকিবে । সাবান গুলিয়া, একটা নলের (বা পাট কাঠির) সাহায্যেও এইরূপ ফুঁপড়ি উড়ান যায় । বলিয়া দাও যে পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র শূন্যে এইরূপ উড়িতেছে । আমরা পৃথিবী হইতে ছুটিয়া যাই না কেন ? এ প্রশ্ন বালকেরা প্রায়ই করিয়া থাকে । আকর্ষণের কথা তাহারা ভাল বুঝিবে না । একটা বড় হাঁড়ির গায়ে পিপিলিকা

জাগিয়া থাকিলে, হাঁড়ি পূনাওলেও সে পিপীলিকা পড়ে না । এই দৃষ্টান্তের দ্বারাও আপাততঃ বুঝা যায় দেওয়া যাইতে পারে । অনেক ভাগ বেশী, অনেক ভাগ কম, ইহা বালককে গোলকে দেখাইয়া দাও ।

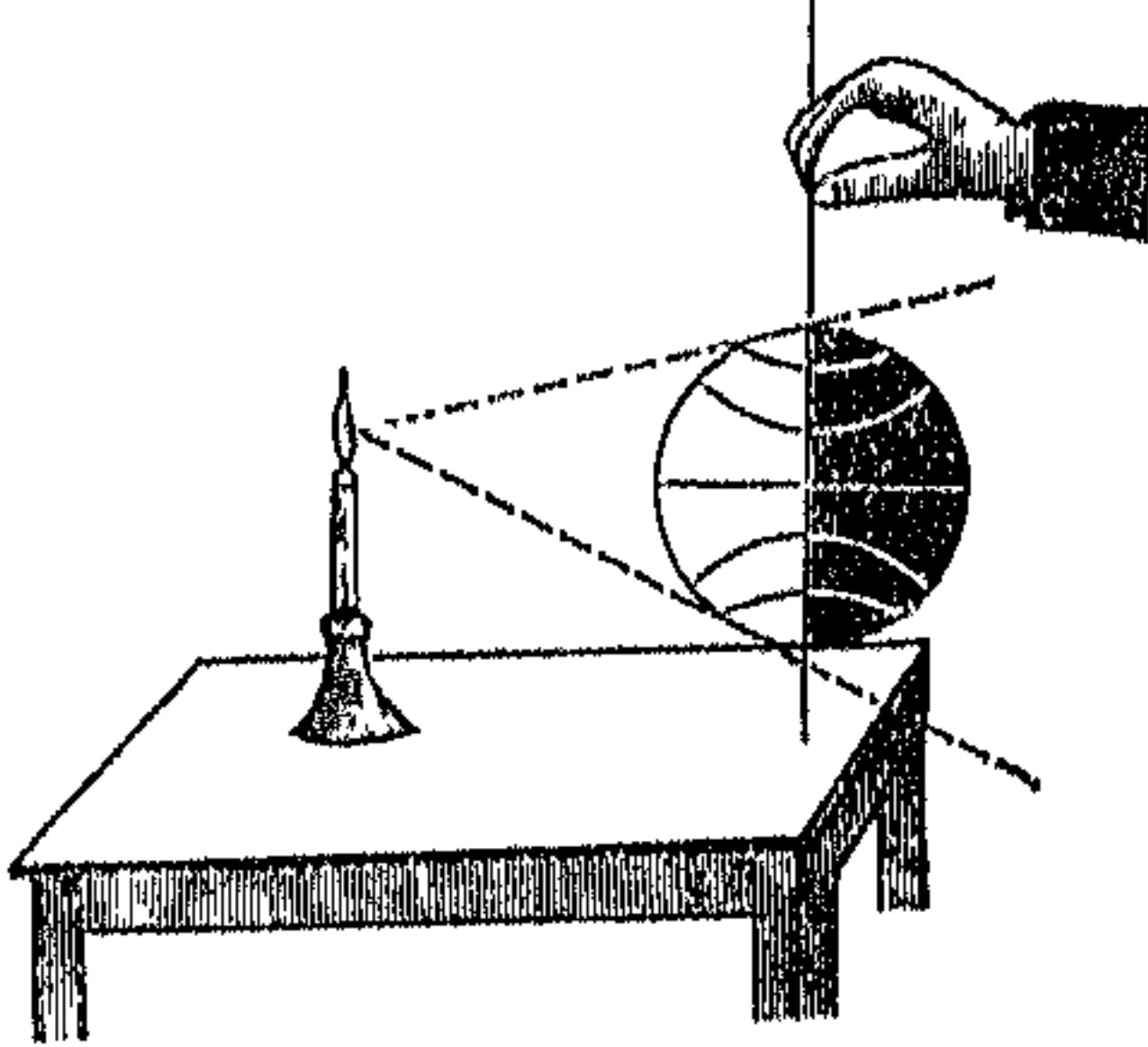
অক্ষরেখা জাঘিমা প্রভৃতি ।—একটা বাতাসি লেবুর (স্থান বিশেষে জাদুরা বলে) নোটের দিক দিয়া অপর দিক পর্যন্ত একটা শলাকা বিদ্ধ কর । পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ দিক দিয়া এইরূপ শলাকা কল্পনা কর । এই শলাকা নক শলাকাকেই মেরুদণ্ড বলে । শলাকার উপর বাতাসি লেবু ঘুরাইয়া দেখাও, পৃথিবীও এইরূপে ঘুরিতেছে । বিভিন্ন স্থানের দূরতা নির্ণয় করার জন্য গোলকের উপর কতকগুলি দাগ কাটা থাকে, উত্তর দক্ষিণে লম্বা দাগগুলিকে জাঘিমা (মাধ্যাহ্নিক রেখা) আর পূর্ব পশ্চিমে অক্ষিত সমান্তর রেখাগুলিকে অক্ষরেখা বলে । পূর্ব পশ্চিমে অক্ষিত রেখাগুলির মধ্যে যেটী ঠিক মধ্যস্থলে তাহাকে বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত বলে ।

এই বিষুব রেখাকে ৩৬০ ভাগে (এক এক ভাগের নাম ডিগ্রি) ভাগ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জাঘিমার রেখাগুলি টানা হইয়াছে । বিষুব রেখার নিকট পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল । তাহা হইলে বিষুব রেখার উপর ১ ডিগ্রি পরিমিত স্থানে $২৫০০০ \div ৩৬০ = ৬৯.৩৯$ এত মাইল স্থান আছে । বিষুব রেখার নিকট দুইটী জাঘিমার মধ্যে যতটা ফাঁক, যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই এই ফাঁক কম হইয়া যায় । সুতরাং দূরত্বও কম হইয়া আসে । মেরুর নিকট সব রেখা মিলিয়া গিয়াছে । আবার প্রত্যেক জাঘিমা-রেখাও ৩৬০ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ও তাহার মধ্য দিয়া অক্ষ বৃত্তগুলি অঙ্কিত হইয়াছে । গ্রীনইচের জাঘিমা-মাকে ০° ধরিয়া অপর সকল জাঘিমা (পূর্ব পশ্চিমে) গণনা করা হয়, ইহাও বলিয়া দিতে হইবে । ৩৬০টী রেখা টানিলে বড়ই অপরিষ্কার দেখায় বলিয়া সাধারণতঃ ৩৬টী রেখা টানা হয় । সুতরাং ২টী জাঘিমার

মধ্যে দাঁক $৬৯.৩৮ \times ১০ = ৬৯৩.৯$ (প্রায় ৬৯৪) মিনিট। আবার দুইটি জাঘিয়ার মধ্যে সময়ের তফাৎ (২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৪৪০০ মিনিট $- ৩৬০ = ৪$ মিনিট) ৪ মিনিট, ১০টীর মধ্যে ৪০ মিনিট, ১৫টি জাঘিয়ার মধ্যে তফাৎ ৬০ মিনিট অর্থাৎ ১ ঘণ্টা। জাপান আন কলিকাতার মধ্যে প্রায় ৫০টি জাঘিয়ার দাঁক। সুতরাং জাপানে সূর্যোদয় হইবার প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে কলিকাতায় সূর্যোদয় হইয়া থাকে। জাপানে যখন প্রাতঃকালে লোকজন কাগো ব্যস্ত, কলিকাতায় তখন শেষ রাত্রিতে বালকগণ নিজায় আচেতন। আবার কলিকাতায় সূর্যোদয়ের প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে দাওনে সূর্যোদয় হয়। বালকগণকে বিভিন্ন স্থানের সূর্যোদয়ের কাল নির্ণয় করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিতে হইবে। ইহাও পর কর্কট-ক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি ও শ্রাবণ মণ্ডলগুলির পরিচয় করানও আবশ্যিক। এ সমস্তই যে কাল্পনিক রেখা, বিদ্যালয়ের গোলকের উপরই আঁকিত থাকে, পৃথিবীর উপরে একরূপ কোনও রেখা নাই তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবে।

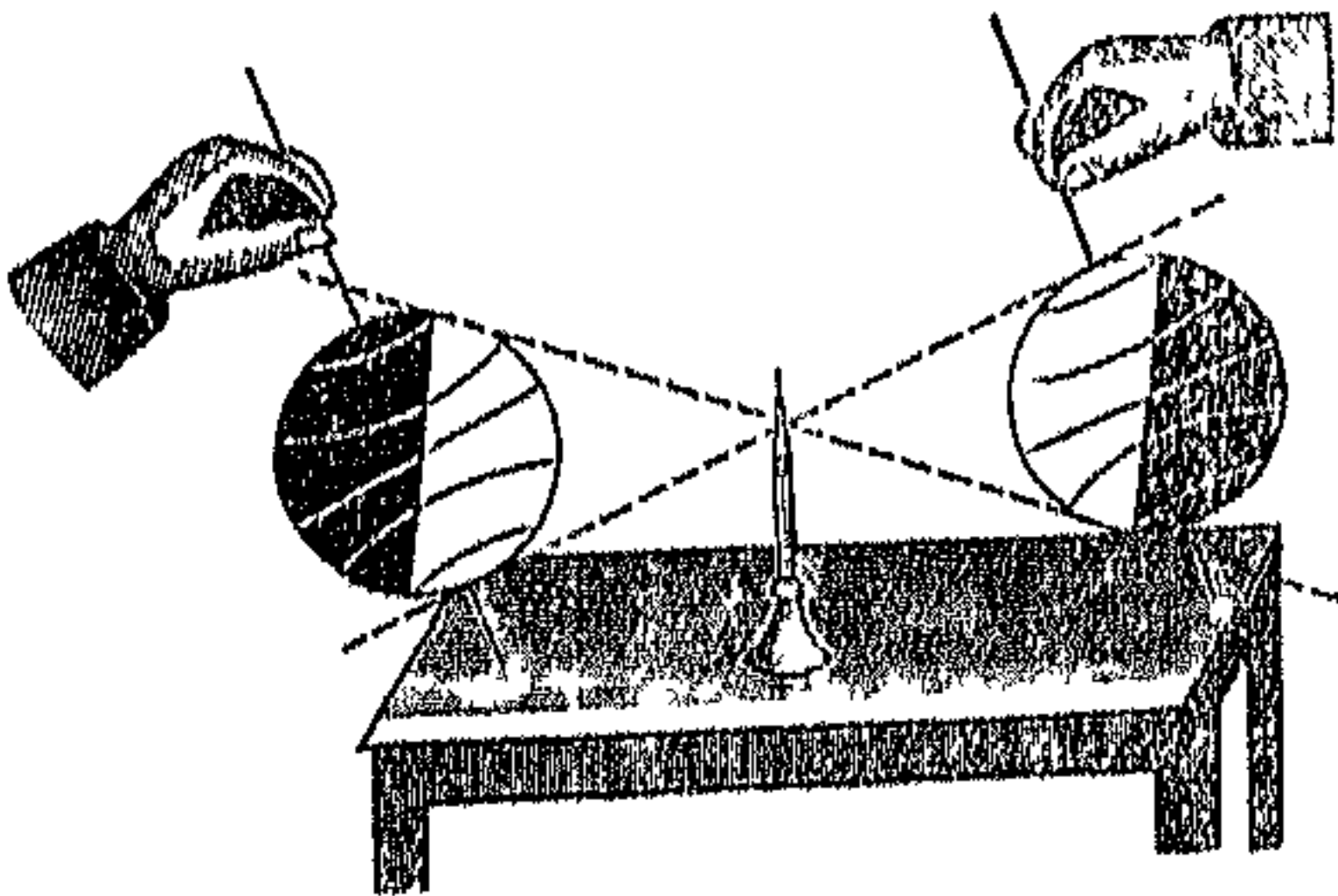
দিবা রাত্রি।—যদি বিদ্যালয়ে গোলক থাকে ভাল, না থাকিলে একটা বাতাবী লেবুর (জাম্বুনার) গণ্ড দিয়া একটা শলাকা বিদ্ধ করিয়া লও। টেবিলের উপর কলকার ছিদ্রের মধ্যে একটা বাতি জালিয়া রাখ। লেবুটির উপর এক স্থানে একটা আল্পিন পুত্ৰিয়া রাখ, যেন সেইটী একজন মানুষ। আন চকের দ্বারা লেবুর উপর বিষুব রেখাটীও আঁকিয়া রাখ। বাতি হইতে প্রায় দুই হাত দূরে, শলাকা বিদ্ধ লেবুটী (শলাকা টেবিলের সহিত দৃঢ় ভাবে ধরিয়া) ধীরে ধীরে ঘুরাওতে থাক। যে অংশ বাতির দিকে থাকিবে সেই অংশে আলো পাঠিবে, অপর অংশ অন্ধকারে থাকিবে; আবার ঘুরাওতে অন্ধকার অংশ ধীরে ধীরে আলোতে আসিবে ইত্যাদি রূপে ছিত্রহন, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি বুঝাইয়া দাও। কিন্তু মেরদওকে এইরূপ লব্ধ ভাবে ধরিয়া পৃথিবী ঘুরাইলে মেরুদণ্ডেও

ও রাত্রি সমান হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিছু তাহা হয় না । যাহারা
এ নিকট বাস করে, তাহারা বলে যে সেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস



৭৮ চিত্র—সমান দিন রাত ।

২। তাহা হইলে পৃথিবীকে কিরূপ ভাবে আলোকের সম্মুখে ধরিলে,
কপ ঘটনা ঘটতে পারে তাহাই দেখা যাউক ।



৭৯ চিত্র ।—দিব রাত্রি সম হইক ।

৭৯ চিত্রাঙ্কপে গোণকটী বামপাশে দানিলো দেখা যাইবে যে, ঐ অবস্থায় গোণক খুবাইগে উত্তর মেরুতে আলো যাইবে না ও দক্ষিণ মেরুতে কখন অন্ধকার হইবে না । সূর্য্য পৃথিবী সূর্য্যের সম্মুখে ৬ মাস এত অবস্থাতে থাকে । এখন আবার গোণকটীকে আলোর অপব পার্শ্বে সরাইয়া আন । গোণক ঠিক ঐকপেত ঘনিয়া রাখ । এখন দেখিবে যে বাতির আলো উত্তর মেরুতে পড়িল, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অন্ধকারে থাকিল, যুরাইলোও আর দক্ষিণ মেরুতে আলো যাইবে না, ও উত্তর মেরু অন্ধকারে পড়িবে না । সূর্য্য পৃথিবী অপর ৬ মাস এইরূপ ভাবে সূর্য্যের দিকে অবস্থান করে । বিয়ুৰ বেখান উত্তর পার্শ্বস্থ কতক স্থানে উত্তর অবস্থাতেই সম্পূর্ণ আলোক পাঠিয়া থাকে ; এই অংশ তাপও অধিক পৰিমাণে পায় বলিয়া এই অংশকে গ্রীষ্মমণ্ডল কহে । যে অংশ অল্প অল্প আলোক ও তাপ পায় তাহা নাতিশীতোষ্ণ, আর যাহা ৬ মাস একেবারেই তাপ ও আলোক পায় না তাহাকে শীতমণ্ডল কহে । কর্কট-ক্রান্তি মকর-ক্রান্তিরেখা দুইটী দেখাইয়া দাও ।

মানচিত্রে শিক্ষা । —বালকগণকে এই সমস্ত লক্ষ্য করিতে বল : ইউরোপের উপকূলভাগ বেশী । সমুদ্রপথে প্রায় স্থানেই যাতায়াত করা যায় । এই অঞ্চ ইউরোপ বাণিজ্যপ্রধান । এমিয়ার উপকূল ভাগ ইউরোপ হইতে কম, আফ্রিকার উপকূল ভাগ বড়ই কম—অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র হইতে দূরে । উপদ্বীপগুলি প্রায়ই দক্ষিণে বিস্তৃত যথা—কামস্কাট্কা, মালয়, ভারতবর্ষ, ইতালী, গ্রীস, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি, কেবল ডেনমার্ক উত্তরে প্রসারিত । উপসাগরগুলিও প্রায়ই উত্তর দক্ষিণে লম্বাকৃতি—পাবল সাগর, শ্যামসাগর, আড্রিয়াটিক সাগর, বাল্টীক সাগর, ইত্যাদি । দেশের উপকূল ভাগ প্রায়ই পৰ্ব্বতময়—সমুদ্রের ঘাতপ্রতি-ঘাতে তাহার সহজে পরিবর্তন ঘটে না । হিন্দুকুশ পৰ্ব্বতকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার বড় বড় পৰ্ব্বতগুলি চারি দিকে বাসার্কের মত বিস্তৃত হইয়াছে ।

এশিয়ার মনাদেশ ঘূর্ণ উচ্চ, গাঁঠ নদীগুলি এই মনাদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া চারি দিকে গড়াচয়া পড়িয়াছে ; যথা—ওবি, ঠনিমে, সেনা, এই মনাদেশ হইতে উমিয়া উত্তর সাগরে পড়িতেছে । ইয়াং সিকিয়াং, হংকং প্রভৃতিও এই মনাদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্বে প্রশান্ত সাগরে পড়িয়াছে । মনাম, হরাবগী, লক্ষপুত্র, সিন্ধু প্রভৃতি এইরূপে ভারতসাগরে পড়িয়াছে । ভারতবর্ষের দক্ষিণাত্য প্রদেশ আর্ঘ্যাবর্ত হইতে উচ্চ । আবার দক্ষিণাত্যের বহু উপকূল মাক্রাজ উপকূল হইতে উচ্চ । এই জল মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি মাক্রাজ উপকূলেই পড়িয়াছে । গঙ্গা ও সিন্ধুর মোহনা দুইটি খুব নীচ স্থান, এই জল এই দুই নদী মোহনাব নিকট অনেক মুখে বিভক্ত হইয়াছে । হিমালয় পর্বত সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত, আবার সাগর ও বঙ্গ উপসাগরের বাষ্প হিমালয় ঢাড়াচয়া তিব্বতে যাঠতে পারে না বলিয়া তিব্বতে বৃষ্টি হয় না । আবার আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বেশি বৃষ্টি হয় । ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ সমুদ্রে ঘেবা, উত্তরাংশ পর্বতে ঘেরা, শত্রু সহজে আক্রমণ করিতে পারে না । কেবল পশ্চিমাংশে কয়েকটি গিরিসঙ্কট আছে ; সেই পথেই আক্রমণকারিগণ ভারতে আগমন করিয়াছিল । সাহারা মরুভূমি এককালে ভূমধ্য সাগরের অংশ ছিল, কালক্ৰমে গাথরাব বালুকায় সমুদ্রজাত জীবজন্তুর যথেষ্ট কঙ্কাল পাওয়া যায় । আগ্নেয় গিরিগুলি প্রায়শঃ সমুদ্রের নিকট অবস্থিত । কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া আগ্নেয় গিরির শ্রেণী যাবাহীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ; আবার আর এক শ্রেণী আগ্নেয় গিরি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত । মনে হয় যেন পৃথিবী একটি আগ্নেয় গিরির মালা পরিয়া বহিয়াছে । এইরূপে প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষত্বের দিকে বালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করান কর্তব্য । নীত গ্রীষ্মাদির ভারতমা বুঝিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা আবশ্যিক ।

ভূগোলের পাঠ মুখস্থ করাইবার প্রণালী ।—ভূগোলের বিবরণ যেমন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক, সেইরূপ পট্টাঙ্কার জন্ত ভূগোলের নাম গুলি মুখস্থ করানও আবশ্যিক । পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নাম গুলি অভ্যস্ত করাইতে হইবে । নিম্নে নগর শিখাইবার প্রণালী প্রদত্ত হইল । অষ্টাশ্র পাঠও এইরূপ প্রণালীতে শিখাইতে হইবে ।

মনে কর ইংলণ্ডের প্রধান নগর শিখাইতে হইবে । বোর্ডে ইংলণ্ডের মানচিত্র অঙ্কিত কর, এবং তাহাতে একটী একটী করিয়া নগরের চিহ্ন দাও ও নাম লেখ এবং সেই সেই মহর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মোটামুটি বিবরণ বল যথা :—(বোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্রে লণ্ডন মহরের স্থান নির্দেশ করতঃ, নগর-জ্যাপক-বিন্দু চিহ্ন দিয়া ও লিখিয়া) লণ্ডন মহর এইখানে—টেম্‌স নদীর উপর, আয়তনে ও ঐশ্বর্য্যে এত বড় মহর পৃথিবীতে আর নাই । আমাদিগের রাজা এই নগরে থাকেন । এইখানে পার্লামেন্ট নামক সম্রাট সভার বৃহৎ বাড়ী আছে (পার্লামেন্ট গৃহের ছবি দেখাও) টেম্‌স নদীরানীচে ৮০০ শত হাত দীর্ঘ সড়ক আছে :—“উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর”—লণ্ডন মহর একটী বড় বন্দর, সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, এই মহরের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ (কলিকাতা, লণ্ডন, পিঙ্কিন, চিকাগো, প্যারিস ও বার্লিন নগরের লোকসংখ্যা জানা আবশ্যিক)

এই লিডারপুল মহর—একটী বড় বন্দর—এইখানে তুলার আমদানি হয়—আর এখান হইতে আমাদিগের দেশে লবণ রপ্তানি হয় ।

এই ম্যানচেষ্টার মহর—আমাদিগের দেশের ব্যবহার্য্য বস্ত্র চাদর কাপড় এইখান হইতে আসে । এখানে অনেক কাপড়ের কল আছে । একটী বড় এঞ্জিনের সঙ্গে হাজার হাজার তাঁত জোড়া থাকে । সেই এঞ্জিনের জোরে এক সঙ্গে অনেকগুলি তাঁত চলে ও এক সঙ্গে অনেক কাপড় প্রস্তুত হয় বলিয়া বিলাতী কাপড় এদেশে আসিয়াও সম্ভার বিক্রয় হয় । (কাপড়ের কলের ছবি দেখাও) ।

এই সেফিল্ড মহর—এইখানে খুন্স ভাল ভাল ছুরী, কাঁচী, গুর প্রস্তুত হয় । (সেফিল্ড লেখা একখান ছুরী কি কাঁচী দেখাও)

এই অক্সফোর্ড ও এই কেমব্রিজ—এই দুইটী মহরে ইংলণ্ডের দুইটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়—অক্সফোর্ডে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতির আলোচনা হয় ও কেমব্রিজে গণিত শাস্ত্রের আলোচনা হয় । আমাদিগের আনন্দমোহন বসু (পরান্জেলপোর নামও কর) কেমব্রিজে শিক্ষাগ্রাভ

করিয়াছিলেন । আর আমাদের বহুভাষা ও বহুবিধ পণ্ডিত হইয়াও দে কল্পনাতে শিক্ষা প্রাপ্ত ।

এই নিম্নোক্ত বন্দন—এখানে রাজা রামমোহন রায়ের (রামমোহন রায়ের গঙ্গা বন) হুত্ব হয়—এখানে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে ।

এইটী গিনউইচ সহর—এইখানে ইংরেজ জ্যোতির্বিদগণের মানমন্দির আছে । হিন্দুদিগের মানমন্দির কাশীতে ছিল ।

এইরূপে আরও তার টী (ডোভর, বার্মিংহাম, প্রিন্স, নিউকাসেল) সহরের বর্ণনা করা যাইতে পারে । ইংলণ্ডের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট বলিয়াই ইংলণ্ডের এতগুলি নগর শিক্ষা করা আবশ্যিক । কিন্তু অসংখ্য দেশের ২৪টি প্রধান নগর শিখিলেই যথেষ্ট হইবে ।

বোর্ডের মানচিত্রে এই সহর গুলি উত্তমরূপে লেখা হইয়া গেলে বালকগণকে বোর্ড লিখিত এক একটা সহরের নাম পড়িতে বল ও তাহার বর্ণনা করিতে বল । বালকগণ অবশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবে । ‘ম্যান্চেষ্টারে কাপড় প্রস্তুত’ হয় বলিলেই এ সহরের যথেষ্ট বর্ণনা হইবে । এইরূপ সকল সহরের বর্ণনা হইয়া গেলে, সহরের নাম গুলির আদ্যাঙ্গর মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ পুছিয়া ফেল । লণ্ডনের ল, লিভারপুলের লি, ম্যান্চেষ্টারের ম্যা রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ পুছিয়া ফেল । এখন আবার বালকগণকে পূর্বের ছায় এক একটা সহরের নাম করিতে বল ও বর্ণনা করিতে বল । ইহার পর আদ্যাঙ্গরগুলিও পুছিয়া ফেলিয়া কেবল সহরের বিন্দু চিহ্নগুলি রাখ । পূর্বরূপ সহরের নাম করিতে বল ও বর্ণনা করিতে বল । তারপর বিন্দুগুলিও পুছিয়া দাও ও বালকগণকে সহরের স্থান ঠিক করিয়া বিন্দু দিতে বল ও নাম করিতে বল । ইহার পর বালকগণকে চক্ষু মূদ্রিত করিয়া সহরের নাম করিতে বল । এইরূপ বাহিরের চিত্র অন্তরে চালনা করিতে হয় । কিন্তু একদিন এ বিষয় শিক্ষা দিয়াই যেন শিক্ষক একথা মনে না করেন যে ইংলণ্ডের নগর বিষয়ে তাঁহার

বালকগণ পাকা হইয়া গেলে । বার বার আন্দোচনা না করিলে, কিছুতেই মনে থাকিতে পারে না । স্মরণার্থে বৎসরে প্ৰত্যেক পাঠের অন্তঃ (মধ্য শ্রেণীর জন্য) ৫৭ বার আন্দোচনা হওয়া আবশ্যিক ।

বালকগণ প্রত্যেক দিন নিজস্বত মানচিত্রে পাঠের বিষয় সন্নিবেশিত করিবে । এইসকল ভূগোল শিক্ষায় মানচিত্রাঙ্কন শিক্ষা নিতাস্তই প্রয়োজন ।

মানচিত্রাঙ্কন ।—চিত্রাঙ্কন শিক্ষার “চিত্রাঙ্করণ” পদ্ধতিতে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, মানচিত্রাঙ্কনেও তাহা অঙ্গুলরণ করিতে হইবে । মুদ্রিত ভূচিত্রাবধীর মানচিত্রে দৃষ্টে তদনুরূপ মানচিত্র অঙ্কন করা, চিত্রাঙ্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । তবে পরীক্ষার সময় মানচিত্রাঙ্কনের প্রশ্ন হইয়া থাকে, সে সময়ে কোনও আদর্শ প্রদত্ত হয় না, নিজের স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই মানচিত্র অঙ্কন করিতে হয় । সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ আবশ্যিক ।

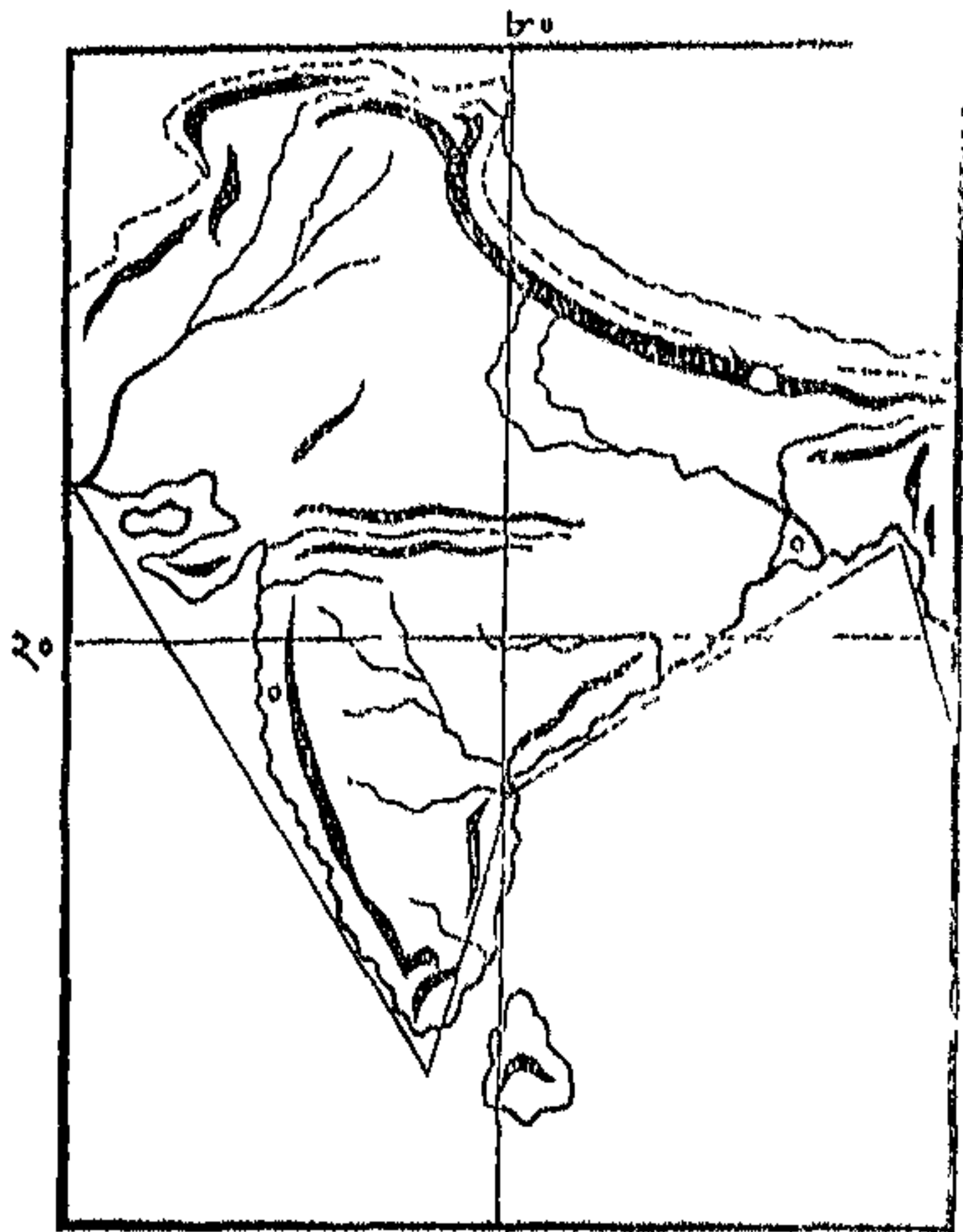
(১) পরীক্ষার কাগজে যে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হয়, তাহার আয়তন লম্বায় ৭ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ পরিমাণ হইলেই চমিতে পারে । কাগজে প্রথমে এইরূপ মাপে, চারিদিকে কালী দিয়া একটু গোটা করিয়া বরডার (পাড়) টানিয়া লইবে । একটা রেখা দিলেই হইবে । দুইটা রেখা দিবার প্রয়োজন নাই । কখনও বরডার ভিন্ন মানচিত্র আঁকিবে না । বরডারে সে কেবল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, কাজেরও সুবিধা হয় । এই বরডারের দীর্ঘ প্রস্থ রেখা সমান্তরাল করিয়া প্রথমে একটা করিয়া অক্ষরেখা ও জাঘিমা টানিয়া দাঁটতে হয় ।

(২) মানচিত্র অঙ্কন কালে অক্ষরেখা ও জাঘিমা শুনি টানিয়া লইলে মানচিত্র অঙ্কনে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । তবে কথা এই যে পরীক্ষার জন্য এত অক্ষরেখা ও জাঘিমা মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর নয় বলিলেও হয় । কিন্তু পরীক্ষায় সাধারণতঃ যে সকল মানচিত্র

অঙ্কিত করিলে দেওয়া হয় যে সকলের অক্ষরেখা ও জাতিমা মনে রাখা বিশেষ কঠিন কাজ নহে । পৃথক মানচিত্রে সমস্ত রেখার অক্ষ মনে রাখিবার আবশ্যকতা নাই । কেবল ঠিক মধ্য অক্ষরেখা ও ঠিক মধ্য জাতিমা মনে রাখিবেই চলিবে । ৮০ চিত্রে ঠিক মধ্য অক্ষরেখা ও ঠিক মধ্য জাতিমা মনে রাখা প্রদর্শন হওয়াতে । এত ছোট ঠিক আকিলেই অপর জলি দিতে পারা যায় । গিনউইচ তঁতৈ মন পুর্বে যাঁতৈতে ৩৩ই জাতিমা ১০, ২০, ৩০, ৪০, করিয়া বাড়িয়া যাঁতৈতে, আবার বিষুব রেখার মন উত্তরে যাঁতৈতে ১০, ২০, ৩০, ৪০, করিয়া অক্ষরেখার অক্ষ বাড়িয়া যাঁতৈতে । ইহা মনে রাখিলে আর সকল অক্ষই দিতে পারা যায় । মাহা হউক সমস্ত অক্ষরেখা ও জাতিমা না টানিলেও অসুতঃ মধ্য রেখা ছোটী অক্ষন করা নিতান্তই আবশ্যক । আর সেই ছোটীর অক্ষ ও বর্ডারের বাহিরে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক । তাহা না করিলে মানচিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । বর্ডারের রেখা একটু মোটা করিতে হইবে, কিন্তু অক্ষরেখা ও জাতিমাগুলি খুব সর হইবে ।

মধ্য অক্ষরেখা ও জাতিমাগুলি একটু মঞ্চিতে মনে রাখিতে হয় যথা—ভারতবর্ষের মধ্য জাতিমা ৮০, অক্ষ ২০ (ছোটী শূন্য) আফ্রিকা ২০ আর ০ (এও ছোটী শূন্য) দক্ষিণ আমেরিকার ৬০ আর ২০, অস্ট্রেলিয়া ১৩৫ আর ২৫ (ছোটী ৫), ইতালীর ১২ আর ৪২ (ছোটী ২), চীনদেশের ২ আর ৫৩ (৫ আর ৩ এর বিয়োগ ফল ২), চীন সাম্রাজ্যের ১০৫ আর ৩৫, জাপানের ১৪০ আর ৪০, ভূমধ্য সাগরের ১৫ আর ৩৫ । পরীক্ষায় জানিই এই সকল মানচিত্র অক্ষন করিতে দেওয়া হইয়া থাকে । এ সকল ছাড়া বঙ্গদেশ বা পূর্ববঙ্গ ও আগামের মানচিত্রও আঁকিতে দেওয়া হয় (২৩ ও ৮৬, ২৫ ও ৯১) ।

(৩) সরল রেখাদি টানিয়া মানচিত্রকে মোটামুটি রকমের একটা সরল তৈরিক ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিলে, আঁকিবারও সুবিধা হয় আর মনে রাখিবারও সুবিধা হয় । নিম্নে ভারতবর্ষের মানচিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল ।



৮০ চিত্র । মানচিত্রাক্ষন ।

সিদ্ধ দেশের নিকটস্থ বরডার ৩ অংশে, তার নীচের অক্ষরেখা ৪ অংশে, তার নীচের জাখিয়া ৪ অংশে ও তার উপরের অক্ষরেখাংশ ২ ভাগে ভাগ করিয়া যেকোনো রেখা সংযুক্ত হইয়াছে তাহা এবং অষ্টাষ্ট বিন্দু ও রেখা লক্ষ্য কর । ছুই তিন দিন দেখিয়া অভ্যাস করিলেই মনে থাকিবে । এ সমস্ত চিত্র অবশ্য প্রথমে পেনসিলের দ্বারা খুব পাতলা করিয়া আঁকিতে হইবে । তারপর মানচিত্র শেষ হইলে রবার দিয়া পুঁছিয়া ফেলিবে ।

(৪) মানচিত্র প্রথমে পেনসিলে আঁকিবে, পরে কালি দিবে ।

সমুদ্রের দ্বারা একটু মোটা করিয়া দাগ দিবে । মানচিত্রের মধ্যে দেশ বিভাগ করিতে হইলে, সে রেখাগুলি মন করিয়া দিবে বা বিন্দু বিন্দু করিয়া দিবে ।

(৫) পক্ষান্তের স্থানে মোটা কালির দাগ দিবে, প্রসিদ্ধ শৃঙ্গের স্থান গুলি সঁক রাখিবে । নদীর রেখা গুলি অঁকা বঁকা করিয়া দিবে । নদীর রেখা উপত্যকার নিকট মন হইবে ও যতই সমুদ্রের নিকট আসিবে ততই একটু করিয়া মোটা হইবে । কিন্তু বেশী মোটা না হয় । নগরগুলির স্থানে এক একটা বিন্দু দিয়া রাখিবে ।

(৬) নগর, নদী, পক্ষান্তের নাম গুলি ছাপার মত করিয়া লিখিবে । জড়া করিয়া লিখিও না । লেখা সুন্দর না হইলে মানচিত্র ভাল দেখাইবে না । মানচিত্রের নামটী এক কোনে বড় অক্ষরে সুন্দর করিয়া লিখিবে ।

(৭) পরীক্ষার মানচিত্রে কোনরূপ রঙ ব্যবহার করিবে না । পরীক্ষক মনে করিবে যে তুমি তাঁহাকে রঙ দিয়া ভুলাইয়া, তোমার অক্ষনের ক্রটি চাকিতে চেষ্টা করিয়াছ ।

(৮) মানচিত্র খুব পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক । রবার দিয়া পেন্সিলের দাগ তুলিতে গিয়া কাগজের সম্বন্ধ নষ্ট করিবে না বা পেন্সিলের দাগ দিয়া সমস্ত কাগজ ময়লা করিবে না । যদি কোন কারণে কাগজ খানি ময়লা হইয়া যায়, তবে তোমার এই ময়লা মানচিত্রের শুদ্ধ রেখাগুলির উপর একটু জোরে পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিলে, (খাতার) নিম্নের কাগজে একটা সাদা দাগ পড়িয়া যাইবে । ময়লা কাগজখানি ভাঁজিয়া রাখ ও এই নিম্নের কাগজের দাগের উপর সাবধানে কালি দিয়া মানচিত্র অঙ্কন কর ।

(৯) খুব কঠিন মানচিত্র হইলেও, পরীক্ষাগৃহে মানচিত্রাঙ্কনে অধিক দীর্ঘকাল বেশী সময় ব্যয় করিবে না ।

ভূগোল শিক্ষাদানের ধারাবাহিক প্রণালী ।—মনে কর মি ক্রীষ্টি জেগার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জলটপ থানার এলাকা-

ধীন দিঘারপার গ্রামাঙ্ক ৭ বিদ্যালয়ের শিক্ষক । এখন কোর্টকে যে
ধারা অনুসারে ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে, নিম্নে তাহার এক প্রদর্শিত
হইল :—

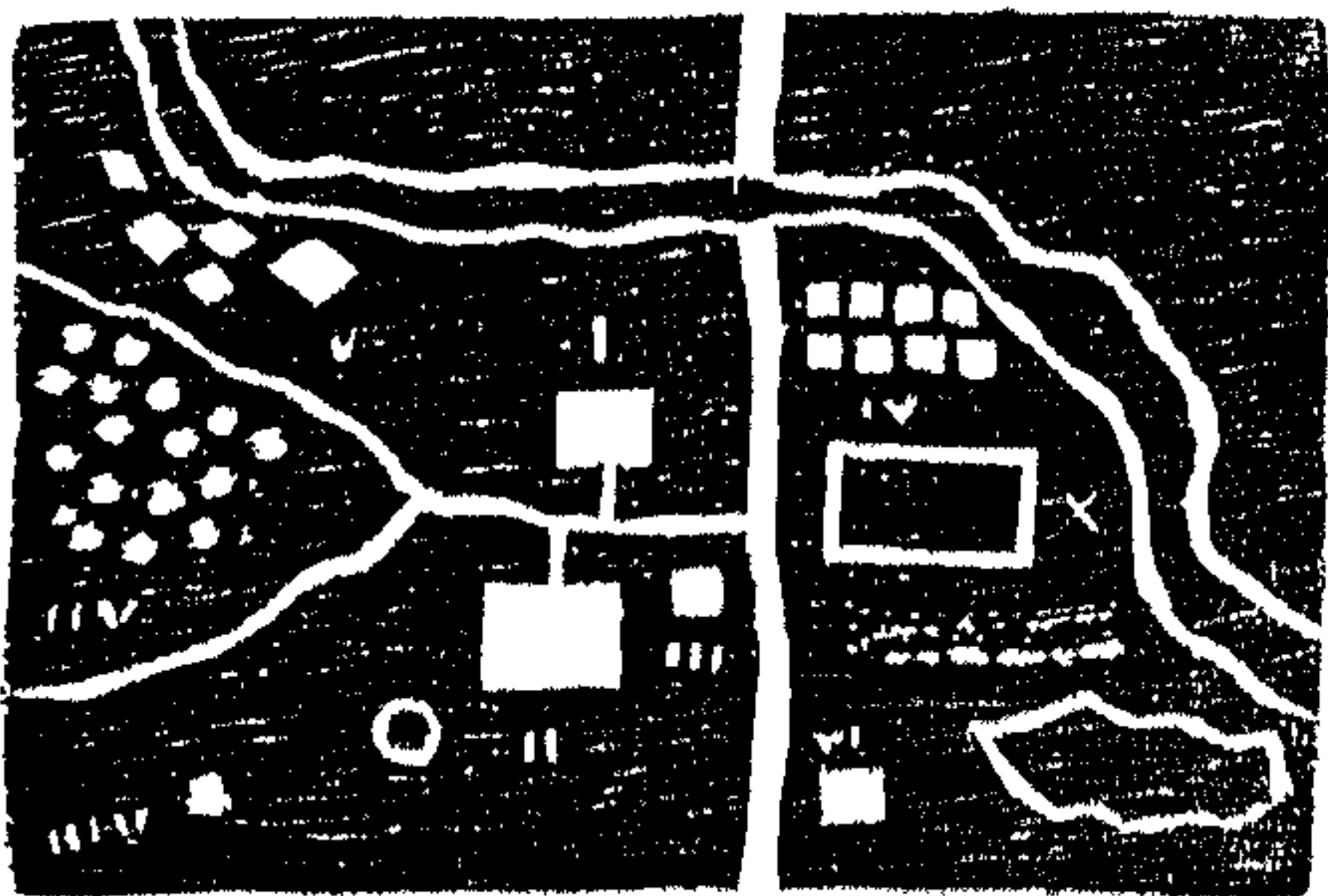
- (১) গ্রাম্য + খেলার স্থান + শ্রেণীকর্ম । অগাধ শ্রেণী + বারান্দা
- (২) নদী + টিলা + পুর + বিদ্যালয় + গণ + দেবাদয় + বাজার + ডাকঘর
+ কুশিক্ষাজ
- (৩) বিমানী + মাতিমুরা + দিঘীরপার + সোণাতলা + কসবা
- (৪) পাথারিয়া + বড়লেখা + পদ্মশ্রী + বাহাদুরপুর + ঢাকা উত্তর
- (৫) রাতাবাড়ী + পাথারকাঁদি + জলচূপ + করিমগঞ্জ
- (৬) সুনামগঞ্জ + হবিগঞ্জ + করিমগঞ্জ + উত্তর শ্রীহরি + দক্ষিণ শ্রীহরি
- (৭) মুমাইপাহাড় + নাগাপাহাড় । শ্রীহরি + কালাড় + বাগিয়া সুনামিয়া পাহাড়
- (৮) মণিপুর + সুরমা উপত্যকা + একাপুর উপত্যকা
- (৯) উত্তরবঙ্গ (রাজসাহী) + আসাম + পূর্ববঙ্গ (ঢাকা চট্টগ্রাম)
- (১০) মধ্যপ্রদেশ + বঙ্গদেশ + পূর্ববঙ্গ ও আসাম + যুক্তপ্রদেশ + পঞ্জাব
+ ব্রহ্ম + বোম্বাই + মাদ্রাজ + উত্তরপশ্চিম সাম্রাজ্য + লী : বেগুচিহ্নান
- (১১) আরব + আফগানিস্থান + ভারত সাম্রাজ্য + পূর্বউপদ্বীপ + তিব্বত
+ চীন + তুরস্ক + তুরকিস্থান + পারস্য + জাপান + মাইবেরিয়া
- (১২) আন্তর্জাতিক + ভারতমহাসাগর + এশিয়া + ইউরোপ + আমেরিকা + উঃ
প্রশান্ত + উঃ মহাসাগর + দঃ মহাসাগর + আমেরিকা + দঃ আমেরিকা + ওসেনিয়া
- (১৩) সূর্য্য + হর্মেজ + শনি + বৃহস্পতি + পৃথিবী + শুক্র + মঙ্গল + বুধ + নেপচুন
(চন্দ্র)
- (১৪) কালপুরাণ ও মুকক + মণ্ডার + সৌরজগৎ + গ্রহ + মেঘাদি ষোড়শ রাশি +
ছায়াপথ ইত্যাদি
- (১৫)

অসমাপ্ত ।

১। শ্রেণীকক্ষ—সকলানা খালা বা মেটের উপর অথবা ১২জা বালিখানা আশুর (২ ইঞ্চি মত পুরু) কর । তারপর উপর ছোট ছোট (একটু শক্ত) কাগজের সর ও লম্বা কাগজ দ্বারা বেশ মাঝাও ও কাগজের অক্ষরপ খণ্ডের দ্বারা চেয়ার, টেবিল, ঘাড় প্রভৃতি রচনা কর । খড় বা কাঠি ভাঙ্গিয়া সরজা জানালা প্রস্তুত কর । খড় জিনিসকে ক্ষুদ্রাকারে দেখানিহ হবার উদ্দেশ্যে । তারপর শ্রেণীর নক্সাপ্রস্তুত কর । ৩৪০ পৃষ্ঠায় নক্সা শিক্ষার স্থানাদি নিবৃত্ত হইয়াছে । তারপরও নিজ নিজ মেটে ইহার অনুরূপ করিবে । তারপর এত শ্রেণীকক্ষের সহিত যোগ করিয়া অষ্টাশ শ্রেণী, বারান্দা, খেলার স্থান প্রভৃতি প্রস্তুত কর : বিদ্যালয় হইল ।

২। বিদ্যালয়—মেট বা খালার উপর বালির আশুর কর । ছোট এক টুকরা কাগজ ভাঁজ করিয়া খরের চালের মত কর ও বালির ভিতর (মেটের সম্মুখে) পুতিয়া দাও । এই যেন ভোমার পুণ । তারপর ছোট ছোট খালের ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া বিদ্যালয়ের যে যে স্থানে বড় বড় গাছ আছে মেটের সেইখানে পুতিয়া দাও । অষ্টাশ খরও কাগজ দিয়া দেখাও । বালির উপর একটা পেন্সিলের দাগ দিয়া পথ দেখাও । একটু গভীর করিয়া দাগ দিয়া নদী প্রস্তুত কর । খাল, বিল প্রভৃতিও বালির মধ্যে গর্ত করিয়া দেখাইতে হইবে । টিলার স্থানে, বালি (নৈবিদ্যের মত) উচ্চ করিয়া রাখ । কৃষিক্ষেত্রের স্থানে খালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশাংশ মার করিয়া পুতিয়া দাও । তারপর বিদ্যালয়ের নক্সা প্রস্তুত কর । ১৬ পৃষ্ঠায় দেখ । গ্রামে কি কি কৃষি হয় ; কৃষিগজ ও জলচূপ যাইবার পথ কোন্টী ? নদী দিয়া কোন্ কোন্ গ্রামে যাওয়া যায় । কোন্ সময়ে নদীর জল বাড়ে, ডাকঘর হইতে কিরূপে পত্রাদি বিজি হয় । কোন্ রাস্তায় অষ্টাশ জেলার পত্র যায়, কোন্ দেবতার দেবালয়, টিলায় জল পাড়িয়া কেমন করিয়া নদী হয়—গ্রামের বড় জমিদানের বৃন্দাশু—জমিদার বাড়ীর কথা (এই পরিবারের কোন রমণী একটা থলিয়া প্রসব করেন, থলিয়া বাটীর বহির্ভাগে ফেলিয়া দেওয়া হয় ; কাকে থলিয়া ডিয় করে, থলিয়া হইতে দ্বাদশ শিশু নহির্গত হয়, সেই দ্বাদশ শিশুই জমিদারীর পতন করেন । গ্রামের বর্তমান পুরুষের নাম বার পাগের দিঘী—বর্তমান জমিদার কালীকিশোর চৌধুরী) গ্রামের নানারূপ গাছ, রসুনাতা শিরোমণির গাছ বল । বাজারে যে সকল জিনিস বিক্রয় হয় (জমিদারী রপ্তানি) কাঁটাল, ফানারস, ধান বিক্রয় হয় । এমন গ্রামের নক্সা প্রস্তুত কর—দ্বিতীয়বার আস হইল । নিম্নলিখিত চিত্রের অনুরূপ করিয়া নক্সা প্রস্তুত করিলেই হইবে :—

ঘর বাড়ী মাদা চৌকার দ্বারা, বাজার ছোট ছোট চৌকায় লাইন করিয়া, টিলাগুলি মাদা লাইনের চৌকার মত করিয়া, বৃক্ষবন মাদা বড় বিন্দু ও বৃক্ষাকার মাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুদ্বারা, বড় পথ মাদা মোটা লাইনে ও গলিপথ মাদা সব লাইনে অঁকিবে। পুকুর একটা আয়তক্ষেত্র, বিল হাওর এঁকাবোকা লাইনের মত, কূপ একটা ছোট বৃত্ত, নদী দুইটা এঁকাবোকা লাইনে অঁকিবে। যাহা মাটির নীচে যেমন পুকুর, নদী, বিল প্রভৃতি তাহা কেবল লাইনের দ্বারা, আর যাহা মাটির উপরে যেমন ঘর, বাড়ী, পাহাড়, বৃক্ষ, তাহার মাগা লাইনের দ্বারা অঁকিয়া, মেহ ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে চকু ঘমিয়া মাদা করিয়া দিবে। (কাগজে অঁকিতে হইলে পেন্সিল বা ময়না কাল করিয়া দিবে) যথা :—



৮১ চিত্র। বোর্ডে গ্রামের নকশা।

৩। গ্রাম—নিখীরাপার গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের নাম শিখাও—কোন গ্রাম কোন দিকে? প্রসিদ্ধ কয়েকটা গ্রামের বৃত্তাকার বন, যথা মোপাতলায় বাহুবোনের বাড়ী, কস্‌বায় অনেক কারবারী লোকের বাস, মাতিয়ুরা মুসলমান প্রধান গ্রাম, বিয়ানীতে বড় বাজার, ডাকঘর ও মঃ ইং স্কুল। অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে পরগণা বলে।

৪। পরগণা—পরগণা অল্পমাত্রের পাহাড়া আদায় হয়। নিকটবর্তী ও নিজ ধানার অন্তর্গত কয়েকটা বড় পরগণার নাম শিখাও। বড় লেখা পরগণায় রেলস্টেশন, ডাকঘর উত্তরে পুরাতন বরাক, পাণের বনজ ; বাহাদুরপুরে মাইনর স্কুল, গ্রাম বাহাদুরের

বাড়ী ইত্যাদি । এই সমস্ত পরগণা জলদ্রুপ থানার অধীন । (বাজালা দেশের যেখানে পরগণার চর সাইে যেখানে পরগণার বিষয় বাস দেওয়া গাইতে পারে) ।

৫ । থানা—চৌকিদারের কার্য, কনেটবলের কার্য, দারোগার কার্য বুঝাইয়া দাও । তাহার কেমন কবিয়া শাস্তি রক্ষা করে, তাহার দৃষ্টান্ত দাও । গ্রামের কোনও দুষ্ট লোকের শাস্তি হইয়া থাকিলে, তাহার গল্প বল । জলদ্রুপ থানার বর্ণনা কর । জলদ্রুপে রেজেন্সি আফিস আছে, নৈরেজেন্সি করার প্রণালী বল । জলদ্রুপের আনারস অসিদ্ধ । অখ্যাত স্থানের আনারসের সহিত জলদ্রুপের আনারসের তুলনা কর । পাথার কান্দিতে একটা ছোট থানা আছে, সেখানে জখলী আফিস আছে—জখলী আফিসের কার্য বর্ণনা কর । এই সমস্ত থানা মিলিয়া কন্নিমগঞ্জ মহকুমা । নক্সা দেখাও ও প্রস্তুত করাও ।

৬ । মহকুমা—অনেকগুলি মহকুমা লইয়া একটা জেলা । মাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফের কার্যের বর্ণনা কর—মাজিষ্ট্রেট চোর ডাকাত প্রভৃতির দমন করেন, মুনসেফ অনিষ্টনা ও টাকা কড়ি বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, গ্রামের দৃষ্টান্ত দাও । কন্নিমগঞ্জ হাইকোর্ট আছে—কি কি পড়া হয়, বল । দাঁতবা চিৎকৎসালয় আছে, ইহার বৃত্তান্ত বল । হাকালুকী হাওরের গল্প কর । বদরপুরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ও বারুগী স্থানের মেদার বর্ণনা কর । বদরপুর জংসন হইতে কোন্ কোন্ দিকে রেল গিয়াছে মানচিত্রে দেখাইয়া দাও । ভাঙ্গার কাঠের কারবার আছে । শ্রীহট্টের মানচিত্রে অখ্যাত মহকুমা দেখাও ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর—এই দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলবী বাজার) রাজনগরে লোহের অস্ত্র ও রাজা হুসৈদ মারামণের বাটীর উল্লেখ । এই হুসৈদগঞ্জ—ছাত্তকে চুণ ও কমলালোহু, অখ্যাত গ্রাম যি, আমু, তেজ পাতা,—প্রচুর মৎস্য (এক সময় আটটি বড় রোহিত মৎস্যের মাথা) জগন্নাথপুরে রাজা বিজয় সিংহের পুরাতন বাড়ী । দেধার-হাওর ও শণির-হাওরের বর্ণনা কর । নবগ্রামে অষ্টমতাচার্যের জন্ম । এই হবিগঞ্জ—আজমিরিগঞ্জ শুষ্ক মৎস্য, বিধলের আখড়া, সফরপুরের তাঁতির কাপড়, খানিয়াচোদ্দে লাউড়ের রাজার বাড়ী । এই উত্তর শ্রীহট্ট—বালাগঞ্জের পাটী, সদরের বেতের জিনিষ, হাতীর দাঁতের পাটী, পাখা, চিরগী, ফেচুগঞ্জের টীমার স্টেশন, ঢাকা দক্ষিণে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাটী, রণকেলির হাওর, মহালক্ষীর মন্দির (পীঠস্থান) ইত্যাদি—জেলা । কাদার দ্বারা বা পুটীনের দ্বারা জেলার বহুর মানচিত্র প্রস্তুত কর (পরিশিষ্টে বহুর মানচিত্রের শিক্ষা প্রণালী পড়)—বহুর মানচিত্রে ও

নক্সায় কি পার্শ্বকা বুঝাইয়া দাও । শীহটের আমতন ৫৫ হাজার বর্গ মাইল, গাঙ্গা ৮৫ হাজার, লোকসংখ্যা ২২৫ লাখ ।

৭ । জেলা —সদর স্টেশনের বর্ণনা কর—মাজিষ্ট্রেট, পুন্ড্র, ডাক্তার সাহেবের ও উকীল মোক্তার, কেরাণী প্রভৃতির কি কার্য্য সংক্ষেপে বাদিয়া দাও । দাতব্যচিকিৎসালয়, জেলখানা (শীহট জেলে নানা প্রকার স্থাপন যেতের টেবিল, চেয়ার ও নানাবিধ বস প্রস্তুত হয়) কলেজ প্রভৃতির বর্ণনা কর । শীহটের সদরে মাজিষ্ট্রেটের দরগা, সনা নামের টিলা, আলী আমচাদের বাড়ী । শীহটের সহিত অত্যাশ্চর্য্য জেলার যোগ কর যথা—কাছাড় (সদর স্টেশন শিলচর)—বিভাগস্থ কমিশনারের আফিস, দুই ইন্স্পেক্টরের আফিস । চা প্রসিদ্ধ । বেত, নানাক্রম কাঠ, মণিপুরী কাগড় ও বাসন পাওয়া যায় । সুরমা সৈন্টের ক্যান্টনমেন্ট আছে । (৩) থামিয়া জিয়ার পাহাড়—এই পাহাড় আশ ৬০০০ ফিট উচ্চ, শিলং সহর বর্তমান রাজধানী, ছোট লাটেন বাড়ী (ছোট লাটের নাম বলিয়া দাও) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের আফিস (ডিরেক্টরের নাম বল) মচমাই নদীর জল প্রপাতের বর্ণনা কর,—উত্তম কমলালেবু পাওয়া যায়—থামিয়া জিয়ার বর্ণনা কর—কমলা, তুলা, পান, আখ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । (৪) নাগা পাহাড়—পাটকই শ্রেণী ; কহিমা রাজধানী, নাগাজিয়ার বিবরণ, তুলা, রবার হস্তিদন্ত । (৫) নুসাই পাহাড়—অম্বর নামক প্রস্তুতীকৃত বৃক্ষ নির্গাস পাওয়া যায় । রাজধানী আইজল, নুসাই জিয়ার বিবরণ । মানচিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে । এই সমস্ত লইয়া সুরমা উপত্যকা বিভাগ—বঙ্গুর মানচিত্র প্রস্তুত কর ও তাহার সাহায্যে শিক্ষা দাও ।

৮ । বিভাগ—অনেকগুলি মাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কমিশনারের উপর একজন কমিশনার বিভাগের কর্তা—অনেকগুলি ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের উপর একজন ইন্স্পেক্টার বিভাগস্থ শিক্ষার কর্তা । সুরমা উপত্যকার বর্ণনা কর । বরাকের গতি, সুরমা কুশিয়ারায় বিভক্ত, সুরমার উপনদী (কুইগাজ, পিয়াইন, গোভা) কুশিয়ারায় উপনদী (লমলাই, জুরি, মসু) ; থামিয়া জিয়ার পাহাড়ের বর্ণনা । ডাকচুড়া, ইটা, প্রতাপগড়, দিনারপুর পাহাড়ে অরণ্য । চেরাপুঞ্জিতে অত্যন্ত বৃষ্টি । লগাপুর উপত্যকার বর্ণনা কর—৭টি জেলার নাম শিখাইয়া দাও (মানচিত্রের সাহায্যে), লগাপুরের গতিপথ দেখাও, প্রধান প্রধান ৩৪টি উপনদী দেখাও । যে সকল স্থানে লচুর পরিমাণে কয়লা, কেরোসিন তৈল, চা, রবার, তসর পাওয়া যায় তাহা বলিয়া দাও । কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের কথা বল । মণিপুর আধীন রাজ্য ; ইংরাজরাজকে কর

দিতে হয় । রাজধানী ইন্দোরে । মণিপুরী জাতির বর্ণনা কর । চৌড়া ও মহিষ
প্রসিদ্ধ ।

৯ । উপপ্রদেশা আসামের চতুঃসীমা দেখাও—গোমালপাড়া, কাছাড় ও
সিহট্ট বাগী প্রকৃত আসামী নয়—ইহাদের ভাষা বাঙ্গালা । আসামী ভাষার ও অহম
জাতির বর্ণনা কর । পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের বিভাগ ও জেলাগুলির নাম শিখাও ।
কোন জেলার কোন জিনিস প্রসিদ্ধ বর্ণনা দাও । ঢাকা ও চাঁদপুর মহালের ও গঙ্গা নদীর
বর্ণনা কর । প্রদেশের বড়ার মানচিত্র ও সমস্ত মানচিত্রে পর্বত, নদী প্রভৃতির ও জেলার
সীমা দেখাও ।

১০ । প্রদেশা—অনেকগুলি কমিশনরের উপর একজন ছোট জাট—অনেক-
গুলি ইন্সপেক্টরের উপর একজন ডিরেক্টর । অত্যাশ্চর্য্য প্রদেশ গুলি মানচিত্রে দেখাও ও
কোনটী আট কোনটী ছোটজাট ও কোনটী চিফ্ কমিশনরের অধীন তাহা শিখাইয়া দাও ।
প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানী শিখাও এবং এই কয়েকটী নগর দেখাইয়া দাও : আগ্রা
(তাজমহলের বর্ণনা কর ও ছবি দেখাও) দিল্লী (জুম্মামসজিদ) কাশী (বিশ্বেশ্বরের
মন্দির) পুরী (জগন্নাথের মন্দির) লাসিক (পঞ্চাবটী বন) করাচী বন্দর (মধ্য যাইবার
পথ) রাশের মেতুনা, অমোদা । রামচন্দ্র কোন রাষ্ট্রায় লক্ষ্য দিয়াছিলেন দেখাও ।
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ মহালের বিস্তারিত বর্ণনা কর ও চিত্র দেখাও ।
কাশীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে অতুলনীয়, বর্ণনা কর । বিশ্ববিদ্যালয়ের
কথা বল ।

১১ । দেশা—অনেকগুলি প্রদেশ লইয়া একটা দেশ—বড়লাট ভারত
সাম্রাজ্যের অধিপতি—ইংলণ্ডের রাজা মণ্ডল এডওয়ার্ডের প্রতিনিধি—বড়লাটের নাম
বল—মানচিত্রে শিল্প দেখাও—কলিকাতায় বড় জাটের বাড়ীর ছবি দেখাও । ভারতের
প্রধান প্রধান ৬৭টা নদী ও ৪৫টা পর্বতের পরিচয় করাও । রাজপুতনার মরুভূমি
ও চিত্রাঙ্গ দেখাও । আন্দামান দ্বীপে খুনী আসামীদিগকে দ্বীপান্তরিত করে কেন,
বুঝাইয়া দাও । ভারতবর্ষের সহিত যোগ করিয়া এশিয়ার অত্যাশ্চর্য্য দেশের নাম ও
প্রধান নগর শিখাও । এশিয়ার খুব বড় বড় ১০১২টা নদী ও ৫৬টা পর্বত দেখাও ।
২৪টা সাগর উপসাগর দেখাও । চানের প্রাচীরের কথা বল । জাপান যুদ্ধের কথা বল ।

১২ । মহাদেশ ও মহাসাগর—এশিয়ার সহিত যোগ করিয়া ইউ-
রোপ দেখাও ও ইউরোপের দেশগুলির রাজধানীর পরিচয় করাও । ইউরোপের ৪৫টা

এখান নদী ও ৪১৫টি পর্বত শিখাও । ইংলণ্ডের রাজধানী ছাড়া লিনকোল, ম্যাগেট্রন, বারসিংহাম ও টেমস নদী দেখাইয়া দাও । আমেরিকার ইজিপ্ত (মীলনদী ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং কেইরো সহ) কেপক্যানি (কেপটাউন) এবং শাহারা মরুভূমি দেখাও, পিমা-মিডের বর্ণনা কর ও চবি দেখাও । ভূমধ্য সাগর কেন বলে ? আমেরিকার কানাডা, ইউনাইটেড্, স্টেট্‌স্, মিসিসিপি, আমেজান, আর্জেন্টিনা দেখাও । অষ্ট্রেলিয়া খুব বড় দ্বীপ । উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরের ভূমির বর্ণনা কর । অ্যাংল মহাসাগর দেখাও । কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে লন্ডনে আগমন পথ দেখাও ও বর্ণনা কর । এখন পৃথিবীর আকার বর্ণনা কর—শুষ্ক অংশ (৩৬৪ পৃষ্ঠা পড়) ।

১৩ । পৃথিবী- অ্যাংল গ্রহগুলির নাম কর—সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রহ ঘুরিতেছে—সূর্যের বর্ণনা কর । সূর্য ও আটটি গ্রহ লইয়া সৌরজগৎ । আকাশে বৃহস্পতি, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ দেখাইয়া দাও (অ্যাংল গ্রহ সহজে পরিচয় করাইতে পারিবে না) । এইরূপ অনেক সৌরজগৎ আকাশে ভাসিতেছে । দিবা রাত্রে পরিবর্তন ও ঋতুর পরিবর্তন বুঝাইয়া দাও (৩৬৬ পৃষ্ঠায় পড়) । প্রতিপদাদিতে চন্দ্রের ক্রান্তি-বৃদ্ধির চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও । চন্দ্রের নিজের জ্যোতি নাই—সূর্য-আলোকে আলোকিত । গ্রহণ বুঝাইয়া দাও ।

১৪ । সৌরজগৎ—কতকগুলি নক্ষত্র পুঞ্জের পরিচয় করাও । অনেক নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা বড় । কালপুত্র ও লুক্র দেখাও—লুক্র সূর্য্য অপেক্ষা ২০০০ গুণ বড় । মঙ্গুরি ও প্রব দেখাও (৩৫৭ পৃষ্ঠায় পড়), মেবাদি ষাটশ রাশির পরিচয় না করাইলে সূর্য্যর দৃশ্যমান গতি বুঝিতে পারিবে না । সকলগুলির পরিচয় করান একটু শক্ত, ব কালপুত্রের নিকট বৃষ রাশির পরিচয় পাইলে সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক ইতি ৫৬টা রাশির পরিচয় করান যাইতে পারে, কারণ এই সমস্ত রাশিতে অতুল্য জ আছে (নক্ষত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া অতুল্য, উল্ল্য, অল্ল্য) । পথ বহুদূরস্থিত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, দেখাইয়া দাও । (যে যাক্ষি গ্রহ ও রাশিগুলি লেনন, ডাহার নিকট হইতে এই দূর শিখিয়া লও । পুস্তক লিখিত বর্ণনা পড়িয়া আকাশের নক্ষত্রের পরিচয় করা কঠিন ।)

১৫ । ব্রহ্মাণ্ড—দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ লইয়া ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ।

২। ইতিহাস।

ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য।—ইতিহাস শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটী :—(১) অতীতের প্রতি যুগ জ্ঞান (২) স্বদেশের প্রতি অমুরাগ জ্ঞান *। ইহা ছাড়া অনেকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে যথা—
(১) কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা বিচার শক্তি বৃদ্ধি করা, (২) স্মরণ শক্তিকে বৃদ্ধি করা (৩) নুতন বিষয় জানিবার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করা। (৪) অতীত দেশের কার্য্য কলাপ দৃষ্টে নিজের অবস্থা উন্নত করা (৫) কুসংস্কার বর্জন করা (৬) সংস্কারের প্রতি আশক্তি জন্মান। (৭) মানবজাতির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া নিজে সাবধান হওয়া।

* From a Lecture of Sir J. Fitch on "The National Portrait Gallery"—"It (a visit to the gallery) will, I hope, strengthen in us the feeling of patriotism. By this I do not mean that theatrical patriotism which exults in conquests, and which expresses itself by waving the Union-Jack and singing 'Rule Britannia' in our schools and public places; but a rational patriotism, founded on knowledge and on an affectionate and grateful recognition of what has been done for us by our ancestors and of the preciousness of the inheritance which they have left us." অমুবাদ—‘এই জাতীয়-চিত্রশালা দর্শনে যে আমাদের হৃদয়ে স্বদেশাশ্রয় বৃদ্ধি হইবে, ইহা আমার বিশ্বাস। যে নাট্যমঞ্চ-পয়োগী স্বদেশাশ্রয় নির্দিষ্ট উন্নতি এবং বিদ্যালয় ও অতীত প্রকাশ্য স্থানে জাতীয় পতাকা সঞ্চালনে ও জাতীয় সঙ্গীত কীর্তনে প্রকাশিত, আমি সেইরূপ স্বদেশাশ্রয়ের কথা বলিতেছি না; যে স্বদেশাশ্রয় প্রবৃত্তি জ্ঞানে সংস্থাপিত এবং ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাগুণ হৃদয়ে পূর্বপুরুষগণকৃত কার্য্যাদির ও তাঁহাদের পরিত্যক্ত অমূল্য সম্পত্তির যথার্থ মর্ম্ম-গ্রহণে শক্তি—আমি সেইরূপ সজ্ঞত স্বদেশাশ্রয়ের কথা বলিতেছি। (‘পণ্ডিতপ্রবর সার জর্জ ফিচ’)

ঐতিহাস প্রকৃত ঘটনাবলীর বিবরণ, সুসঙ্গত কাহিনী কাননের পবিত্রিত
দৃষ্টান্ত । উপদেশ অপেক্ষা মগন দৃষ্টান্তের শিক্ষা মনোহর । এই অমিকতব
ফলপ্রসূ, যখন ঐতিহাসের শিক্ষা যে নীরম উপদেশাদির অপেক্ষা
অমিকতব ফলপ্রসূ হইবে, তাহাতে আর মনোহর কিছু হইবে যেমন
করিয়া শিখান চাই । 'এত পক্ষান্ত মুগ্ধ করিয়া আসিবে' - এই শিক্ষক
ইহাষ্ট আদেশ করিয়া ঐতিহাস শিক্ষা শেষ করিয়া থাকেন, তিনি
উপকার না করিয়া বরং অপকারই করিয়া থাকেন । প্রকৃতরূপে
ঐতিহাস শিক্ষা দিতে হইলে মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটিকে মর্মেদা স্থির রাখিতে
হইবে ।

নিম্ন শ্রেণীতে ঐতিহাস ।—নিম্ন শ্রেণীতে ঐতিহাসিক সমস্ত
ঘটনা ধারাবাহিকরূপে না শিখাইয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, উপাখ্যান
রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । যে শিক্ষক শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহার
উপাখ্যান বলিবার ক্ষমতা থাকা চাই । শ্রুতকের বিবরণ, ঐতিহাসের
নীরম ভাষায় ব্যক্ত করিলে, কোনই ফল হইবে না । যে প্রণালীতে
ঠাকুর মা উপকথা বলিয়া থাকেন, কতকটা সেই প্রণালী অবলম্বন
করিতে হইবে । তাই বলিয়া প্রকৃত ঘটনার সহিত অপ্রকৃত ঘটনা
যোজনা করিতে হইবে না । ছুংগের কথাগুলি একটু কাঁতরসবে,
ভয়ের কথাগুলি ভীতি সূচক মৃদুস্বরে, রাগের কথাগুলি একটু কর্কশ
স্বরে ব্যক্ত করিলে ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে ও মুখে, ছুংগ ভগ্ন রাগ প্রভৃতির
বাহ্যিক প্রকাশ দেখাওলে, বালকগণের আকর্ষণ হইবে । কথকগণ
যে প্রণালীতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা জ্ঞান করিয়া থাকেন,
এ প্রণালীও কতকটা সেইরূপ । কথকগণ মনো মনো যেমন গল্পীত
করিয়া থাকেন, ঐতিহাসের শিক্ষকগণ তদ্রূপ প্রামাণ্য কবিগণের ঐতি-
হাসিক কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া উপাখ্যানকে আরও সরস করিতে
পারেন ।

ইতিহাস শিক্ষাদেও পরিচিত বিষয়ের সাহায্যেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। গানের কোন প্রসিদ্ধ লোকের জীবন চরিত্র বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা কর। কিন্তু সাবধান, লোক বিশেষের কেবল গুণের ভাগি বিকাশ করিতে হইবে। আবার সেই গুণগুণ কেবল বর্ণনা করিয়াই যাইবে; তাহা হইতে যে সকল নীতি শিক্ষা হইতে পারে, তাহা পৃথক ভাবে দেখাইয়া দিও না। “রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের অমৃত বনে গেলেন” এই ঘটনাটি উদ্ভবরূপে বর্ণনা কর ‘তোমাদেরও এইরূপ পিতৃভক্ত হওয়া উচিত’ ইত্যাদিরূপ উপদেশের অবতারণা করিও না। সরস হইলে এই উপদেশ, অজ্ঞাতভাবে বাগ্যকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। দৃষ্টান্ত অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুব বড় জমিদার ছিলেন, প্রজাদিগকে খুব ভাগ বাসিতেন ও তাহাদিগের উপকার করিতেন। অমুক প্রকার কার্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, অমুকের ঘর করিয়া দিয়াছিলেন, পুজার সময় সমস্ত গ্রামকে খাওয়াইতেন, গরীবদের কাপড় দিতেন; স্কুল, ডাক্তারখানায় টাকা দিতেন ইত্যাদি, (২) অমুক মৌলবী ছিলেন, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেন, হাটিয়া দিল্লীতে গিয়া আরবী পড়েন, পরে বড় মৌলবী হইয়াছিলেন, সরকারে খুব সম্মান করিত, সত্য কথা কহিতেন, ৫ সন্ধ্যা রীতিমত নমাজ করিতেন ইত্যাদি। (৩) অমুক মাধা ৫ টাকা পুঁজী নিয়ে এক দোকান করে, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিত, কোথায় কোন্ জিনিষ সস্তা খোজ রাখিত, দুই বৎসরের মধ্যে দোকান খুব বড় হইল, শেষে পাটের কারবার আরম্ভ করিল, খুব হিসাবী ছিল, মরিবার সময় ছেলেদের অল্প ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যায় ইত্যাদি।

এইরূপ জেলার ২৩টী লোকের বা ঘটনার ও পরে সেই প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিবে। তারপর ভারত ইতিহাসের অতি প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি শিখাইয়া দিবে। ভারত ইতিহাস শিক্ষার

উপযোগী জীবনী ও ঘটনান কাহিনী নিয়ে প্রাদুর্ভূত হইল। বালকগণের বয়স ও বিদ্যালয়ের সময় বিবেচনায় বিষয়গুলির সংখ্যা কম বা বেশী করিয়া লভ্য হইবে। আর এই সকল উপাখ্যান বাণ্যে হইলে শিক্ষকগণকে, জীবন চরিত্র, লম্বা বৃদ্ধান্ত ও বড় বড় চরিত্রসমূহের আশ্রয় লভ্য হইবে। ছোট ছোট চরিত্রসমূহ যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখক হইয়া থাকে তাহা উপাখ্যানের পক্ষে উপযোগী নহে।—

রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, মহাশয়দের গল্প, মুসলমান রাজাদের গল্প, (আকবরের, আওরঙ্গজেবের ও ভাস্করদের) শিবাজীর গল্প, চৈতন্যের গল্প, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, হংকংজাদিগের গল্প, পলাশীর যুদ্ধ, ঠগা, গঙ্গা সাগরে সঞ্চার নিষ্ফল, মতীদাহ, মিশাহী বিজোহ, মহাবাহী ভিক্টোরিয়াব গল্প, বিদ্যাগারের গল্প। কি কি শুনে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কি কি কাহণে তাহারা জন সাধারণের নেতৃত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর আশাদিগে। উপকারার্থ তাহারা কোন্ বিশেষ ব্যাপার লইয়া জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছিলেন—জীবনী বর্ণনায় এইগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশ শাসনের রীতিও একটু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার থাকে, এরা সকলে এক এক থানার দারোগার অধীন, আবার অনেকগুলি থানার দারোগা মাজিস্ট্রেটের বা ডেপুটি কমিশনারের অধীন; আবার এষ্টরূপ নানা জেলার মাজিস্ট্রেট, একজন বিভাগীয় কমিশনারের অধীন, আবার নানা বিভাগের কমিশনার একজন ছোটলাট (বা গভর্নরের) অধীন, নানা প্রদেশের ছোটলাট একজন গভর্নর জেনারেলের অধীন। এইরূপ আর নানা দেশের গভর্নর জেনারেল এক বাজার অধীন। নিজের জেলা ও প্রদেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিবে। সাময়িক ছোটলাট, বড়লাট ও রাজার নাম জানা নিতান্তই আবশ্যিক।

উচ্চ শ্রেণীতে ইতিহাস।—রীতিমত শিক্ষাদান করিবার

পূর্বে বালকগণকে শাসননীতি একটু আভাস প্রদান করা কর্তব্য। মাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, ডোটিয়ার, বড়গাট, প্রভৃতি কমিটারিগণ কি কার্যের জন্য নিযুক্ত ও তাঁহারা কিরূপে শাসন পরিচালনা করেন, ইহা যুগ ভাবে বুঝাওয়া দিবে। চংনেজের পূর্বে কোন জাতি ভারত শাসন করিতেন ; কোন দেশে তাহারা আসিয়া, কেমন করিয়া ভারত অধিকার করিলেন, তাহাও অতি সংক্ষেপে বলিয়া দিবে। আবার মুসলমান জাতির পূর্বে, ভারত-শাসন কার্য যে ভারতবাসীর হাতেই ছিল, তাহারা যে সে সময়ে পৃথিবীতে যুব উন্নত জাতি ছিলেন, নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহাও বলা আবশ্যক। এই সমস্ত বলিয়া ইতিহাসের শিক্ষা আরম্ভ করিবে। কেহ কেহ বর্তমান সময়ের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ অতীতের ইতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ অতীতের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্তমানের দিকে অগ্রসর হয়েন। প্রথা দুইটাই ভাল, তবে সে শিক্ষক যে প্রথায় কার্য করিয়া সুবিধা পান, তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইতিহাস শিক্ষাইবার নিয়ম।—(১) ইতিহাস শিক্ষায় ভূগোলের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক অবস্থাব সহিত মনুষ্যের আনন্দ্য যে যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝাইতে হইবে। পার্বত্য জাতি সম্রাট ও পরিশ্রমী, নিম্ন স্থানের লোক দুর্বল ; শীত প্রধান স্থানের লোক শ্বেতবর্ণ, গ্রীষ্ম প্রধান স্থানের লোক কৃষ্ণ বর্ণ ; সমুদ্র তীরবাসী লোক ব্যবসায়-পটু ইত্যাদি। যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ণনায়, ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনায় মানচিত্রের সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং যে দেশের ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে, সে দেশের মানচিত্র দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখা কর্তব্য।

(২) যে অংশ শিক্ষা দিবে, সেই অংশ প্রথমে বালকগণকে গল্পচ্ছলে শুনাও, পরে বালকগণকে পুস্তক পড়িতে দাও। প্রয়োক্তর কবাইয়া

ইতিহাসের প্রধান বিষয়গুলি মুখে মুখেই বালাকগণকে শিখাইয়া দিতে পারা যায় ।

(৩) বালাকগণের বয়স বিবেচনায় ক্রিষ্টিয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস শিখান কর্তব্য । রাজাদিগের নাম মুখস্থ করা অপেক্ষা, এই শিক্ষাই কার্যকরী ।

(৪) এক সঙ্গে অনেক শিখাইতে চেষ্টা করিও না । অনেক ইতিহাসের পুস্তকে এক অঙ্কুশেদের তলে ছেলে বহু ঘটনার বিবরণ সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে বালাকগণের আনন্দ না হইয়া, বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে ।

(৫) যে সকল কঠিন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা বালাকগণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হওয়া সম্ভব পর নহে, সে বিষয় পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ।

(৬) শিক্ষক উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, ইতিহাস পড়াইতে পারিবেন না, ইহাই মেন তাঁহার মনে থাকে । মানচিত্র, ছবি বা আঁচাচর বে সকল জিনিষ সংগ্রহ করা আবশ্যিক, তাহা পূর্কোঠ ঠিক করিয়া রাখা কর্তব্য । বিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে নানাক্রম পুরাতন মুদ্রা, তাম্রফলক, দলিল, পুঁথি, পুরাতন রাজ প্রাসাদ বা কীৰ্ত্তি স্তম্ভের ইষ্টক বা পাথর, ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র, পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্র, প্রভৃতি জব্যাদির সংগ্রহ রাখিতে পারিলে ইতিহাস শিক্ষার মধ্যেই গাভায়া হইবে ।

(৭) বালাকগণের দ্বারা এক প্রস্থ ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন করাইতে চেষ্টা করিবে । আকবরের রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত ছিল, আওরঙ্গজেবের সময়েই বা তাঁহার কি পরিবর্তন হইল, লর্ড ক্লাইবের সময় ইংরাজদিগের কি পরিমাণ অধিকার ছিল, তারপর একে বুদ্ধি হইতে হইতে (ওয়েলসলি, ডালহৌসী, বেন্টিন, ক্যানিং, ডফ্রিন) লর্ড কার্জনের সময় তাঁহার কি পরিমাণ প্রসার হইল ইত্যাদি বিষয়ক মানচিত্র অঙ্কন

শক্তি প্রবৃদ্ধি সহায় । আজ কাল ঐতিহাসের প্রায় পুস্তকেই এ সকল মানচিত্র থাকে । (অগুনতন আছে বহু “ভাষ্য ঐতিহাসের মানচিত্র” নামক ইংরেজী ভূচিত্রাবলী কলিকাতা লণ্ডনমানস গ্রীনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়—মূল্য—২২) ।

মন ত্বরিত শিক্ষা ।—মন ত্বরিত শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ কোন সহজ প্রণালী দেখা যায় না । কেবল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করাই ত্বরিত মনে রাখিবার একমাত্র উপায় । তবে শিক্ষকগণ বা শিক্ষার্থীদের স্মৃতির সাহায্যার্থে নানরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন । নিম্নে সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল ।

(১) সদৃশ বা বিসদৃশ প্রাথায় ।—একটি সদৃশ প্রাথার দৃষ্টান্ত (ত্বরিত জ্ঞান সমস্তই এক রকমের)ঃ—

যথা—৫৫৭ খৃঃ পূঃ বুদ্ধদেবের জন্ম । হিন্দু ধর্মের পরিবর্তন ।

৫৭ খৃঃ পূঃ বিজয়াদিত্যের মংগল আরম্ভ । সাহিত্য যুগের অভ্যুদয় ।

৬৫৭ খৃঃ পূঃ অঃ মুগলশাসনদিগের ১ম আক্রমণ ।

১৩৫৭ খৃঃ পূঃ অঃ বাহমনি রাজত্বের গঠন শেষ (১৩৫৭ সনে আরম্ভ)

১৫৫৬ খৃঃ পূঃ অঃ আকবরের রাজ্য প্রাপ্তি ও মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ।

১৬৫৮ খৃঃ পূঃ অঃ আরঞ্জিবের রাজ্য প্রাপ্তি ও মোগল রাজত্বের অবনতি ।

(১৬৫৮ হইতে ১ বাদ দিয়া, আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত যোগ করিলে উভয়েরই রাজ্য প্রাপ্তির সময় ৫৭ই পাড়িবে)

১৬৫৭ খৃঃ পূঃ অঃ প্রতাপ গুড়ের যুদ্ধ, হিন্দুর পুনরুত্থান ।

১৭৫৭ খৃঃ পূঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজ রাজত্বের প্রতাপ ।

১৮৫৭ খৃঃ পূঃ অঃ সিপাহী বিদ্রোহ ও মহারাণী কর্জুক ভারত শাসনের তার গ্রহণ ।

(২) কবিতা বা ছড়ার সাহায্য—

বেনুটিং জাটের কথা শুন দিয়া মন ।

আঠার আটশে তাঁর হেথা আগমন ॥

উনত্রিশে সতীদাহ হ'ল নিবারণ ।

কিছু দিন পরে হল ঠগের দমন ॥

নজিমে কাভাড় দেশে গিয়া ভুজ হইল ।
 স্রবৎসর পরে গিয়া কুণ্ডে গেল ॥
 স্বল্পমের নরনালি হইল বারন ।
 কোল জাতি করিলেক বশ্যতাগ্রহণ ॥
 শাসনের বায় ভার দায়ব হইল ।
 পারমী উঠিয়া গিয়া বাজল চালাল ॥
 ইংরাজী শিক্ষার চল পরিলে হইল ।
 রাজা রাম এর তরে অনেক খাটিল ॥
 সেই মনে ডাক্তারী কলোন্স বসিল ।
 সেই মনে বেনটীং ভারত ছাড়িল ॥

(৩) অষ্টাষ্ট্রকপ সংক্ষেপের সাচানো :—

(ক) ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ মনে করিয়া লও । এখন এই ছড়া মনে রাখ ;—

জাগনূপ—আকবর
 তাপমনি—আহাঙ্গীর
 জিপথেন—সাজাহান
 তপনব—আরাজেন

জাগনূপ (অর্থাৎ ত = ১, থ = ২, দ = ৩, ধ = ৪, ন = ৫, প = ৬, ১৫৫৬) আবার অর্থ = জাগনূপ অর্থাৎ যে নূপ ভারতকে অশান্তি হইতে জাগ করিয়াছিলেন । এইরূপ তাপমনি (১৬০৫) অর্থাৎ মদ্য মাংসমাদি তাপ প্রদানকারী জিনিষের যিনি মনি ছিলেন । জিপথেন (১৬২৮) = জিপথ + ইব, অর্থাৎ রাজা, পিতা ও বনি যিনি এই তিন পণেই ছিলেন । 'তপনব' (১৫৫৮) অর্থাৎ রাজার পূর্বে পুরুষেরা যে তপ বা তপস্যা বা দর্ম্ম অনুসারে চলিয়াছিলেন, তিনি তাহা ছাড়িয়া নব তপ লইয়া ছিলেন ।

(খ) তারপর গভর্নর জেনারেলদিগের নাম মনে রাখার সংকেত :—প্রত্যেক লাইটের নামের আদ্যাক্ষর লইয়া হে কসোয়ো কমি ময়া বের এ হাদা কে ? *

* হে হেমস্টিংস, ক কর্ণওয়ালিস, মো মোর (জন মোর), যো ওয়েলেসলি, ক কর্ণওয়ালিস (পুনর্ব্বার), মি মিটো, ম মমরা, যা আমহারষ্টে, বে বেনটিং, ম অকলাঙ, এ এলেনবরা, হা হারডিঙ্গ, না দালাহাউগী, কে কেনিং ।

অর্থ, 'হে' (কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া) কসোয়ো অর্থাৎ খুব কসাকসি (কুপণতা) কর, তাহলে কসি (কস) সয়া (খানার জিনিষ) 'বেয় (বায়) হইবে। এ (এই) হাদা (অর্থাৎ হাদা, বোকা) কে ৭ মে এ বণা নোনে না ।

তারপর রাগ প্রতিনিধিদিগের নাম ত্রুপ পকারে কে এল মেন ৯ খা ডাঙ্গা এক ৭^১ অর্থ, কে এল ৭ টি ব্রেন মেন কেহ বজিতেছে 'মেন' অনেক লোক । ইংরেজীতে উত্তর দেওয়া হইল, পাছে যাহারা আসিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে । তারপর যেন প্রশ্ন হইল, কয় জন লোক ? সম্বন্ধে উত্তর হইল ৯ খ, ৮৭ জন (পরবর্ণের ৮৭ ও ৭৭ বর্ণ বলিয়া) কিন্তু ডালা মাল একখান । কাজেই খুব কসাকসি করিয়া ব্যয় করিতে হইবে । (এ সমস্ত অর্থ আবশ্য কষ্টে কয়মা, কেমন মনে রাখিবার সহায়তার জন্য এতপ করিতে হয় ।)

তবে বেশী তারিখ শিক্ষা দেওয়া কখনই মুস্তিযুক্ত নহে । যে সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনার ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটয়াছে, সেই সকল ঘটনার তারিখই আবশ্যক । প্রধান ঘটনাবলি যে শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল তাহার একটা জ্ঞান থাকা উচিত । ১ম পাণিপথের যুদ্ধের তারিখ ১৫২৬ না খিখিয়া ১৫৩০ কি ১৫৪০ খিখিলে তত সারাজ্ঞক হয় না, যেমন ১৬২৬ খিখিলে হয় । মায়াল সাহেব কৃত 'খারগী ইয়াস' অব টিচিং নামক পুস্তকে সময় নির্দেশক তালিকা প্রস্তুত করিবার যে উপদেশ আছে, তাহা দৃষ্টে একটী তালিকা প্রস্তুত হইল । (২য় পরিশিষ্ট দেখ) । পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একখানা তালিকা প্রস্তুত করিলে, অন্ততঃ শতাব্দীর ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ।

ইতিহাস পাঠনার আদর্শ ।—বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের মানচিত্র দেয়ালে ঝুলান, টেবিলের উপরে রাজা লক্ষণসেনের বাটির ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক, কাষ্ট, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি ; চক ও ব্লাক বোর্ড—উপকরণ ।

(এই পাঠ উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে । এই আদর্শ পাঠনা ভূদেব বাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত)

১. কে কেনিং, এ এলগিন, জ লনেন্স, মে মেয়ো, ন মর্থক্রিক, ৯ মিটন, ৪ স্পিন, ডা ডাকসিং, সা জানমডাউন, এ এলগিন, ক কর্জন ।

শি । নবদ্বীপ দেখাও ।—নবদ্বীপ এখানে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত ?

বা । এইখানে অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত বাস করেন । অনেক সংস্কৃত টোল আছে । গৌরীশ্র এইখানে জগৎগ্রহণ করেন ।

শি । পূর্বে ঐ নবদ্বীপ সমুদায় গৌড় দেশের রাজধানী ছিল । এইজন্যই আজ পর্যন্তও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রধান মন্দির । এখন ইংরাজী ভাষায় বিদ্যান লোক কোন মহলে সর্বাপেক্ষা অধিক ?

বা । কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা অধিক ।

শি । যেমন কলিকাতা ইংরাজদিগের রাজধানী বলিয়া এখানে ইংরাজীতে বিদ্যান লোক অধিক হইয়াছে, তেমনি নবদ্বীপ হিন্দুরাজ্যদিগের রাজধানী ছিল বলিয়া তথায় সংস্কৃত বিদ্যান প্রাচুর্য্যব হইয়াছিল । আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঐ নবদ্বীপে লক্ষণ সেন নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন (এই লক্ষণ সেনের রাজবাড়ী ভাঙ্গা হইত) সেন উপাধি বিশিষ্ট আর কোন রাজার নাম শুনিয়াছ ?

বা । বর্মান সেন ।

শি । যে বর্মান সেনের নাম শুনিয়াছ, এই লক্ষণ সেন সেই বংশেরই একজন রাজা বলিয়া মনে হয় । আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে লক্ষণ সেনের বয়স ৮০ বৎসর মত । স্বতরাং বৃদ্ধ রাজা রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিতেন না । কেবল ধর্ম্ম কার্য্যেই মন দিয়াছিলেন । একদিন রাজা লক্ষণ সেন বলিয়া আছেন ; এমন সময় তাঁহার পুরোহিত ও অধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজা তাঁহাদিগকে যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিলেন । কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন বলিতে পার ।

বা । রাজা দাঁড়াইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন ও বাসিবার আশন দিলেন ।

শি । হাঁ, ঠিক কথা । তারপর রাজ পুরোহিত বলিতে লাগিলেন “মহারাজ, শাস্ত্রের উক্তি মিথ্যা হইবার নয় । বয়সে যে যবনামিক্ত হইবে তাহার কাজ উপস্থিত । শুনিলাম যবন সেনা আগত আয়, অতএব চলুন শীঘ্রক্বে প্রস্থান করি ।” মানচিত্রে শীঘ্রক্বে দেখাও—নবদ্বীপ হইতে কোন রাস্তায় শীঘ্রক্বে যাওয়া যায়—শীঘ্রক্বে অপর নাম কি ?

বা । (মানচিত্রে প্রদর্শন)—শীঘ্রক্বে অপর নাম জগন্নাথ বা পুরী ।

শি । রাজা বৃদ্ধ—বৃদ্ধ অবস্থায় প্রায়ই পরিবর্তনে অনিচ্ছা হয় । রাজা পণ্ডিত বর্গের পরামর্শ গ্রহণে অসম্মত হইলেন । ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধ রাজাকে পন্নিভাগ করিয়া যাইবেন

কিনা ভাবিতে লাগিলেন। অনেকই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু কেহ কেহ রাজার প্রতি মেহ বশতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। একপাশে রাজাকে পরিত্যাগ করা কি ভাল হইয়াছিল ?

বা। কখনই না—যাহারা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তাহারা নিতান্ত সার্থপর।

শি। যে সময়ে নব্বইশে এই ব্যাপার ঘটে তাহার একমাস পূর্বে দিল্লীর (মানচিত্রে দেখাও) বাদশাহ কুতুবুদ্দিন একদিন সন্ধ্যাপরি বসিয়া বহু পত্র যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। পূর্বকালের রাজাদিগের ইটী একটী প্রদান আদায় ছিল। তাহারা কেবল বন্য পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ দেখিয়াই তুষ্ট হইতেন এমন নহে, বজবান মঙ্গলগণের সহিত ঐ সকল পশুর সংগ্রাম করাইতেন—তাহাতে অনেক নরহত্যাও হইত। আর কোন দেশের গল্পে এইরূপ সামুদ্রিক পশুর যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ ?

বা। হা, সে দিন ভূগোল পড়ার সময় রোমনগরের উপলক্ষে শিক্ষক মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন।

শি। কুতুবুদ্দিন যুদ্ধ দেখিতেছেন এমন সময়ে একটা বিকৃতাকার পুন্ড্র সেইখানে প্রবেশ করিলেন। তাহার হস্ত বানরের হস্তের ন্যায় দীর্ঘ, আকার খর্ব এবং গাত্র সমুদ্র বড় বড় স্কোনে আবৃত। আচ্ছা বলদেখি, ঐ ব্যক্তিও মুসলমান—মুসলমানেরা গায়ে জামা পরে। তবে ঐ ব্যক্তির গায়ের বড় বড় লোম কিরূপে দেখা গেল ?

বা। যাহারা কুস্তি করিতে যায় তাহারা গায় জামা পরে না। তাহারা কেবল কাটা পরে।

শি। সেই খর্বাকার ব্যক্তি রক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটা প্রকাণ্ডকায় হস্তির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, দর্শক সাত্রেই চমৎকৃত হইয়া থাকিল। কাহারও মুখে কথা নাই। ঐ ব্যক্তি হস্তির সহিত কক্ষকাল যুদ্ধ করিয়া, পরে তাহার শুভে এগনি দারুণ প্রহার করিল যে হস্তিটা চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল।

বা। গায় ত খুব জোর।

শি। তখন বাদশাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অনেক পুরস্কার প্রদান করিলেন। এই ব্যক্তির নাম বক্তিমার খিলিজি (বোর্ডে লিখন)। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে বক্তিমার বেহার জয় করিয়াছিলেন। এইবারে ইনি বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয় ?

কোন দেশে সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে, মাঝামাঝি সেই দেশে যে নদী গিয়াছে তাহারই তীরে তীরে যাইতে হয় ।

বা । তবে দিল্লী হইতে যমুনা নদীর দূর দিয়া আসিলে এখানাবাদ পর্যন্ত আসা যায় (মানচিত্রে দেখাইয়া) তারপর গঙ্গার পাশে পাশে যাইয়া কানৌ ও বেহার পার হইলেই বঙ্গদেশে উপস্থিত হওয়া যায় ।

শি । হাঁ, বক্তৃতার বিলিঞ্জি গ্রাম ঠিক ঐ পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন । তাহারই আগমনের কথা শুনিয়া নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । বক্তৃতার কেবল গঙ্গার পার ধরিয়া আসিতে থাকিলে কোণায় গিয়া পড়িতেন ?

বা । সমুদ্রে ।

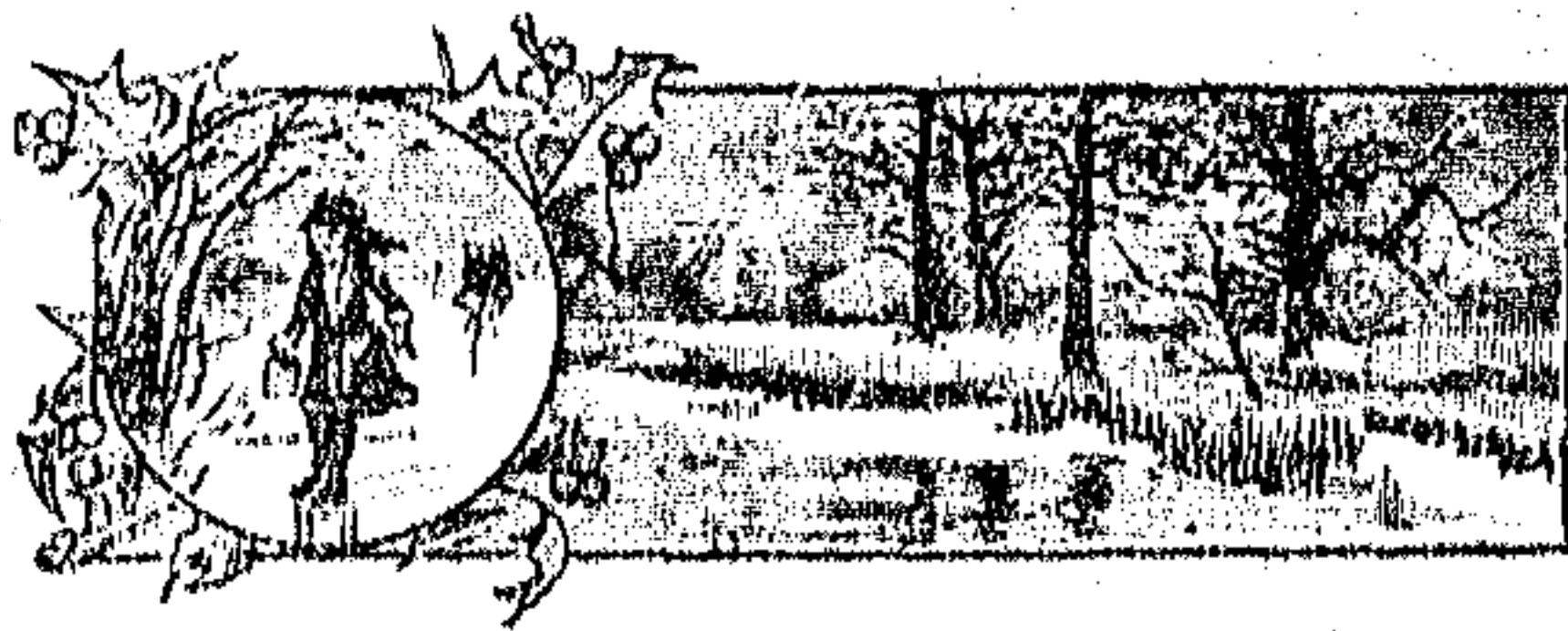
শি । তবে কোন্ পান হইতে তিনি নবদ্বীপের পথ ধরিয়া লইলেন ? নবদ্বীপ কোন্ নদীর উপর ?

বা । নবদ্বীপ ভাগীরথীর উপর—ভাগীরথী গঙ্গার এইখান থেকে বাহির হইয়াছে । এই স্থানকে ছাপখাটীর মোহানা বলে—মুর্শিদাবাদ জেলার একটা গ্রাম (মানচিত্র দেখাইয়া) ।

শি । ঐ সকল স্থানে নদীর ধোয়াটমাটিতে পরিপূর্ণ । অনেকস্থল কেবল বাধুকাময় । এইজন্যই নদীর মুখ সকল সময় ঠিক থাকে না । যে থানে বর্ষাকালে গঙ্গার বেগ অধিক লাগে সেই স্থানেই ভাগীরথীর মোহানা হয় । বক্তৃতার এই মোহানা হইতে, ভাগীরথীর তীরে তীরে আসিয়া নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন । সৈন্য সামন্ত দুই রোপিয়া কেবল মণ্ডুদণ্ড জন আশ্রয়হরণে নগরে আবেশ করিলেন । নগর রক্ষী কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, আমরা বেহার-জ্যেতা যবন রাজার দূত ।

বা । নগররক্ষীরা তাহাদিগকে কেন মারিণ না ?

শি । দূতকে মারিতে নাই—সকল রাজারই এই নিয়ম । এইরূপ বকনা করিয়া মুসলমান সেনাপতি রাজবাড়ীর দ্বারে উপনীত হইলেন এবং অমতক রক্ষিবর্গকে হনন করিতে লাগিলেন । রাজা আসন্ন যুদ্ধ বুঝিয়া রাজ বাটীর পশ্চাত্তর দরজা দিয়া ভাগীরথীর তীরে পলায়ন করিলেন ও একপানি মোকামোজে জগন্নাথ চলিয়া গেলেন । শাস্ত্রে লেখা আছে বঙ্গদেশে যবনের অধিকার হইবে, আর যবনও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা বুণা, ইহাই মনে করিয়া নগরনাগী এবং রাজার সৈন্য সামন্তও নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন । এইরূপে বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্তগত হইল ।



ষষ্ঠ প্রকরণ—বিজ্ঞান বিষয়ক ।

১। পদার্থ পরিচয় ।



শিক্ষার উদ্দেশ্য ।—পদার্থ বিশেষের গুণাগুণের পরিচয় করাকে পদার্থ পরিচয় বলে । পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা কাচ খণ্ডের স্বচ্ছত্ব, কঠিনত্ব, ভঙ্গুরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণ করিলেই কাচ রূপ বস্তুর গুণাগুণের পরিচয় হয় । বালকেরা পুস্তকে যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়া থাকে, তাহা পণ্ডিত-

গণের পর্যবেক্ষণের ফল । যাহাতে বালকগণ নিজের পর্যবেক্ষণের দ্বারা, সেই সেই ফল, সেই সেই পদার্থ হইতেই, অল্পের সাহায্য ব্যতিরেকে লাভ করিতে পারে, পদার্থ পরিচয় শিক্ষার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় বালককে পর্যবেক্ষণ করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে ; আর তাহার সেই পর্যবেক্ষণী শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে । এই পর্যবেক্ষণ শক্তির উন্নয়ন ব্যতীত, পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় আরও কয়েকটি বিশেষ ফল লাভ হয় । (১) নিজের হস্ত ও চক্ষুর সাহায্যে

নানাবস্তু পরীক্ষা করিতে শিখিয়া বাগদেকরা বিশেষ আনন্দ লাভ করে (২) পুস্তকাদির সাহায্য ব্যতীত বাগদেকগণ আবশ্যকীয় নানা প্রাকৃতিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় । (৩) জীব জন্তুর জ্ঞান জ্ঞান বৃদ্ধিতে পারিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে । (৪) কন্ম-জিয় ও জ্ঞানোজিয় সমূহের সমবায় উন্নতি সাধিত হয় (৫) বাগদেকগণ যে নিজ শক্তি নিয়োগেও অনেক কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা বুদ্ধিতে পারিয়া আত্ম শক্তিতে নিভর করিতে শিক্ষা করে ।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষার বিষয় ।—গরু, খোড়া, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পশু ; মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি কীট ; পিপীলিকা, উই, মাকড়সা প্রভৃতি কীট ; গীম, মটর, আলু, আম, বাগ, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদ ; সোণা, রূপা, পিত্তল, লোহা প্রভৃতি ধাতু ও কাঁচ, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ই পদার্থ পরিচয় শিক্ষার বিষয় । তবে এ সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের কতৃপক্ষগণ শিক্ষকগণের সাহায্যার্থে সমুচিত বিষয় নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ।

যখন বাগদেকগণ বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাৰ্য্য করিতে করিতে বিরক্তি বোধ করে, তখন শিক্ষকগণ পদার্থ পরিচয় শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন । পদার্থ পরিচয় পাঠ্য তালিকা ভুক্ত কোন বিষয় নহে, আর বার্ষিক পরীক্ষায়ও এ বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয় না । শিশুকে আনন্দ দান করাষ্ট এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, জ্ঞানদান তাহার অন্তরালে—পদার্থ পরিচয় শিক্ষা দানের সময় শিক্ষকের মনে এই কথা বিশেষ ভাবে মনে থাকে ।

পদার্থপরিচয় শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত ।—একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পদ্ধতির একটা আভাস পাঠবেন । মনে করুন প্রচলিত মুদ্রার আকার বিষয়ে পাঠ দান করিতে হইবে । বাগদেকগণের হাতে একটা করিয়ু পয়সা দিয়া জিজ্ঞাসা করুন :—

- শি। এ গুলি কি ?
- ছা। এ পয়সা ।
- শি। ইহার আকার কেমন, কোন জিনিষের মত ?
- ছা। ইহার আকার গোল, খালার মত ।
- শি। আর কোন জিনিষের মত ?
- ছা। মুটির মত, (টাদের মত ইত্যাদি) ।
- শি। (একখানি কাঠের, টিনের বা গ্লাসের বা মেইনপ গুলি কোন শক্ত পদার্থের ছোট টুকরা হাতে দিয়া) এ টুকরা খানির আকার কেমন ?
- ছা। চৌকির মত আকার ।
- শি। হাতে চাপিয়া ধর ; হাতে বাথা লাগে কি ?
- ছা। চৌকির এই চারিটি কোণ হাতে লাগে ।
- শি। পয়সাটা চাপিয়া ধর, হাতে লাগে কি ?
- ছা। না লাগেনা, পয়সা গোল, ইহার কোন মাই ।
- শি। পকেটে রাখিলে কি হাতে করিয়া নিজে বাথা লাগিবার সম্ভাবনা নাই । (হাতে কতকগুলি মারবেল দিয়া) এ গুলিরও ত কোন নাই, হাতে চাপিয়া দেখত লাগে কিনা ?
- ছা। হাতে চাপিলে লাগেনা । তবে পয়সা, মারবেলের মত গোল করিলেও ত হইত ।
- শি। আচ্ছা, তোমাদের মারবেল গুলি দাও (মারবেলগুলি এক সঙ্গে লইয়া, একটু জোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া) এই মারবেল গুলির দশা কি হইল ?
- ছা। টেবিলের উপর দিয়া গড়াইয়া, চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল ।
- শি। পয়সাগুলি কি এমন করে গড়াইয়া যায় ?
- ছা। না, পয়সা মারবেলের মত গোল নয়, অমন করে ছড়ায় না ।
- শি। অমন করে ছড়াইলে কি হইত ?
- ছা। পয়সা গুলি অতি সহজেই হারাইয়া যাইত ।
- শি। (পয়সার সঙ্গে কয়েকটা আধুলী হাতে দিয়া) কোন্টা পয়সা ও কোন্টা আধুলী কেমন করে বুঝিতেছ ।
- ছা। পয়সাটা তামার তৈয়ারী, লাল রং—আর আধুলীটা রূপার তৈয়ারী, সাদা রং ; রং দেখিয়াই পয়সা ও আধুলী চিনিতে পারিতেছি ।

শি। আচ্ছা তুমি চোখ বুজিয়া থাক । একজন একটা পয়সা চাহিল, কেমন করিয়া দিবে ?

ছা। (একটু চিন্তা করিয়া) তা দিতে পারি। এই খাদ্যুদীর দ্বারা কাটা আছে, হাত দিয়েই বুঝতে পারা যায় । পয়সার দ্বারা তেলতেলে ।

শি। (হাতে একটা মিকি ও একটা আধ পয়সা এবং একটা আনী দিয়া) কোন্টা মিকি, কোন্টা আধ পয়সা ও কোন্টা আনী চোক বুজিয়া ঠিক করত ।

ছা। (চোখ বুজিয়া) এই পাশ কাটাটা মিকি, এহঁ মেটার পাশে ঢেউ তোলা মেটা আনী, এই তেলতেলে পাশওয়ালাটা আধ পয়সা ।

শি। আকারে এত রকম করা হইয়াছে কেন ?

ছা। আমরা অন্ধকারেও টাকা, পয়সা, মিকি ও আনী দিতে ভুল না করি ইত্যাদি । ('পাঠনার নোট' পরিচ্ছেদের ৯ ও ১০ম নোট পাঠ করুন ।)

পদার্থ পরিচয় শিক্ষার ধারা ।—(১) বাৎকেনা যে সকল পদার্থ সাধারণতঃ দেখে, প্রথমতঃ নেষ্ট সকল পদার্থ বিখ্যেস্ত পদার্থ পরিচয়েব পাঠ দিতে হইবে । যে বস্তু সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইবে, সে বস্তু সংগ্রহ করা আবশ্যিক । যদি পদার্থটা ছোট ও সহজ প্রাপ্য হয় (যেমন পাখুরে কয়লা, গোহার গোক, ধুতরা ফুল ইত্যাদি) তবে প্রত্যেক ছাত্রের হাতে এক একটা করিয়া পদার্থ প্রদান করিতে হইবে । যদি পদার্থ বৃহৎ হয় বা অধিক সংগ্রহের পক্ষে অসুবিধা হয় তবে একটা বস্তু সংগ্রহ করিয়া (যেমন গরু, টেবিল, গৃহ ইত্যাদি) তাহার চারিদিকে বাৎকগণকে দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিতে হইবে । কথা এই যে বাৎকগণ যেন বস্তু সমস্ত অংশ নিজ হাতে পরীক্ষা করিতে পারে । অস্তাব পক্ষ্যে কোন কোন পদার্থের ছবি বা পুস্তকের সাহায্যে (যেমন সিংহ, কয়লার খনি, আলোক গুহ ইত্যাদি) পাঠ দিতে হয় বটে, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক না হইলে এরূপ পদার্থ সম্বন্ধে পাঠ না দেওয়াই ভাল ।

(২) পদার্থ পরিচয়ের পদার্থ শ্রেণীর উপযোগী হওয়া আবশ্যিক । আবার সেই পদার্থের এমন সমস্ত গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যিক,

যাহা বালকগণ সহজে বুঝিতে পারে । আলোচনায় কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করা উচিত ।

(৩) বাসকেবা যাহা হইবে পদার্থটি পরীক্ষা করিয়া নিজেরাই তাহার গুণাগুণ নির্ধারণ করিতে পারে এরূপ ভাবে তাহাদিগকে পানিচাপিত করিতে হইবে ।

(৪) যে পদার্থ বিষয়ে পাঠ দেওয়া হইবে (সহজ প্রাপ্য হইলে) সেই পদার্থ সংগ্রহের জন্য বালকগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে । যদি বালকগণ পদার্থটির অংশ বা সমস্ত পদার্থটি জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, তবে জ্ঞান কবান আবশ্যিক । আর যদি মাটি দ্বারা তাহার প্রতিকৃতি গঠন করিতে পারে, তবে আরও ভাল ।

(৫) শিক্ষাদানে একটা শৃঙ্খলার অনুসরণ করা বিশেষ আবশ্যিক । গুরুত্ব বিষয় আলোচনা করিবার সময় গুরুত্ব মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ পর্যন্ত বর্ণনা কর, কিংবা লেজ হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্যন্ত আলোচনা কর । বিস্তৃত মাথার এক কথা বলিয়া, তারপর লেজের এক কথা আলোচনা করিয়া, আবার মাথার এক কথা বলা, রীতি বিরুদ্ধ । এইজন্য শিক্ষককে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে ।

(৬) ব্লাক বোর্ডের উপযুক্তরূপ ব্যবহার করা আবশ্যিক । যে পদার্থ বিষয়ে পাঠ দিবে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি বোর্ডে আঁকিয়া দেখাইতে হইবে, আর পাঠের সংক্ষিপ্ত সারও বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে । (পাঠনার নোটের পরিচ্ছেদ দেখ) ।

(৭) যাহা শিখাইলে, তাহা শৃঙ্খলাক্রমে বর্ণনা করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে । নিম্ন শ্রেণীর বালকগণ মুখে মুখে বর্ণনা করিবে, উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ লিখিয়া বর্ণনা করিবে । এই প্রথা রচনা শিক্ষারও প্রধান সহায় ।

২ । বিজ্ঞান ।

বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যিকতা ।—কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি আগাদিগের জীবন ধারণের প্রদান সহায় । এই কৃষি, বাণিজ্যের সম্যক উন্নতি কেবল বিজ্ঞান আলোচনার উপর নির্ভর করে । কোন দেশ-বিশেষের সভ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করিতে হইলে, সেই দেশের বিজ্ঞান আলোচনার পরিমাণ নির্দেশ করিলেই তথাকার সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ধারণ করিতে পারা যায় । বিজ্ঞানোন্নত দেশ সমুদায়ত্ব ধনে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধিশালী হইয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বহিয়াছে । সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনা যে সকল শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা আবশ্যকীয় ও ফলপ্রসূ তাহা বলা বাহুল্য ।

পদার্থপরিচয় বিজ্ঞানালোচনার প্রারম্ভ । আবার কিণ্ডারগার্টেন পদার্থ পরিচয়ের প্রারম্ভ । তবে পদার্থপরিচয় ও বিজ্ঞানে এই মাত্র সামান্য প্রভেদ আছে যে, পদার্থপরিচয় পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ, আর বিজ্ঞান পরীক্ষণ সাপেক্ষ ।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয় ।—উদ্ভিদবিদ্যা পড়াইতে হইলে মূল্যবান যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না ; একটা অণুবাক্য যন্ত্র হইলেই হইল । অল্পবয়স্ক একজন শুল্কমধ্য কাচ (মূল্য ২৩ টাকা) হইলেও কাজ চলিতে পারে । আর যখন উদ্ভিদ বিদ্যার সহিত কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে উদ্ভিদের আলোচনার বিশেষ ফল লাভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস । উদ্ভিদের পরে শরীরতত্ত্ব ; কিণ্ডার বায় বাহুল্য নষ্ট । তবে একেবারে কতকগুলি আদর্শ কিনিয়া রাখিলে আর বিশেষ ব্যয়ের আবশ্যক হয় না । কিন্তু পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন, বায়ুসাপেক্ষ । একবারে জিনিষ কিনিতেও চলে না । আরক প্রভৃতি ফুরাইয়া যায়, আর যন্ত্রাদিও সহজে ভাঙিয়া যায় । তবে ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন পড়ান কর্তব্য বটে । কারণ সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যেই এই দুই বিজ্ঞান নিহিত আছে । শিক্ষকগণের পক্ষে এই চারিটি বিষয় নেইই আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক ; সুতরাং ট্রেনিং স্কুলে এই চারিটি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য ।

পরীক্ষণ বিষয়ে সাধারণ উপদেশ ।—(১) কোন পরীক্ষণ প্রদর্শন করিবার পূর্বে নিজে সেই পরীক্ষণের পরীক্ষণ করা কর্তব্য । অপ্রস্তুত ভাবে প্রেরিত আশিয়া কোন পরীক্ষণের চেষ্টা করিও না ।

(২) পরীক্ষণের জন্ত যে সকল জব্যাদির আবশ্যক হইবে তাহা পূর্বেই সংগ্ৰহ করিয়া রাখিবে । পরীক্ষণের সময় জব্যাদির জন্ত দোড়া-দোড়ি করা বড়ই কদর্য ।

(৩) যে সময় কোন জব্য উত্তপ্ত বা শীতল করিতে হয়, সে সময় বালকগণ (চুপ করিয়া না বসিয়া) নিজ নিজ খাতায় সেই পরীক্ষণের যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবে ।

(৪) আবশ্যক বিবেচনায় শিক্ষকও ব্র্যাক বোর্ডে সমস্ত যন্ত্রের বা তাহার অংশের ছবি আঁকিয়া দিবেন । বালকেরা তাহা নকল করিয়া লইবে ।

(৫) ব্যবস্থা থাকিলে বালকগণের দ্বারাও পরীক্ষণ করান কর্তব্য । নিজের হাতে পরীক্ষণ করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় ও বিশেষ রূপ মনে থাকে ।

(৬) পরীক্ষণের প্রত্যেক কার্য্য শাস্ত্র ভাবে ও ধীরে ধীরে দেখা-টবে । তাড়াতাড়ি করিলে বালকেরা পরীক্ষণের বিষয় ভাল করিয়া অনু-দান করিতে পারিবে না ।

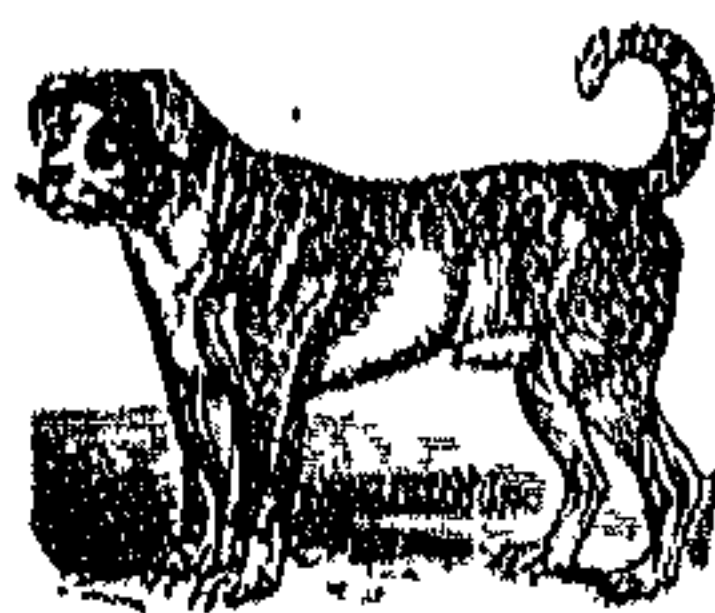
(৭) পরীক্ষণে কি ফল লাভ হইবে তাহা পূর্বে বলিয়া দিও না । বালকের সম্মুখে পরীক্ষণের কার্য্য করিয়া যাও ও বালকগণকে সেই কার্য্য ও তাহার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে বল । পূর্বে বলিয়া দিলে উৎসুক্য নষ্ট হইয়া যায় ।

বায়ুর উর্দ্ধচাপ পরীক্ষণ করিবার পূর্বে যে শিক্ষক “বায়ুর উর্দ্ধচাপ পরীক্ষণ করিতেছি” বলিয়া আরম্ভ করেন তিনি বালকগণের তেমন মনাকর্ষণ করিতে পারেন না । কিন্তু যে শিক্ষক কিছু না বলিয়া, এক গেলান জল লইয়া, তাহার মুখে এক বানা শক্ত কাগজ দিয়া,

গেলাশ উন্টাইয়া দেখাইলেন যে জল পড়িল না, তিনিই বালকগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইলেন । কারণ এই পরীক্ষণে, ‘জল কেন পড়িল না’ তাহাই জানিবার অন্য বাণী হইয়া, বালকেরা নিজ নিজ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকিলেন ।

(৮) এক বিষয় সম্বন্ধে অনেক রকমের পরীক্ষণ দেখান ভাল নয় । আবার নিজের বাহ্যদ্রবী দেখাষ্টবার জন্য শব্দ শব্দ পরীক্ষণও দেখান উচিত নয় । পরীক্ষণ যেমন সংখ্যায় কম হওয়া উচিত, তেমনি সরল হওয়াও আবশ্যক ।

(৯) অনেক সময় বালকেরা পরীক্ষণের বিষয় ও পরীক্ষিত সত্য পৃথক করিয়া লইতে পারে না । পূর্বোল্লিখিত পরীক্ষণের পর পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে বালকগণকে প্রশ্ন করিলে হয় ত কেহ কেহ উত্তর করিবে “গেলাশের মুখে কাগজ আটিয়া দিলে জল পড়িবে না” । এইজন্য পরীক্ষিত সত্য (বায়ু উর্দ্ধ দিকেও চাপ প্রদান করে) বোঝে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক ।





সপ্তম প্রকরণ—শিল্প বিষয়ক ।

১। চিত্রাঙ্কন ।



বশ্যকতা ।—স্থল কার্যে, চক্ষুর ও হস্তের যে কার্যকারিতা শক্তির আবশ্যক হয়, চিত্রাঙ্কনে তাহার যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায় । শিল্প ব্যবসায়ীদিগের এ বিদ্যা বিশেষ প্রয়োজনীয় । বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায়, চিত্র বিদ্যার যথেষ্ট আবশ্যকতা হইয়া থাকে । যজ্ঞাদির

আভ্যন্তরিক অবস্থা, জীব দেহের ব্যবচ্ছেদ, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি স্থিতি, গুরুর ভূগর্ভস্থ বিভাগ প্রভৃতি অনেক সময় চিত্র দৃষ্টেই বুঝিয়া লইতে হয় । বহু বর্ণনা করিয়াও যে বিষয় প্রকাশ করা কঠিন, এরূপ অনেক বিষয়ও চিত্রের সাহায্যে অতি সহজে প্রকাশ করা যায় । এ সকল ছাড়া চিত্র বিদ্যার একটা মোহিনী শক্তি আছে । সম্মুখের মত ইহাতে মানুষের মন প্রফুল্ল রাখিতে পারে । চিত্র বিদ্যায় সৌন্দর্য ও সমতার জ্ঞান বিকাশ করিয়া দেয় । বিশেষ, চিত্র না জানিলে শিক্ষকতা কার্য চালান কঠিন হইয়া পড়ে ; কারণ শিক্ষককে বালকের পরিচিত, অপরিচিত নানা পদার্থের চিত্র আঁকিয়া অনেক বিষয় বুঝাইতে হয় ।

বিভাগ ।—একটা ছবি দেখিয়া তদ্রূপ বা তাহার অপেক্ষা বড় কি ছোট চিত্র অঙ্কনকে ‘চিত্রাশুলিপি’ কহে । একটা জবা দেখিয়া তদ্রূপ কি তাহা অপেক্ষা বড় কি ছোট চিত্রাঙ্কনকে ‘জবাশুলিপি’ কহে । আবার আঁকিবার জন্যও দুই রকম—এক প্রকার যন্ত্রাদির (ক্লেয় কম্পাশ প্রভৃতি) সাহায্যে (যান্ত্রিক অঙ্কন) ; অপর যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত (অযান্ত্রিক অঙ্কন বা মুক্ত পানী অঙ্কন) । বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সকল চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকেই করিতে হয় ।

শিক্ষার আরম্ভ ।—কিঙারগার্টেন পদ্ধতি বর্ণনা কালে, শিশু শ্রেণীতে যেক্রমে ভাবে অঙ্কন শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা (২০১পৃঃ) একরূপ বলা হইয়াছে । সেই রূপেই আরম্ভ করিতে হইবে ।

বালকেরা অঙ্কন খুব পছন্দ করে, কিন্তু মৈথিল্য সহিত লাইন শিক্ষার কষ্ট সহ্য করিতে চায় না । যেমন গান শিখিতে গেলে, শিক্ষার্থী মা রে গা মা সাধন করিবার কষ্ট সহ্য করিতে চায় না, একেবারেই গান শিখিতে চায়, অঙ্কন সম্বন্ধেও তদ্রূপ । এটা স্বাভাবিক ভাব । সুতরাং এই ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া বালকগণকে সহজ সহজ জব্যাদির অঙ্কন শিখাইতে আরম্ভ করা কর্তব্য । কিঙারগার্টেন প্রকরণের কাঠি সাক্ষান প্রবন্ধে (১৯৩ পৃঃ) এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে । নানা আকৃতির, কতকগুলি গাছের পাতা সংগ্রহ কর । পুরাতন খবরের কাগজের ভাঁজে ভাঁজে পাতাগুলি রাখিয়া, কোনও ভারি জিনিষ দিয়া চাপা দিয়া রাখ । পাঁচ সাত দিনেই পাতা গুলি চাপে সমান হইয়া যাইবে । এইরূপ এক একটা পাতা বালকদিগকে দাও । তাহার পাতাটী স্কেটের উপর রাখিয়া, তাহার চারি পাশে পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিবে । পাতা উঠাইয়া নিলেই স্কেটে পাতার ছবি দেখিতে পাইবে । এইরূপে কিছুদিন অভ্যাসের পরে, কেবল পাতা দেখিয়া পাতা আঁকিতে শিক্ষা দিবে । তারপর পাতার ছবি দেখিয়া, সেইরূপ পাতা আঁকিতে অভ্যাস করিবে । এইরূপে খুব সহজ ফুলের (যেমন রজন, চামেলী, যুঁই

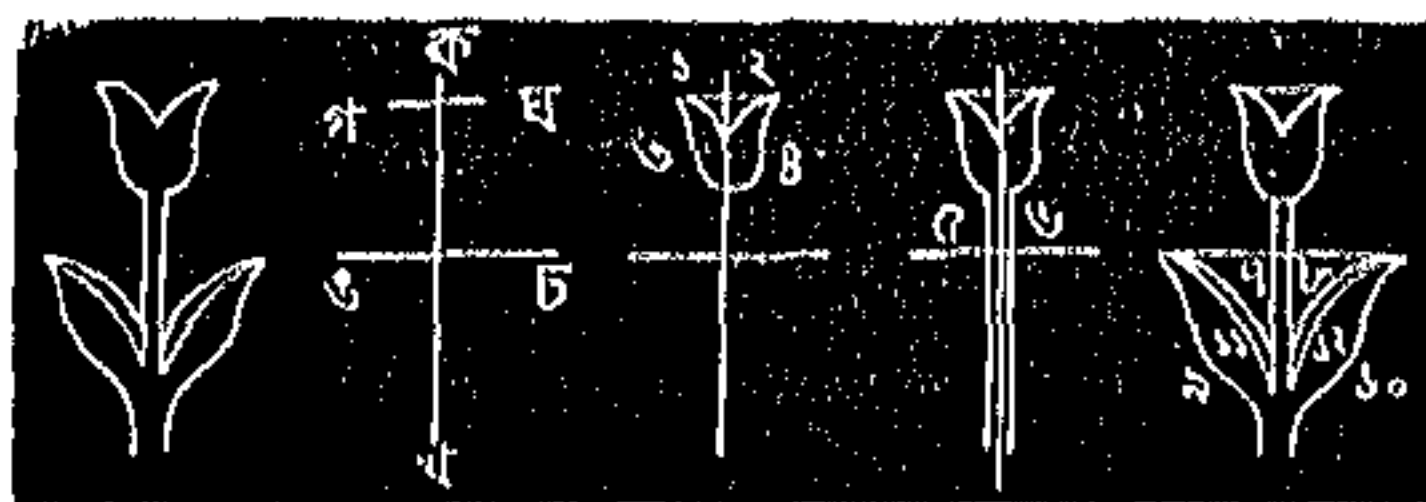
ইত্যাদি) সাধারণ অংশ (কেবল পাণ্ডি গুলি) আঁকিতে অভ্যাস করিবে । এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে বালকগণ শ্রীবীর নির্দিষ্ট চিত্র অঙ্কন করিতে সক্ষম হইবে ।

কাগজ, পেপিসল ও রবার— চিত্রাঙ্কনের কাগজ পুরা ও বস্তুসমূহ রক্ষণের হওয়া আবশ্যিক । পাতলা ও ভেলভেলে কাগজে চিত্রাঙ্কন ভাল হয় না । যে পেপিসলের উপর ১১ বা ১২ লেখা থাকে (ইহাকে ডুইং পেপিসল বলে) অঙ্কনের পক্ষে তাহাই সুবিধাজনক ।

সাধারণ নরম পেপিসে আঁকিতে গেলে কাগজ ময়লা হইবে ও দাগগুলি মোটা হইবে । ডুইং পেপিসের অগ্রভাগ ছুরি দ্বারা বেশ সরু করিয়া লইতে হইবে । ভেঁতা হইয়া গেলে, আবার সরু করিয়া লইতে হইবে । এইজন্য একখানা ছুরি থাকাও দরকার । একখানা রবার থাকা আবশ্যিক, কিন্তু বালকেরা যাহাতে রবারের যথেষ্ট ব্যবহার না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । যাহাতে তাহার প্রথম অঙ্কনের সময় পেপিসল দিয়া খুব জোরে দাগ না কাটে, সে বিষয়ে তাহারিগকে পুনঃপুনঃ সাবধান করিতে হইবে । চিত্রের কাঠামু করিয়া লইবার সময়, এত পাতলা করিয়া দাগ দিতে হইবে যে, রবারের দ্বারা এক টান দিলেই যেন সে দাগ উঠিয়া যায় । চিত্র শেষ হইলে, আবশ্যকীয় দাগের উপর দিয়া একটু জোরে পেপিসল চালাইয়া, সে দাগটা পরিষ্কৃত করিবে ও অল্প দাগগুলি রবার দিয়া তুলিয়া ফেলিবে । অনেক বালক রবারের ব্যবহারও জানে না । রবারের দ্বারা দাগ তুলিতে হইলে, এদিক ওদিক করিয়া ঘসিতে নাই । বাম হইতে ডানদিকে, নীচ হইতে উপরে, অর্থাৎ একদিক হইতে রবার ঘসিতে থাকিবে । দুইদিকে ঘসিলে কাগজ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে বা কাগজের নমুণতা নষ্ট হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বালকের হাতে রবার না দেওয়াই ভাল ; কারণ রবার হাতে আছে এই ভরসায়, সে অসাবধানে যেমন তেমন করিয়া রেখা টানিতে থাকিবে । রবার না দিলে সাবধান হইতে অভ্যাস করিবে ; একথা বলা নয় ।

চিত্রানুশীলপি ।—পাঠ্য পুস্তকে বা পরীক্ষার প্রার্থে যে সকল চিত্র থাকে, তাহার অধিকাংশই সমপার্শ্ব চিত্র । বালকেরা এইগুলি অঙ্কন করাই একটু কঠিন মনে করে । এসকল চিত্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

যে চিত্রের অনুলকরণ করিতে হইবে তাহাকে একটি কাল্পনিক লম্বরেখা টানিয়া সমান দুই ভাগে বিভক্ত কর। তামার কাগজে একটা লম্বা লম্ব রেখা টানিয়া, মনে করিয়া লও যেন সেইটাই তোমার কাল্পনিক রেখার নকল। এখন এই রেখার বাম পাশে মেরুপ রেখাদি আছে, তাহা উপর হইতে আঁকিতে আরম্ভ কর। প্রথমে বামদিকের এক অংশ আঁকিয়া, ওজ্রপ ডাইনে নকল কর। আবার বামদিকের অল্প এক অংশ আঁক, আর ওজ্রপ ডাইনে নকল কর। এইরূপ করিয়া ক্রমে নীচের দিকে নাগিতে থাক। নিম্নের চিত্রে ১, ২, ৩ প্রভৃতি চিত্রের দ্বারা কোন্ রেখা প্রথমে ও কোন্টী পরে আঁকিতে হইবে তাহার একটু আভাস দেওয়া হইল।



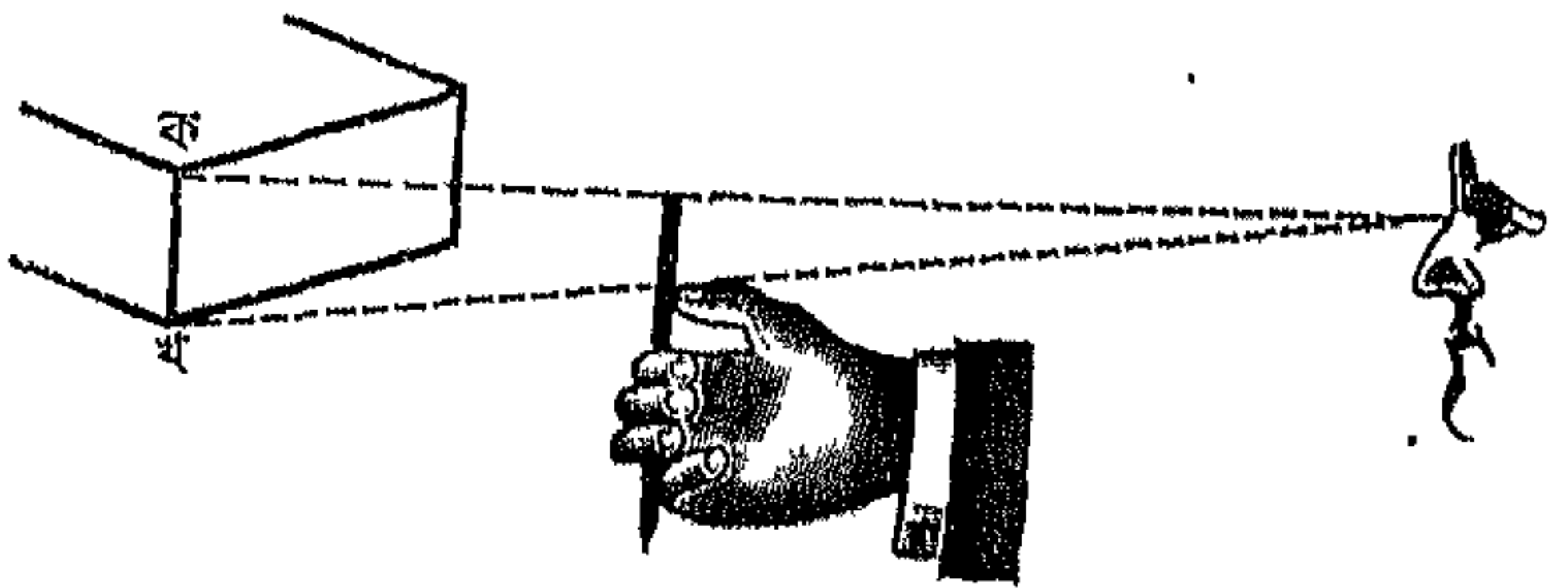
৮৩ চিত্র।—সমপাখ চিত্রাঙ্কন।

একেবারে সমস্ত রেখা না আঁকিয়া, সময় সময় বিস্তর দ্বারা মোটামুটি সমস্ত চিত্রটি চিত্রিত করিয়া লইলেও সুবিধা হয়। লম্বালম্বি একটা রেখা ছাড়া পাশাপাশি আরও কতকগুলি রেখা টানা আবশ্যক হইতে পারে। কি কি রূপ রেখা টানিলে অঙ্কনের সুবিধা হইবে, তাহার আদর্শ অনেক চিত্র পুস্তকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। চিত্র শেষ হইলে অবশ্য এ রেখাগুলি রবারের দ্বারা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। বক্র রেখাগুলি একটানে আঁকিবে; একটু একটু করিয়া আঁকিতে গেলে বক্রত্বের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। খুব অভ্যাস না করিলে উত্তম চিত্রকর হওয়া যায় না।

পরীক্ষার ছই মাস পূর্বে ইতিহাস ভূগোল মুখস্থ করিয়া সেই বিষয়ে পাশ করা যায়, কিন্তু চিত্রাঙ্কন সমস্ত বৎসর অভ্যাস না করিলে পাশ করা যায় না ।

জব্যাক্সলিপি ।—জব্যাক্সলিপি শিশুর দিবার পূর্বে, জব্যাক্সলিপি বিষয়ক চিত্র দৃষ্টে বালকগণকে চিত্রাক্সলিপি করাইতে হইবে । গোলা, বাটী, খটী, ঢোল, বোতল, গেলাগ, ছক, বাক্স, টেবিল প্রভৃতির চিত্র নকল করাইতে হইবে । ইহাতে তাহার বিয়য়ের একটা ভাব পাইবে । আমরা নিকটস্থ ও দূরস্থ জব্যাদি কিরূপ দেখি তাহা বুঝাইতে হইবে । যদি নিকটে রেলের পথ কি অনেক দূর বিস্তৃত সড়ক পথ, কি লম্বা ঘর বা বারান্দা থাকে তবে বালকগণকে সেইরূপ কোনও স্থানে লইয়া যাইবে । দেখাও যে, রেলের রাস্তা যতই দূরে গিয়াছে, ততই যেন ছই রেলের মধ্যের ফাঁক মিশিয়া গিয়াছে ; আর শেষে যেন, আকাশ ও মাটি মেথানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে । আর এক কথা—রেলের রাস্তা যতই দূরে গিয়াছে, ততই যেন উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে । আর টেলিগ্রাফের খামগুলি সব সমান হইলেও যেন দূরের খামগুলির মাথা ক্রমশঃ ছোট হইয়া নীচু হইয়া পড়িয়াছে । যদি বালক এই শেষ বিষয়টী বুঝিতে না পারে, তবে এক কাজ কর । আগে তাহাকে আয়ত ক্ষেত্রাকার জব্যাদির বাহুর সহিত পেন্সিল মিল করাইতে শিখাও । বালকের হাতে পেন্সিল বা একখান সরল কাঠি দাও । তাহাকে সেই কাঠিখানা ভূসমান্তর ভাবে ধরিয়া, বোর্ডের ধারের সহিত, টেবিলের ধারের সহিত, ডেস্কের ধারের সহিত মিল করিতে বল । তুমি নিজেও একটা পেন্সিল বা কাঠি লইয়া মিল করিবার প্রণালী দেখাইয়া দাও । এই সময় হইতেই এক বিষয় সাবধান করা কর্তব্য—বালকগণ মাপ লইবার সময় যখন পেন্সিল বা কাঠি ধরিবে, তখন বাহু যেন সহজ ভাবে, বেশ টান করিয়া রাখে । বাহু ভাঙ্গিয়া, পেন্সিল ধরিয়া মাপ

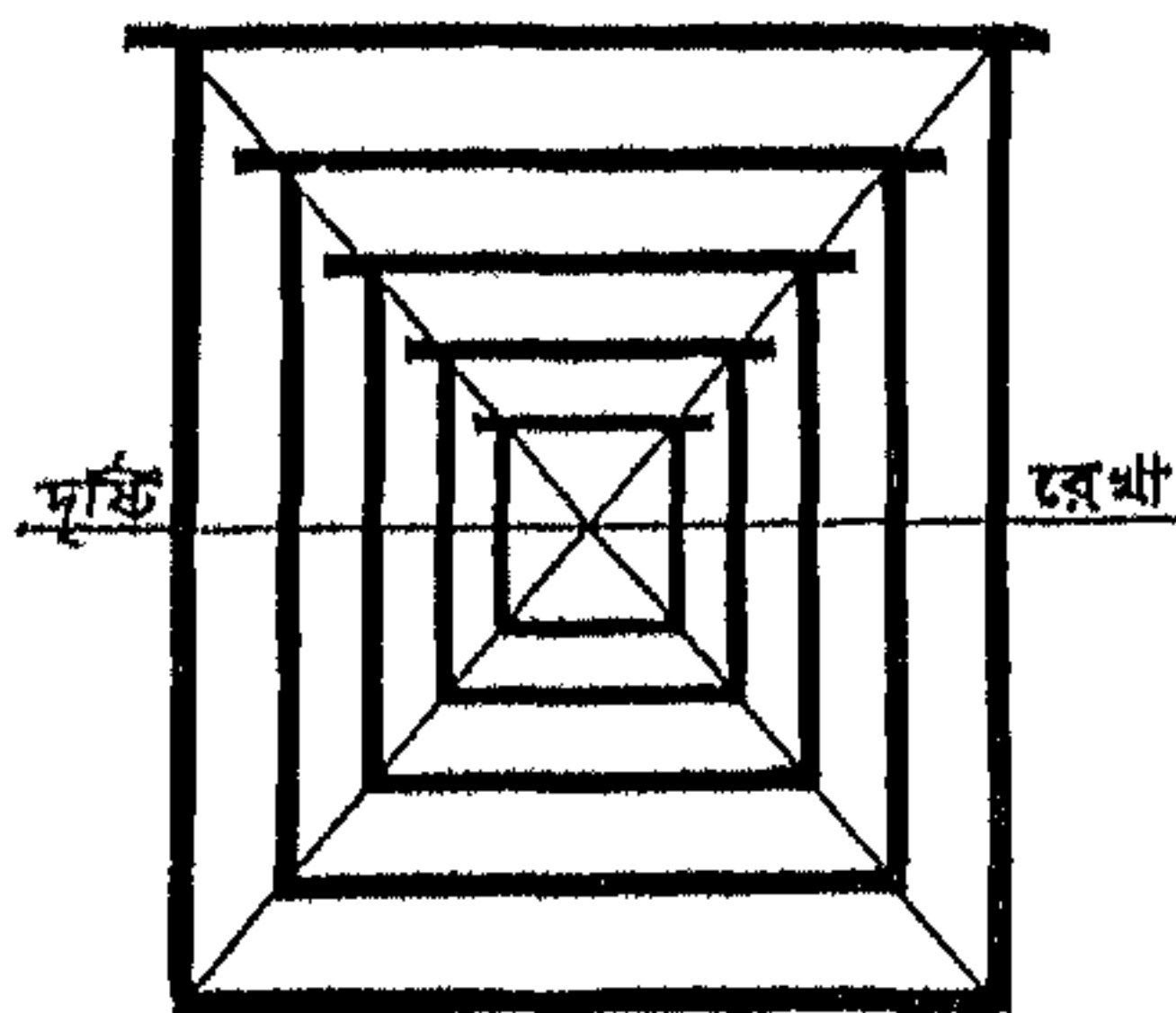
লইলে, প্রথমবার যেকোন মাপ পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় বারের ভাড়া মাপ হইতে পাবে, কাবণ পূর্বে বাহু সে পরিমাপ বজা ছিল, তাহাও দ্বিতীয় বার ঠিক থাকিবার কথা নহে । এইজন্ত সকল সময় বাহু টান করিয়া মাপ লওয়াই কর্তব্য । পেন্সিলকে আনন্দ্রক মত লম্বভাবে বা ভূমিসাঙ্করভাবে ধরিতে হইবে । কিন্তু একথা মেন মনে থাকে যে, কোন সময়েই পেন্সিলকে ভেড়া করিয়া ধরিয়া কোনও ভেড়া রেখার সহিত মিল করিতে হইবে না । মাপ লইবার সময় হয় ভূরেখার উপরে কোনও লম্বের মাপ লইবে বা ভূরেখার সমান্তর কোনও ব্যবধানের মাপ লইবে ; পেন্সিল সকল অবস্থাতেই বাহুর সহিত সমকোণে অবস্থিত থাকিবে । বৃক্স্মুলির দ্বারা সরাসিয়া সরাসিয়া উচু নীচু করিতে হইবে । একচক্ষু মুদ্রিত করিলেই মাপ লইবার সুবিধা হয় । যেকোন পেন্সিল ধরিতে হইবে তাহা নিম্নের চিত্র দৃষ্টে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে ।



৮৪ চিত্র ।—পেন্সিল দিয়া মাপ লওয়া ।

এইরূপে পেন্সিল বা কাঠির দ্বারা জব্যের লাইনের সহিত পেন্সিল মিল করিয়া ধরিতে শিখিলে, বালকগণকে একটা খুব লম্বা ঘর বা বারান্দার দাঁড়া করাইবে । সেই ঘর বা বারান্দার মেঝেতে কতকগুলি লম্বা লম্বা কাঠি, আড়াআড়িভাবে সাজাইয়া রাখ । এখন বালকগণকে সেই

ঘর বা বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়া করা হয়, সেই লম্বা কাঠিগুলির সহিত (ভূসমান্তরভাবে ধরিয়া) পেন্সিল মিল করিতে বল । প্রথমে, যে কাঠি নিকটে তাঁহার সহিত পেন্সিল মিল করিতে বল । তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে মিল করিতে থাকুক । বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে, কাঠি যতই দূরে যাঁতেছে পেন্সিল ততই উচ্চ করিয়া মিল করিতে হইতেছে । আবার এইরূপে ছাদের বিমের (কড়িকাঠ) সঙ্গে পেন্সিল মিল করাও । এবারে তাঁহারা বুঝিতে পারিবে যে যতই দূরের বিমের সহিত পেন্সিল মিল করিতে হইতেছে, ততই পেন্সিলটি নীচের দিকে নামাইতে হইতেছে । যদি কোনও গৃহ বা বারান্দায় গিয়া এরূপ পরীক্ষার সুবিধা না থাকে, তবে আর এক উপায় বলিয়া দিতে পারি । একটু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে । একটা মাঠের মধ্যে বা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, এক লাইনে, দূরে দূরে পাঁচ সাত হাত ফাঁকে ফাঁকে চারি পাঁচটা আড় (হরাই অন্ট্যান বারের মত) বসাইয়া লও ; আর প্রত্যেক আড়ের নীচে মাটির উপরে একখান করিয়া কাঠি আড়াআড়ি

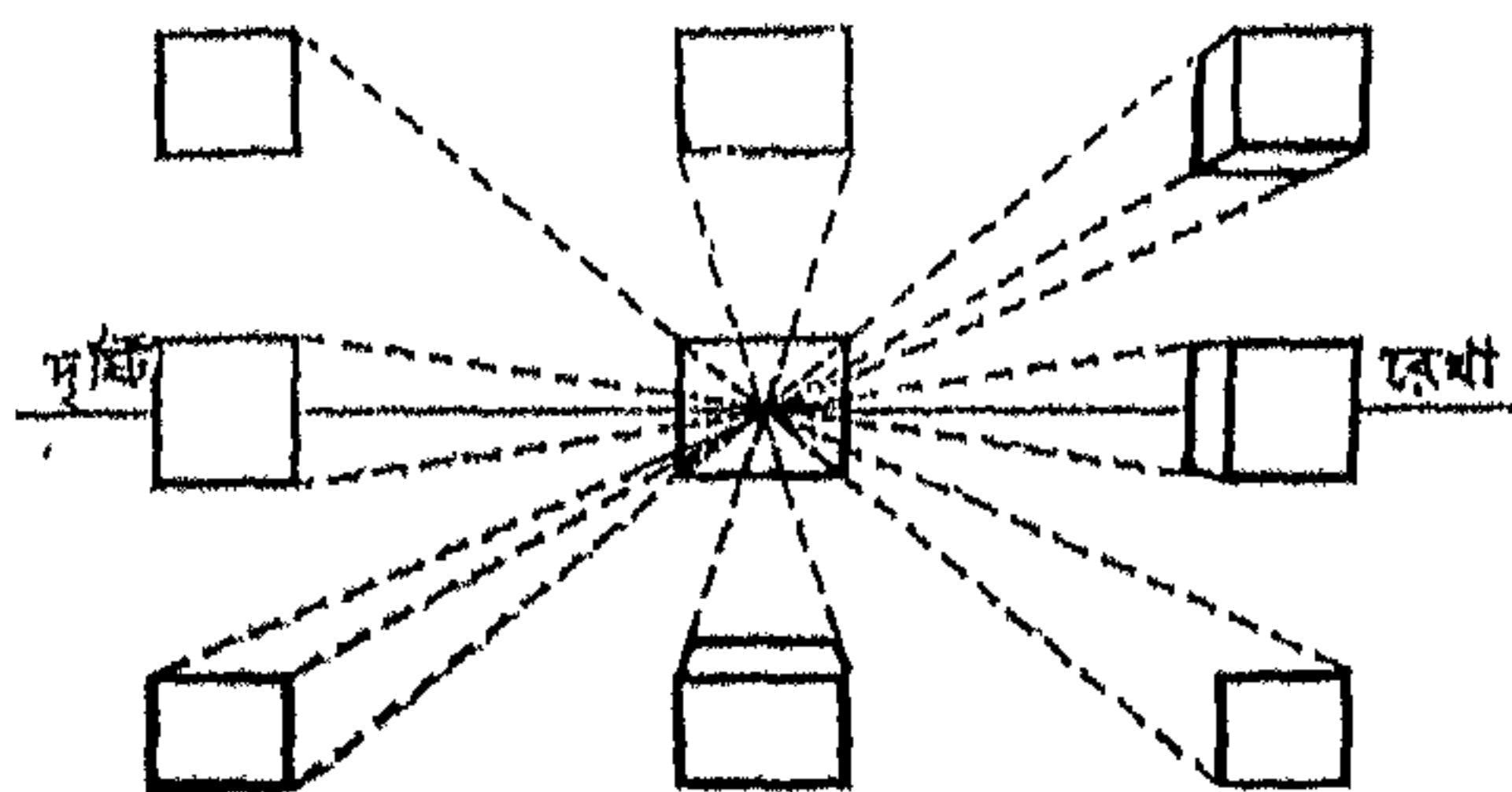


৮৫ চিত্র ।—দৃষ্টি বোধ ।

ভাবে রাখ । সামান্য বাথারোর (কাবারী, কাইম) দ্বারা এইরূপ আড় করিলেই হইবে । তবে খুঁটির বাথারোগুলি যেন ছয় হাতের কম না হয় । ইহাতেও পূর্বের মত পরীক্ষা করা যাচতে পারিবে । বালকেরা এই আড়গুলি যেক্রপ দেখিল তাহা বোড়ে অঙ্কিত করিয়া দেখাও (৮৫ চিত্র), বুঝাইয়া দাও যে যদি বহুদূর পর্য্যন্ত এইরূপ আড়া সাজান থাকিত, তবে যেখানে আকাশ ও মাটি মিশিয়াছে, সেই খানে শেষে তাহারাও ছোট হইতে হইতে এক বিন্দুতে পরিণত হইত । এই বিন্দুর নাম 'মিলন বিন্দু' । আমাদের চক্ষুর উপরে যে সকল জিনিষ থাকে তাহা যেন নামিয়া আসে, আর চক্ষুর নীচে যাহা থাকে তাহা যেন উঠিয়া গিয়া মাটি ও আকাশের মিলিত রেখার উপরে মিলিত হয় । এই রেখাকে 'চক্রবাল রেখা' বলে । সমস্ত মিলন বিন্দু এই চক্রবাল বা থ রেখাতেই পতিত হইবে ।

কতকগুলি জুতার খালি বাক্স, কি কতকগুলি আস্ত হুঁট এক লাইন করিয়া সাজাইয়া যাও । বালকগণকে এক প্রান্ত হইতে সেই হুঁটগুলি দেখিতে বল । কি দেখিল ? হুঁটগুলি ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে । এক পাশে দাঁড়া করাইয়া দেখাও । পাশগুলিও ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে । এ সমস্ত রেখাকে যদি বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই চক্রবাল রেখায় গিয়া এক বিন্দুতে মিলিত হইবে ।

এখন একটা বাক্স লও । বালকদিগের সম্মুখে ধর । তাহারা বাক্সের কয় পিঠ এক সঙ্গে দেখিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে । চক্ষু ঠিক রাখিয়া একবারে একসঙ্গে, তিন পিঠের অধিক দেখা যায় না । তারপর বাক্সটি নানা অবস্থায় ধরিয়া বালকদিগের দ্বারা বোড়ে বাক্সের চিত্র অঙ্কন করাও । প্রথমে বুঝাইয়া দেও যে, বাক্সের পাশের রেখাগুলি বাড়াইয়া দিলে ইহারাও বহুদূরে গিয়া চক্রবাল রেখার এক বিন্দুতে মিলিয়া যাইবে । নিম্নের চিত্রাঙ্কনায়, বাক্সের স্থান পরিবর্তন করাইয়া বালকদিগকে শিখা দাও :—

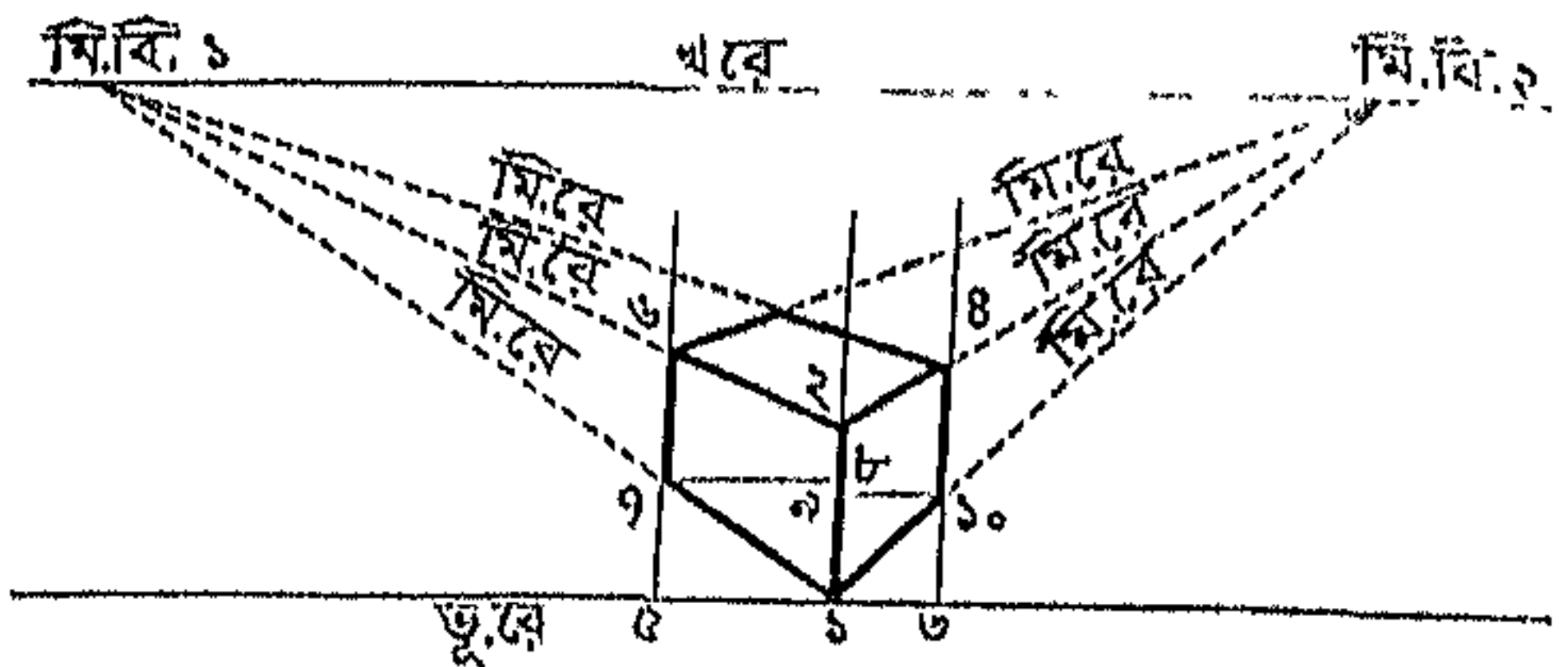


৮৬ চিত্র।—সমধান বা কিউব অঙ্কন ।

দৃষ্টান্ত :—বাক্সের যখন তিন পিঠ দেখা যায় তখন কিরূপে আঁকিতে হইবে? প্রথমে বালক বাক্সের সম্মুখের পিঠ আঁকিয়া লইবে (যেমন বামদিকের উর্দ্ধ চিত্র)। তাহার পর তাহার তিন কোণ হইতে সরু রেখা টানিয়া মিলন বিন্দুতে মিলিত করিবে (বামের নিম্ন চিত্র)। তারপর বাক্সের অপর দুইটি পিঠ আন্দাজে আঁকিবে এবং কোণের নিকটস্থ রেখাগুলি সংলগ্ন করিয়া দিবে (ডাহিনের উর্দ্ধ চিত্র)।

সমধান বা কিউব অঙ্কন শিক্ষা দানের ধারা।—কাগজের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটি রেখা টান। ভূমিতে যে স্থানে কিউবের সম্মুখস্থ কোণ আছে (১ কোণ) তাহার ঠিক নীচ দিয়া, সমকোণ করতঃ, ভূমিতে একটা কাঠি রাখিলে, যে রেখা পাওয়া যায়, এইটী যেন সেই রেখা। ইহার নাম ভূরেখা। ইহার উপর একটি লম্ব উত্থান কর; যথা ১,২। কিউবের ১০,৪ বাহু বর্জিত করিলে ভূরেখার যেখানে মিলিত হইবে বলিয়া মনে হয়, সেই স্থানটা লক্ষ্য করিয়া রাখ (যেন ৩); তার পর পেন্সিলের এক প্রান্ত কিউবের ১ বিন্দুতে রাখিয়া, পেন্সিলের যে

স্থানে ও বিন্দু মিলিত হইবে বুঝিবে, পেন্সিলের সেই স্থান ধরিয়া আনিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত ভূরেখার ১ হইতে মাপ লইয়া, ও বিন্দু নির্ধারণ



৮৭ চিত্র।—কাগজে কিউব অঙ্কন।

কর। তারপর ও বিন্দু হইতে অল্প একটা দণ্ড উত্তোলন কর যথা ৩, ৪। এই প্রণালীতে ৫, বিন্দু নির্ধারণ করিয়া, ৫, ৬ দণ্ড উত্তোলন কর। পেন্সিল লম্বভাবে ধরিয়া, কিউবের ১, ২ বাহুর মাপ ঠিক করিয়া তোমার চিত্রের ১, ২ রেখার মাপ ঠিক কর। তারপর পেন্সিল ভূসমান্তর ভাবে ধরিয়া ও তাহার এক প্রান্ত ১, ২ রেখার সংলগ্ন রাখিয়া, ক্রমে পেন্সিল উঠাইতে থাক। যেখানে দেখিবে যে কিউবের ১০ কোণ আসিয়া পেন্সিলের সহিত মিলিল, ১, ২ রেখার সেইস্থান নির্দিষ্ট (যেমন ৮) রাখ। ও সেই বিন্দু হইতে ভূরেখার সমান্তর একটা রেখা টান যেমন, ৮, ১০। এইরূপে ৯, ৭ টানিয়া লও। এখন ১, ৭ ও ১, ১০ সংযুক্ত কর। তারপর কিউবের ১০, ৪ বাহু মাপিয়া চিত্রে ৪ বিন্দু নির্ধারণ কর। এইরূপে ৬ বিন্দুও ঠিক করিয়া লও। ২, ৪ ও ২, ৬ সংযুক্ত কর। তোমার এই সমস্ত মাপ ঠিক হইল কিনা তাহা এখন এইরূপে পরীক্ষা কর। (১) ১, ১০ ও ২, ৪ বর্জিত করিয়া দিলে, এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া আবশ্যক। (২) সেইরূপ ১, ৭ ও ২, ৬ বর্জিত করিলেও এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া

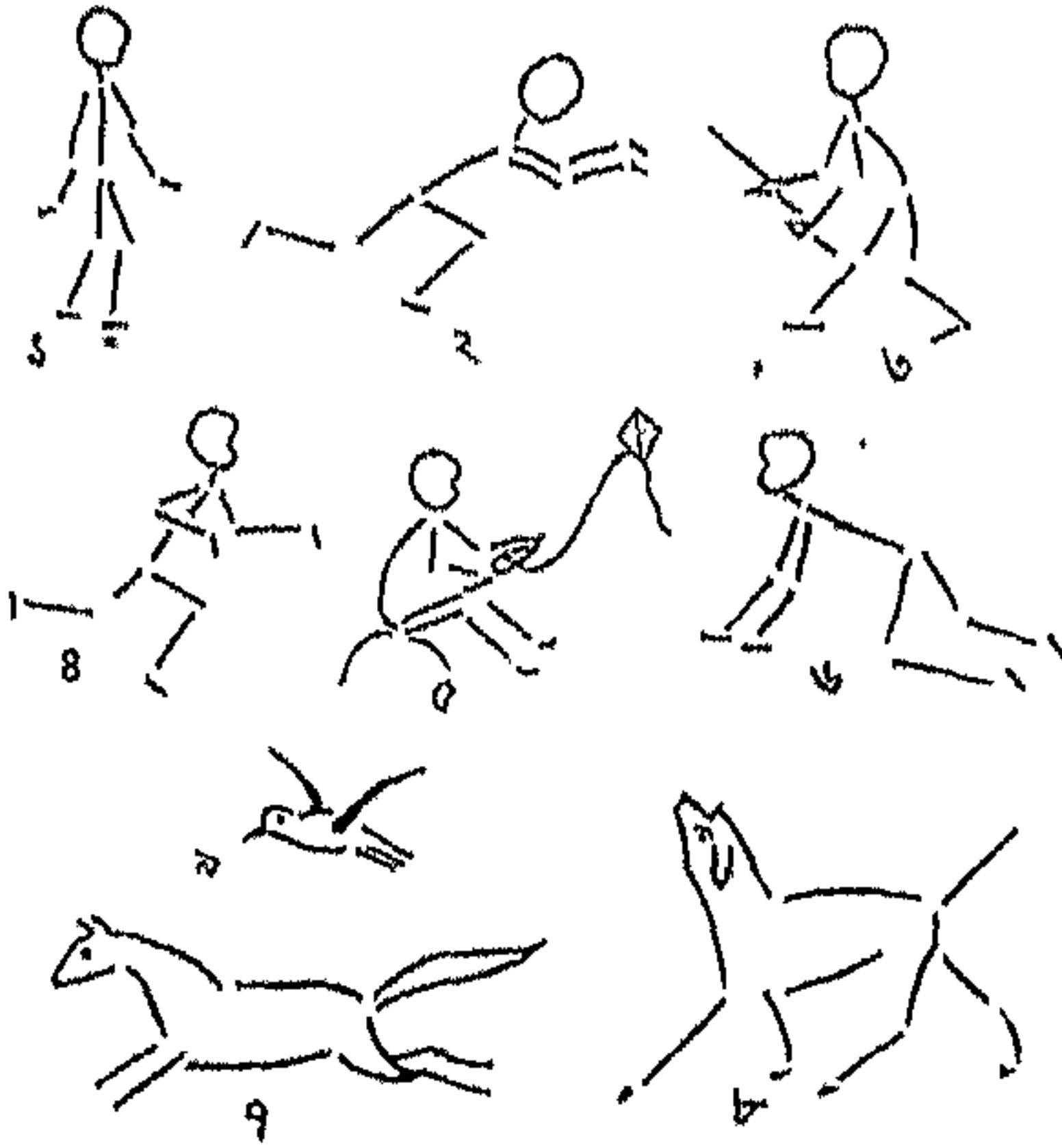
আবশ্যক । (৩) আবার এত ছোট বিন্দু (মি. বি. ১ ও মি. বি ২) সংযুক্ত করিলে যে রেখা (ধরে) পাওয়া যাইবে, তাহা ভূরেখার সমান্তর হওয়া আবশ্যক । এই তিনটি বিষয় যদি ঠিক হয় তবে ত্রোমার মাপ ঠিক হইয়াছে ও চিত্রও ঠিক হইয়াছে । তাহা না হইলেই মাপে বা অঙ্কনে ভুল হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই সমস্ত ঠিক হইলে কিউবের উপরের পিঠ অঙ্কন করা শক্ত নয় । মি. বি ১ এর সঙ্গে ৪ ও মি. বি ২ এর সঙ্গে ৬ যোগ করিয়া দাও ; এই ছই রেখা যেখানে ছেদ করিবে, সেই খানেই কিউবের উপর পিঠের দূরত্ব কোণ । এখন কিউবের পার্শ্ব রেখাগুলি রাখিয়া, অন্য রেখাগুলি মুছিয়া ফেল । কেহ কেহ “মাপ” শিখাইবার জন্য, প্রথমেই কিউবের মাপ লওয়া না শিখাইয়া, বালকগণকে ব্ল্যাক বোর্ড বা দেওয়াল-সংলগ্ন-মানচিত্র বা ঐরূপ কোনও পদার্থের (বেধ বাদ দিয়া) চিত্র অঙ্কন করাইয়া থাকেন । এ প্রথাও বেশ । তারপর আবার কিউব অঙ্কন শিখাইবার জন্য কেহ কেহ প্রথমে এইরূপ প্রথাও অবলম্বন করিয়া থাকেন :—টেবিলের উপর এক খানা সাগীর কাচ (৪ খানা ইটের সাহায্যে) খাড়া করিয়া রাখ । কাচের সম্মুখে একটা কিউব রাখ । অপর পার্শ্বে একটা চতুর বালককে দাঁড়া করাইয়া, তাহাকে, কাচের উপর কিউবের কোণগুলি যে যে স্থানে দেখা যাইতেছে, সে সকল স্থান কাচের উপর চিহ্নিত করিতে বল । তারপর রেখা টানিয়া, কাচের উপরের সেই বিন্দুগুলি (কিউবের পাণের লাইন অনুসরণ করিয়া) যোগ করিতে বল । একটা মাদা চক-পেন্সিল লাল কালিতে ডুবাইয়া লইলেই, তাহা দ্বারা কাচে দাগ কাটা যাইবে । ভূতলস্থ কিউব এইরূপে চিত্রতলে অঙ্কিত হইল । ‘চিত্রতল’ও ‘ভূতল’ কথা দুইটীও একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে । স্কেট, ব্ল্যাক বোর্ড, কাগজ প্রভৃতি পদার্থ, অর্থাৎ বাহার উপর আমরা চিত্র অঙ্কিত করি তাহাই ‘চিত্রতল’ আর যে ভূমির উপর কিউব আছে সেই ভূমি (চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত) ‘ভূতল’ । সাধারণ কাগজে কিউব

অঙ্কিত করিতে হইলে অনেক সময়েই এত স্থান পাওয়া যায় না যে, কিউবের বাহুগুলি (মি. রে. ১০ মিলন রেখা ক্রমে) দুইটী মি. বিপর্যস্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। তবে চোখের দ্বারা এই একপ বুঝিতে পারা চাই যে, বাহুগুলি বর্দ্ধিত হইলে শূন্যে গিয়া যেন একটী রেখায় মিলিত হয়। * কাগজে কিউবের চিত্র বড় হইলে ২,৪ ও ১,১০ এবং ২,৬ ও ১,৭ রেখা গুলি প্রায় সমান্তর হইয়া থাকে। অনেক সময় ১,১০ ও ১,৭ রেখা টানিয়া ২,৪ ও ২,৬ রেখা দ্বয়, যথাক্রমে তাহাদের সমান্তর করিয়া টানিলেও কিউবের চিত্র হয়।

বালকগণ যদি উত্তমরূপে কিউবের অঙ্কন প্রণালী বুঝিতে পারে, তবে অন্যান্য জব্যের অঙ্কলিপি করিতে আর কাঠিন্য বোধ করিবে না। সেইজন্য কিউবের অঙ্কনীলন খুব অধিক হওয়া আকর্ষক। কারণ চেয়ার, টুল, ডেস্ক, বাগা, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই কিউব হইতে উৎপন্ন। মিলি-গ্লার ও বলের চিত্র শিক্ষা করা তত শক্ত নয় বলিয়া বর্ণিত হইল না। মিলিগ্লার ও বল আঁকিতে শিখিলেই গাছ, পালা, ফুল, ফল, মানুষ, গরু, প্রভৃতি সকলই আঁকিতে পারিবে। কারণ এসমস্তই মিলিগ্লার ও বলের সংযোগে গঠিত।

রেখা চিত্র ।—বালকগণকে, বিশেষতঃ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণকে রেখা চিত্র শিক্ষা দিলে, স্বল্প সময়ে অনেক বিষয়ের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিষয়াদি বুঝাইবার সুবিধা হয়। ড্রিল কমন্স প্রভৃতির নানারূপ ভঙ্গী, রেখা চিত্রের দ্বারা অতি সহজে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারা যায়। উক্ত ভঙ্গী গুলির লিখিত বর্ণনা অপেক্ষা, রেখা চিত্রে বুঝিবারও অধিকতর সুবিধা হয়। আর রেখা চিত্র শিক্ষা করা বিশেষ কঠিনও নয়। পর পৃষ্ঠায় চিত্রের সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

একপ চিত্রাঙ্কনে বালকদিগকে এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে :—মাথা প্রায় একটা গোলাকার শূন্যের দ্বারা অঙ্কিত করিতে হইবে।



৮৮ চিত্র।—রেখার দ্বারা চিত্র।

মেগন ১, ২, ৩। বা পারিলে একটু মুখের ভঙ্গী দেখাইতে হইবে (৪, ৫, ৬)। প্রত্যেক ঘোড়ের স্থান ফাঁক রাখিয়া দিতে, হইবে। মাথা ও গলার মধ্যে, গলা ও ঘাড়ের মধ্যে, ঘাড় ও হাত পার সন্ধিস্থলে ফাঁক। পিঠের রেখা অবস্থানসারে একেবারে সরল (যথা ১) সম্মুখে কুঞ্চিত (যথা ৩) বা পশ্চাতে কুঞ্চিত (যথা ৪) করিতে হইবে। যদি এক আঙ্গুর উপর দিয়া অথবা অঙ্গ বা কোনও বস্তু দেখাইতে হয়, তবে উপরে যে অঙ্গ বা বস্তু থাকিবে তাহার রেখা সম্পূর্ণ ঠিক থাকিবে। নীচের রেখা কাটিতে হইবে ও কাটার দুই পার্শ্বে একটু একটু ফাঁক রাখিতে হইবে, যথা ৪র্থ চিত্রে—ডান হাত শরীরের উপর বলিয়া হাতের রেখা ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু পিঠের রেখা কাটিয়া হাতের দুই পার্শ্বে একটু ফাঁক

করিয়া দেওয়া হইয়াছে । অঙ্গুলির রেখাটী আবশ্যক মত সরল বা সম্মুখে একটু বক্র করিতে হইবে । ৩ নং চিত্রে যে হাত দিয়া বাক্স পরিয়াছে তাহার অগ্রভাগ বক্র, কিন্তু ১ নং চিত্রে যে হাত গুলিয়া আছে তাহা সরল । চরণের রেখা সম্মুখেও প্রান্তরূপ । ৪ চিত্রের সম্মুখের চরণ সরল রেখায়, কিন্তু পশ্চাত্তের চরণের অগ্রভাগে ভর পড়িয়াছে বলিয়া একটু বক্র ।

এইরূপে বালক ঘুড়ি উড়াইতেছে, নৌকা বাহিতেছে, স্ট্রেট হাতে স্কুলে যাইতেছে, ছুইজনে তাড়াহাতি করিতেছে, লাঠি খেলিতেছে, প্রভৃতি অনেক রূপ ছবি রেখাচিত্রে সুন্দর ভাবে দেখান যাইতে পারে ।

ব্ল্যাক-বোর্ড চিত্রাঙ্কন ।—ব্ল্যাক বোর্ড চিত্রের দুইটী প্রকরণ ।
(১) বোর্ডের উপর বালকগণের শিক্ষাদানার্থ ব্যাক, দাতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির পূর্ণ বা আংশিক চিত্র অঙ্কন করা । (২) বোর্ডের উপর ছুই বাছ দ্বারা একসঙ্গে সমপাশ্ব চিত্র অঙ্কন করা । এই দ্বিতীয় প্রকরণই সাধারণতঃ “ব্ল্যাক-বোর্ড চিত্রাঙ্কন” বা বৈবাহিক চিত্রাঙ্কন নামে প্রচলিত । প্রথম প্রকরণের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে পূর্বে লিখিত চিত্রাঙ্গুলিপির প্রণালী অনুসারে কিছুদিন চেষ্টা করিবেই হাত ঠিক হইয়া যাইবে । তবে এ পরিমাণ অভ্যাস হওয়া উচিত যে, পড়াইবার সময় যেন আবশ্যক মত প্রশ্ন সময়ে বোর্ডে সামান্য জবাবদির সকল প্রকার অবস্থা সহজে অঙ্কন করিতে পারা যায় । দ্বিতীয় প্রকরণও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, তবে কিঞ্চিৎ উপদেশ আবশ্যক :—

(১) ছুই হাতে ছুইখানি চক্-পেন্সিল লও ।

(২) বোর্ডের পূর্ব নিকটে দাঁড়াইওনা । যে স্থানে দাঁড়াইয়া বাছ প্রসারণ করিলে, চক্-পেন্সিলের মাথা বোর্ডে গিয়া লাগে, এক দূরে দাঁড়াইবে ।

(৩) বোর্ডে আঁকবার পূর্বে, দুই হাত, দুচার বার (চিত্রের রেখাঙ্করণে) শূন্যে ঘুরাইয়া, হাত ঠিক করিয়া লইবে ।

(৪) বাক রেখাগুলি যথাগম্ভব এক টানে আঁকিতে চেষ্টা করিবে ।

২ । মৃন্মূর্ত্তিগঠন ।

আবশ্যিকতা ।—চিত্রাঙ্কন শিক্ষার যে আবশ্যিকতা ইহারও প্রায় তুল্য । অধিকন্তু ইহাতে দুই হস্তের সমস্ত গুলি অঙ্গুলির পরিচালনা আবশ্যক হয় বলিয়া তহা দ্বারা হাতের জড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সমস্ত গুলি অঙ্গুলি নানারূপ স্থান কার্যে ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া সম্ভ্রান্ত ও চিত্রবিদ্যার মত ইহাতেও নির্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে ।

মাটি প্রস্তুত ।—উত্তম আটালে মাটীই এই কার্যের উপযোগী । যে মাটিতে প্রাতিগাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে সেই মাটি হইলেই চলিবে । মাটিতে জল দিয়া উত্তম রূপ মথিয়া লইতে হইবে । শক্ত কোন জিনিষ থাকিলে বাছিয়া ফেলিতে হইবে । যখন (কটির জন্য) মথা ময়দার মত হইবে অর্থাৎ সহজে হাতে লাগিয়া থাকিবে না, কিন্তু যেমন করিয়া গড়িতে ইচ্ছা হয়, তাহাই পারা যাইবে, তখন মাটি ঠিক হইল । নিম্নের চিত্রানুরূপ ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি বাঁশের চটা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে । এই গুলির দ্বারা কাটা ছাঁটার কাজ করিতে হইবে :—



আঁরন্তু ।—বালাকগণকে সর্বপ্রথমে

বল্ বা গোলক প্রস্তুত শিক্ষা দিতে হইবে ।

মাটি লইয়া বাম হাতের তালুর উপরে রাখিয়া

ডান হাতের তালু দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বল্

প্রস্তুত করিতে পারিবে । তারপর সেই বল্,

৮৯ চিত্র । মাটি কাটিবার ছুরি । চটীর দ্বারা সমন্বিত কর, এবং চটীর

অগ্রভাগের সাহায্যে সেই অর্ধ গোলায় মমোর মূর্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া, ছুইটা বাটা প্রস্তুত কর । যদি বাটার ভিতর বা বাহির অপরিষ্কার বোধ হয়, তবে আঙ্গুলে একটু অল লাগাইয়া, বাটার সমস্ত গাত্র মাজিয়া মাজিয়া সমান করিতে হইবে । ইহার পর মাটি দ্বারা একটা ঢোল প্রস্তুত কর । মধ্য হইতে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া ঢোল হইতে গেলাম, বোঁতল, বস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারা যায় । তারপর একটা ছক্ (কিউব) প্রস্তুত কর ও পূর্ববৎ মাটি তুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে ডালা শূন্য বাক্সে পরিণত কর । একটা ডিম প্রস্তুত কর । একদিক অপেক্ষা, ডিমের অপর দিক একটু বেশী মোটা । তারপর পাখীর গলা ও ঠোঁট প্রস্তুত কর । ডিমের যে দিক সর, সেইদিকে ঠোঁট ও গলা লাগাইয়া দাও । ডিম হইতে পাখী হইল । (৯০ চিত্র দেখ) ।

ফল গঠন ।—বিদ্যালয়ে গাছের গন্ধ প্রভৃতির মূর্তি শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা বা সময় হয়না । কতকগুলি সাধারণ ও সহজ ফল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল । যে ফল শিখাইতে হইবে তাহা সংগ্রহ করা নিতান্তই আবশ্যক । বালকেরা দেখিয়া দেখিয়া গড়িতে থাকিবে । বন্ বা গোলক হইতে কমলা লেবু করা যায় । বৃন্তের স্থানে ও তাহার বিপরীত স্থানে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিলেই ঠিক কমলা হইল । তবে একটা বৃন্ত না লাগাইলে ফল ভাল দেখায় না । একটু মাটি দ্বারা ছোট একটা বৃন্ত প্রস্তুত কর, আর যে স্থানে সেই বৃন্তটি লাগাইবে সেখানে পেন্সিলের মাথা দিয়া একটু গর্ত করিয়া, সেই গর্তে তোমার বৃন্তটি আশে টিপিয়া ধর । বৃন্ত লাগিয়া গেল । আবার বোঁটাটা খাড়া করিয়া রাখিলেও ভাল দেখায় না ; একটু হেলাইয়া দিবে । পেবু, জাম, শশা প্রস্তুত করিয়া একটী বৃন্ত লাগাও । পেয়ারা, দাড়িম্ব, বেগুন প্রভৃতি ফল প্রস্তুত বিষয়ে একটু উপদেশ আবশ্যক হইতে পারে । সাধারণ পেয়ারার আকার গোল নহে—নীচের দিকে

গোটা, বোটার দিকে সর। তারপর ফলের উপর পল তোলা আছে। সকল জাতীয় ফলের গঠনই ছুঁত হাতের আঙ্গুল চালান আবশ্যক। প্রথম মাটির একটা বল করিয়া লও। বাম হাতের আঙ্গুল কয়টির উপরে সেই বলটি রাখিয়া, ডান হাতের আঙ্গুল কয়টির অগ্রভাগ দ্বারা সেই ফলটি ঘূরাও ও একটু একটু করিয়া উপরের দিকে (পেয়ারার উর্দ্ধভাগের মত) লম্বা করিয়া লইয়া যাও। আকার ঠিক হইলে, ডান হাতের আঙ্গুলের টিপিতে পল তোলার কাজ শেষ কর। তারপর বোটার স্থানে টিপিয়া একটু নীচু করিয়া রাখ। পূর্বের মত বোটা প্রস্তুত করিয়া লাগাও। এবারে আরও একটু কাজ আছে। পেয়ারার নীচে ফুল দেখাইতে হইবে। ঔষধের বড়ির মত ৭৫টা বড়ি প্রস্তুত কর; তাহা টিপিয়া চেপ্টা কর। পেয়ারার নীচে একটু একটু দাগ কাটিয়া সেই গুলির মধ্যে ঐ চেপ্টা খণ্ডগুলি চক্রাকারে লাগাইয়া দাও। একটা ফুলওয়াল পেয়ারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দাড়িঘের ফুলও এইরূপ পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে হইবে। বেগুনের বোটার সঙ্গে যে কুণ্ড (calyx) থাকে তাহা পৃথক প্রস্তুত করিয়া লইলেই প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হয়।



২০ চিত্র। মৃত্তিকার ফলাদি গঠন।

এই বিবরণ পড়িয়া কাজ কঠিন বোধ হইতে পারে ; কাজ কিন্তু তেমন কঠিন নয় । বাবাকেরা অতি সহজেই এত সমস্ত গঠন শিক্ষা করিয়া থাকে । আবার স্বাভাবিক শিখ-বুদ্ধি-মঙ্গল বাবাকেরা ছুটার দিনের মধ্যেই, চমৎকার গঠন কৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে । একবার কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিবেন যে একাধা তেমন শক্ত নয় ।

৩ । সঙ্গীত ।

আবশ্যিকতা ।—সঙ্গীতে যেমন নিম্নলি আনন্দ অল্পভব করা যায়, এমন আর কিছুতে হয় বাকিয়া মনে হয় না । আর এই আনন্দ বিনা ব্যয়ে সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিতে পাবেন । সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা যে অত্যাবশ্যকীয় তাহা বলা বাহুল্য । উত্তম সঙ্গীতে হৃদয়ের স্বকোমল বৃত্তি গুলিকে খুলিয়া দিয়া, মানুষের মন পবিত্র করে ও চরিত্র উন্নত করে । এইজন্য যশা মন্দিরে সঙ্গীতের ব্যবস্থা । রোগে, শোকে, দুঃখে, কষ্টে, সঙ্গীতের সাহায্যে আশ্চর্য্য শান্তি লাভ করা যায় । ইহা ছাড়া গানে দুঃস্বপ্নের উপকার হয়, আর রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা হয় ।

ইংরেজ বালকদিগের অস্থ যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সর্বত্রই সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে । আমাদের দেশে কোন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু বালকদিগের বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায় না । শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ ব্যবস্থা না করিলে, আমরা যে নিজ হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইব, তাহা আমাদের আকৃতি নয় । এ কথা আমরা জানি যে, সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ দিবেন বই বাধা দিবেন না । কিন্তু তবুও সকল ব্যবস্থার জন্যই আমরা কর্তৃপক্ষের আদেশের অপেক্ষা করিয়া থাকি । যেটা ভাল বুঝিতে পারা যায়, স্থাবধা হইলে যেটা কার্য্যে পরিণত করাই সম্ভব । কর্তৃপক্ষেরও সকল বিষয়ে আদেশ দেওয়া সম্ভব পর নহে ।

বিদ্যালয়ে স্বল্প অথবা বিদ্যমান মঞ্চে এ বিদ্যালয় যথেষ্ট আলোচনা হওয়া সম্ভব নয় । আর বিদ্যালয়ে মঞ্চীত শিখাইয়া এক এক জনকে জানমন করাও উদ্দেশ্য নহে । সাধারণ মঞ্চীতাদি পুস্তিকার ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক ; তাহা না হইলে মঞ্চীতের সমাপাদন করিতে পারা যায় না । বিদ্যালয়ে সেই ক্ষমতার উদ্যোগ করিয়া দেওয়া হয় যাজ । আর যাহাতে অল্পতঃ পঞ্চমঞ্চীতে বা কীৰ্ত্তনাদিতে যোগদান করিয়া পূর্ণচর্চায় সহকারী হইতে পারে, বালককে সে বিষয়ে উপযুক্ত করিয়া দেওয়াও অল্প উদ্দেশ্য বটে । সম্ভাছে ২ কি ৩ দিন, ১৫ কি ২০ মিনিট করিয়া মঞ্চীতের আলোচনা করিলেই বিদ্যালয়ের পক্ষে যথেষ্ট ।

শিক্ষার ধারা ।—শিক্ষক নিজের একটি সহজ সুরের ক্ষুদ্র মঞ্চীত বাছিয়া লাইবেন । লক্ষ্যে ঠুংরীকেই অনেক প্রথম শিক্ষার্থীর উপযুক্ত সুর বলিয়া মনে করেন । যাহা হউক, একতালা, ঠুংরী, গৎ, কাণ্ডগালী, ছেপকা প্রভৃতি সহজ সহজ তালে, খাম্বাজ, ভৈরবী, ললিত, সাহানা মদ্যার, বিভাস, কিঁকিঁট, বেহাগ প্রভৃতি সুরে রচিত গান, আরম্ভের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় । তবে প্রথম শিক্ষাদানের সময়ে কোন সুরেই তরঙ্গ, মূর্ছনা, গিঠখারী প্রভৃতির অবতারণা করিতে নাই । যতদূর সম্ভব সুর সরল হওয়া আবশ্যিক । শিক্ষক প্রথমে গানের প্রথম লাইন ২৩ বার গাইবেন, বালকেরা শুনিবে । তারপর বালকগণও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে গান আরম্ভ করিবে । বালকেরা খুব সহজেই সুর মকল করিতে পারে । সুররাং শিখাইতে কষ্ট হইবে না । প্রথম দিন কেবল প্রথম একটি কি দুই লাইন মাত্রই আলোচনা করিবে । সেই লাইন দুইটি এক রকম অভ্যাস হইলে, অস্তুরা আরম্ভ করিতে হইবে । দু চার দিন অস্তুরার অভ্যাস হইয়া গেলে, আবার প্রথম হইতে সমস্ত গান এক সঙ্গে গাইতে হইবে । ইহার পর শিক্ষক গান আরম্ভ করিয়া দিবেন মাত্র, কিন্তু বালকগণের সঙ্গে সমস্ত লাইন গাইবেন না । প্রত্যেক অস্তুরার প্রথম অংশ আরম্ভ করিয়া দিয়া, তিনি থামিয়া যাইবেন, বালকেরা গাইয়া যাইবে । এইরূপে অভ্যাস করাইবেন ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নিম্নলিখিত গানটী প্রায় বিদ্যালয়েই
প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে :—

খাদ্য—একতারা ।

- (১) তোমারি গেহে, পালিছ মেহে, তুমি দয়্য দয়্য ছে ।
- (২) আমারি প্রাণ, তোমারি দান, তুমি দয়্য দয়্য ছে ।
- (৩) দিয়েছে অনম অনন্য কোড়ে, রেখেছে পিতার বশে মোরে,
বৈধেছে সবার প্রাণ ডোরে, তুমি দয়্য দয়্য ছে ।
- (৪) তোমার বিশাল বিচিত্র ভুবন, কয়েক আমার নয়ন শোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমি দয়্য দয়্য ছে ।
- (৫) অস্তরে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে সন্তোষে, তুমি দনা দনা ছে ।

শিক্ষকের সাহায্যার্থ নিম্নে স্বরলিপি প্রদত্ত হইল :—

- (১)

সা	সা	সা	রা	রা	গা	গা	গা	প্র	স
তো	মা	রি	গে	হে	পা	লি	ছ	মে	হে

সা	নি	স	গ	প্র	স	গ	রা
তু	মি	ধ	য়	দ	ন	য়	হে

- (২)

না	না	না	নি	নি	সা	সা	সা	প্র	স
আ	মা	রি	প্রা	ণ	তো	মা	রি	দা	ন

সা	নি	স	গ	প্র	স	গ	রা
তু	মি	ধ	না	দ	ন	না	হে

- (৩)

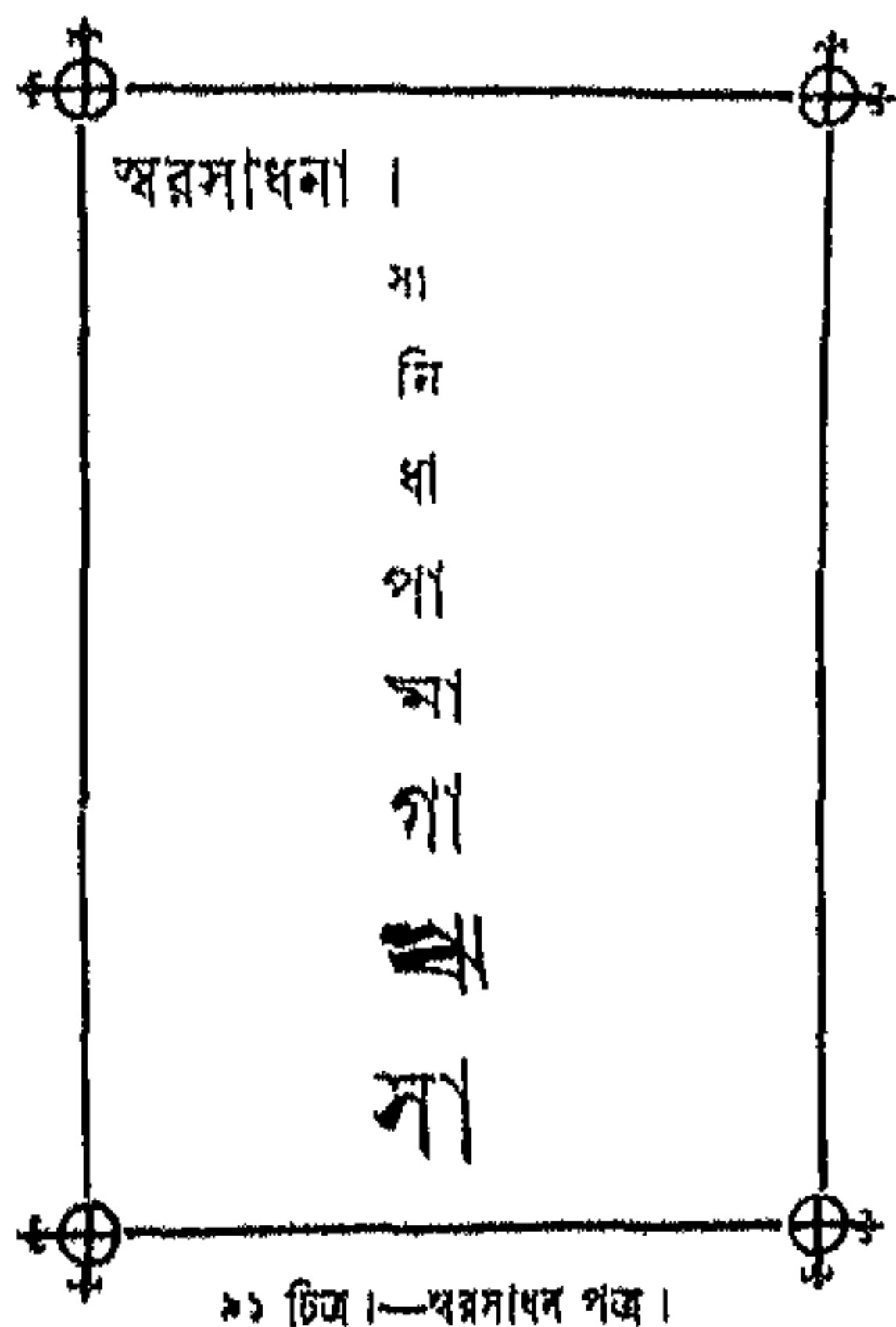
গ	প্র	প্র	নি	নি	নি	সা	সা	নি	সা	সা
দি	য়ে	ছে	অ	ন	ম	অ	ন	ন	কো	ড়ে

নি নি নি | মী মী মী | মী সা সা নি | সা সা |
 মে মে ৫ | মি ডা ৪ | ব ০ ফে | মো মে |

সে সে সে সা | গা না সা না | গা গা গা | সা সা |
 বে বে ৬ | গ খা র | আ খ য | ডা মে |

সী নি | সা গা | সা সা | সা সা |
 ৩ মি | ৫ গা | ৫ ০ গা | ৫ ৫ |

গাঙ্গাগা গাঙ্গাগা একটু নিখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। একখানা বড় কাগজে নিম্নলিখিত রূপে সা সা গা গা বড় বড় অক্ষরে * লিখিয়া দাও।



* বাঙ্গালা মুজাফ্ফে সাধারণতঃ যে কয় প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সমস্তের নাম জানা আবশ্যক। এই স্বর সাধনার চিত্রে যে বড় অক্ষরটী (সা) দেখিতেছ

এই কাগজ থানি দেয়ালে নুগাওয়া যাব । পরে একখান লম্বা কাঠের (মাপপয়টার) দ্বারা (একাদিক্রমে) সুরের এক একটা অক্ষর কাঠের অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে সা, খা, গা, মা, রীতিমত ভাবে গাহিয়া যাও ; স্বাক্ষরগণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাহিলে । আবার এইরূপ সা, নি, গা পা করিয়া কাঠী নামাওয়া আন । এইরূপ প্রত্যহ ৪৫ বার অভ্যাস করাইলে ভাল হয় । সুরের আরম্ভ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ দৃষ্ট হয় । আজকাধিকার মত এত যে আরম্ভে সা হঠাৎ উপরের দিক না গিয়া, সা হঠাৎ নীচের দিকে নামিয়া আসিত সুবিধা । যাহা হউক শিক্ষক যেরূপ সুবিধা মনে করেন তাহাষ্ট করিবেন । এইরূপ কয়েকদিন সা খা গা মার অভ্যাস হইলে পর, এইরূপ কাঠী সম্বালনের দ্বারা ঐ কাগজের উপর সারে, রেগা, গামা ঠতাদি ছুইটা ছুইটা করিয়া ও সারেরগা, রেগামা ঠতাদি রূপ তিনটা তিনটা করিয়া সুরের অভ্যাস করাইতে হইবে । একটা হারমনিয়াম সংগ্রহ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা ।

সুরের কথা ।—সারি গামা প্রভৃতি নামগুলি যড়জ (নামা, কঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয় স্থান হইতে জাত কেকাতুল্য স্বর) ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, দৈবত, নিষাদ প্রভৃতি শব্দের সংশ্লিষ্ট মাত্র । আগাদিগের স্বর সহজে যতদূর উচ্চ উঠে ও সহজে যতদূর নিম্নে নামে এই সীমার মধ্যে অংশকে সাও ভাগে ভাগ করিয়া, এক একটি স্বরকে যথাক্রমে যড়জ, ঋষভ প্রভৃতি নামাকরণ করা হইয়াছে । এষ্ট সপ্তস্বর, যেটা যে ভাব ব্যঞ্জক নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

তাহার নাম 'টুলাইন পাইকা', তার উপরে ঋ 'গ্রেট আইনার এটিক', গা 'গ্রেট আইনার',
মা 'স্মলপাইকা এটিক', পী 'ইংলিস', খা 'পাইকা', নি 'স্মলপাইকা', ও সা 'বরজাইস' ।

মা—গভীর বা তেজ ব্যঙ্গক পদ ।

মু—উদ্ভেদক বা আশা উদ্বোধক ।

গা—গীত বা শাস্তি বিধায়ক ।

মা—কোমল বা ভয়ভীতি প্রদায়ক ।

পা—অমূল্য বা আনন্দ ব্যঙ্গক ।

মা—কলণ বা শোক প্রাপক ।

নি—জয় বিজয়কারী বা মোহ সঞ্চারক ।

তবে গানের আর্থের সঙ্গে ও গায়কের গান করিবার কায়দার সঙ্গে শ্রবের এই সমস্ত ভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । এ সমস্ত কথা বালকগণ সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া এ বিষয়ের অধিক আলোচনা অনাবশ্যক ।

তিনটি প্রাণের (উদার, মূদার, তার) কথাও একটু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক । তাল যে সময় পরিমাপক উপায় বিশেষ, ইহা বলিয়া দিবে ; এবং তালের সহিত সঙ্গত হইলে যে মধুর হয়, আর তাল ভেদেই সে ত্রাতিকটু হয়, তাহা পরীক্ষণের দ্বারা দেখাইবে । কোনরূপ বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন নাই ; কেবল একটা কাঠের দ্বারা টেবিলের উপর (তাল রক্ষার জন্য) টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিলেই হইবে । গানগুলির শ্রবের নাম ও তালের নাম বলিয়া দিবে ; সঙ্গীতের দিকে বালকগণের আকৃষ্টাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিলেই হইল—বিদ্যালয়ে তাহাকে সমস্ত শিখাইবার প্রয়োজন নাই আর সময়ও নাই । তবে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে অবশ্য সমস্ত বিষয়ের রীতি মত আলোচনা হওয়া আবশ্যক ।

৪ । সূচীশিক্ষা ।

আবশ্যকতা ।—বঙ্গ যখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, তখন এই বস্তু রক্ষার উপায় শিক্ষা করা নিতান্তই কর্তব্য । সূচী-বিদ্যা

জীবিকা নির্বাহেরও একটা মহৎ মত্বপায়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের এ বিদ্যার ৩৩ আবশ্যক না হইতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের গৃহে সূচীশিল্প অমব্যক্তনের মত নিত্য আবশ্যকীয়। এষ্ট শিল্প, প্রত্যেক বালিকান শিক্ষা করা কর্তব্য, কারণ গৃহস্থালীতে যেমন তাহাদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অশনের ভার লঠতে হইবে, সেমনি বসনের ভারও লঠতে হইবে। বালকগণেরও এষ্ট শিল্প কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে, আমার সেলাই খুলিয়া গেলে, বালিশের খোলার আবশ্যক হইলে দর্জির আশ্রয় গ্রহণ করা লজ্জার কথা।

আসবাব।—কাঠের বা টিনের বা বেতের একটা ছোট বাক্স। তাহাতে সূঁচ, সূতা, ছুরী, কাঁচি, বোতাম প্রভৃতি উপকরণ থাকিবে। বাক্সটির মধ্যে ছোট ছোট ২১৩টি খোপ থাকিলে আরও ভাল হয়। নানা প্রকারের সূঁচ (৫, ৬, ৭, ৮ নং) আবশ্যক। যে সূঁচ টিপিলে বাঁকিয়া যায় না তাহাই ভাল সূঁচ। গাদা রঙের দুইটা তিনটা রিল, ২১৩টা গুঁটা সূতা, ২১১টা কাল রিল, একখানা বড় কাঁচী (কাপড় কাটিবার জন্য) ও একখানি সরু ছোট কাঁচী, একখানি ছোট ছুরী, একটা অঙ্গুলি-প্রাণ, একটা ফিতার গজ, কতকগুলি পিন, একটু মোম ও আবশ্যক মত কতকগুলি বোতাম হইলেই মোটামুটি সেলাইএর আসবাব হইল।

শিক্ষার ধারা।—প্রথমে বালিকাকে এক টুকরা ছেঁড়া কাপড় দিবে ও একটা সূঁচে সূতা লাগাইয়া তার ডান হাতে দিবে। সে নিজের ইচ্ছামত কাপড়ের ভিতর সূঁচ ঢালাইয়া যেমন তেমন ভাবে সেলাই করিবে। ইহাতে সে সূঁচের ব্যবহার নিজের চেষ্টাতেই কতক পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিবে। একপ ৬৭ দিন শিক্ষার পর, তাকে আর এক খণ্ড কাপড় দাও আর সেই কাপড়ের উপর নীল পেনসিল

১। একটি সরল রেখা টানিয়া দাও । বালিকাকে এবার এঁট
 ণার বরাবর সেলাই করিতে বল । এঁঠরূপে আনার ডাগ দিন চলিয়া
 গে, কাপড়ের উপর একটা লাল পেনসিল দিয়া দাগ কাটিয়া, সেই
 লাল দাগের উপর সমান দূরে দূরে নীল পেনসিলের দ্বারা বিন্দু চিহ্ন
 দিয়া দাও । এবার বালিকাকে লাল রেখার উপর দিয়া ও কেনল ঐ
 সকল নীল বিন্দুর গণ্য দিয়া স্ট্রুট টাঙ্গাইতে বল । তারপর কাপড়ে
 একটি বৃত্ত আঁকিয়া দাও ও ছাত্তোকে সেই বৃত্তের দাগের উপর সেলাই
 করিতে বল । এইরূপে অভ্যাস করাইলেই বালিকার হাত ঠিক হইয়া
 আসিবে । প্রথমে সাদা কাপড়ের উপর সাদা সূতা দিয়া সেলাই না
 করাষ্টয়া, কাল সূতার দ্বারা সেলাই করান কর্তব্য ; কারণ সাদার উপরে
 কাল রঙ ভাসিয়া উঠে বলিয়া শিক্ষার্থী তাহার নিজকৃত সেলাইএর
 সৌন্দর্য্য বা দোষ গুণ সহজেই বুঝিতে পারে । সেলাইএর সময়
 বালিকার মাহাতে প্রথম হইতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করিতে
 শিক্ষা করে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক । অনেকগুলি
 বালিকাকে এক সঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে বোর্ডে সেলাইর দ্বারা আঁকিয়া
 দেখাইতে হইবে ।

আবশ্যকীয় সেলাই ।—প্রথমে লপ্‌কী বা সাদা সেলাই শিক্ষা
 দেওয়া কর্তব্য । কারণ এইটাই শিক্ষা করা সহজ । তারপর মুড়ি
 সেলাই ও তৎপরে বথেরা সেলাই শিক্ষা দিলেই সাধারণ কাজ চলিবার
 মত বিদ্যা হইবে । বোতামের ঘর করা, চুনট করা, মশারির ঝুল ও
 চাল—ফিতার ভিতর দিয়া সেলাই করা, বালিশের খোলে ঝালড় লাগান
 প্রভৃতি পরে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । আর একটা অতি আবশ্যকীয়
 সেলাই, রিপু করা । এটা শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন । ছাঁটের
 মধ্যে পুতুলের জামার ছাঁট প্রথমে শিক্ষা দিতে হইবে । তারপর ছোট
 ছোট পিরান, ক্রক, বডি ড্রয়ারস, সেমিজ ইত্যাদি । ইহা অপেক্ষা

অধিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বা অবসর থাকিলে মোজা বুনা, মোজার রিগু, রঙাণে নাম লেখা শিখান যাইতে পারে। উলের কাজ তেমন আবশ্যকীয় মনে হয় না। তবে উলের কাজে যে একটা সৌন্দর্য্য বোধ জন্মে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ছোট টুপি, জাক, গলাবন্ধ, মোজা প্রভৃতির কাজ মন্দ নয়। কার্পেটের জুতা, আসন, খয়িপোষ প্রভৃতি কার্য্য সুন্দর হইলেও সে সকল কার্য্যে যে পরিমাণ সময় নষ্ট হয় ও যে পরিমাণ চক্ষুর প্রতি অত্যাচার করিতে হয়, তাহাতে সে সমস্ত কার্য্যে অধিক প্রাশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কল্কা কাটা (Embroidery) কাজ এদেশে অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—কাজও বেশ। বিদ্যালয়ে সূতা দ্বারা ফুল কাটা শিখান যাইতে পারে। লেসের কার্য্যও খুব আদরের। সূঁচ এবং কাঠিম (bobbin) আর আলপিনের সাহায্যে লেন্ প্রস্তুত শিক্ষা দিতে পারা যায়। কাঠিমের দ্বারা লেন্ ও কার্ প্রস্তুতের প্রণালী অত্যন্ত সহজ—একবার দেখিলেই বালিকারা অতি সহজে শিখিয়া লইতে পারিবে।

৫। উদ্যান রচনা ।

আবশ্যিকতা ।—(১) বালক বালিকাগণের সৌন্দর্য্য বোধ বিকশিত করা (২) প্রকৃতির লীলা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রদান করা (৩) জীবন মারণের প্রদান মধ্যম কৃষিকার্য্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা (৪) নিজ হস্তে কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া (৫) আর এক উপকার এই হয় যে, এই কার্য্যের প্রতি অনুরক্ত হইলে তাহাদিগের অবসর সময় এই কার্য্যেই ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়, সুতরাং সে কার্য্যের অভাবে আর অস্থায় কার্য্য করিবার অবসর পায় না।

শিক্ষাদানের প্রণালী—এক খণ্ড অগ্নিতে জাল দিয়া নিম্নের চিত্রানুরূপ ভাগ করিয়া দাও :—



७२ हिंसा । अग्नि विनाश ।

এক ভাগ অগ্নি (পাঠশালায় ছাত্রের পক্ষে) মেন ৩×৬ হাতের বেনী না হয় । সেই স্থান তাহাকে পরিষ্কার করিতে দাও ; কিরূপে কোদলাইতে হয় (খুব ছোট ঢেলের জন্ত নয়), কিরূপে নিড়াইতে হয়, কিরূপে ঘাস বাছিতে হয় দেখাইয়া দাও । তারপর নানারূপ সার সংগ্রহ কর, যথা— পচা গোবর, খৈল, পচামাছ, ভেড়া ছাগলের নাদি, হাঁস পাখরা, কুক্কুটের বিষ্ঠা, ছাই, উঠান কাটনা, পোড়ামাটি প্রভৃতি । এক এক দল বালককে এক এক রকমের ফুলের বা সবজীর বীজ দাও আর প্রত্যেক বালককে এক প্রকারের সার দাও । বালকেরা জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া বীজ রোপণ করিবে এবং রীতিমত জল সিঞ্চন করিবে । প্রত্যেক বালকের এক খান করিয়া খাতা থাকিবে । তাহাতে প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে নিজ-হস্ত-রোপিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বিষয় (পেন্সিলের দ্বারা) নোট করিবে । নিম্নে এইরূপ নোট করিবার একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল ।—

ਅਗੁਕ ਵੀਜ਼—ਅਗੁਕ ਸਾਨ

- ৭৬।০৭—সফা/র সময় যপম করিয়া জল দিলাম ।
 ৮৬।০৭—অক্ষুর দেখা দিয়াছে । জল দিয়াছি ।
 ৯৬।০৭—অক্ষুর বড় হইতেছে । জল দিলাম না । বৃষ্টি হইয়াছে ।
 ০৬।০৭—
 ১৬।০৭—একটা পাতা খুলিয়াছে । জল দিলাম না ।
 ২৬।০৭—আর একটা পাতা দেখা দিয়াছে । মাঠী ভিজা আছে ॥

১৩।৬।০৭—একটা লাল পোকায় নুতন পাতাটা নষ্ট করিয়াছে । সেই পোকাটা মারিয়াছি ।

১৪।৬।০৭—গাছ ১ ইঞ্চি বড় হইয়াছে । ছোট ছোট খাস তুলিয়া ফেলিলাম ইত্যাদি ।

এক বালককেও দুই তিন রকমের গার দেওয়া যাইতে পারে । সে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মান প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে ।

ছোট ছেলেরদের জন্য ফুলের টবে বা ছোট ছোট হাঁড়িতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । একটা টবে কেবল মাটি দিয়া গাছ লাগাও, সাব ও জল দিওনা । ২য় টবে মাটি ও গার দাও, জল দিওনা । ৩য় টবে মাটি আর জল দাও, গার দিওনা । ৪র্থ টবে মাটি, গার ও জল দাও । কোন গাছ কিরূপ বাড়িতেছে তাহা বালকগণকে লক্ষ্য করাও ।

শিক্ষক নিজে ছাত্রগণের সহিত কোদালি না ধরিলে ছাত্রগণকে এই কার্যে ব্রতী করিতে পারিবেন না । আন শিক্ষক যদি নিজ হাতে যত্ন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উত্তম ফুল ও সবজীর বাগান রচনা করিতে পারেন, তবে সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বালকগণ অতি আনন্দের সহিত এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবে । পুষ্পের সৌন্দর্য্য যখন কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন বালকেরা কেন হইবে না ?

মৃত্যুগোপাল মুখোপাধ্যায় কৃত ‘সরল কৃষি বিজ্ঞান’ (মূল্য ১২) নামক পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষকের পাঠ করা কর্তব্য ।





অষ্টম প্রকরণ—নীতিধর্ম বিষয়ক ।

১। নীতিশিক্ষা ।



দায়ী ?—অভিভাবক বলেন যে বালকের স্বভাব চরিত্রের জন্ত শিক্ষক দায়ী, শিক্ষক বলেন যে অভিভাবক দায়ী। শিক্ষক বলেন যে বালকের সহিত যখন তাঁহার কেবল ৫৬ ঘণ্টা মাত্র সময়ের সম্বন্ধ, তখন অভিভাবকই বালকের চরিত্রের জন্ত দায়ী ; আবার অভিভাবক বলেন যে, সেই ৫৬ ঘণ্টা কাল শিক্ষক বালকের মনের উপর যে পরিমাণ আধিপত্য করিয়া থাকেন, তাহার সহিত তুলনায় ১৮।১৯ ঘণ্টার আধিপত্য অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং শিক্ষকই দায়ী। ফল কথা, উভয়েই দায়ী। শিক্ষকের উপদেশ কোথায় আসিয়া যাইবে, যদি বালক বাড়ীতে আসিয়া পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর আচার ব্যবহারে চরিত্রহীনতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়। আবার পিতা মাতার সহপদেশও সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, যদি বালক বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষকের দোষ ত্রুটি প্রত্যক্ষ করিবার অযোগ্য পায়।

শিক্ষার উপায় ।—“উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের শক্তি অধিকতর প্রবল” একথা পুরাতন হঠাৎও এখন মত। বালকের আত্মীয় বন্ধু বাস্তব প্রকৃতি সকলোই চরিত্রবান হইবে, বালক কখনও কুচরিত্র হইতে পারে না। তবে যে ভাল ভাল পরিবারের ছেলেকেও চরিত্রহীন হইতে দেখা যায় তাহার কারণ এঁই, পিতা মাতার অসাবধানতা বশত সে ছেলে কুসঙ্গে মিশিবার সুবিধা পায়। ব্যাপার খুব শক। চারিদিকের পাপ প্রলোভনের দৃষ্টান্তের মধ্যে বালক বালিকাকে মজরিত্র করিয়া রাখা বড়ই কঠিন।

(১) বালক যাহাতে কুসঙ্গে মিশিতে না পারে তাহার উপায় করা সর্ব প্রধান কর্তব্য। বালক সম্মী চায়, সে আগোদ আহ্লাদ চায়; সে সমস্ত দিন এক প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকিতে চায়না, তাহা তাহার প্রকৃতি। সুতরাং তাহার আগোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পিতা মাতা যদি ছেলের সহিত মিলিয়া খেলা করিতে পারেন, তবে তাহার অপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। পিতাকে প্রায়ঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অন চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, আর মাতা মূর্খ। তবে যে সকল স্থলে একরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর সেখানে সেষ্ট ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য।

বালক বালিকা বিনাকার্যে থাকিতে চায়না। তাঁহাদিগকে কেবল ‘পড় পড়’ বলিয়া আবদ্ধ রাখা যায় না বা উচিতও নয়। চিত্রাঙ্কন, মূর্তিকাদি দ্বারা পুতুল গঠন, কাগজ কাটিয়া খুব পাখা পোস্ত করণ, উদ্যানে পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ ও নানারূপ আগোদজনক কার্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। কোন কাজ না পাঁচলোষ্ট অন্য় কার্য করিবে বা কুসঙ্গে মিশিবে।

(২) চাকর চাকরানীর হস্তে বালক বালিকার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বড়ই দোষের। তাহারা চরিত্রহীন ও মন্দা কুৎসিৎ

আমোদ এবং গল্প লিখ থাকে । বালক বালিকাকেও মেঠে সকল গল্প শুনায়ে ও মেঠে সকল আমোদের স্বরে লভিয়া যায় । অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেদেরা পোষিত্র প্রভৃতি চরিত্রের তত্ত্বা পড়ে ।

(৩) চরিত্র উন্নত করিবার একটা প্রদান উপায়, সময়-নিষ্ঠ হওয়া । নির্দিষ্ট সময় খুন্স হঠতে উঠিবে, নির্দিষ্ট সময় পড়িতে বসিবে, নির্দিষ্ট সময় স্কুলে যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক । বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবার ১০ মিনিট পূর্বে বালক স্কুলে পৌঁছিবে । অনেক পূর্বে স্কুলে যাইয়া মন ছেলেদের সঙ্গে মেশে ও শিক্ষকের নির্দেশ বা বিদ্যালয়ের প্রণয়াদি নষ্ট করে ।

(৪) অপরাহ্নে বেড়ান ভাষা বটে, কিন্তু প্রায়ই বালকেরা ছুটে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া কুৎসিৎ গল্প বা পরমিন্দার সময় কাটায় । ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর । অভিভাবক নিজে সঙ্গে করিয়া বেড়াইবেন বা পরিচিত ২।১টি ভাল ছেলের সঙ্গে বেড়াইতে দিবেন ।

(৫) সন্ধ্যার (প্রদীপ জালার) পরে কোন বালককে বাহিরে থাকিতে দেওয়া উচিত নয় । কুসঙ্গে মিশিয়া, কুৎসিৎ গানে বা আমোদে লিপ্ত থাকে বলিয়া, ঠিক সন্ধ্যার সময় অনেক বালক বাড়ীতে ফিরিয়া আসে না । সিজাসা করিলে উত্তর দেয় যে ‘রামের বাড়ী হইতে খাতা আনিতে গিয়াছিলাম বা যত্নে পাঠ্যগিত ফিরাইয়া দিতে গিয়াছিলাম’ ইত্যাদি । এ সকল খাতা বা পুস্তক আনিবার কথা প্রায়ই সত্য হয় না ।

(৬) যাত্রা, নাটক প্রভৃতির অভিনয় দেখিবার জন্য বালকগণকে একা ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই অনিষ্টজনক । কুসঙ্গে মিশিয়া কুকার্য করিবার জন্য এই সকল স্থানই উপযুক্ত ক্ষেত্র । অনেক সময় দেখিতে না দেওয়াই ভাল । তবে ভাল যাত্রা নাটক হইলে অভিভাবক নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন ।

(৭) অপরাহ্নে অর্ধ ঘণ্টার অন্তর ক্রিকেট, ফুটবল কি হাডু ডুডুর মত খেলায় লিপ্ত থাকিতে দিবে না । অনেকক্ষণ খেলা করিয়া একপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে সম্ভাবনা পড়িতে পারেনা । অতি সম্ভবই ঘুমাইয়া পড়ে ।

(৮) বৃথা গল্প বা ভর্ক করিতে শুনিতে তখনই থামাইয়া দিবে । ইহাতে চরিত্র নীচ হইয়া পড়ে । নাটক নভেল পাঠে ভাষার নোথ জন্মে বটে, কিন্তু চরিত্রে ভোগ বাসনা প্রবল হইয়া উঠে । তবে যে সমস্ত নভেল পাঠে একপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা পড়িতে দেওয়া যাইতে পারে ।

(৯) অভিভাবকের উদাসীনতার অনেক বালক নষ্ট হইয়া যায় । নিজে আফিস হইতে আমিরাই পাশা খেলায় বসিলেন । রাত্র ১২টা পর্যন্ত খেলাই চলিল । ছেলে কি করে না করে তার খোঁজ নাই । নিজের নিকটে বসাইয়া পড়াইতে হইবে, আর মধো মধো শিক্ষকের নিকটও খোঁজ নিতে হইবে । কিরূপ সঙ্গে মিশে তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে । যে দিনের যে কাজ সে দিন তাহা সম্পন্ন করিল কিনা, ইহা প্রত্যহ খোঁজ লওয়া আবশ্যিক ।

(১০) । অনেক অভিভাবক আবার অতি শাসনে ছেলে নষ্ট করিয়া থাকেন । দিনরাত্র কড়া কথা, দিনরাত্র মার মার, রাত্রদিন চোখ রাখান অতি অনিষ্টকর । আদরের সঙ্গে শাসন চাই । আদরের মাত্রাই আবার অধিক হওয়া আবশ্যিক । যে অভিভাবককে বালক উত্তম খেলার সাথী মনে করে, তিনিই প্রকৃত অভিভাবক ।

(১১) । অনেক অভিভাবক নানাকারণে বাধ্য হইয়া উপশিক্ষক (প্রাইভেট টিউটার) নিযুক্ত করেন । একপ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে অল্প বেতনের শিক্ষক নিযুক্ত করিতে নাই । হয় অধিক বেতন দিয়া ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, না হয় একেবারেই নিযুক্ত

করিবেনা । অল্প বেতনের শিক্ষকের দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে । তেলে কম পড়ে, সুতরাং অল্প বেতনের একজন যেমন তেমন লোক হইলেও চণ্ডিবে—তঁহা মারাত্মক বিশ্বাস । যেমন তেমন শিক্ষক পড়া পড়াইতে পারিবেই না, অধিকন্তু ছেলেটার মাথা খাটয়া যাইবে । ছোট ছোট তেলে শিখানই শক্ত ।

(১২) । বাদ্যকগণকে বিলাসী হইতে দিবেনা । ভাল জামা, ভাল মোজা, ভাল জুতা পরিব ; আঁঠর, ল্যাঙেঙার ও স্নগন্ধি তৈল মাখিব ; মাথার উপরে নানারকমের মিথি কাটিব ইত্যাদি রূপ আবদারের প্রণয় দিতে নাই । স্নগন্ধি জবা ব্যবহার করিতে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত । অবস্থা বিবেচনায় সাধারণ জামা, মোজা ব্যবহার করিতে দিবে । মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটিবে । বিলাসিতায় সময় নষ্ট হয় ও মনকে কলুষিত করে ।

(১৩) । আহাৰাদি সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া কর্তব্য । আহাৰের মাত্রা বুদ্ধি করা কর্তব্য নহে । পুত্র এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবে, অতএব তিন বেলা তাহাকে লুচী মোহনভোগ খাওয়াইতে হইবে—ভুল ধারণা । স্বল্প আহাৰেই বুদ্ধি সতেজ হয় । যাহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের অধিক আহাৰের প্রয়োজন বটে । অধিক মিষ্ট বা অন্ন জবা ভক্ষণে যে কেবল শারীরিক রোগ জন্মে তাহা নহে, বুদ্ধিবৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায় । আহার অধিক মিষ্ট জবাদি খাইলে, মিষ্ট খাটবার জন্য একটা নেশা হইয়া পড়ে । অনেক বালক শেষে পয়সা চুরি বা দোকানে দেনা করিয়া সন্দেশ খাটতে আরম্ভ করে ।

যাহা বলা হইল সে সমস্ত বিষয়ে অভিভাবকের দায়িত্বই অধিক । শিক্ষকের কর্তব্য বিষয়ে ‘সুশাসন’ পরিচ্ছেদে অনেক কথা বলা হইয়াছে । বালককে সৰ্ব্বদা কার্যে নিযুক্ত রাখাই যে তাহাকে চরিত্রবান করার একমাত্র উপায় তাহাও কথিত হইয়াছে । বিদ্যালয়ের নিয়মিত

৪।৫ ঘণ্টার পরও শিক্ষক বালকগণকে লইয়া অন্য কার্যে ব্যাপ্ত থাকিতে পারেন । অপরাহ্নে ব্যাখ্যাগাদির চর্চা করা যাইতে পারে বা খেলারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । অবসর দিনে বালকগণকে দিয়া কবিতা প্রভৃতির আবৃত্তি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় করান যাইতে পারে । মধো মধো বালকগণকে সঙ্গে করিয়া কোন স্থানস্থানে বেড়াইতে যাওয়া উত্তম প্রথা ; ইহাতে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই হয় । সভা সমিতিতেও বালকগণকে ব্যাপ্ত রাখিতে পারা যায় । বিদ্যালয়ের সভা সমিতিতে যে বালকেরা ইচ্ছাপূর্বক যোগদান করে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে শিক্ষকগণ সভাকেও বিদ্যালয়ের রচনা শিক্ষার শ্রেণী বিবেচনা করিয়া, সভাতে কেবল রচনার পারিপাট্য ও ব্যাকরণগত ভুল লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন । সভায় অভিনয় হইবে, কবিতার আবৃত্তি হইবে, হাসির গল্প হইবে, গান হইবে, কোতুক প্রদর্শন হইবে ও এইরূপ নানা আনন্দের ব্যবস্থা থাকিবে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে রচনা বক্তৃতা প্রভৃতিও থাকিবে ।

কোন কোন শিক্ষক বালকগণের নৈতিক বৃত্তির উন্নয়ন করিবে এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, যথা—বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, পথে বা খেলবার মাঠে, যে সকল ঘটনায় নিম্নলিখিত গুণের একটীর বা একাধিকের পরিচয় পাইবে, সেই সকল ঘটনার সংক্ষেপ বর্ণনা লিখিয়া রাখিবে :—সত্যানুরাগ, সহানুভূতি, সদাচার, সততা, সংসাহস, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্বদেশানুরাগ, ইত্যাদি । শিক্ষক সমুদাহে একদিন এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করেন ।

কেনন করিয়া বালকের চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে তাহাই লিখিত হইল । তাহার চরিত্র কিরূপে উন্নত করিতে হইবে তাহা বলা কঠিন । ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই বিষয়ের বহু উপদেশ ও উপায় নির্দিষ্ট আছে । সে সমস্তের কিরূপ প্রয়োগ করিলে বালকগণের চরিত্র উন্নত হইবে তাহা ধর্মোপদেশক বলিতে পারেন । বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত সেব্যব্যবস্থা হয় নাই । আমরাও জানি না ।

২ । ধর্ম ।

আনন্দ্যকতা ।—বালাকালে মন সরম ও নমনীয় থাকে । ংঠ সময়ে ধর্মের বীজ রোপণ করিতে পারিলে যে সফল ফলিবে সে বিষয়ে আর সতর্কতা নাট । যদি চরিত্রের ভিত্তিতে ধর্মভাব না থাকে, তবে কেবল শুদ্ধ নীতির সাহায্যে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখা স্কঠিন । ংঠজন্তু বিদ্যালয়ে ধর্মাসুশীলন নিতান্ত আবশ্যক ।

শিক্ষার প্রণালী ।—বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে ধর্মাসুশীলনের শিক্ষা প্রদান করিলে সফল লাভ করিতে পারা যাইবে তাহা ং পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাট । খৃষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে প্রার্থনা হয়, বাইবেল পড়া হয় ও তাহার ব্যাখ্যা করা হয় । কাশীর হিন্দু কলেজের (স্রীমতী আনী বেসান্তের) জন্ত কতকগুলি ধ্রোক সংগ্রহ করিয়া ংকথানি পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে । সেখানে ং পুস্তকের পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় । আর প্রত্যেক ছাত্রকে রীতিমত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হয় । স্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ংকুরের বোলপুর বিদ্যালয়েও রীতিমত উপাসনা বন্দনার ব্যবস্থা আছে । আর রবীন্দ্র বাবু নিজে প্রত্যহ ধর্মোপদেশ প্রদান করেন । আলিগড় কলেজের মুসলমান ছাত্রগণকে রীতিমত নমাজ করিতে হয় । আর সেখানেও মধ্যে মধ্যে কোরাণসরিফ কি জন্ত ধর্ম গ্রন্থাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় । শুদ্ধ-কুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রীতিমত ব্রহ্মচর্যের পালন করিতে হয় । যাহা হউক ংঠ সমস্ত দৃষ্টে আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে, বালকগণ যাহাতে রীতিমত ধর্মাসুশীল দৈনিক উপাসনা বন্দনা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে যত্নশীল হইতে হইবে । কিন্তু শিক্ষক নিজে ধর্মশীল না হইলে বালকগণকে কেবল উপদেশের দ্বারা কার্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিবেন না । ং ং সমস্ত বোর্ডিং স্কুলের

ব্যবস্থা । ডে স্কুলের ছাত্রগণের জন্য শিক্ষক অপেক্ষা অভিভাবক
অধিকতর দায়ী ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ।
বিশেষ আত্মনির্দেশে । কোন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে ? শাক্ত
না বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম না খৃষ্টান, বৌদ্ধ না জৈন, সিয়া না জুয়ি ? বিদ্যালয়ে
কোন ধর্ম বিশেষ গঠিয়া তর্ক করিতে হইবে না । যে বালক, যে ধর্ম
সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাকে সেই ধর্মালম্বায়ী দৈনিক সখ্যা বন্দনাদি করিতে
বাধ্য করিবে মাত্র । কোন বালক তর্ক করিতে আসিলে, তাহাকে
কঠোর শাসনে তর্ক হইতে নিবৃত্ত করিবে । ধর্ম বিষয়ে তর্ক বিচারাদির
সময় বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ।

কিছুদিন পূর্বেও দেখিয়াছি যে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতি নাতিনীরা
অতি প্রত্যয়ে “ঠাকুর তুমি কালো, আমায় কর ভালো” প্রভৃতি সরল
কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে । ছেলেরা এখন যুম থেকে “খাব খাব”
করিয়া উঠে, আর সমস্ত দিনেও সে খাওয়া মেটে না । মিটিবেও না ।
যা'ক সে কথা—ছোট ছোট ছেলেদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, বন্দনাপূর্ণ
ছোট ও সরল কবিতা আবৃত্তি করাইবে । নিম্নে এইরূপ একটি কবিতার
আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

তুমি ভালবাস বলে, কত সুখে থাকি ।
ছুখে পেলে এস কাজে, যেই আসি ডাকি ।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি দয়াময়,
না চাহিতে দয়া করে, দাও সমুদয় ।
আশীর্বাদ কর যেন, জীবন ভরিয়া,
তোমারে বাসিতে ভাল, না যাই তুলিয়া ।
কুকথা না মুখে আনি, লোভে নাহি পড়ি,
করি সনে আড়াআড়ি, কতু নাহি করি ।

ভক্তি করি শুভাশনে, কাছে রাগি মন,
ছুই বুদ্ধি মনে যেন না গামে কণন ।
তুমি থেকে মাথে মাথে চালাও আমায়,
ভক্তি ভরে হে ঠাকুর, অগনি তোমারে ॥

কয়েকটী ব্রাহ্মশিক্ষকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এইরূপ একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলাম । শিলচর নক্ষাত্র বিদ্যালয়ের ছোট্টা নিবাসী হিন্দু ছাত্রগণ সোমবার প্রাতে সমবেত হইয়া সমগ্র মঙ্গলকাম তন্ত্রের ‘নমস্তে মতে মর্ক লোকায়াম’ স্তোত্র (৩য় উচ্চাঙ্গ) পাঠ করে ও মুসলমান ছাত্রগণ শুক্রবার প্রাতে মোলুদ মরিকের ‘দরাদ’ নামক স্তোত্র পাঠ করে । যাহারা কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অস্তিতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বর্গীয়ায়ী সন্ধ্যা বন্দনা করে ; আর যাহারা কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করে নাই তাহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিঃশব্দে উক্ত স্তোত্র পাঠ করে ।





নবম প্রকরণ—নানা বিষয়ক ।

১। পাঠনার নোট লিখিবার পদ্ধতি ।



শিক্ষকগণ কোন বিষয় শিক্ষা দিবার পূর্বে সেই বিষয় সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া বালকগণের শিক্ষা দানের নিমিত্ত উপযুক্ত তত্ত্ব ও প্রণালী নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং শ্রুতির সাহায্যার্থে সেই সমস্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন । এই লিপিকেই পাঠনার

(পড়াইবার) নোট (টোকা) বলে। ইহার সাহায্যেই শিক্ষক, পরিপাটীরূপে, শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হন ।

পাঠনার নোট প্রস্তুত করিতে হইলে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি উত্তমরূপে জানা আবশ্যিক । নূতন শিক্ষকের পক্ষে প্রথম প্রথম উত্তম নোট প্রণয়ন কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য করিলে এবং নোট প্রস্তুতের চেষ্টা করিলে বিষয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যায় ।

শিক্ষাদানের নোট সাধারণতঃ দুই প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে, এক বিস্তৃত নোট, অপর সংক্ষিপ্ত নোট । পরীক্ষা কাগজে বিস্তৃত

নোট লেখা রীতি, কারণ পরীক্ষক সেই নোট দেখিয়া পরীক্ষার্থীর জ্ঞান ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আর শিক্ষকতা কার্যের অন্তঃ প্রথম তিন বৎসর বিস্তৃত নোট লেখাই কর্তব্য। কারণ এষ্ট সমস্ত নোট দৃষ্টেই পরিদর্শকগণ নূতন শিক্ষকের উপযুক্ততার বিচার করিয়া থাকেন।

যদি এক বৎসর চেষ্টা করিয়া নোট প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে আর অন্ত্যান্ত বৎসর বড় একটা বেগ পাইতে হয়না। নোটের খাতার এক পৃষ্ঠা করিয়া লেখা উচিত, অপর পৃষ্ঠা সাদা থাকিবে। শিক্ষকতা কার্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা মনে আসিয়া থাকে। সময় সময় আবার কার্যক্ষেত্রেও অনেক অচিন্ত্য-পূর্ব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, নোট প্রস্তুতের সময়, বালকদিগের যে অভাব অনুমান করিয়া প্রণালী নির্ধারণ করা হয়, কার্যকালে হয়ত অন্তরূপ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের আবশ্যিকতা হইয়া থাকে। সাদা পৃষ্ঠায় এই সকল নূতন কথা লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

লিখিবীর নিয়ম।—শিক্ষাদানের নোট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) শ্রেনী—বালকগণের পূর্বজ্ঞান বিবেচনা করিয়া নোট প্রস্তুত করা আবশ্যিক। যাহারা ক্ষুদ্রকথা জানেনা তাহাদিগকে কোম্পানি-কাগজ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। শিক্ষাদানের ভাষা, দৃষ্টান্ত, প্রণালী প্রভৃতিও বালকগণের অবস্থানুযায়ী করা আবশ্যিক।

(২) সময়—শ্রেনী ও পাঠ্য বিষয়ের বিবেচনায়, সময় নির্ধারণ করিয়া, সেই সময়ের উপযুক্ত পাঠনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২০, ৩০ কি ৪০ মিনিটের উপযুক্ত নোটই সাধারণতঃ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সময়ের পরিমাণ বুঝিয়া পাঠনার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে, বরং

একটু কম হইলে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু অল্প সময়ে অধিক পাঠ দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর ।

(৩) বিষয়—বিষয় শ্রেণীর উপযুক্ত হওয়া আবশ্যিক । উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে একটি বিষয়ও পড়ান যাইতে পারে—কেবল বিষয়ের ‘সাধারণ তত্ত্বের’ ও ‘প্রণালীর’ পরিবর্তন করা আবশ্যিক । ‘ভূগোল’ বিষয় নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হইলে, একটা দাঁড়িপাল্লা ও একপ্রান্ত বাটকারা আনিয়া, কোন জিনিষ মাপিয়া, তাহার ব্যবহার দেখান যাইতে পারে । কিন্তু সেই বিষয় উচ্চ শ্রেণীতে পড়াইতে হইলে ভূগোলও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিষয় (ভারমধ্য, বলমধ্য, আশ্রয়মধ্য) শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(৪) উদ্দেশ্য—প্রত্যেক দিনের শিক্ষাদানে, একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি লক্ষ্য থাকা আবশ্যিক । সাহিত্য শিক্ষায় আজ বহুব্রীহি সমাস শিখাইব, আর এই এই শব্দের অর্থ শিখাইব ; পাটীগণিত শিক্ষায় আজ ভগ্নাংশ কথার অর্থ বুঝাইব ইত্যাদি । এক পাঠে একটি বা দুইটির অধিক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য নহে । কর্ম্মধারয়ের আলোচনা দুই চারি দিন হইলে, তাহার পর বহুব্রীহি আরম্ভ করা যাইতে পারে । এইরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া নোট প্রস্তুত করা আবশ্যিক । এই উদ্দেশ্যের কথা নোটের কাগজে লিখিয়া রাখিতে হয় । অনেক সময় কেবল বিষয় উল্লেখের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হইয়া থাকে ; যথা, বিষয় ‘মবুজ ও কমলা রং’ উদ্দেশ্যও তাই, মবুজ ও কমলা রং শিক্ষা । এরূপ স্থলে উদ্দেশ্য উল্লেখ না করিলেও চলে ।

(৫) উপকরণ—শিক্ষাদানে যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যিক, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে ও পাঠনার নোটে একটি একটি করিয়া লিখিতে হইবে । বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যিক মনে করিলে উপকরণের মধ্যে

তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যিক । অনাবশ্যকীয় উপকরণ বা অতিরিক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবেনা । আর শ্রেণী বিবেচনায় উপকরণের আবশ্যকতা নির্ধারণ করিবে । ‘বিদ্যালোক সম্পন্ন হৃদয় কুটীর’ বুঝাইবার জন্য দেশলাই ও মোমবাতির আবশ্যকতা নাই, কারণ যে শ্রেণীর জন্য উক্ত অংশের নোট লিখিতে হইবে তাহারা আলোকের কার্য জানে ও বুঝে । (১ম পাঠনার নোট দেখ) ।

(৬) সূচনা বা উপক্রমণিকা—বিষয়ের প্রতি বালকগণের চিন্তা আকর্ষণ করিবার জন্য (সময় সময়) পাঠনার পারশ্বে নানারূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যিক হইয়া থাকে । বিষয় ভেদে এই প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন । সাহিত্য শিক্ষায়, পাঠের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া, বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে কোন ঘটনা বলিয়া, বা পাঠ সংস্কৃষ্ট ক্ষুদ্র গল্প করিয়া পাঠনা আরম্ভ করা যাইতে পারে । পাঠীগণিত শিক্ষায়, প্রায়ই দুই তিনটি মানসিক অঙ্কের অনুশীলন করাইয়া কার্য আরম্ভ করা হয় । ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায়, পূর্বদিনের পাঠ সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠ আরম্ভ রীতি । বস্তু বিচার শিক্ষায় নির্দিষ্ট বস্তু বা তাহার প্রতিকৃতি বা ছবি উপস্থিত করিয়াই বালকগণের চিন্তাকর্ষণ করা যাইতে পারে । তবে এসম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই ; অবস্থা বিশেষে ও শিক্ষকের দক্ষতা অনুসারে ‘উপক্রমণিকা’ বহুপ্রকার হইতে পারে । কেবল ইহাচ মনে রাখিতে হইবে যে উপক্রমণিকাতে ২ হইতে ৫ মিনিটের অধিক সময় নষ্ট না হয় । আর উপক্রমণিকা না হইলেও যে বিশেষ কোন দোষ হয়, তাহাও নহে । কোন কোন পাঠে উপক্রমণিকা একেবারেই আবশ্যিক হয় না ।

(৭) বিষয় বিভাগ—পাঠনার বিষয়টিকে শৃঙ্খলার সহিত ভাগ করিয়া লইতে হইবে । এক ভাগ শিক্ষা দেওয়া হইলে, অপর ভাগ আরম্ভ করিবে । এইরূপ ভাগ যেন সংখ্যায় খুব অধিক না হয় । যথা,

ভারতবর্ষের নদীর বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে, ইহাকে এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) বিদ্যা পর্বতের উত্তরাংশের নদী (২) বিদ্যা পর্বতের দক্ষিণাংশের নদী (৩) নদীর গতি (৪) নদীর উপত্যকা বা বেসিন (৫) প্রধান প্রধান শাখা নদী (৬) নদী তীরস্থ প্রধান প্রধান নগর (৭) বাণিজ্যাদির সুবিধা ও অসুবিধা।

(৮) পদ্ধতি—বিষয়ের প্রত্যেক বিভাগ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখিতে হইবে। পদ্ধতি লিখিতে এই কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যিক যে জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত, সরল বিষয়ের সাহায্যে জটিল, নিকটস্থ বস্তুর সাহায্যে দূরস্থ বস্তু ও বর্তমানের সাহায্যে ভূত ভবিষ্যৎ শিক্ষা দিতে হইবে।

(৯) পুনরালোচনা—পাঠনা কালে যে সমস্ত নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইল, তাহার মধ্য হইতে অত্যাবশ্যকীয় অংশ বাছিয়া লইয়া, সেই সময়ে, পাঠের শেষে (২ হইতে ৫ মিনিটকাল) পুনরালোচনা করা আবশ্যিক। পুনরালোচনার উদ্দেশ্য বাস্তবের স্মরণ ও বোধ শক্তির পরীক্ষা করা এবং বিষয়ের অত্যাবশ্যকীয় অংশে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা; এইজন্য পুনরালোচনার কেবল কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

(১০) বোর্ডের ব্যবহার—প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতেই উপযুক্ত রূপ বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যিক। পাঠনা কালে বিশেষ আবশ্যকীয় শব্দ, সূত্র, সিদ্ধান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। আর পাঠ বিশদীকরণার্থ আবশ্যিক মত নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। নোটে সেই সমস্ত শব্দ সূত্র, সিদ্ধান্ত এবং চিত্রাদির উল্লেখ থাকা আবশ্যিক।

পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি।—নোট লিখিবার আর একটি বিস্তৃত পদ্ধতি আছে। ইহাকে “পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি” বলে। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। এ পদ্ধতিও উত্তম তবে নূতন শিক্ষকের পক্ষে তত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক পূর্বোক্ত

পদ্ধতিতে নোট লিখিতে শিখিলেই এ পদ্ধতি অল্পমারে নোট লেখা শক্ত হইবে না । এই পদ্ধতি নিম্নলিখিত পাঁচ আশে বিভক্ত :—

১। প্রবেশ।—বালকের পূর্বজ্ঞাত বা পরিচিত বিষয়াদির একপ উপলেক্ষ করিতে হইবে যে বালক নূতন বিষয় বুঝিতে যেন সে সকলের সহায়তা পাইতে পারে । কিরূপে বালকের পূর্ব জ্ঞানের সহিত নূতন বিষয়ের সংযোগ করিতে হইবে তাহা শিক্ষককে বিশেষ বিবেচনা পূর্বক নির্ধারণ করিতে হইবে । ইহাই উপক্রমণিকা বা সূচনা ।

২। প্রদান—শিক্ষক বিষয়ের নূতন তথ্য মধ্যমে বালককে শিক্ষা দান করিবেন । কিন্তু সাধন যেন নূতন তথ্য শিখাইতে গিয়া কেবল মাত্র কতকগুলি নূতন শব্দ শিখাইয়াই শিক্ষক সন্তুষ্ট না হন ।

৩। প্রকাশ।—বালককে যে সকল নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইল, সে গুলি কিরূপে উপযুক্ত ও পরিমিত ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । এখানে কতক ‘আদানের প্রশ্ন’ অবলম্বন করিতে হইবে ।

৪। প্রশ্ন।—কোন পরিচিত পদার্থ বা ঘটনার সহিত সংযোগ করিতে পারিলে, নূতন বিষয় মনে রাখিবার সুবিধা হয় । বালকের স্মৃতির সাহায্যার্থে একপ উপায় অবলম্বনীয় । নিঃসংশয় বিষয়েও স্মৃতির সাহায্য হইয়া থাকে, যেমন কোন কথার স্মরণার্থ চানরে গেরো দিয়া রাখা হয় । এখানে গেরোর সহিত বিষয়ের কোন সাদৃশ্য থাকে না বটে, কিন্তু গেরো দেখিয়া, কি ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি । ইহাই ভাব প্রশ্ন ।

৫। প্রয়োগ।—বালক যে নূতন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহার প্রয়োগ আবশ্যক । পাঠ্য-পুস্তকের নিয়ম অর্থে প্রয়োগ করিবে ; ব্যবহারের নিয়ম পদ-বিব্রাহে বা পদ-রচনায় প্রয়োগ করিবে, পদার্থ পরিচয়ের বিষয় রচনায় লিপিবদ্ধ করিবে বা বস্তুর বিচারে প্রয়োগ করিবে, বিজ্ঞানের বিষয় পরীক্ষণে প্রয়োগ করিবে ইত্যাদি । বাস্তবিক পক্ষে যদি উপার্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে না শিখিল তবে সে জ্ঞানের কোনই আনশাকতা নাই ।

এইগুলি নোট লিখিবার সাধারণ নিয়ম ।—নোট লিখিবার নানারূপ দ্বারা আছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে নানা বিষয়ের নোট প্রদত্ত হইল :—

১। গদ্য সাহিত্য ।—সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে প্রণালীতে শিক্ষাদানের নোট লিখিয়া থাকেন নিম্নে তাহারই আদর্শ

প্রদত্ত হইল। আবশ্যক মত ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সংক্ষেপ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে নবীন শিক্ষকের সুবিধা হইবে না।

অক্ষয় কুমার দত্ত কৃত চার পাঠ তৃতীয় ভাগের “সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য” প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ পড়াইতে হইবে যে নাপ নোট আবশ্যক তাহার আদর্শ :—

“জ্ঞানের কি আশ্চর্য প্রভাব। বিদ্যার কি মনোহর মূর্তি। বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব-জাতি পশু জাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-প্রদত্ত বিশুদ্ধ স্বপ্ন ইচ্ছিয়জানিত সামান্য স্বপ্ন অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌরুষামীর স্বপ্ন-ময়ী গুরুবাসিনীর সহিত অসাবিত্তার তামসী নিশার মেরুপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক সম্পন্ন স্বচার চিন্তা-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইকপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্বপ্নে ও নিকৃষ্ট কাণ্ডে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিকৃষ্ট স্বখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনায় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ স্বপ্ন সম্বোধন করিয়া আপনাকে ভুলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভূবনাধিবাসেন উপযুক্ত কবিয়া থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও স্বপ্নের তারতম্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একপার্থায় প্রাণী বলিয়া লভ্য হওয়া সুকঠিন।”

মধ্য শ্রেণী ।

বিষয়—গদ্য সাহিত্য—উদ্দেশ্য-জ্ঞানোপার্জনে বালকগণের
উৎসাহ বৃদ্ধি করা ।

সময়—৪০ মিনিট ।

উপকরণ—ব্ল্যাকবোর্ড ও চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
উপক্রমণিকা	“স্বদেশে পূজাতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজাতে,” কেন? বিদ্যা-মাগর দর্শিত কিন্তু তাহার বন্ধু পাইকপাড়ার রাজা ধনী ছিলেন, কাহার প্রভাব বেশী ইত্যাদি।

বিষয়	পদ্ধতি
২। শব্দার্থ ও বাণী। জ্ঞান ও বিদ্যা— বিদ্যাহীন মনুষ্য পৌনঃপুন্য প্রভৃতি	জ্ঞান বিদ্যার মূল স্বরূপ, বিদ্যা জ্ঞান লাভের উপায়। আবার 'বিদু, জ্ঞানেন'। বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়, তবে কি? কেন? মনের গৌরব কি? আর দেহের গৌরব কি? পূর্ণ মাস—মাস পূর্ণ হই পূর্ণ চন্দ্র—য ও মপ। স্বধাময়ী শুক্লমাসিনী, অজ্ঞান-ভিত্তির বৃত্ত—অর্থ ও সমাস। অজ্ঞানতা যদি ভিত্তির মদন, তবে জ্ঞান কি? কেন?
অজ্ঞানতার দৃষ্টান্ত	লক্ষ্যে লক্ষ্যমগ্ন বাস করে, পৃথিবী জিকোন ও গজ কচ্ছপের উপর অবস্থিত, সূর্যই ঘূর্ণিত হচ্ছে, রাহু চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে ইত্যাদি।
চিহ্ন-সামান্য ও রূপ কুটীর— পৌর্ণ মাসীন... প্রতিমাসীন হয়	সামান্য = বৃহৎ অট্টালিকা—সজ্জিত, আলোকিত। কুটীর = ক্ষুদ্র গৃহ—অপরিষ্কার ও অন্ধকার। কাহার সাহিত কাহার ভুলনা? অলক্ষ্য? বাক্যের ভাবার্থ কি?
নিবৃষ্ট স্থল ও নিবৃষ্ট কার্য	ইন্দ্রিয়াদির অপরিমিত পরিভূক্তি সাধনে যে স্থল। অতি ইতর রকমের রঙ্গ ভাসামায় যে আনন্দ। নিবৃষ্ট কার্য মণা—চুরি, ডাকাতি, পরহিংসা, পরপীড়া, পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি। অশিক্ষিত ব্যক্তি কেন নিবৃষ্ট স্থল ও নিবৃষ্ট কার্যে রত থাকে? শিক্ষিত থাকেনা কেন?
জ্ঞানজনিত স্থল ও ধর্মোৎপাদী স্থল	আত্মিক গতি, বার্ষিক গতি, লাপলাপের বৃত্তান্ত, সামান্য সহ্য- ভারভের আত্মায়িক পাঠে বা প্রবণে স্থল—জ্ঞানজনিত। পরোপকার, পরমেশ্বর, গুরুভক্তি, কর্তব্য পালন, সাধুতা, মতা নিষ্ঠায় স্থল—ধর্মজনিত।

বিষয়	পদ্ধতি
ভুলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট- তর	'ছালোক' কথা শিখাইতে হইবে । উৎকৃষ্টতা কেন ? ভুলোকই না অপকৃষ্ট কেন ?
একজাতীয় প্রাণী পুনরালোচনা	একজাতীয় প্রাণীর দৃষ্টান্ত দাও । তবে কি বিষয়ে লক্ষ্য ? জ্ঞানের অভাব আশ্চর্য্য কেন ? মানব জাতি পশু অপেক্ষা কি শ্রেণে শ্রেষ্ঠ ? অনিচ্ছিতের মন অসাবিত্তা আর স্থানিচ্ছিতের মন পৌর্নগামী, ইহার ভাব বুঝাইয়া দাও । অজ্ঞান-তিসিরা- বৃত্ত, ধর্মোৎপাদা, ভুবনাবিসার—যা'ম নাকা ও মমাম ?

২। পদ্যসাহিত্য ।—সাধারণতঃ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণ পরীক্ষা
কাগজে যেকোন ভাবে নোট লিখিয়া থাকে নিজে তাহারই আদর্শ দেখান
হইল । এই নোট নিয় প্রাথমিকের শ্রেণী উপলক্ষ করিয়া লিখিত
হইয়াছে । উচ্চ প্রাথমিকের জন্ত প্রায় একরূপই হইবে, তবে কিঞ্চিৎ
কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রগণের পক্ষে দুই
দিনের (৩০ মিনিট করিয়া) মত পাঠ হইয়াছে । কিছু কমাইয়া উচ্চ
প্রাথমিক শ্রেণীর জন্ত (৩০।৪০ মিনিটের) একদিনের পাঠ করিয়া
লওয়া যাইতে পারে । এইরূপ নোটকেই 'বিস্তৃত নোট' বলে ।
(শিলচর নর্মাল স্কুলের এসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু ভগমণি দে
কৃত "শিক্ষাদানের নোট" হইতে গৃহীত) 'সম্ভাবনাকের' নিম্নোক্ত
অংশের পাঠনার নোট :—

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর,
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর ;
গুণ গুণ গুণ তবে কত সমুদরে
কেমন পুলকে তারা মধু পান করে ;
কিন্তু এরা হারাইবে এদিন যখন,
আমিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন ?

আশায় বাক্য হলে আগিবেনা আর,
আর না করিলে নই ময়। নাকার।
সময়ে অনেকই বসে বসে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়।
কেবল অমর এই নিমপতি যিনি,
সকল সময়ে ন্যায় সকলের তিনি ।



নিম্ন প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণী
বিষয় পদ্য সাহিত্য—সময় ৩০ মিনিট
উদ্দেশ্য—প্রবন্ধের বিষয় ।

উপকরণ—পদ্য, মধু মাফকা (বা ছবি), বোর্ড, চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
১। বোর্ডে লিখিত নূতন শব্দের পাঠ :— বিশ্বপতি, গজার, বকিত, গুপ্তন	১। নূতন শব্দ কয়েকটি শৃঙ্খলার সহিত বোর্ডে লিখিত হইবে। বালাকগণ প্রথমে তাহা আবার সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধে পাঠ করিলে। নির্দেশ যাত্র যে কোন শব্দ পড়িলে। তৎপর ভিন্ন ছাত্রকে পড়িতে বলিয়া পাঠ শিক্ষা হইয়াছে কিনা দেখিতে হইলে।
২। সূচনা :— ফুলের বাগানে লম্বা ফুল ও পতঙ্গাদি বিষয়ে কথোপকথন।	২। বালাকগণকে সঙ্গে লওয়া ফুলের বাগানে যাইতে হইবে ও ফুলের ফুলে পতঙ্গাদি দেখাইয়া প্রগোস্তর ছলে পতঙ্গের উদ্দেশ্য কি তাহা আদায় করিতে হইবে। ফুল ফুটিলে পতঙ্গাদি জুট আর শুকাইয়া গেলে কোন পতঙ্গ তাহাতে আসেনা।
৩। আদর্শ পাঠ ও ব্যাখ্যা :—	প্রথমে পাঠ্য পড়িতে হইবে; তৎপর দৃষ্টান্ত, বর্ণনা ও প্রশ্নের সাহায্যে তাহা বুঝাইতে হইবে।

বিষয়	পদ্ধতি
সরোবরে কমল নিকর	কমল ফুল দেখাইতে হইবে (অভাবে স্থল পদ্ম, গোলাপ ইত্যাদি দেখাইয়া পদ্ম বর্ণনা করা যাইতে পারে ।) 'কমল' কথা শিখাইতে হইবে এবং 'পদ্ম' নাম আদায় করিতে হইবে । পদ্ম কোথায় ফুটে ? দিঘাঁকা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সরোবর ও জলাশয় কথা শিক্ষা দিতে হইবে । নিকর = মকল । পদ্মবন ও তাহার শোভা বর্ণনা করিতে হইবে ।
আশ্চর্য্য মনোহর শোভা	বাগানের শোভা মনোহর, কি আশ্চর্য্য । ইহা বুঝাইতে হইবে । যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইনা এমন বস্তুকে 'আশ্চর্য্য বস্তু' বলি ; দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে । মেকপ শোভা মকল সময় দেখা যায় না তাহাই আশ্চর্য্য শোভা । যে শোভা দেখিলে মনে খুব আনন্দ হয়, তাহাই মনোহর শোভা ।
মধুকর	মৌমাছি কিরূপ, ছবি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে । 'মধুকর' কেন বলে ? অলি ও ভ্রমর শিখাইতে হইবে ।
শুণ শুণ রবে	পাখী সব রব করিতেছে ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা রব = শব্দ বুঝাইতে হইবে । পাখা নাড়াতেই এইরূপ শব্দ হয়, মৌমাছি বসিয়া থাকিলে শব্দ হয়না ইহাও বুঝাইতে হইবে ।
পুলকে মধু পান করে	কলকে করনী বা অস্ত্র ফুলের রস চুষিয়া খাইতে দিয়া, মধু কি বুঝাইতে হইবে । বাজকগণ পুলকের সহিত সন্দেশ খায় ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা "পুলকে = আনন্দের সহিত" আদায় করিতে হইবে ।
গদ্য	কমল শুভ্র কোথায় ফুটিয়াছে ? তাহার কিরূপ শোভা ধরিয়াছে ? তাহাদের মধু কাহার পান করিতেছে ? কিরূপ শব্দ করে ? এইরূপ প্রশ্নের সাহায্যে গদ্য করাইতে হইবে ।

বিষয়

পদ্ধতি

	প্রাথমিক আদায় করিয়া বোর্ডে মার লিখিতে হইবে । [অংশে পদা ফুটিয়াছে, ভ্রমর তাহার সমুদায় করিতেছে]
এরা..... যখন	"এরা" কে ? 'এদিন' অর্থাৎ ফুটিয়া অবস্থা । হারাইবে এদিন = শুকাইয়া যাইবে ।
শুধু করিতে	শুধু শুধু রব করিতে । কিন্তু এই শব্দ উৎপন্ন হয় ?
আশায় বর্ণিত হলে	রাস পানীয় পুরস্কারের আশা করিয়াছিল, কিন্তু সে আশায় বর্ণিত হইয়াছে । এইরূপ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে, কিছু পাইবার ইচ্ছা করাই 'আশা' আর তাহা না পাইলে আশায় বর্ণিত হলে বলা যায় । অর্থাৎ কি আশায় ফুল আসে ? কিন্তু তাহাতে বর্ণিত হইতে পারে ?
মধুর বাক্য	শিশুগণ পায়ের নুপুর বা মল পরিণে বাক্য শব্দ হয় ইত্যাদি বাল্যে "বাক্য" কথা বুঝাইতে হইবে । তাহা শুনিতে কেমন লাগে ? কোকিল, দৈমাল, বুলবুল ইত্যাদির শব্দের দৃষ্টান্ত দ্বারা মধুর শব্দ কি বুঝাইতে হইবে । কাক, পেঁচা, মধুর ইত্যাদির ককণ শব্দের কথাও বলিতে হইবে । ইহাদ্বারা পূর্বোক্ত শুধু শুধু রব ও শুধু শুধুই বুঝাইতেছে ।
গদা—	হারাইবে কে ? কি হারাইবে ? অর্থাৎ আসিবে কি ? কি করিতে আসিবে না ? কেমন আসিবে না ? আর কি করিবে না ? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া গদ্য আদায় করিতে হইবে । বোর্ডে লিখিতে হইবে (ফুলগুলি শুকাইয়া গেলে ভ্রমর আর আসিবে না)
অন্যমনস্ক...নয়	পিতামাতা ও সহপাঠীদের দৃষ্টান্তে 'বন্ধু' শব্দ বুঝাইতে হইবে ।
ব্যাখ্যা	আদর করা যে বন্ধুর কার্য, প্রশ্ন দ্বারা আদায় করিতে হইবে ।

বিষয়	পদ্ধতি
	কুটুস্ত অবস্থায় পদোন্নয়ন কে তিল ? পদাঙ্কহীয়া গেলে আন তাহারি আসে কি ? কেন আসে না ? 'হায়, দুঃখের সময়ে' উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে । মানুষের সুসময় কখন বধা যায় ? অসময় কি ? ধর্মোদয়ের অনেক আত্মীয় শত্রু থাকে কিন্তু পরিচয়ের নিকটে কেহ যায় না । প্রমাণ দ্বারা আদায় করিতে হইবে । ভাবার্থ এই :- আমাদের টাকা পয়সা যখন থাকে, তখন অনেক আত্মীয় কুটুস্ত জুটে, আর যখন টাকা পয়সা থাকে না, তখন কেহ আমাদের কাছে আসে না ।
ঈশ্বর... যিনি	বিশ্ব = সমস্ত সংসার ; মানুষ, গরু, গাছ, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ লইয়া বিশ্ব । যিনি এই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা যাহার পূজা করি ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইতে হইবে, তিনিই ঈশ্বর । পতি— জীলোকের পতি, গৃহ পতি ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা, পতি = কর্তা, আদায় করিতে হইবে । ঈশ্বর আমাদের সকলের কর্তা, এই বিশ্বের পতি ।
সকল... তিনি	ঈশ্বর আদিগকে সকল সময় রক্ষা করেন । দরিদ্র অবস্থায়ও অনুগ্রহ করেন । বিপদের সময়ও ছাড়িয়া যান না । অতএব তিনি আমাদের সকল সময়ের বন্ধু । প্রকৃত, ইহা প্রকৃত সোণার আংটি ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা প্রকৃত = যথার্থ, ঠিক, বুঝাইতে হইবে । ঈশ্বর কিরূপে আমাদের প্রকৃত বন্ধু ? কে প্রকৃত বন্ধু নয় ? প্রকৃত বন্ধু ও অপ্রকৃত বন্ধু বা নকল বন্ধু বুঝাইতে হইবে ।
ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু	বোর্ডে সার—[ভাগ অবস্থায় আমাদের অনেক আত্মীয় জুটে, মন্য অবস্থায় সময় কেহই কাছে আসে না ; কিন্তু ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদের রক্ষা করেন । অতএব ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ বন্ধু ।]

বিষয়	পদ্ধতি
৪। সমস্বরে পাঠ	বালকগণ বামার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠটি পড়িবে।
৫। বাস্তবিক পাঠ	প্রত্যেক বালক পড়িবে। (আমি মধো মধো আদর্শ দেখাইব, কিন্তু পাঠের সময় বিশেষ বাধা দিব না)
৬। পুনরাবোচনা	বোর্ড মুদ্রিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে :— জগৎস্থল কখন পদা বলে আসে ? কখন আসে না ? মানুষের কোন সময় খুব বড় জুটে ? কখন জুটে না ? কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু ? কিরূপে ? আকার প্রতি কি করা উচিত ? ইত্যাদি।
বোর্ড	সার :—উল্লিখিত পদ্যগুলি ফুটিয়াছে। জগৎগণ তাহাতে মনোপান করিতেছে। ফুলগুলি শুকাইয়া গেলে জগৎ আর আসে না ; ভাল অবস্থায় আমাদের অনেক আত্মীয় জুটে, খারাপ অবস্থায় সময় কেহই কাছে আসে না। প্রথম সকল সময়েই আমাদের কাছে অনুগ্রহ করেন। অতএব প্রথমই আমাদের যথার্থ বন্ধু।
বিশ্বপতি	
আশ্চর্য	
বন্ধু	

৩। পদার্থ পরিচয়।—প্রথম দুইটা নোটে যেরূপ ভাবে বিষয় ও পদ্ধতির বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে হয়তঃ পাঠকগণ একটু চিন্তায়িত হইয়াছেন ; কোনটিকে বিষয় করিতে হইবে, আর কোনটিকে বা পদ্ধতি হইবে, তাহা হয়ত ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক, বিষয় নির্ধারণের যে একটা নিশ্চয় বোধবাধি নিয়ম আছে তাহা নহে ; আবশ্যিক মত বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। নিম্নে অল্পরূপ একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। (ওয়াকার কৃত অবজেক্ট লেসনস্ হইতে।)

মধ্য বায়না প্রণী — বিস্ময় শিশির

সময়, ৪০ মিনিট।

উপকরণ—জলগরম করিবার পাত্র, আঁতুণ বা স্পিরিট

ল্যাম্প, দেশলাই, জল, ঠাণ্ডা থালা।

বিষয়	পদ্ধতি
১। শিশিরের উৎপত্তি— (ক) যদি একখানি থালায় একটু জল রাখিয়া বাহিরে রাখা যায়—জল জমশঃ উড়িয়া যায়। জল বাষ্পীভূত হইল। (খ) গরম জলের উপর একখানা ঠাণ্ডা থালা ধর; থালা সরাইয়া পরীক্ষা কর। থালায় হাত দিলেই জল দেখিতে পাইবে। (গ) একটা গেলাসে খুব ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া সেই গেলাসটী (গরম) রাখা ঘরে আনিলেই দেখিতে পাইবে যে গেলাসের চার পাশে, জলের আবরণ পড়িয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে উষ্ণ বাতাস (বা বাষ্প) কোন শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়। (১) ২। শিশির সঞ্চারণ— নানারূপ প্রাকৃতিক অবস্থার ভেদে শিশির সঞ্চারে তারতম্য ঘটে। প্রধানতঃ (১) স্থান (২) শিশির সঞ্চারণ হইবার জন্ত যে	(ক) শীতের প্রাতঃকালে মাঠে বেড়াইবার সময় ঘাস ভিজা দেখিতে পাই। বৃষ্টি না হইলেও ঘাস ভিজিয়া থাকে। (খ) পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে। (১) সমুদ্র সর্বদা স্বর্ধোর উত্তাপ পাইতেছে। সেইজন্য সমুদ্র হইতে সর্বদা বাষ্প উঠিতেছে, এই বিষয় এখন বাষ্পকণাকে ২৪টী প্রশ্ন করিয়াই আদায় করা যাইতে পারে। তারপর বুঝাইতে হইবে, মাটি শীতাই ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা মাটিতে লাগিয়া ঘনীভূত হয়। এই রূপে শিশিরের উৎপত্তি হয়।

বিষয়	পদ্ধতি
শিশুর বাহিরে রাখা হইয়াছে, সেই শিশুর শৈত্যের পরিমাণ (৩) বায়ুর অবস্থা ।	(২) মেঘলা সন্ধ্যাতে শিশুর সন্ধ্যার হয় না কেন ? গাছের নীচে শিশুর সন্ধ্যার হয় না কেন ? জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে ।
পরিষ্কার রজনীতেই উত্তমরূপে শিশুর সন্ধ্যার হয়, কারণ পৃথিবীর তাপ বায়ু পথে শীঘ্রই উড়ে পরিচালিত হয়, মেঘে বাধা পায় না । মাটি গুল শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে (২) ।	
মৃত্তিকা বা প্রান্তর অপেক্ষা বৃক্ষাদিতে অধিক শিশুর পাত হয়, কারণ বৃক্ষাদি প্রান্তরাদি অপেক্ষা অধিক সময়ে তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অতি শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে ।	
৩। শিশুর কার্য— পৃথিবীকে শীতল করা ও বৃক্ষাদি উৎপত্তির সহায়তা করা । কতক পরিমাণে বৃষ্টির কাশ করা । (৩)	(৩) তিব্বতে সময় সময় এত শিশুর পাত হয় যে, কখন কখন মৃত্তিকা কদমে পরিণত হয় ।

৪। পাঠীগণিত (গুণন)—অঙ্কের নোট প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় সময়ই উদাহরণকে বিষয় ধরিয়া লইতে হয় । নিয়মের নোটে তাহাষ্ট দেখান হইয়াছে । অঙ্কের নোটের সূচনায় বালকের পূর্ব জ্ঞানের পুনরাবলোচনা আবশ্যিক । জড়িত প্রশ্ন হইলে, তদ্রূপ সহজ সহজ প্রশ্ন করিয়া বিষয় আরম্ভ করা রীতি । যে রূপ প্রশ্নের উত্তর বালকেরা মুখে মুখেই দিতে পারে, সূচনায় কেবল তাহাই জিজ্ঞাসা করিবে ।

শ্রেণী—২য় মান

বিষয় পাঠীগণিত—সময় ৪০ মিনিট ।

উপকরণ—বালকগণের গেষ্টে, পেন্সিল ; শিক্ষকের বোর্ড ও চক ।

পূর্বজ্ঞান—একটি অঙ্কের দ্বারা গুণকরা বালকেরা শিখিয়াছে ।

উদ্দেশ্য—দুইটি অঙ্কের দ্বারা গুণশিক্ষা ।

উদাহরণ	পদ্ধতি
১। সূচনা—পূর্বজ্ঞানের পুনরা- লোচনা ।	১। বোর্ডে ১১ লেখ । শেষের একের মানে কি ? নামে আর একটা এক লেখ । এই একেরই বা মানে কি ? ২৬ এর ২এর মানে কি ? সেই জন্য ২৬ মানে ২০+৬ ।
২। দুইটি বা ততোধিক অঙ্ক- যুক্ত সংখ্যার অর্থঃ— $২৬ = ২ \times ১০ + ৬$ $৩৬৪ = ৩ \times ১০০$ $+ ৬ \times ১০ + ৪$	২। যদি শ্রেণীতে ২৬ জন বালক থাকে, আর প্রত্যেকের ৫৭ টা কলিয়া মারবেল থাকে, তাহা হইলে সকল ছেলের কতগুলি মারবেল আছে ? কেমন করে হিসাব করা যায় ? আগে ৬জন বালকের কয়টা মারবেল আছে দেখ, তারপর ২০ জনের কয়টা আছে হিসাব করা যাউক । এখন সকলের কয়টা আছে তা কেমন করে জানা যাবে ?
কোন রাশিকে ২৬ দ্বারা গুণ করাও যে কথা, সেই রাশির ২০ গুণকে আর ৬ গুণের সঙ্গে যোগ করাও সেই কথা । ২৬ জন বালকের একটা উদা- হরণ দিয়া বুঝাইতে হইবে ।	তবে ২০ দিয়ে কেমন করে গুণ করা যায় তাই আগে শিখিতে হইবে ।
৩। ১০ দিয়া গুণ করিবার সময় সংখ্যার শেষে একটা শূন্য দিলেই হয় ।	৩। ১০ দিয়া গুণ করার কাজ যে শূন্য বসাইলে হয় তাহা যোগ করিয়া দেখাও । দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দাও ।

উদাহরণ

পদ্ধতি

২০ জন দ্বারা গুণ করার সময়,
২ দিম্বা গুণ করে তাহার শেষে
একটা শূন্য যোগ ।

রানের ১০ খণ্ডে মারবেল আছে, আর যত্ন ২০ খণ্ডে
আছে । কার বেশী ? যত্ন মারবেল, রানের মারবেল
হইতে কত বেশী । মনে কর প্রত্যেক খণ্ডেতে ১৫টা
করে মারবেল আছে । রানের কমটা, যত্ন কমটা ?
এখন তবে ২০ দিম্বা কেমন করে গুণ করিবে ?

(প্রথমে ১০ দিম্বা, তারপর ২ দিম্বা)

১৬৪কে ২০ দিম্বা গুণ করিতে হইবে ।

$$১৬৪ \times ১০ = ১৬৪০$$

$$১৬৪ \times ২০ = ৩২৮০$$

এইরূপে দেখ ।

$$\begin{array}{r} ১৬৪ \\ ২০ \\ \hline ৩২৮০ \end{array}$$

উত্তরটি লক্ষ্য করাক, যদি শেষে শূন্যযুক্ত রাশি দ্বারা গুণ
করিতে হয়, তবে উত্তরের শেষেও শূন্য হয় । ৩০, ৪০,
প্রভৃতি দ্বারাও গুণ করাইতে হইবে ।

৪ । এখন দুই অঙ্কের
রাশির দ্বারা গুণ —
৫৭ × ২৬

৪ । ২৬ জন বাণকের ৫৭টা করিয়া মারবেল আছে ।

$$৫৭ \times ৬ = ৩৪২$$

$$৫৭ \times ২০ = ১১৪০$$

$$\text{যোগ করিয়া } ৫৭ \times ২৬ = ১৪৮২$$

আবার এই অঙ্ক সোজা স্তম্ভেও কষা যায়—

$$\begin{array}{r} ৫৭ \\ ২৬ \\ \hline ৫৭ \times ৬ = ৩৪২ \\ ৫৭ \times ২০ = ১১৪০ \\ \hline ৫৭ \times ২৬ = ১৪৮২ \end{array}$$

৫। পাটীগণিত (ভগ্নাংশ) — আবার অঙ্কের নোট অন্য রকমেও লিখিতে পারা যায়। নিম্নে আদর্শ দেওয়া গেল। এখানে উদাহরণকে বিষয় ধরা হয় নাই। (জইগ কৃত হাওবুক অব্ জুগ মেনেজমেন্ট হইতে)।

বিষয়—ভগ্নাংশের যোগ।

শ্রেণী—পঞ্চম।

সময়—৩০ মিনিট।

উপকরণ—ব্ল্যাক বোর্ড, কয়েক খণ্ড কাগজ, একখান ছুরী বা কাঁচি।

বিষয়	পদ্ধতি
১। যদি ভগ্নাংশের হর সমান থাকে তবে কেবল লব যোগ করিলেই হইবে।	একখানা লম্বা কাগজের ফালী (ফাইল) লইয়া কাটিয়া ৮ সমান ভাগে ভাগ করিব। এইরূপ ২ টুকরা ও তিন টুকরা কাগজ একখানে করিলে ৫ টুকরা হইবে অর্থাৎ— $৩ + ২ = ৫$ এইরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। (১) আর এক খণ্ড কাগজের ফালী লইয়া তিন সমান ভাগে ভাগ করিব। ২ টুকরা কাগজ সমস্তের ৬। আবার এই তিন টুকরা কাগজ কাটিয়া সমান ৬ টুকরা করিব। আগে যে ২ টুকরা কাগজ লইয়াছিলাম, এখন সেই দুই টুকরা ৪ টুকরা হইয়াছে। এখন সেই ৪ টুকরা সমস্তের ৬ কারণ সমস্তকে ৬ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। হুতরাং— $৬ = ৬$ $৬ = ৬$ এই অঙ্ক বালকগণের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়া লইবে।
২। ভিন্ন ভিন্ন হরযুক্ত ভগ্নাংশের যোগ। (১) ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ভগ্নাংশের মূল্যের কোন বৃদ্ধি হয় না।	

বিষয়	পদ্ধতি
(২) ভগ্নাংশ গুলিকে সমান হয়ে আনিয়া তাঁহাদের যোগ করিলেই যোগ করীর ফলাফল হয় ।	(২) উদাহরণ— $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ সাধারণ হয়— $\frac{12}{8}$ $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ $\therefore \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{6}{8} + \frac{4}{8} = \frac{10}{8}$ সমান হয় বার বার না লিখিয়া একবার লিখিলেই হয় । যথা— $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{6}{8} + \frac{4}{8} = \frac{10}{8}$

৬। ইতিহাস ।—যাঁহারা নান্দা জ্ঞান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতেই ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপে শিক্ষা হইয়া থাকে । কারণ তাঁহারা স্থানগুলির উত্তম বিবরণ প্রদান করিয়া, বালকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন । নিম্নের নোট লিখিত ইতিহাসের বিষয় শিক্ষায়, যদি শিক্ষক আগ্রহ করেন ও যে ক্ষুদ্র কক্ষে সাহাজানকে বন্দী রাখা হইয়াছিল তাঁহার বর্ণনা করিতে পারেন, তবে বালকগণের উক্ত বিষয় মনে রাখা বেশ সহজ হইবে । অভাব পক্ষে চিত্রাদি প্রদর্শন করান কর্তব্য । এই নোট দেখিয়া কোন কোন শিক্ষক মনে করিতে পারেন যে, এ সকল কথাতে পুস্তকেই আছে, পুথক নোটের আবশ্যিকতা কি । কিন্তু যাঁহারা জানেন যে পুস্তক দেখিয়া শিক্ষাদান ও গল্পচ্ছলে শিক্ষাদানে অনেক প্রভেদ, তাঁহারা এ প্রশ্ন করিবেন না । শিক্ষক যাঁহাতে বালকদের নিকট এই ঘটনার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারেন, সেইরূপে তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে । এই নোট তাঁহার স্মরণার্থ লিপি মাত্র । (শিলচর টেনিং স্কুলের ইন্সট্রাক্টর মৌলবী আজহার আলী লিখিত নোট হইতে) ।

মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণী

বিষয়—ইতিহাস । সময় ৪০ মিনিট ।

(আরম্ভজ্ঞেবের সিংহাসন প্রাপ্তি ।)

উপকরণ—ভার ৩বর্ষের মানচিত্র, আগ্রা-ছগের চিত্র,
আরম্ভজ্ঞেবের চিত্র, ব্লাক বোর্ড, চক ।

বিষয়	পদ্ধতি
সুচনা, সাজাহানের পুত্র- গণের বিবরণ ।	দারী জ্যেষ্ঠ, আকবরের মত একেশ্বরবাদীও উদার, কিন্তু উদ্ধত । পিতার নিকট থাকিয়া তাহার রাজকাৰ্য্যের সহায়তা করিতেন । সুজা দ্বিতীয়, সদাশক্ত, কিন্তু বুদ্ধিমান, বাঙ্গালার শাসন কর্তা । আরম্ভজ্ঞেব তৃতীয়, চতুর, রণ-নিপুণ ও মুসলমান ধর্মে গোড়া, দক্ষিণাত্যের শাসন কর্তা । মুরাদ কনিষ্ঠ, সাহসী কিন্তু সরল ; শুজারাতের শাসন কর্তা । (মানচিত্রে স্থানগুলি দেখাইতে হইবে ।)
(১) সাজাহানের পীড়া ।	(১) সাজাহানের কঠিন পীড়া দারী গোপন রাখিয়া রাজ কাৰ্য্য চালাইতে লাগিলেন । কিন্তু অচ্যুত পুত্রগণ জানিতে পারিয়া প্রত্যেকেই রাজপদ প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন । সাজাহানের আরোগ্য লাভ । কিন্তু পুত্রগণের ষড়যন্ত্রের বৃদ্ধি ।
(২) পুত্রগণের ষড়যন্ত্র ও পরস্পরের যুদ্ধ ।	(২) প্রথমে সুজার মৈন্য অগসর, দারীর পুত্র মলিমান কানীর নিকট যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করে । সুজার মৃত্যুর খবর আসায় গ্রহণ । মুরাদ আরম্ভজ্ঞেবকে মিলিত হইতে অনুরোধ করেন । আরম্ভজ্ঞেব প্রত্যাশ্রমে সম্মত, মুরাদকে রাজ্য দিয়া সফায় যাইবেন এইরূপ প্রস্তাব করেন । মর্শদারতীরে ছই জাতার মৈন্য একত্র (মানচিত্র দেখ) । যশোবন্ত সিংহ কর্তৃক চালিত দারীর মৈন্য পরাজিত । দারীর যুদ্ধে আগমন । উজ্জয়িনীর নিকট (মান চিত্রে দেখ) দারী পরাজিত ।

বিষয়	পদ্ধতি
(৩) মাঠাশান বর্ণা, আনন্দজ্যেবের সিংহাসনারোহণ (১৬৫৮) ।	(৩) আনন্দজ্যেব ও মুরাদের আগা প্রবেশ । উজ্জয়িনীর নিকট যুদ্ধে মুরাদ আহত ও পীড়িত । দারার জাহাঙ্গীরে পলায়ন । আনন্দজ্যেব কর্তৃক আগা দুর্গে সাজাহান বর্ণা । আনন্দজ্যেবের সিংহাসনারোহণ । ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ ।
(১) (২) (৩) লিপিত বিষয় সকলোতে বিবিত্ত হইবে । পাঠের শেষে এই বিষয়গুলি অনন্বয়ন করিয়াই পুনরাবলোচনা করিতে হইবে ।	

৭ । ভূগোল ।—নিম্নে ভূগোলের নোট বিখ্যাত একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল । কিন্তু এই আদর্শ দেখিয়া কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, সমস্ত দেশের বিবরণই বুঝি এইরূপে লিখিতে বা শিখাইতে হইবে । আবশ্যক বোধে নোট বড়, ছোট বা খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে । ভারতবর্ষ শিক্ষা দিতে হইলে, নদী, সাগর, পর্বত প্রভৃতি পৃথক পৃথক করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । বঙ্গদেশের ভূগোল শিক্ষায় কেবল ভাগীরথী এবং পূর্ববঙ্গ ও আগামের ভূগোল শিক্ষায় কেবল ব্রহ্মপুত্রের বিষয়ই একদিন শিক্ষা দিতে হইবে । তবে যত অনাবশ্যকীয় বিষয় হইবে বা যত নিম্নস্তরে দেশ হইবে ততই শিক্ষণীয় বিষয় কমাইতে হইবে । নিম্নে নোট নিম্নোক্তর কোন টেনিং স্কুলের ছাত্রের লেখা । নোটের শেষে শিক্ষকের সনাক্ষাটনা প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা পাঠে, 'নোট সনাক্ষাটনা' প্রণালীও শিক্ষা হইবে । টেইলার কৃত হাউ টু প্রিপেয়ার নোটস অব জ্যেগনস হইতে) :—

নব জিলাও।

সময় ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য—নব জিলাও যে উপনিবেশের পক্ষে উপযোগী, তাই দেখান।

উপকরণ—গোলক, ভূমণ্ডলের মানচিত্র, ব্লাক বোর্ড, চক।

বিষয়	পদ্ধতি
১। সূচন।—দেশে বাবসা বাণিজ্যের অসুবিধা দেখিয়া অনেক লোক বিশেষতঃ কৃষকাদি নব জিলাও উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের বাবসের পক্ষে নব জিলাও উপযোগী কিনা?	বালকেরা এ বিষয়ের কিছু জানে বলিয়া বিশ্বাস, স্তব্ধতাং একপ প্রশ্ন করা প্রাভাবিক।
২। উপনিবেশে যাহা থাকা আবশ্যিক :—	২। উপনিবেশের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে বালকেরা কি কি চায়, তাহার প্রশ্ন করিতে হইবে। তারপর উপনিবেশে কি কি আবশ্যিক জিন্সমা করিতে হইবে।
(১) জলবায়ু আবশ্যক; ইংলণ্ড হইতে শীতে অধিকতর উষ্ণ; শস্ত উৎপাদনের জন্ত যথেষ্ট বৃষ্টি; অনাবৃষ্টি নাই।	দেশ আবশ্যক হওয়া চাই ইত্যাদি। বালকগণের চিত্তকে বিষয়ের সূচী অনুসারে চালিত করিতে হইবে।
(২) খাদ্য—শস্ত, শাক সবজী, ফল। পশু—গরু, ঘে, শূকর ইত্যাদি, এবং মৎস্য।	ব্লাকবোর্ডে সংক্ষিপ্ত সার লিখিতে হইবে।
(৩) বাবসায়, ভূমি উর্বরা। কয়লা, লোহা, জল, কাঠ, উত্তম পণ্য, উত্তম রেল রাস্তা (সম্ভব পর হইলে) নগর ও বন্দর, যেখানে উৎকৃষ্ট জবা পাঠান যাইতে পারে ও যেখান হইতে অল্প জিনিস পাওয়া যাইতে পারে।	
৪। অধিবাসী—ইংরেজ বা বৃটনবাসী, অসভ্য জাতি নাই।	

বিষয়	পদ্ধতি
৩। স্থানের উপযোগিতা বিষয়ক ভৌগোলিক বিবরণ ।	
(১) আকারাদি—তিনটি দ্বীপ, উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ, কয়েকটি মিলিয়া গ্রাম বুটন দ্বীপের সমান ।	গ্রাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে ।
(২) অবস্থান ও ভাষা বঙ্গদেশ—ইংলণ্ডের বিপন্নীত দিকে, বিশ্ব রেখার নিকট । অশান্ত মহাসাগরের মধ্যে । ইংলণ্ড হইতে শীত কম, গ্রীষ্ম অধিক, বৃষ্টিও অধিক ।	ইংলণ্ড হইতে নবজিলাও পর্যন্ত জাহাজে যাইবার পথ দেখাইতে হইবে—মানচিত্রে ও গোলকে । শীত গ্রীষ্মাদির তারতম্য কেন, তাহা বালকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে ।
(৩) ভূভাগ, মাটিকা ও ফসল । উত্তর দ্বীপে অনেক পর্বত আছে । উর্বরা উপত্যকা আছে ; অনেক বরষাতা নদী উপত্যকা দিয়া গিয়াছে । দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে একটা পর্বত শ্রেণী নাম আলপস্ । পশ্চিমে ও পূর্বে অশান্ত উর্বরা সমভূমি ভূমি আছে । অনেক নদী আছে, পূর্বের নদীগুলি বড় ।	গ্রাকবোর্ডের মানচিত্রে পর্বতগুলি চিহ্নিত করিতে হইবে ।
কলকটে মাই, উত্তম সংস্কার অভাব নাই । উত্তরের পথগুলি ভাল নয়, দক্ষিণের ভাল ।	দেশের বর্ণনা করিতে হইবে । যাহা যাহা আবশ্যিক তাহা এই দেশে আছে, ইহা বালকগণকে অগ্র করিয়া আদায় করিতে হইবে ।
(৪) উৎপন্ন জাতি—বিলাতী শাক সবজী ও পশুাদি । মেঘ ও গম যথেষ্ট । যথেষ্ট কয়লা । ইহা ছাড়া লোহা, তামা ও সোণ ।	নব জিলাও হইতে এদেশে কি কি আস-দানী হয় ।
(৫) সহর ও বন্দর—ওয়েলিংটন, অকল্যান্ড, ডিউন ডিন, জাইটচার্চ ।	মানচিত্রে স্থান সমূহ চিহ্নিত করিতে হইবে ।
(৬) লোকসংখ্যা—১০জন উরোপবাসী ও ১জন মেওমারী এই অল্পপাত । মোটসংখ্যা ৫০০,০০০।	পুনরালোচনা ও পরীক্ষা ।

সমাপোচনা—ভূগোলেন নোট লিখিতে শিক্ষকেরা সাধারণতঃ যে মাপ ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক ভাষিত করিয়াছেন । এখনে গব্বান, চতুঃপাদ, আকার, ভূভাগ ভাষিত বর্ণনা করা যে শিক্ষকদের একটা বীণা নিয়ম আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, বেশ মনোরম ও কাজের কথা দিয়া পাঠনা আনত করা হইয়াছে । বিষয়ের দ্বিতীয় শীর্ষের কথাগুলি ভাল হয় নাই “কি কি অবস্থা দেখিয়া উপনিবেশের স্থান নির্দেশ করিতে হয়” এইরূপ লিখিয়াই ভাষিত হইত । যেখানে ভাষিত পাঠ, এক বেশ রাস্তা আছে, তাহা দেখিয়াই যে উপনিবেশের স্থান নির্দেশ করিতে হইবে, এ শিক্ষা ইংরাজ রাজককে দেওয়া সম্ভব মনে করি না । আর এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াও আমরা এখন উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাই নাই । তৃতীয় শীর্ষের অন্তর্গত বিষয়গুলির স্থান নির্দেশ হইয়াছে । বড়ানন ও বহুসংখ্য পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক কেবল ইংরাজদের নামের পক্ষে নবজিলাও কি পরিমাণ উপযোগী এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা আবশ্যক তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন । পদ্ধতির অন্তর্গত নোটগুলি দুই সংক্ষিপ্ত, তদাধো কতকগুলি বেশ হইয়াছে আর কতকগুলি যেখানে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, মনে হয় যে কেবল শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্যই শিক্ষক সেগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন । (শিক্ষকের দস্তখত ও তারিখ)

৮ । বিজ্ঞান ।—নিম্নে বিজ্ঞানের নোট লিখিবার দ্বারা প্রদত্ত হইল । পদার্থপরিচয়ের অনেক বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া, উক্ত বিষয়ক নোট প্রস্তুত করিতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে । (গারলিক ও ডেকসটারকৃত অবজেক্ট লেসনস হইতে) :—

বায়ুর চাপ ।

উপকরণ—একটা গেলাস, শক্ত কাগজ, বোতলেরমত মুখ বিশিষ্ট টিনের পাত্র (তার গায় আবার বাঁকুর মত চিদকরা) কাচের ফ্লাস্ক, খুব পাতলা কাগজ, তুলা, স্পিনিট ল্যাম্প, চীনে মাটির বোতল, একটু বেশী সিদ্ধ করা ডিমের খেঁচ খণ্ড (ডিমখণ্ড চীনে মাটির বোতল মুখের চেয়ে একটু বড়) :—

পরীক্ষার পদ্ধতি	পরীক্ষার ফলাফল	সিদ্ধান্ত
(১) (ক) একটা গেলাম জ্বলন্ত পুঁজ কর, তার উপর স্ফুটন কক্ষ খানি দিয়ে ঢাকিয়া দাও, সাবধানে গেলামটি উত্তীর্ণ কর।	কাগজ পাড়িয়া যাইবে না, জলও পাড়িবে না।	বায়ু উচ্চ দিকে চাপ প্রদান করে।
(গ) ছিদ্র মুক্ত টিনের পাট্টা জ্বলন্ত পুঁজ কর, পাট্টার মুখ কাগজ দিয়া টিপিয়া ধরিয়া উঠাও।	তলার ছিদ্র দিয়া জল পাড়িবে না।	
(২) টিনের বোতলের মুখ থেকে স্ফুটন সরানো।	জল পড়িতে আরম্ভ করবে।	বায়ু নীচের দিকে চাপ প্রদান করে।
(৩) (ক) পাট্টা কাগজ খানি ফান্ডের মুখে বাধিয়া গরম কর।	কাগজ উপর দিকে ঠোঁটয়া উঠিবে।	খালি ফুসকে চাপ দিলে, অভ্যন্তরের কতক বায়ু বাহির হইয়া যায়।
(গ) চানে মাটির বোতলের মুখে ডিম থুত রাখ।	ডিম বোতলের মধ্যে পড়িবে না।	
(ঘ) ডিম সরাইয়া রাখ ; কাগজ জ্বলিয়া বোতলের ভিতর ফেলিয়া দাও, আবার ডিম বোতলের মুখে রাখ।	এবারে বোতলে ডিম ঢুকিয়া পড়িবে।	বাহিরের বাতাস বোতলে প্রবেশ করিতে গিয়া, ডিম থুতকে বোতলের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছে।
(খ) আবার ঐ চানে মাটির বোতলে কাগজ জ্বলিয়া ফেলিয়া দাও, একটা খালককে এগন বোতলের উপর হাত রাখিতে বল।	খালকের খোদ হইবে যেন তাহার হাত বোতলের ভিতর ঢুকিতে চাহিতেছে।	বায়ু নীচের দিকে চাপ প্রদান করে।
(৪) আবার (৩) এর (গ) পরীক্ষা কর, বোতলটি এবার কাত করিয়া রাখ।	ডিম থুত এবারেও বোতলের ভিতর প্রবেশ করিবে।	বায়ু পানেও চাপ প্রদান করে।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ	পরীক্ষণের মূল	মিচ্ছাস্ত
(৫) পূর্বে যে জলের চাপের পরীক্ষা করিয়াছি তাহার উল্লেখ করা	বায়ু ও জল দুইই উচ্চে, নিম্নে ও পার্শ্বে চাপ প্রদান করে।	জলের মত বায়ুও সকল দিকে চাপ প্রদান করে।

ব্লাক্ বোর্ডে

বায়ু উচ্চ দিকে চাপ প্রদান করে

,, নিম্ন দিকে ,, ,,

,, পার্শ্বে ,, ,,

যেমন জল করিয়া থাকে

বায়ু (জলের মত) সকল দিকেই চাপ প্রদান করে।

৯। শিক্ষক ছাত্রের কথোপকথন।—কথোপকথনচ্ছলে কখন কোন বিষয়ের পদ্ধতি বিধিতে হঠলে নিম্নের ঐকালী অবগম্বন করিতে হইবে। (মিসিস্ ব্রাউন্স্ কুণ্ড কিত্তার গার্টেন টি.চিং টন ইতিয়া হইতে) :—

প্রাথমিক শ্রেণী।

বিষয়—মাকড়সা।

সময়—৩০ মিনিট।

উপকরণ—ব্লাক বোর্ড, মাকড়সা ও তাহার জালের চিত্র।

সম্ভবপর হইলে একটা জীবন্ত মাকড়সা।

শিক্ষক—মহম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণ যে কেমন করিয়া শত্রুদের হাত থেকে পলাইয়া গেছেন, তাহা সেদিন তোলাদিগকে বলিয়াছি। তাহার কোথায় গিয়া পুকাইয়া ছিলেন?

জা—আমরা একটা গছের লুকাইয়া জিনে ?

শি—শাকগণ মোহে গছেরের চিত্র অসুস্থমান করিগনা কেন ?

জা—শাকরা দেখিল যে গছেরের মুণেই একটা মাকড়সা জাল পাতিয়া আছে, আর নিকটেই একট ঘুণু—তার বাসায় বসিয়া আছে ; এই সকল দেখিয়া তাহারা মনে করিল এইখানে নিশ্চয়ই লোক নাই ।

শি—তাছাড়া, আজ তোমাদিগকে এই মাকড়সার কথাই বলি । এই মাকড়সাটা দেখ — বোড়ে মাকড়সার ছবিও দেখ, মাকড়সার কি কি দেখিতেছ বল ।



৯৪ চিত্র ।—মাকড়সার জাল ।

জা—এটা একটা ছোট জালী ; ইহার শরীরটার দুই ভাগ, মাথা আর বড় । এক এক দিকে ৪ খান করিয়া, ৮ খান পা আছে । দুইটা হুল আছে, আর বড় বড় দুইটা চক্ষু আছে ।

শি—হী—মনেই ঠিক হইয়াছে কেবল ৪ পা ও চোখের কথা ছাড়া । যে দুটাকে হুল মনে করিয়াছ, সে গুলি খুব শক্ত ছোট ছোট নখের মত, আর যেটাকে একটা চোখ মনে করিয়াছ, তাহা একটা চোখ নয়, ৬টা কি ৮টা । যদি এক দিকেই ৬টা চোখ থাকে, তবে দুই দিকে কটা ?

ডা—দুই দিকে তবে ১২টা চোখ, কি আশ্চর্য্য !

শি—আবার কোন কোন মাকড়সার ১৬টা চোখও থাকে । এত শুধি পা ও চোখ
দিয়া মাকড়সা কি করে ?—মাকড়সা কি খায় জান ?

ডা—মাকড়সা কীট পতঙ্গ খায় ।

শি—হাঁ । কেমন করে কীট পতঙ্গ ধরে ?

ডা—জাল দিয়া ধরে ।

শি—মাকড়সা কেমন করে জাল বোনে জান ? জান না ? তবে শোন । এটা গুল
একটা চমৎকার কথা । আচ্ছা গোপাল, মাকড়সার মড়কা আসায় দেখিয়ে দাওত ।
এই মড়ের নীচে চারটা ছোট ছোট নল আছে, আর প্রত্যেক নলের নীচে আর
১০০০ ছোট ছোট ডিম আছে । মাকড়সা, আসামের মূণের দাখার মত
এক বকম রংের দ্বারা সূতা তৈয়ার করিয়া এই সকল ডিম দিয়া বাহির করে ।
সেই সূতা বাতাস লাগিবা গাল শুকাইয়া শক্ত হয় । মাকড়সার পিছনের পা
ছথানির অগ্রভাগ চিবাণির মত । এই দুই পা দিয়া সেই সব সূতা শুধি একত
করিয়া ও পাকাইয়া মোটা সূতা তৈয়ারী করে । সেই সূতা দিয়া জাল বোনে ।
ত্রেমরাও ত মাকড়সার জাল দেখেছ ? সূতাশুধি বেশ মূল্য না মোটা ?

ডা—পূব সন্ধ্যা, ভাল রেশমের মত ।

শি—সন্ধ্যা বটে কিন্তু সেই এক গাছির মধ্যে আবার কত গাছি আরও সব সূতা আছে ।
আচ্ছা সেই একটা নলের ভিতর কতগুলি ডিম আছে ?

ডা—এক হাজার ডিম ।

শি—কয়টা নল আছে বলত ?

ডা—৪টা নল ।

শি—আচ্ছা যদি প্রত্যেক ডিম দিয়াই এক এক গাছ সূতা বাহির হয়, তবে সকল সময়ে
কত গাছ সূতা হয় ?

ডা—চার হাজার সূতা । কি ভয়ানক ।

শি—তাই এখন দেখ জালের এক এক গাছ সূতা, ৪০০০ গাছ সন্ধ্যা সূতা পাকাইয়া
প্রস্তুত করিয়াছে । কেমন কারিকর দেখ । জালের জালের চেয়েও কত বেশী
কারিকরী । বোর্ডে চিত্র আছে, তাহা দেখিয়া মাকড়সার জালটার একটা
বর্ণনা কর ।

কা।—গাঢ়াণ চাকান মজাকার মত, মান থান থেকে কতকগুলি সূতা আনের
বাছিরের দিকে গিয়াছে, মেথল আনান অথ সূতার সঙ্গে নানা স্থানে বীধা, এই মজাকা
খানের উপর দিয়াই সূতাওয়া সূতাছেয়া সূতা গাঢ়িয়া গিয়াছে ।

শি। মগন ফাড়া ডাড়া মাহতে মাহতে এই জালে বাছিয়া পড়ে, তখন মাকড়সা
কি করে ?

কা। মাকড়সা দৌড়িয়া গিয়া পোকাটাকে ধরে ।

শি।—এখন বুঝিতে পারিতেছি যে মাকড়সার ডলানি পা, আর ১২টা চক্ষুর দরকার
কি ? চার দিকে চোপ রাখিতে হয়, পোকা ফাড়া পড়িলেই দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে হয়,
তা না হইলে তাহারা পলাইয়া যাইবে বা জাল টিড়িয়া উড়িয়া যাইবে ইত্যাদি ।

১০। সঁজিফণ্ড কথোপকথন ।—এই কথোপকথনের
পদ্ধতি উল্লিখিত না লিখিয়া সংক্ষেপেও নিম্নলিখিত রূপে লেখা যাইতে
পারে । (মিসিস্ মনটিয়ার কৃত নোটস অব লেসনস্ ফর ইনফ্যান্টস
হর্টনে) :—

বিষয়—বিড়াল ।

শ্রাবী—(৫৬ বৎসরের) শিশু ।

উপকরণ—একটা পোষা বিড়াল ।

১। সাধারণ বর্ণনা—বালকেরা বিড়ালের হাত, পুড়, মাথা প্রভৃতি দেখাইবে ও
কোমটা কেমন ভাষা বলিবে । মাথাটা গোল, চোপ দুটি বড়, শরীরটা লম্বা, গায়ের লোম
বেশ নরম ও ঘন । বিড়ালের চারখানা পা । ভোমারের কয়খানা ? বিড়ালের পায়ের
নীচে কি আছে ? (থাবা) আছে। এখন এই থাবা দেখ । থাবাতে কি কি দেখিতে
পাচ্ছে ? (ছোট ছোট কটা রঙের নরম গদি) এই প্রায়ই বিড়াল চলিয়া গেলে শব্দ হয় না,
যদি চুকিলে টের পাওয়া যায় না ? সূতা পায়ের দিয়া হাঁটলে টের পাওয়া যায়
না ? আছে। আবার বিড়ালের নথ দেখ কেমন ধারাল ? এই নথ দিয়া
কি করে ? (আঁচড়ায়) আছে। ভোমার গায়ে বিড়ালের পা লাগিলেই কি আঁচড়
লাগে ? (না) কেম লাগেনা ? জাননা তবে বলি শুন । বিড়াল নথগুলি তার

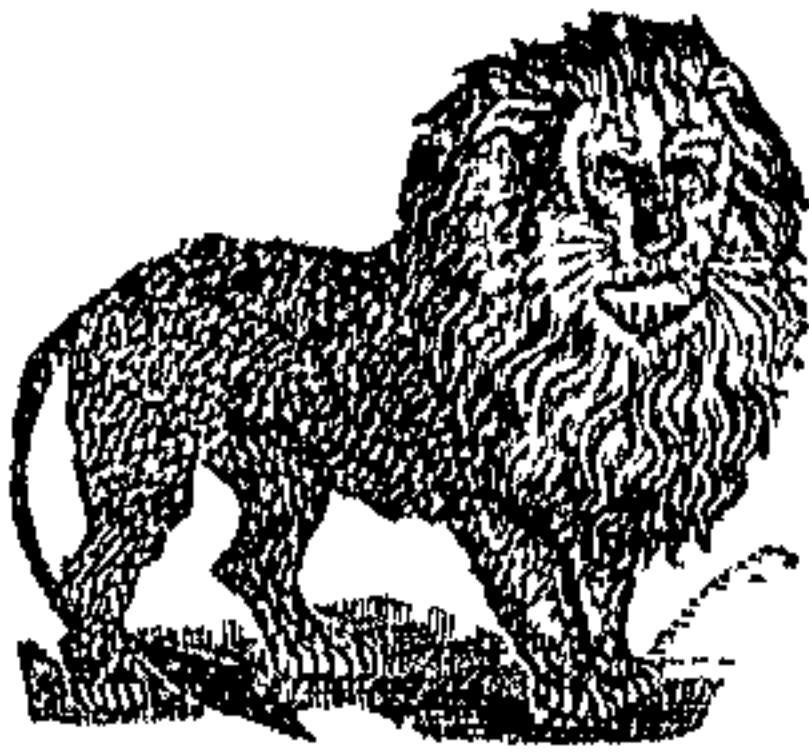
পায়ের গদর নীচে লুকাইয়া বাথে যখন হচ্ছ। হয় তখন বাহির করে । যদি বিড়ালকে উৎপাত কর, কি মার তাহা হইলে সে তোমাকে খাঁড়াতার লম্বা নখগুলি বাহির করিলে ।

২। বিড়ালের ঢলাফেরা ও খাদ্যাখাদ্যঃ—খাবার না মাগিলেও বিড়াল তার নখগুলি বাহির করিয়া থাকে । কখন বস্বে খায় ? (কোন জিনিস খরবার জন্য) হাঁ তার খাবার জিনিস খরবার জন্য । আচ্ছা বিড়াল কি খায় ? কোন সময় বিড়াল ভোমার কাছে না ডাক্তেই আসে ? (খাবার সময়) ভোমাদের কান কান বাড়ীতে বিড়াল আছে ? আচ্ছা লোকের বিড়াল রাখে কেন ? (হাঁর খরবার জন্য) আচ্ছা বিড়াল হাঁর খরবার খেলে ভোমার সা থুগী হন কেন ? (হাঁর আমানের খাবার জিনিস নিয়ে যায়) খাবার ভোমার সা কখন কখন বিড়ালের উপর রাগ করেন কেন ? কখন রাগ করেন ? (যখন আমাদের খালা থেকে মাছ চুরি করে দেয় (শিক্ষক এখানে বিড়ালের পাখী ঘরে খাওয়ার গল্প করিতে পারেন ; খাচা ভেঙ্গে যে পোখা পাখীও ধরিয়া খায় একপ একটা ঘটনা বিবৃত করিলেন) আচ্ছা তাহাইলে বিড়ালকে আমরা কি করি ? কিছু সব সময়ই কি তাকে মারা উচিত ? বিড়াল যখন রাগ করে, তখন তাহার লেজটা মেখেছ ? বিড়াল কেসন করে ডাকে ? (ছই বকসে ডাকে, মিউ মিউ করে আর পরব পরব করে) হাঁ যখন তার মন থুগী হয় তখন পরব পরব করে । মিউ মিউ করে কখন ? (যখন সে মার খায় বা কোন জিনিস চায়) বিড়ালের বাচ্চা মেখেছ ? তারা কি খায় ? (মার ছদ্ম) বিড়ালী বাচ্চাকে ছদ্ম দেয়, আর কি করে ? (আর গা পুঁছে দেয়) কি দিয়ে ? (তার জিভ দিয়ে) বিড়ালের জিভ বড় থম্ব থমে । ভোমার কেসন, হাত দিয়ে মেপত ? (বেশ নরম) । বিড়াল তার বাচ্চাগুলি নিয়ে কেসন খেলা করে মেখেছ ? সে সময় বিড়ালীকে উৎপাত করিতে নাই ।

৩। সংক্ষিপ্তসার—বালকগণ সম্মুখে আবৃত্তি করিলে :—(১) বিড়ালের মাথা গোল । (২) বিড়ালের চোখ দুটা বড় বড় । (৩) বিড়ালের গায় লোম বেশ নরম আর গরম । (৪) বিড়াল থুগী খানিলে পরব পরব করে, আর যখন কিছু চায় তখন মিউ মিউ করে ।

৪। তারপর (সুবিধা হইলে বালকগণকে সিংহ ও ন্যায়ের ছবি দেখাইয়া) এই বিড়াল কাদের মাগী পিগী জান ? (না) বিড়াল এই বাঘের মাগী, আর সিংহের পিগী ।

মন্তব্য ।—৫.৬ বৎসরের বালকগণের পক্ষে ইহাঃ যথেষ্ট । বিড়ালের অস্বাভাবিক বিবরণ উপর শ্রোণিতে শিক্ষা করিলে । মোট জিপিবার সময় যেন বালকগণের যত্নের দিকে দৃষ্টি থাকে ।



৯৫ চিত্র।—সিংহ।



৯৬ চিত্র।—বাঘ।

যে দিন বিশেষ কোন বিষয় লেখাইয়া দিতে হইবে সেই দিন সেই বিষয়ই নোটের খাতায় লিখিয়া আনিতে হইবে, যথা রাজগণের বংশাবলীর তালিকা, আকবরের বাজত-চিহ্নিত-গানচিত্র, আবৃত্তির জন্য কোন নুতন কবিতা ইত্যাদি। যে দিন সাপ্তাহিক বা অন্যবিধ পরীক্ষা, সেইদিন সেই পরীক্ষার প্রশ্নই নোটের খাতায় লিখিয়া আনিতে হইবে। নোটের খাতা যেন শিক্ষকের দৈনিক কার্যের বোজ নাগড়া।

২। পাঠনা-সমালোচনা পদ্ধতি।

পূর্বে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা শিক্ষকের কার্য পরিচালনার্থ একটা সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিলাম। ইনস্পেক্টর প্রভৃতি পরিদর্শকগণ এই সকল বিষয় দৃষ্টেই শিক্ষকের উপযুক্ততা বিচার করিয়া থাকেন। নর্মাল ও ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রেরাও এই পদ্ধতি অনুসারে পরস্পরের পাঠনা সমালোচনা করিয়া থাকে। যখন একজন পাঠদানে নিযুক্ত হয় তখন অন্যান্য সকল ছাত্র তাহার প্রণালীর দোষগুণ (এই প্রণালীক্রমে) সংক্ষিপ্ত নোটের আকারে লিখিয়া রাখে। পরে শিক্ষার্থী শিশুগণ চলিয়া গেলে নিজ নিজ নোট দেখিয়া শিক্ষকের নির্দেশক্রমে, দোষগুণের বিচার করিয়া থাকে।

সমালোচনা বলিলে আমরা সাধারণতঃ দোষ প্রদর্শনই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সে ভুল বিশ্বাস। সমালোচনায় দোষসূচক ছুইট ভাঙ্গা করিতে হইবে। অস্বাভিহা অপেক্ষা স্বাভাভিহা ভাগই অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমালোচনায় দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে, সেই দোষের হেতু ও সেই দোষ সংশোধনের উপায়ও সম্মে সম্মে নির্দেশ করিতে হইবে।

পরীক্ষকগণ, শিক্ষানবীশ শিক্ষককে শিক্ষাদানের পূর্বক অধ্যাপনার বিষয়, শিক্ষার্থী ছাত্রগণের বয়স, শ্রেণী বা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানের সময় বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন। শিক্ষককে নির্দিষ্ট বিধানে বৃন্দ পাঠনার নোট প্রস্তুত করিয়া বা পূর্বকৃত নোটের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়সম্বন্ধে শ্রেণীস্থ বালকগণের বয়স ও পূর্বাভাস বিবেচনায় নির্দিষ্ট বিধানে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণা ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইল কি না ও বালকগণ সেই শিক্ষায় লাভবান হইয়া আনন্দানুভব করিল কিনা, পরিদর্শক, পরীক্ষক ও সমালোচকগণ ইহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষকগণকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

১। শিক্ষক বিষয়ক—

* (ক) স্বর—উচ্চ, মৃদু, কৰ্কশ, আতিমধুর, দীর্ঘ, দ্রুত।

শিক্ষকের স্বরের বিষয়ে এইগুলি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। সমালোচনা কালে পর ক্রম তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। আতিমধুর স্বরই যে সর্বাপেক্ষা ভাল তাহা বলা বাহুল্য। মানুষের স্বাভাবিক স্বর কৰ্কশ নয়। যাহারা সদা কুচিহ্নায়িত হইয়া নিরানন্দ থাকে, তাহাদের স্বরই কৰ্কশ হইয়া থাকে। অকুচিহ্ন বাস্তব স্বর মধুর। আমরা যে আরো সাধারণতঃ কণা বলি, তাহাই শিক্ষাদানের পক্ষে উত্তম স্বর।

(খ) ভাষা অনর্গল (বাধ বাধ না হওয়া) বিশুদ্ধ (বাক্যগত দোষ না থাকে) বিশদ (বুদ্ধিতে কষ্ট না হওয়া) স্থূলষ্ট (উচ্চারণে অড়তা না থাকে) সৌন্দর্য উপযোগী (কঠিন ভাষা না হওয়া)।

সমালোচকগণ অশুদ্ধ ভাষা ও অশুদ্ধ উচ্চারণের নোট রাখিবেন। যথা 'মেঘের' স্থানে 'মাগ'—উচ্চারণের দোষ; 'তাহার কাছে শুনিয়াছি' স্থানে 'তিনি'র কাছে শুনিয়াছি'—অশুদ্ধ ভাষা।

১. (গ) ভাব—কঠোর, পীড়িত, উৎসাহবর্জক, নৈরাশ্র প্রণোদক ।

পীড়িত ও উৎসাহবর্জক ভাবেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় । কটকট দৃষ্টি ও মেজমকালন, কঠোর ভাবের পরিচায়ক । 'তোমার কিছু হবে না, তুমি খাম কাটি গিয়ে'—নৈরাশ্র প্রণোদক ।

ক (ঘ) অবস্থান—দণ্ডায়মান স্থান হইতে সমস্ত ছাত্র শাসন যোগ্য কি না । ভঙ্গী, গতিবিধি, মুদ্রাদোষ, পরিচ্ছদ ।

যে ভেবেকে প্রশংসা করা হয়, কোন কোন শিক্ষকের অভ্যাস, তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়ান । এ সময়ে তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি থাকে না । কথা বলার সময় একটু হাত মুখের ভঙ্গি আবশ্যক । ইহাতে ভাব প্রকাশের অনেক সহায়তা করে । চিত্রপুস্তকিকার স্থায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিও ভাব নয় বা ভঙ্গির মত ইচ্ছাকৃত সঞ্চরণ করাও ভাব নয় । জিভ-বাহির করা, চোক মিটমিট করা, গোপ দাড়ি কামড়ান, অঙ্গুলি মটকান, গায়ের ময়লা তোলা, পা নাচান, আস্তিন টানা প্রভৃতি মুদ্রাদোষ । আবার কেহ কেহ এক কথা বড় বেশী ব্যবহার করেন যথা:—“আমি নাকি একবার নাকি যখন নাকি কাশী গেলেম নাকি সেখানে নাকি বড় গরম নাকি তাই নাকি আমার নাকি কলেরা হ'ল নাকি” এও মুদ্রাদোষ । পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বরূপসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক । সাধারণ পোষাক মলিন না হইলেই স্বরূপসম্পন্ন । অবস্থার অধিক ব্যবস্থা, কুরূপের পরিচায়ক । যাহার সোণার বোতাম ব্যবহার করিবার মত অবস্থা, তাহার পক্ষে সোণার বোতাম ব্যবহার দুর্জনীয় নহে । কিন্তু পরিষের পক্ষে সোণার গিলাটি করা বোতাম ব্যবহার করা কুরূপের পরিচায়ক ।

ক (ঙ) পূর্বাভাস—অধ্যাপনায় শিক্ষকের পূর্বাভাসের পরিচয় পাওয়া যায় কি না ?

যে শিক্ষক বাড়ী হইতে পাঠনার নোট লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া আসেন, তাহার প্রশংসা করিতে, কি পড়াইতে বাধ বাধ হয় না, আর তাহার পাঠনার চিত্তারও পরিচয় পাওয়া যায় ।

২ । শ্রেণীবিময়ক—

(চ) স্থাপনা—বালকগণ উপযুক্ত স্থানে শৃঙ্খলাগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-বেশে ও সুন্দররূপে উপবেশন করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া আছে কি না ?

ইচ্ছাকৃত কেহ বসিয়া আছে বা কেহ দাঁড়াইয়া আছে, এক বেঞ্চে যেখানেই বসিয়া অনেক বালক বসিয়াছে, অন্য বেঞ্চ খালি, কেহ বেঞ্চে পা তুলিয়া, কেহ অপরের গায়ে

হেলিয়া বসিয়াছে ; কেহ জিভখী হইয়া দাঁড়ইয়াছে—ইত্যাদি নিশ্চয় ভাব সম্বন্ধে শিক্ষককে সাবধান হইতে হইবে । চাপরে বা জামায় গা ঢাকিয়া মনান মূরে মূরে বসিয়া বা দাঁড়াইলে বেশ স্বন্দর দেখায় ।

(ছ) জবাবদি—বালকগণের পুস্তক, খাতা, পেন, পেনসিল প্রভৃতি আবশ্যকীয় জবাবদি প্রস্তুত আছে কি না ; আর সে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না ?

কোন জিনিষ না থাকিলেই নিজ প্রেরণী হইতে অথ প্রেরণী হইতে হয় । ইহাতে কেবল যে কানের বিশৃঙ্খলা হয় তাহা নহে, বালকগণেরও উদারীনতা রুজি পায় । সুতরাং বালকেরা যাহাতে আবশ্যকীয় জিনিষ আনিতে না ভুলে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । খাতা কিম্বা পুস্তকের মগাট শু ধোও যেন অপরিষ্কার না থাকে ।

(জ) শাসন—বালকগণ সমস্ত ক্রটি বিষয়ে শিক্ষক কর্তৃক শাসিত হইয়াছে কি না ?

(চ) ও (ছ) লিখিত ক্রটি ছাড়া, ছষ্টামী, অস্থমনস্কতা প্রভৃতি আরও অনেক ক্রটি দেখিতে পাওয়া যায় । ক্রটি দেখিলেই শাসন করিতে হইবে । চক্ষু চালনা দ্বারা যে শাসন তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম । একবার ছষ্ট ছেগেটের দিকে কটমট করিয়া চাহিলেই সে সাবধান হইবে । পাঠনার সময় অস্থরূপ শাসন করিতে হইলে কার্যের বাধাত হইবে, বালকগণের মনোযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে ।

(ঝ) শিক্ষা—শিক্ষায় বালকগণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছে কি না ?

বালকগণের মুখ দেখিয়া ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । পাঠে প্রবোধ না করিলে বালকেরা অনন্যযোগিতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে ।

* (ঞ). ব্যবহার—বালকগণের বিনয়, ভজ্ঞতা, আত্ম-প্রতিপালন, মনোযোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিবে ।

নূতন শিক্ষক দেখিলে ছষ্ট বালকেরা কিছু উৎপাত করিতে চেষ্টা করে । কিন্তু শিক্ষক যদি প্রেরণীতে উপস্থিত হওয়া মাত্রই পড়াইতে আরম্ভ করেন, আর সমস্ত কাজকে কার্যে নিযুক্ত রাখেন, তবে গোলমালের বা অনন্যযোগের সম্ভাবনা কম । শিক্ষক প্রেরণীতে প্রবেশ করিলে, বালকেরা দাঁড়ায় কি না, শিক্ষকের আজ্ঞা মাত্র পুস্তক, গ্রেট, খাতা, পেনসিল প্রভৃতি লয় কি না, ইত্যাদি বিষয়ও সমালোচকগণ দেখিয়া থাকেন ।

(৫) আদীন ভাবে—বালকগণ আদীন ও নির্ভীক ভাবে এবং স্বল্পমূল্যে ক্রমে আদীন ভাবে উত্তর দিচ্ছে কি না ?

আদীন ভাবে অর্থাৎ 'অল্প বালকের সাহায্য লেতে চেয়ে' করিয়াছে কি না । অনেক সময় কিছু কিছু করিয়া এক বালক অল্প বালককে সাহায্য করে । দুই হইতে শিশুক শুনিতে পান না । আর যে সকল বিষয়ে একটা কথা বলিয়া দিচ্ছে তাহার উত্তর দিক করিতে পারে যায়, সেখানে অল্পকে সাহায্য করা সহজ । শিশুক পূর্ব কড়া শাসনে এই দুর্নীতি পরিভাগ করাইবেন । নির্ভীক ভাবে অর্থাৎ আদীন উত্তর দিতে হইলে তেমন সাহস থাকে না । স্বল্পমূল্যে—মনে মনেই থাকিলে কথাকথি পরিভাগে বাহির হয় না ।

(১) পূর্বজ্ঞান—বিষয় সম্বন্ধে বালকগণের পূর্বজ্ঞান ছিল কি না ?

যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা জামে না, এতদপক্ষে এম প্রতিষ্ঠা বুঝিবে না । বালক হয়ত যুগের বিষয়ই জানে না, শিশুক তাহাকে মনোবর্ণ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন । অতরাং পূর্বজ্ঞানের পরিচয় আবশ্যক । অতঃপর শিশুকেরা অথমেই ২৪ টা প্রশ্ন করিয়া বালকগণের পূর্বজ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণ করেন ।

* (৬) বুদ্ধি চাণনা—বালকগণ শ্রবণশক্তি, তুলনাশক্তি, সিদ্ধান্তবৃত্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি মানসিকবৃত্তির পরিচালনা করিবার সুযোগ পাঠিয়াছিল কি না ?

শ্রবণশক্তি—প্রশ্ন করিয়া একটু সময় না দিলে, বালকগণ শ্রবণশক্তির ব্যবহার করিতে পারে না । তুমি-তুমি-তুমি করিয়া গেলে শ্রবণ করিবার অবসর পায় না ।

তুলনা শক্তি—বিড়াল ও কুকুর বা তাহাদের চিত্র প্রদর্শন করাইয়া জিজ্ঞাসা কর, বিড়াল-যেমন যুগের মধ্যে কুকুরের যুগের তুলনা কর । বালকগণ নিজে দেখিয়া বুঝিবে 'বিড়ালের মুখ গোলা কুকুরের লম্বা ইত্যাদি ; ভারতবর্ষের মানচিত্র ও ইংলণ্ডের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও, দুইটাই জিভের দত, তারপর জিজ্ঞাসা কর এই দুই জিভের পার্থক্য কি, বালকেরা নিজে তুলনা করিয়া উত্তর দিলে 'ভারতবর্ষের জিভের ভূমি উপরে ইংলণ্ডের ভূমি নীচে' । বালকগণের মিকট এইরূপে আদায় করিতে হইবে ।

সিদ্ধান্ত বৃত্তি—আমি যে লোহা আনিয়াছি ইহা আশ্রমে পোড়াইলে লাল হইল, তুমি যে 'লোহা আনিয়াছ তাহাও লাল হইল, বহু গেলী আনিয়াছে তাহাও তরুণ হইবে, এখন কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি ? বালক উত্তর দিলে, সব লোহা পোড়াইলেই লাল হয় ।

উদ্ভাবনীশক্তি—আশ্রমের ভাগে খটীর জন্য বাষ্প হইয়া যাঁতেছে । এই বাষ্পই মেন হইতেছে । প্রতিদিন এরূপ অনেক মেন হইতেছে । সমুদ্র ও নদা থেকেও এইরূপ বাষ্প উঠিয়া থাকে—কোন ভাগে এইরূপ বাষ্প হয় ? বাষ্পকেই চিত্রা করিয়া বলিতে পারিবে, ‘সূর্যের ভাগে’ । অর্থাৎ ও জাগ্রতিতে এই শক্তির চালাই হয় ।

কল্পনাশক্তি—পাহাড়, পর্বত, নদী, ছাট, বাজার, নগর প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারিলেও এই শক্তির অনুশীলন হয় । শিক্ষক কর্তৃক অসংখ্য বিষয়াদির বর্ণনা শ্রবণ করিলেও বাষ্পকেই এই শক্তির অনুশীলন হইয়া থাকে ।

* (চ) নবজ্ঞান—বাঁচানোর কি পরিমাণ নবজ্ঞান দাঁড় করিয়া ?

পূর্বের সাহা জানিত তাহারই পুনরাবলোচনা করা হইল, না তাহার কিছু নূতন শিখিল । যদি নূতন না শিখিয়া থাকে, তবে কেবল বৃথা সময় নষ্ট হইল । তাহোক দিন বাঁচকেরা যাঁহাতে কিছু নূতন বিষয় শিখিয়া যাঁহাতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

(গ) ত্রুটি—কোন বাঁচকের চক্ষুর জ্যোতি বা শ্রবণ শক্তির হ্রাস না কি উচ্চারণের জড়তা কি সাধারণ বুদ্ধি বৃত্তির শ্রমতা লক্ষ্য করা হইয়াছে কিনা ও তাহার কি প্রতিবিধান করা হইয়াছে ।

যে বাঁচকের চক্ষুর জ্যোতির হ্রাসতা আছে তাহাকে বোর্ডের নিকটে ; যাহার শ্রবণ শক্তির হ্রাসতা আছে, তাহাকে শিক্ষকের নিকট বসাইতে হইবে । উচ্চারণের জড়তা থাকিলে, তাহার দ্বারা কঠিন শব্দের অংশগুলি পৃথক করিয়া উচ্চারণ করাইয়া দিবে । বুদ্ধির শ্রমতা থাকিলে, তাহার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিতে হইবে ।

৩ । অধ্যাপনা বিষয়ক—

(ভ) পরিমাণ—নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণের অধিক কি অল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ।

কোন কোন শিক্ষক, পরীক্ষক বা পরিদর্শকের নিকট নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া, বাস্তবগণকে পরিমাণের অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া থাকেন । ইহাতে পরিদর্শক সন্দেহিসাবী মনে করেন, পরীক্ষক কম মাত্রা দেন ।

(গ) নূতন শিক্ষা—পূর্ব শিক্ষার সহিত যোগ করিয়া নূতন শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে কিনা ?

কোন কোন সময়ে পুনর্দর্শনের শিক্ষা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আলোচনা করিয়া বিষয় আরও করিতে হয়। তাৎক্ষণিক শিক্ষায় এই জন্য প্রয়োজন করা আবশ্যিক। অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট ও হঠাৎ অবশ্যকতা ঘটে। সাক্ষরতার কোন প্রকার এক অংশ পড়া হইয়াছে অবশিষ্টাংশ পড়াচনার সময় পুনর্দর্শনের পাঠের মূল বিষয়ের পুনরাবলোচনা করা প্রয়োজন।

(৮) উপকরণ—শিক্ষাদানের উপকরণের উত্তম ও উপযুক্ত হইয়াছে কিনা ?

শিক্ষাদানের বিষয়ে বালকের মন আকর্ষণ করাই উপকরণবিকার উদ্দেশ্য। অল্প কথায় মনোমগ্নতা উপকরণের বিন্যাস হওয়া আবশ্যিক। এ বিষয়ে নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত পাঠনার নোট পরিলক্ষ্যে লক্ষিত হইয়াছে।

(৯) বিভাগ—বিষয়টি সুস্বাভাবিক বিভাগ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে কিনা।

পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যামিতি শিক্ষায় শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাস ভূগোলেও অনেক সময় শৃঙ্খলার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(১০) প্রণালী—যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে কিনা।

বালকেরা যদি মনোযোগের সহিত শুনিয়া থাকে, তবে ফলপ্রসূ হইবারই সম্ভাবনা। তারপর শিক্ষকের প্রণীত উদ্দেশ্যে বালক গাছা বলে, তাহা শুনিতেই নুতনে পারা যায়, বালক কিছু শিখিয়াছে কিনা ?

* (১১) উপকরণ—শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা প্রচুর কিনা ও তাহার সং ব্যবহার হইয়াছে কিনা ?

চক্ষুর সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করা যায় তাহাই যখন সর্বাপেক্ষা উত্তম, তখন চক্ষুর সাহায্যার্থে যত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় ততই ভাল। আবার সেগুলির সং ব্যবহার আবশ্যিক। সেখানে মানচিত্র খুলাইয়া রাখিলে বটে, কিন্তু কাগজকালে বালকের নিকট কেবল ভূগোলীর পাঠ মুদ্রিত লইয়াই পড়া শেষ করিলে, তাহা হইলে মানচিত্র ব্যবহার হইল কেন ?

* (১২) ব্ল্যাকবোর্ড—ব্ল্যাক বোর্ডের উপযুক্তরূপে ব্যবহার হইয়াছে কিনা, অক্ষিত চিত্রগুলি উত্তম ও উপযুক্ত হইয়াছে কিনা।

প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষায় যথেষ্টরূপে ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার করিতে হইবে। কঠিন শব্দ, সংশ্লিষ্ট বিষয়, মানচিত্র প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিবে। চিত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ

দেখাইবে। আর চিত্রাদির রেখা একটু মোটা করিয়া দিবে। দূরের বালকগণের দেখিবার অসুবিধা হইবে না।

* (ব) গন্ধতি—পরিচিত বস্তুর সাহায্যে অপরিচিত, জ্ঞান পদার্থের সাহায্যে অজ্ঞাত, প্রত্যক্ষ বিষয়ের সাহায্যে অনুমান, বর্তমানের সাহায্যে ভূত ভবিষ্যৎ শিক্ষা দিবার যে প্রণালী তাহা অবলম্বিত হইয়াছে কিনা।

চিল বা বাজের সাহায্যে, অপরিচিত অমল পানীর নিয়ম বুঝাইয়া দিতে পারা যায়। পক্ষীর উচ্চতা, নদীর দৈর্ঘ্য প্রভৃতি কেবল সংখ্যার দ্বারা উল্লেখ করিলে, সেই উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য বিষয়ে বালকগণের কোন জ্ঞান জন্মে না। এইজন্য নিকটস্থ কোন বৃক্ষের উচ্চতা মাপের দ্বারা ঠিক করিয়া রাখা আবশ্যক। কোন স্থানের উচ্চতা বুঝাইতে হইলে, উক্ত বৃক্ষের সহিত তুলনায় বুঝাইয়া দিলে বালকগণের একটি ধারণা জন্মিতে পারে। সেইরূপ দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও কোন পরিচিত রাস্তার পরিমাণ জানা থাকিলে, তাহার সাহায্যে নদী প্রভৃতির দৈর্ঘ্য বিষয়ক জ্ঞান দান করা সহজ হইতে পারে। একটা বাতি ও বলের সাহায্যে দিবা রাত্রির কারণ বুঝাইয়া দিলে পৃথিবী ও সূর্যের সম্পর্কে ক্রিয়াকলাপ দিবারাত্রির সংঘটন হয়, তাহা অনুমান করা সহজ হইতে পারে। কেহ কেহ ইতিহাস শিক্ষায়, প্রথমে বর্তমান কালের বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, তাহার সহিত অতীত ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৪। প্রাপ্ত বিষয়ক—

* (ভ) সরলতা—প্রশ্নগুলি সরল, শুদ্ধ ও উদ্দেশ্য প্রতীপাদক হইয়াছে কিনা।

অতি অল্প কথায়, সহজ ভাষায়, প্রশ্ন রচনা করিতে হইবে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার যেন কোন উদ্দেশ্য থাকে, আর প্রশ্নের রচনা এমনকি কৌশল সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যে, প্রশ্নের দ্বারা যেন সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়; অর্থাৎ বালকের নিকট হইতে যাহা আদায় করিলে মনে করিয়াছে, ঠিক তাহাই যেন আদায় হয়। সে প্রশ্নের যেন, সে উত্তর ছাড়া অন্য উত্তর না হয়।

* (স) প্রশ্নোত্তর—(১) শিক্ষক কোন প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও ক্ষান্ত হইয়াছেন কিনা?

(২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর পাইয়া তিনি কিরূপে সম্পূর্ণ শুদ্ধ উত্তর আদায় করিয়াছেন।

(৩) অল্প উত্তর শুধু তিনি কি ডাব প্রকাশ করিয়াছেন ?

(৪) নিম্নোক্তের গ্রাম উত্তর দিলে তিনি তাহার কি প্রতিকার করিয়াছেন ।

(১) কোন জলের উত্তর না পাইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । বালক লব্ধ বুদ্ধির দ্বারা পাই, কি শিক্ষকের কথায় মনোযোগ করে নাই, কি সে জলের দ্যে উত্তর, তাহা সে জানে না- এই সকল কারণের প্রতিকার করা আবশ্যিক । (২) আংশিক শুষ্ক উত্তর পাইলে অপর অংশের জল ভিন্ন প্রশ্ন করিয়া, সে অংশের শুষ্ক উত্তর আদায় করিতে চেষ্টা করিব । (৩) শুষ্ক উত্তর পাইলে বালককে উৎসাহ দিবার জল মধো মধো বা, বেশ, ঠিক কথা প্রভৃতি উৎসাহ দৃঢ়ক বাক্যের ব্যবহার প্রয়োজন । (৪) নির্দোষের মত উত্তর দিলে তাহারও কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যিক ।

(৫) শৃঙ্খলা —প্রশ্নগুলি শৃঙ্খলা পূর্বক করা হইয়াছে কিনা ?

শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে সকল প্রশ্ন করা হয়, তাহার শৃঙ্খলা থাকা নিতান্ত আবশ্যিক । সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর একত্র করিলে যদি বিষয়টি ধারাবাহিকরূপে বুঝিতে পারা যায়, তবে প্রশ্নগুলি সুশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে । পরীক্ষার নিমিত্ত প্রায় শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ কোনরূপ দৃষ্টি রাখা হয় না ।

(৬) প্রশ্ন সংখ্যা—শিক্ষক অত্যধিক কি অত্যল্প প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।

হুই হুই মোদের । তবে অত্যধিক অপেক্ষা অত্যধিক অধিকতর মোদের । বালকগণের বয়স, অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিমাণ দৃষ্টে প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হয় ।

* (৭) পুনরাবলোচনা—পুনরাবলোচনার জন্ত যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার দ্বারা বালকের নবোপার্জিত জ্ঞানের উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কিনা ?

বালকেরা যে শব্দ, অর্থ, পূত্র, সংজ্ঞা প্রভৃতি (সম্পূর্ণ নুতন) শিক্ষা করিল, সেগুলি তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে কি না, তাহাই বুঝিবার জন্ত পাঠের শেষে পুনরাবলোচনার প্রশ্ন করা হয় । এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পাঠ্য নোট পরিচ্ছেদে জ্ঞেয়া ।

৫। বিষয়গত ভুল—

অজ্ঞতা—কোন কোন স্থানে শিক্ষক নিজেই অজ্ঞান পানিচয় দিয়াছেন ।

আকবরের রাজত্ব কাল শিক্ষা দিতে যদি শিক্ষক মানচিত্রের দ্বারা আকবরের রাজত্বের পরিমাণ নির্দেশ করিতে না পারেন, এম আভিত্য প্রমাণ করিতে যদি তিনি ঠগ আভিত্য প্রয়োগ করিতে না পারেন, তবে তিনি অজ্ঞতার পানিচয় দেন ।

* (শ) কোন কোন স্থানে শিক্ষক ভুল শিক্ষা দিয়াছেন ।

লালে ও নীলে নিশাইলে সবুজ হয়, কলিকাতা ভাগীরথী । পানিচয় পাড়ে, শ্রীনাথপুরী কাগজের ২৪থানে এক দিক্তা হয় আভুতি ভুল শিক্ষা ।

সমালোচকগণ এইরূপে সমালোচনা করিয়া, উপসংহারে একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

৬। উপসংহারে সংক্ষেপ মন্তব্যের এই রীতি—

(য) পাঠদান উত্তম হইলে—উত্তম, উৎকৃষ্ট, বা সুন্দর ।

(স) মধ্যম হইলে—মধ্যম, সামান্য বা মন্দ নয় ।

(হ) অধম হইলে—অধম, নিকৃষ্ট বা ভাল নয় বলিয়া সমালোচনা করিতে হয় ।

অনুগ্রহ ।—প্রত্যেক সমালোচনায় * চিহ্নিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে । যে সকল সাধারণ জ্ঞান প্রায় শিক্ষকেই দেগিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য কোন কোন জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ যোগ্য না থাকিলে (সমালোচনা সংক্ষেপে করিবার জন্য) কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও চলিবে । কেবল সৌগিক শিক্ষাদান সমালোচনা করিবার জন্যই এ পদ্ধতি নির্দেশ করা হইল, অধ্যাপন শিক্ষাদান কালে এই পদ্ধতির অবস্থা-সুস্থাপ পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে । এই কারণে অল্পসংখ্যে একবার সমালোচনা অভ্যাস হইয়া গেলে, আর নির্দিষ্ট পদ্ধতির আবশ্যক থাকিবে না । তখন সমালোচকগণ নিজেরাই সমালোচনায় নানাবিধ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিবেন ।

৩। পরীক্ষা পদ্ধতি ।

পরীক্ষার আবশ্যিকতা । —যে শিক্ষক সমস্ত বৎসর বালককে পড়াশুনাতেই বিনা বিরামে পড়াশুনা করিতে বাধ্য করেন তাহাকে (যেমন সাহিত্যে ১২%, অঙ্কে ১২%, ইতিহাসে ১২%, উত্তর হইবার শেষ সীমা) তবে পরীক্ষা না করিয়া শুধু পড়াশুনা করিয়াই নিষ্কাশন করা যায় না ।

পরীক্ষা আছে বলিয়া বালকগণ প্রথম হইতেই অতি সাবধানে পাঠ্যভাগ করে । পরীক্ষার সময় কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া উত্তর হইতে হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করে । কিন্তু ইহার আবার দোষ আছে । পরীক্ষা আছে বলিয়া বালকগণ অনেক সময় সমস্ত পাঠ্য না পড়িয়া, কেবল যে সকল স্থান হইতে প্রশ্ন আসিবার সম্ভাবনা, তাহা পঠি করে । তাহা পড়িয়া উত্তর হইবার আশায়, নানানরূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য প্ররোচিত হয় ।

পরীক্ষার প্রকার । —মৌখিক, লিখিত এবং মৌখিক ও লিখিত একত্রে । লিখিত পরীক্ষায়, বালকগণ চিত্তা করিয়া উত্তর দিবার সময় নাম বটে, কিন্তু আবার উত্তররূপ বচন শক্তি না থাকিলে, উত্তর লিখিয়া উঠিতে পারে না । মৌখিক পরীক্ষায়, রচনার তেমন আবশ্যিকতা হয় না বটে, কিন্তু আবার চিত্তা করিবার সময় পাওয়া যায় না । উভয় কক্ষ লিখিত ও লিখিত মৌখিক সে বীতি, তাহাই অনেক উন্নত বলিয়া মনে করেন ।

পরীক্ষার প্রশ্ন । —অনিকাংশ বালক যেকোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, সেইরূপ প্রশ্ন দেওয়াই কর্তব্য । বালক বাছ জানে, তাহাই পরীক্ষা করা প্রশ্নের উদ্দেশ্য ; বাছ জানে না তাহা পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নহে । অনেক পরীক্ষক কঠিন প্রশ্ন দিয়া বাছকে লইতে চান, কিন্তু

ইহাতে নিম্না এই স্থগাতি হয় না । তারপর প্রাণ্ডি দিয়া, নিজে একবার তাহার উত্তর লিখিতে চেষ্টা করা উচিত । তাহা হইলে প্রশ্ন সংখ্যা অধিক হইল কিম্বা, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । ৩ ঘণ্টার প্রশ্ন করিতে হইলে, ২ ঘণ্টায় যে পরিমাণ লিখিতে পারা যায়, তাহারই প্রশ্ন করিতে হইবে । অস্ত্যতঃ এক ঘণ্টা সময় চিন্তা ও পুনরাবোচনায় অল্প বাদ রাখা উচিত । পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে, প্রতিভাসম্পন্ন বাচক নির্দোষের জন্য, একটী মাত্র কঠিন প্রশ্ন দেওয়া যাইতে পারে । পুনরুদ্ধার তাহার প্রশ্নের যে পরিমাণ উত্তর আনা করেন, তাহা বাচকের প্রশ্নের পাণ্ডিত্য মূল্য দেখিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকে । সুতরাং যে প্রশ্ন যে পরিমাণ কঠিন বা তাহার উত্তর লিখিতে যে পরিমাণ সময় লাগিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নের মূল্য লিখিয়া দিবেন । প্রশ্নের অশ্রুত যে সকল জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা ১২০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে ।

প্রশ্নের উত্তর ।—প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হওয়া আবশ্যক । উত্তরের পরিমাণ প্রশ্নের মূল্য দৃষ্টে নির্ধারণ করিতে হইবে । “আকবরের বিসয় লিখ” —এ প্রশ্নের মূল্য যদি ১ হয়, —তবে আকবরের বিসয় ৮৫ লাইনে লিখিতে হইবে । কিন্তু যদি ১০ নম্বর থাকে, তবে $8 \times 10 = 80$ লাইন কি ৫০ লাইন লিখিতে পার । সাধারণতঃ ১ নম্বরের জন্য ৩৪ লাইন পরিমিত লিখিলেই হইবে । তবে যদি একপ প্রশ্ন হয় যে “পলাশীর যুদ্ধের তাবিল লিখ” —আর প্রশ্নের নম্বর থাকে ১, তখন অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরে “১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল” ভিন্ন আর ৩৪ লাইন লিখিবার কিছুই নাই ।

[পরীক্ষা কাগজের ২ আঙ্গুল পাশ রাখিলেই চলিবে । যত কম কাগজ ব্যবহার করা যায় ততই ভাল । পরীক্ষায় যখন কাগজ উজ্জ্বল

* ইতিহাসের প্রশ্ন-১৩ ঘণ্টার জন্য—পূর্ণ মূল্য ৬০—ছাত্রবৃত্তি বা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ।

করিয়া নথর দেওয়া হইল না, তখন কম কাগজে উত্তর দিলেই পরীক্ষকের
পক্ষে সুবিধাজনক হইবে । দেখা বেশ পরিধান, পরিচ্ছন্ন হওয়া আব-
শ্যক । পোশাক পোশের উত্তর (পোশের নথর দিয়া) পৃথক পৃথক করিয়া
লিখিতে হইবে । উত্তর কোম অংশ ভুল হইলে, কেবল মাত্র একটী
টান দিয়া কাটিয়া দিবে । নেথান পাঠনের মধ্যে মাত্র এক আঙ্গুল পরি-
মিত স্থান থাকি আবশ্যক । যদি কোন কথা বা অংশ কোন স্থানে যোগ
করিবে হয়, তবে সেই স্থানে একটা ক্যারেট (A) চিহ্ন দিয়া উপরের
ফাঁকে, সেই কথা বা অংশ যোগ করিয়া দিতে পারা যায় ।]

উত্তরের কাগজ পরীক্ষা ।—সাপ্তাহিক পরীক্ষায় কাগজ
পরীক্ষা করিয়া বালকগণকে সন্দেহ দিতে হয় । উত্তরে যত প্রকার অশুদ্ধ
থাকে সমস্তই শুদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে । বর্ণ বিন্যাস ভুল করিলে,
সেই শব্দের নীচে ছুটী টান দিয়া রাখিবে, বালকগণ নিজে ভুল শুদ্ধ
করিবে । ব্যাকরণ ছুটে * পদের নীচে একটী টান দিয়া রাখিবে । কোন
স্থানে হঠাৎ কথা ফেলিয়া গেলে সেই স্থানে একটা ক্যারেট (A) চিহ্ন
দিয়া রাখিবে । ব্যাকরণে সেই শব্দ নিজেই পূরণ করিবে । এক শব্দের
সঙ্গে অন্য শব্দের সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে, উত্তর শব্দের নীচে X চিহ্ন দিয়া
রাখিবে, বালকগণ তাহা নিজেই শুদ্ধ করিবে । অসম্বন্ধ বর্ণনা করিলে
বা অসম্বন্ধ শব্দ লিখিলে সেখানে একটা (?) প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দিবে ।
নির্দেশ পর মন কোন উত্তর লিখিলে তাহান উপর আশ্চর্য্য বোধক চিহ্ন
(!) দিবে । যে ভুল ব্যাকরণ শুদ্ধ করিতে পারিলে না সনে হয় কেবল সেই
ভুল কাটিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে । যেখানে বালকের বাক্য বা বাক্যাংশ

* অধীনস্থ, অনাটন, আবশ্যকীয়, আয়ত্তাধীন, একত্রিত, জৈবাবৃত্তিক, জাতাগণ, বিধায়,
নিয়াক, নির্দেশী, নিয়ন্ত্রণাধী, রাষ্ট্রাগণ, মহারাজা, সাবাস্ত সাম্রাজ্য, সাহায্যবৃত্ত, সম্রাজী,
মহারাজী, দিব্যরাজী, মঙ্গল ও ভুতি কথা ব্যাকরণ ছুটে হইলেও ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রচ-
লিত হইয়াছে । সুতরাং একগুণ শব্দ না কাটিয়েও চলে ।

অপেক্ষা, উত্তম বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ বিশেষ মনে কর মেনে
থানে সেই উত্তম বাক্যাদি বাক্যকে বাক্যের উপর লিখিয়া দিবে। বাক্য
কালির দ্বারা ভূগ সংশোধন করিবে। নিম্নে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

?

“দশবথ অমোঘ্য। মহাদেশের রাজা ছিলেন। তাহার প্রিয়ান্না
মহীষ কোশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার A বাক্য এবং টেকক্যোব

!!! জন্ম গ্রহণ করেন

গর্ভে ভরত ও শত্রুঘ্ন জন্ম গয়েন। দশবথ বার্কিকা তা দশায় উপনীত
হইলে গোষ্ঠ পুত্র রামকেই তিনি রাজপদে আনয়ন করিতে অভিলাষ

X

কবিতা।”

X

বালকেরা যে সকল প্রশ্নের উত্তর কবে নাহ, তাহার উত্তর প্রত্যেক
কাগজে লিখিয়া দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব। এজন্য যে দিন
পরীক্ষার কাগজ ফিরাইয়া দিতে হয়, সেইদিন শ্রেণীতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর
বলিয়া দিতে হইবে। যাহারা যে প্রশ্নের উত্তর গোথে নাহি তাহারা তখন
লিখিয়া দাইবে বা সম্পূর্ণ লিখিয়া লইতে না পারিলে একটু একটু টোকা
(নোট) করিয়া দাইবে। পরে বাড়ীতে গিয়া পূর্ণ উত্তর লিখিবে।
বালক লিখিল কিনা তাহার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। কোন কোন শ্রেণী
প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য, বালকেরা এক এক খানি খাতা বাণিয়া
রাখে। যেমন সাহিত্যের খাতা—অর্থাৎ বৎসরে সাহিত্য বিষয়ে যত
পরীক্ষা হইবে, সে সমস্তই এই সাহিত্যের খাতায় লিখিত হইবে। পৃথক
পৃথক আনুগ কাগজে সাপ্তাহিক পরীক্ষার উত্তর গোথা সুবিধাধনক
নহে। অনেকের এইরূপ খাতার ব্যবস্থা পছন্দ করেন।

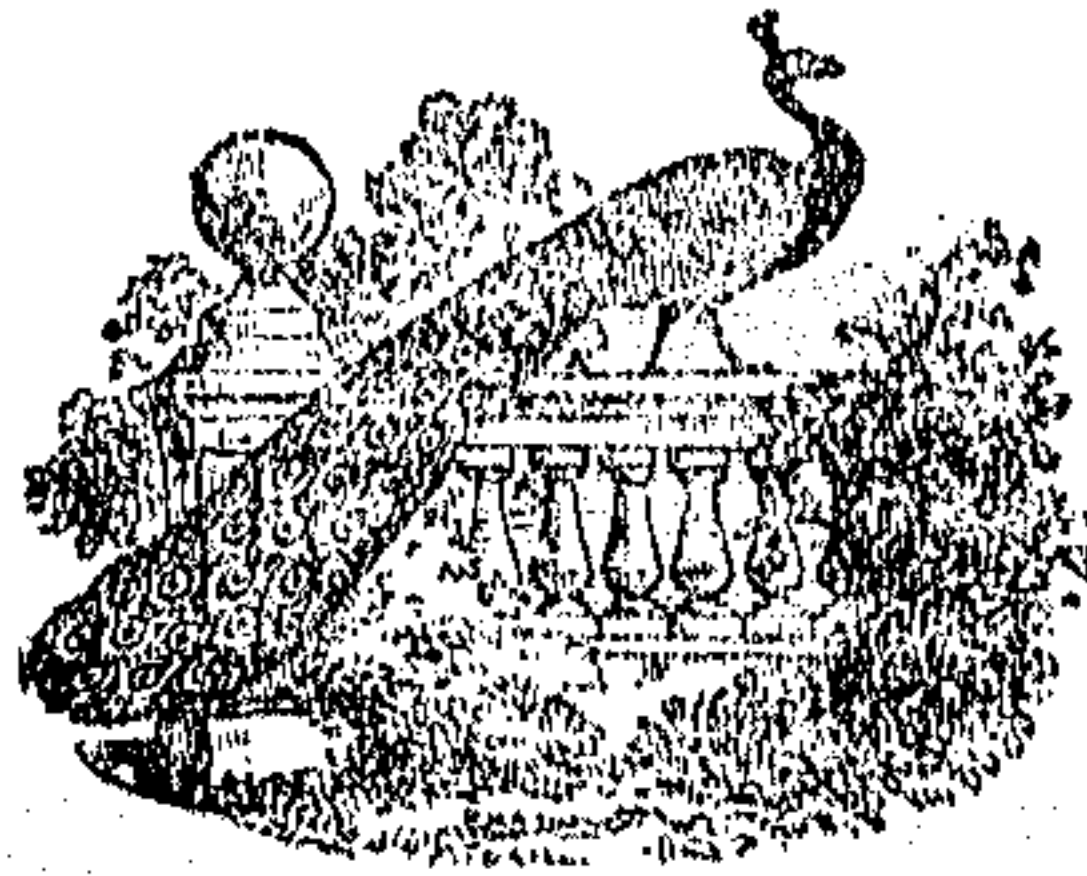
প্রশ্নোত্তরের মূল্য।—শুন্দর বচনা করার ক্ষমতা, একটা
বিশেষ শক্তি। যেমন সকলে কবিতা লিখিতে পারে না, তেমনি সকলে

সুন্দর নানী কবিতা পাঠের নী । মূল্য দিবার সময় এ কথা মনে রাখা
করনা । আবার যে শ্রেণীর বালাকে নিকট যেকোন রচনা আশা করা
যাচ্ছে পাঠে, তাহাৎ দেখিয়া মূল্য দিতে চলেবে । সাপ্তাহিক পরীক্ষার
মূল্য ৭ বাৎসরিক পরীক্ষার মূল্য সম্বন্ধে একটু পার্থক্য রাখা আবশ্যিক ।
সাপ্তাহিক পরীক্ষার যেমন পোড়োশক পত্রের অতি ক্ষুদ্র হিসাবে মূল্য
দেওয়া হয়, বাৎসরিক পরীক্ষায় তাহান একটু ব্যতিক্রম করা আবশ্যিক ।
এমন হয় যে একটি বালাকে কতকগুলি শব্দের জীবিত ও কতকগুলি শব্দের
অকৃতি পোড়োশক আলাপ জীবিত, এক আশ নম্বর জুটাইতে জুটাইতে
কোন রকমে ২৩ পাঠিয়া পাঠের নম্বর রাখিল । কিন্তু তাহাব রচনাংশ
হয়ত শ্রেণীর উপযোগী নয় । আবার একটি বালাকে রচনাংশ উন্নয়ন
বটে, কিন্তু অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর করিতে পাবিল না বলিয়া
৩০ নম্বর পাঠিয়া “ফেল” হইল । একপ অবস্থায় উভয়কেই সমান নম্বর
দেওয়া উচিত, অথবা যাহাব রচনা প্রশ্নের ভাল তাহাকে কিছু বেশী নম্বর
দেওয়াই মনে আছে । আবার প্রশ্নের ৩টি অঙ্ক মাত্র কমিয়া একজন ৩×
১০=৩০ নম্বর পাঠিয়া পাশ করিল ; আবার এক জনে ৪টি অঙ্ক কমিয়াছে
বটে, কিন্তু উত্তরের কাছে আসিয়া ২টি অঙ্কে একটু একটু ভুল করিয়া
২×১০=২০ নম্বর পাঠিয়া ফেল করিল । এ ফেলের কোন অর্থ নাই ।
৪ঠা ২ ১/২ লিখিতে ১/২ লিখিয়াছে বলিয়া অঙ্ক ভুল কবিয়াছে । একটি অঙ্ক
খুঁজা কবিলেই মনে ১০ নম্বর পায় তখন ঐকপ অঙ্কের কাগজ পরীক্ষার
সময় বিবেচনা করা আবশ্যিক । এইজন্য বাৎসরিক পরীক্ষার সময়,
সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বরগুলির হিসাব করা উত্তম প্রথা ।

পরীক্ষার আধিক্য ।— পরীক্ষার আধিক্য ভালও বটে আবার মন্দও বটে ।

যন যন পরীক্ষা হয় বলিয়া বালাকে যদি পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত না হয়, আর যদি শিক্ষক
কাগজাদি পরীক্ষা করিতে শৈথিল্য করেন, তবে পরীক্ষায় ফল না হইয়া বরং কুফলই
হইয়া থাকে । সময় সময় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বহুবিধ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া

আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন । শিক্ষকেরা মনে করেন যে সময়ের স্বল্পতা ও বিষয়ের আধিক্য হেতু সে আদেশ পাশন করা কঠিন । কিন্তু সে বিষয় ভুল । পরীক্ষা বলিলেই যে তৎক্ষণাত্ প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই । কতকগুলি ভাগ মূলে মূলে দিওয়া কর, একটি দুইটি প্রশ্নের উত্তর (নমন রচনা, উইং, অঙ্ক) লিখিতে দাও । এক ঘণ্টা কি অর্ধ ঘণ্টাতেই সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইতে পারে । বালকগণকে আহ্বত করাইতে হইবে, পরীক্ষার এই উদ্দেশ্য ঠিক রাখিবে । কিন্তু লিখিত পরীক্ষার যে সমস্ত কাগজ তৈরীকে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা যাহাতে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া সম্বন্ধিত সিদ্ধান্ত দিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে । তাহা না করিলে বালকগণের পরীক্ষার প্রতি ভয় ভক্তি কমিয়া যাইবে ।





উপসংহার ।



শুধু শেষ হইল বটে কিন্তু সমস্ত কথা বলা হইল না । বলিতে গেলে যে কেবল পুস্তক বাঁড়িয়া যায় তাহা নহে, তাহাতে কিছু অপকারও হইতে পারে । সমস্ত কথা পুস্তকে পাইলে, শিক্ষকগণ আর তাহাদিগের আদীন চিন্তা শক্তি পরিচালনা করিয়া নূতন নূতন পদা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবেন না । এই শ্রেণীর পুস্তকের উদ্দেশ্যই কেবল শিক্ষককে পথে তুলিয়া দেওয়া মাত্র । তারপর গন্তব্যপথ, গন্তব্যমান ও গন্তব্য স্থান তিনি নিজে ঠিক করিয়া যাইবেন ।

আর এক কথা—পুস্তকে নানারূপ পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, সকল পদ্ধতি সকলের ভাল লাগিবে না । যিনি যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়া সুবিধা বোধ করেন, তিনি সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিবেন । আবার তাই বলিয়া কোন পদ্ধতি বিশেষের দাস হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে । যেমন করিয়া হউক বালককে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে । এখন যে পদ্ধতি (লাঠী মারা বাদে) অমুমরণ করিলে সেই ফল লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত পদ্ধতি । আরও এক কথা, যে যে বিষয়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে এই পুস্তকে উপদেশ প্রদত্ত হইল, শিক্ষকের যদি সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান না

থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে কেবল পদ্ধতিগত পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করা কান্দেও চেষ্টা করা বৃথা । এই পুস্তকে শিক্ষাদানের প্রকরণসমূহ মাত্র দেখানিয়া দেওয়া হইয়াছে,—বিষয়ের জ্ঞান মেরু মেরু বিষয়ক পুস্তক দ্বারা কানিয়া উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইতে হইবে ।

তারপর আরও একটা বিশেষ কথা এই যে পুস্তক শিক্ষক হইতেও হইবে ছাত্র হইতেও হইবে ; আত্ম শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা কারণ হইবে । বিদ্যালয়ে শিক্ষান শেষ হয় না । চিরজীবনই শিক্ষার সময় । বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হইতেই আত্মশিক্ষার কাণ্ড উপস্থিত হয় ।

আত্মশিক্ষার বহু উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি সামান্য—(১) উত্তম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন (২) পাঠ, কথকতা, বক্তৃতাাদি প্রবণ (৩) উন্নত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ (৪) দেশ ভ্রমণ ; (৫) পর্যটনভ্রমণ ।

আব আত্মশিক্ষা বিশেষ আবশ্যকও বটে, কারণ (১) বিদ্যালয়ে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাকরা অসম্ভব, (২) যাঁহা কিছু শিক্ষা করা হইয়াছে সেগুলিকে সতেজ রাখিবার জন্য আত্মোচ্চনা আবশ্যক । (৩) চারিদিকেই কঠোর প্রতিযোগিতার সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে হইবে, মঙ্গল নিজকে নবনব জ্ঞানে উন্নত রাখা আবশ্যক (৪) আত্মোন্নতি পদোন্নতি, ভবিষ্যৎ উন্নতি সমস্তই এই আত্মশিক্ষার উপর নির্ভর ।

আত্মশিক্ষার যে সমস্ত উপায় উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে উত্তম পুস্তক পাঠই সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে কতকগুলি বাজে পুস্তক পাঠ করিলে, বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না । আত্মশিক্ষার জন্য (ক) নিজের রচিকর উত্তম পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে । জীবন চরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস, পুনাগ, প্রাদী বৃত্তান্ত, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি উত্তম বিষয় ।

(খ) পুস্তক পাঠ করিয়া কি নূতন জ্ঞান লাভ হইল তাহা চিত্তা করিতে হইবে ।

(খ) কোন একটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করা উচিত । কেবল সময় কাটাটবার জন্য পড়ায় কোন ফল নাই ।

(ঘ) যে বিষয় শিক্ষা করিলে অবস্থার উন্নতি বা মনের উন্নতি সাধন হইতে পারে, এষ্টরূপ একটি কি দুইটি বিষয় নির্ণয় করিয়া, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে ।

(ঙ) সম্ভবপর হইলে আরও একটি কি দুইটি ভাষা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত । আমাদিগের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যিক । তাহার উপর সংস্কৃত কি আরবীয় আলোচনা করিতে পারিলে আরও উন্নয়ন ।

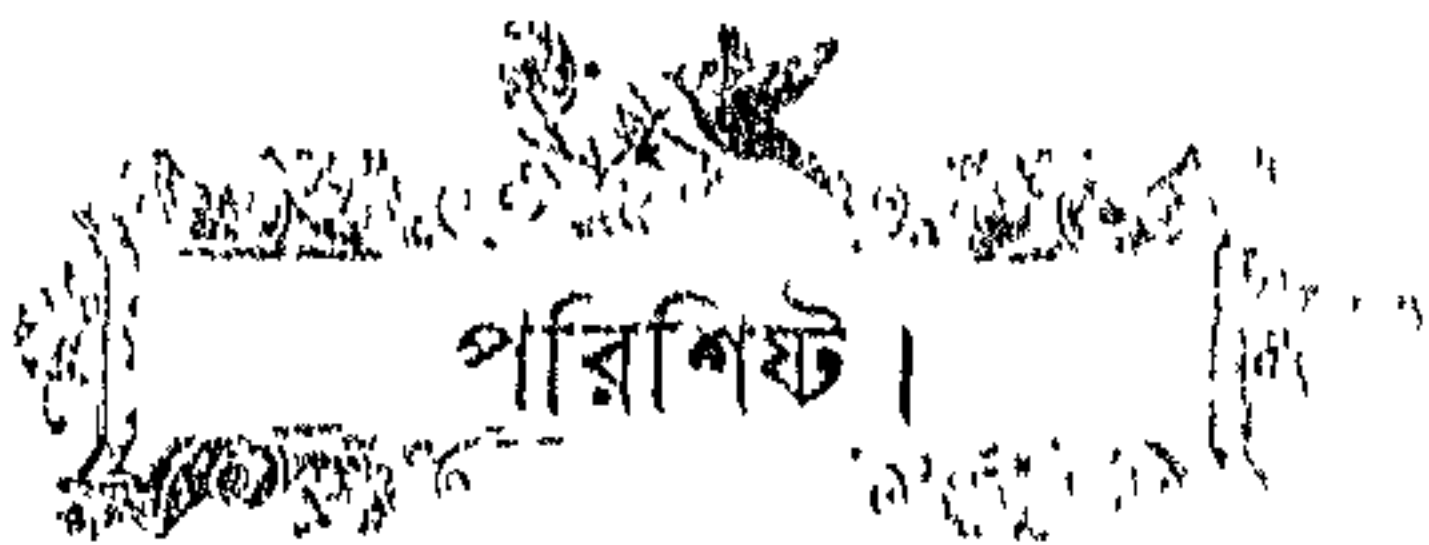
(চ) সম্ভবপর হইলে নিজের একটা ক্ষুদ্র পুস্তকাগার করা আবশ্যিক । আত্মকাল বজবাসী, বঙ্গমতী ও হিতবাদীর অনুগ্রহে পুস্তকের দাম খুব কমিয়া গিয়াছে ।

(ছ) পৃথিবীর কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে, কি কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে আপনাকে অভিজ্ঞ রাখিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠ করা কর্তব্য ।

শেষকথা—উন্নতির মূলমন্ত্রের সাধনা ব্যতিরেকে কখনই কার্য সিদ্ধি হইবে না । শিক্ষক নিজে সেই মন্ত্রের সাধক হইবেন, আর শিষ্য-গণকেও সেট মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন । সে মন্ত্র কি ?—

সর্বত্রং পরবশং দুঃখং সর্বব্রহ্মাবশং স্মৃথম্ ।

ইতি তারিখ ২১শে চৈত্র, ১৩১৫ ।



পালিশ (Polish)।—লক্ষ, ডেমক, টোবল, চেয়ার বাচুশি বাবহারে
সময় হইয়া উঠিলে, প্রথমে মোড়া মিশিও গরম জল দিয়া ধুইয়া নেমিতে হইবে। মুঠবান
সময় নানিকেলের চোবড়া কাটিয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঘসিলে সমস্ত ও কাচের দাগ অনেক
পরিমাণে উঠিয়া যাইবে। পরে শিরিস কাগজ দ্বারা ঘসিয়া আর একটু পালিশ করিয়া
লইতে হইবে। তারপর তাহাতে তুলি বা চোঁড়া কাগড়ের দ্বারা পালিশ লাগাইতে হইবে।

পালিশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—সাধারণ স্পিরিটের (অনামান) মতো কয়েকবট চাচ
(গয়নাব ভিতর যে দাগকা ভরিয়া দেয়) মেলিয়া রাখ, চাচ স্পিরিটে গলিয়া যাইবে। যদি
ঘন বোধ হয় তবে একটু স্পিরিট দিয়া পাতলা করিতে হইবে। এমণোজার পাতলা রমেন সহ
ঘন হইলেই কাষো উপযুক্ত হইবে। যদি একটু লাগতে রঙ পড়ন্ত কর তবে ইহার সঙ্গে
একটু খুনথারাপি (এক রকম আল রঙের গুঁড়া) মিশাইয়া লইবে। এতদ্বারা রঙ মেখন
কাঠের পালিশে প্রায়ই মিশাইয়া থাকে। হলুদ বট (কাঠালের কাঠের মত) করিতে
হইলে একটু পেউড়ী (এক প্রকার হলুদ রঙের গুঁড়া) মিশাইয়া লইবে। এইরূপ পালিশ
একবার কি দুইবার লাগাইলেই হইবে।

বার্ণিশ (Varnish)।—যদি পালিশ করিয়া তাহাকে আবার চক্চকে
করিতে ইচ্ছা হয়, তবে বার্ণিশ লাগাইতে হইবে। অল্প বার্ণিশ প্রস্তুত করিয়া লওয়া
অপেক্ষা কেনাই সুবিধা বলিয়া বার্ণিশ প্রস্তুতের কথা লিপিত হইল না। সাধারণতঃ এটি
সকল কার্যের পক্ষে কোপ্যাল বার্ণিশই উত্তম। এক মেয়ের দাম ১।০।

ব্ল্যাক বোর্ডের রঙ (Black-Board Varnish)।—
যদি নূতন ব্ল্যাকবোর্ড (অর্থাৎ যে বোর্ডে পুকের রঙ দেওয়া হয় নাই) রঙ করিতে হয়,
তবে পালিশের সঙ্গে পেউড়ী বা ইটের গুঁড়া মিশাইয়া বোর্ডে একবার কি দুইবার পালিশ

জাগ্রত হইবে । মত পালিশ শুকায় যা গেলে শির্ষক কাগজ দিয়া ঘষিয়া, পুনরায় নুশন পালিশের সহিত তুলা কাঁচ (বাস্প ত্রাক) মিশাইয়া, বার দুই পালিশ লাগাইলেই বোর্ডে বসে । বোর্ডে নান্দন করিতে নাই । বোর্ডে রঙ ডিহিয়া গেলে তুলা কাঁচ মিশ্রিত পালিশ লাগাইতে পালিশ নুশন হইয়া যাবে । কিন্তু যদি বোর্ডে পুকা রঙ, আবকাভতা (বোকা) বা বাস্প ত্রাক দিয়া রঙ করা হইয়া থাকে, তবে সেই রঙ শির্ষক কাগজ দ্বারা ওঠাইয়া, নুশন বোর্ড রঙ করিবার ভাণ্ডারে রঙ করিতে হইবে । বোর্ডের রঙ নির্দেশ সাওয়া যায় । শুধর মাঝে বাম এনেমান রঙ রাখাইয়া, সেই স্থান বোর্ডের উপর লাগাইয়া দিলেই প্রকার রঙের দান পড়িয়া যাইবে । দীর্ঘ পক্ষে এককণ কাল কাটিয়া লগেই চেক বোর্ড হইবে ।

বলফ্রেম (Ball-Framo) ।—কতকগুলি স্থানরা জিন্ন করিয়া দিবে । তাহান ভিতর জোহার ভাণ্ডারাইয়া একটা ভোট চৌকাঠের সহিত লাটিয়া লও (৬০/৮০ মেন্স) তহা করিলে তেলের বড় দিয়া রঙ করিতে পার । অথবা মাটির কতকগুলি গুঁটা করিয়া তাহানের মধ্যে জিন্ন কর । পরে শুকাইয়া গেলে পোড়াইয়া লও । ইহাতেও বেশ বসন্তের গুঁটা হইতে পারে ।

পুটিন (Putty) ।—একমের চকের গুড়া, আধ পোয়া রক্তনের গুড়া ও আধ পোয়া মত তিমির তেল (এই অনুপাতে) একত্রে মিশাইলেই পুটিন হয় । প্রথমে চকের গুড়া ও রক্তন চূর্ণ মিশাইয়া তাহাতে একটু একটু করিয়া তেল মিশাইবে ও হাতুড়ী বা পাথরের দ্বারা খুব করিয়া পিটিতে থাকিবে । যখন মিশ্রিত জবা রুটী গড়ার সময়ের মত হইবে তখনই কাজের উপযুক্ত হইল মনে করিবে । আবশ্যক হইলে তেলের ভাগ একটু কমেনশী করিতে পার । কিন্তু সাবধান বেশী তেল দিও না, তাহা হইলে কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে । কাঠের কোম জিনিষে যদি কাটা কি গর্ত থাকে তবে এই পুটিনের দ্বারা তাহা যথাক্রমে মাইতে পারে । শুকাইলে এই পুটিন খুব শক্ত হয় । বন্ধুর-মানচিত্র (রিলিফ মাপ) এই পুটিনে প্রস্তুত করিতে হয় ।

বন্ধুর-মানচিত্র (Raised map) ।—একখানা (১৮" x ২২" মত) কাঠের বোর্ড প্রস্তুত করিয়া লও । এক কাঠের হইলে ভাল, না হইলে জোড়ের স্থান বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে । চার দিকে আধ ইঞ্চি প্রস্থ ও আধ ইঞ্চি উচ্চ, বিট বা কার্গিল লাগাইয়া লও । এই বোর্ডের উপর পেন্সিল দিয়া মানচিত্র অঙ্কিত কর । তার উপর (মানচিত্রের ভূমি ভাগের উপর) পুটিন টিপিয়া টিপিয়া বসাও । পর্বতের স্থানে

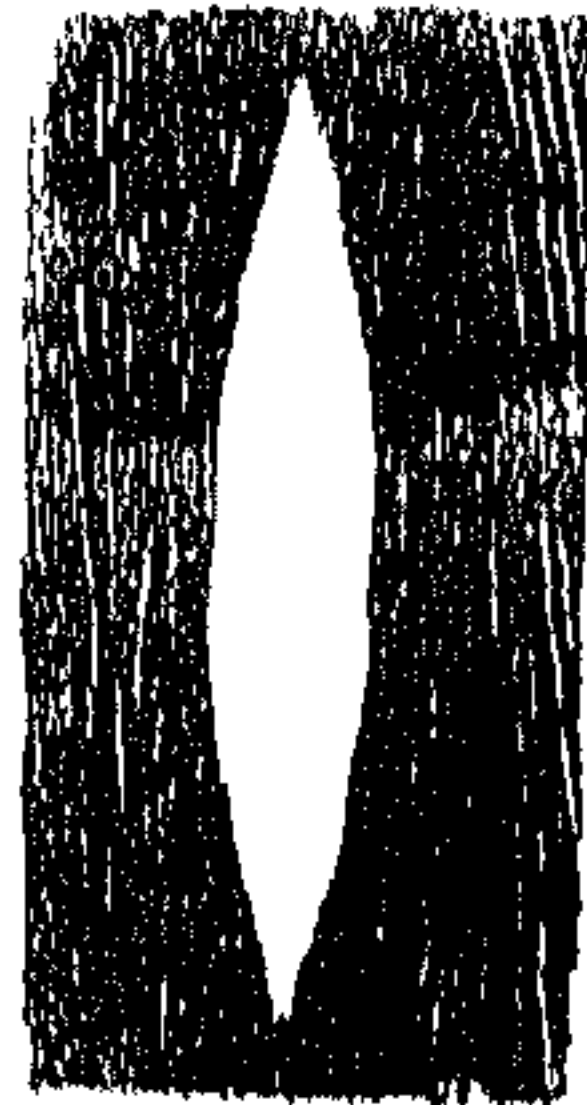
বেশী পুটীন দিয়া উচ্চ করিবে। সমুদ্রের তটে খুব পাড়না করিয়া পুটীন দিবে। একঘানা বন্ধুর মানচিত্র দেখিতে পারিলে প্রস্তুত করা সহজ হইবে। ভূগোল শিখার মান্যনা আদর্শও এই পুটীনে প্রস্তুত করিতে হয় (৩৬১ পৃ: দেখ) কাগজের মধ্যে দাঁড়াও বন্ধুর মানচিত্র প্রস্তুত করা যায়। রাজ্যে কাগজ ভিজায় রাখা, পরদিন শিল নোড়া দিয়া বেশ করিয়া পিষিয়া লও। জল চিপিয়া ফেলিয়া, তাহাতে একটু গদের আঠা মিলাইয়া লইলেই বেশ কাজ করা যাইবে। কাগজমণ্ডের মানচিত্র বেশ হালকা হয়। পুটীনের মানচিত্র ভাবি। তবে কাগজের এক অস্থিবিধা এট যে (নদী, ধন, সমুদ্র) জল ঢালিয়া দেখান যায় না। পুটীনের মানচিত্রে জল ঢালিলে নষ্ট হয় না। আর পুটীনের মানচিত্র যত সহজে ভাঙা গড়া যায়, কাগজমণ্ডের মানচিত্র তত সহজে যায় না। এইজন্য বিদ্যালয়ের কাজের পক্ষে পুটীনের মানচিত্র করাই সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়।

গোলক (Globe)।—একটা ফাঁপা মাটির বল (৮৯ ইঞ্চি মত বাস) সংগ্রহ কর। কুস্তকারকে বলিলেই প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই বলের উপর ছোট ছোট টুকরা কাগজ আঁটিতে আরম্ভ কর। প্রথম স্তর কেবল জল দিয়া, তাৎপনের স্তরগুলি আঠা দিয়া আঁটিতে হইবে। এইরূপে ১২।১৪ স্তর আঁটি হইলে, কাগজের স্তরের উপর দুই



দিয়া ইঞ্চি দুই পরিমাণ স্থান এইরূপ ভাবে ৭ কাটিয়া লও। এখন গোলকের উপর একটা লাঠি দিয়া ওয়া ৭৮ আঘাত দিলে, ভিতরের মাটির গোলকটা ভাঙিয়া যাহবে। এই কাটা স্থান

৯৮ চিত্র। গোলক। ফাঁক করিয়া মাটি বাহির করিয়া ফেল। এখন এই কাটা মুখ সংযুক্ত করিয়া সুতা দ্বারা সেলাই কর। একটা বেশ হালকা কাগজের গোলক হইল। পরে এই কাগজের গোলকের উপর দুই (বীপরিত) দিকে দুইটা বিন্দু দিয়া সেরা চিহ্নিত করিয়া লও। পরে ৯৯ চিত্রের অনুরূপ সাদা আংশে অক্ষর করিয়া সাদা কাগজ কাটিয়া লও। এই কাগজ, একপ ভাবে লাগাইতে আরম্ভ কর যেন কাগজের দুইটা সেরা আঁত দুইটা সেরা বিন্দুতে একত্রীভূত হয়। ইহার উপর সুতার সাহায্যে অক্ষরেখা আঁখিয়া টানিয়া লও, পরে মান চিত্র অঙ্কিত কর। যদি বন্ধুর-গোলক প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয় তবে এই মানচিত্রের উপর পুটীন আঁটিয়া আচ্ছাদিত



৯৯ চিত্র।

৫৬ নীচ কন । আর যদি সাধারণ গোলক ক্রিতে হয়, তবে এই মান ৮৫০
১৫ দাঁড় ।

রঙের কথা (Paint and colour) ।—বকুর-মানচিত্র ও বকুর-গোলকে
রঙ করিতে হইবে । তেলের রঙ ব্যবহার করিতে হইবে । তেলের রঙের সাধারণ কোটা ১/০
কি ১/০ আনার দাঁড়িয়া যায় । ভাল এনেমান্ রঙ ক্রিতে হইলে এক এক কোটা ১/০ কি
১/০ আনা লাগিতে পারে । সাধারণতঃ লাল, নীল, হলুদ, সাদা ও কাল রঙ ক্রিগেই
চলে । এইগুলি মিশাইয়াই অত্যাশ্চর্য বস্তু করিয়া লওয়া যায় । তবে পয়সা থাকিলে সকল
রঙের রঙই ক্রয় করা যাহতে পারে । কাঠের জিমিসেও এ সমস্ত বস্তু ব্যবহার করা যায় ।
কিন্তু যদি কাগজের সাধারণ চিহ্ন রঙ দিতে হয়, তবে জলের রং ব্যবহারই সুবিধা । গোলক
ও মানচিত্র প্রভৃতিতে নবন তুলি দ্বারা পাতলা বার্ণিশ (কোপ্যাল বার্ণিশ) লাগাইলে
সুন্দর দেখায় ।

খাতার আদর্শ (Exercise Book) ।—শ্রমীর সকল বালকের পাতা
এক আকারের ও এক রকম কাগজের হওয়া আবশ্যিক । এমন কি তাহার গলাটিগুলিও
যেন এক রকমের ও এক রঙের হয় । প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক একখানি পাতা থাকিবে ।
এক নিয়ম মধ্যস্থে যত কাজ, বাড়ীতেই কবাক বা খুলেই কবাক, সমস্তই এক পাতায়
থাকিবে । বিদ্যালয়ের কার্যের জন্য কোনরূপ খসড়া পাতা থাকিবে না । পর পৃষ্ঠায়
অঙ্কের খাতার নমুনা প্রদত্ত হইল । কিরণে অন্যান্য পাতা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা
ইহা দৃষ্টেই বুঝিতে পারিবে ।

খাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে । বাড়ীর অঙ্ক বাড়ীতে কালি দিয়া কসিবে, খুলের
অঙ্ক খুলে কালি কি পেন্সিল দিয়া কসিবে । বৎসরের প্রথম হইতে ধারা বাহিকরূপে
অঙ্কের নথর দিয়া যাইবে । বৎসরে যতগুলি অঙ্ক কমান হইল, হাতে তাহার এফটা
হিসাব থাকিবে । নামের পৃষ্ঠায় গুণ, ভাগ প্রভৃতি খসড়া কার্য্য করিবে । অঙ্কগুলি
বালক নিজে চেষ্টা করিয়া কসিয়াছে কি নকল করিয়া আনিয়াছে তাহা এই বাম পৃষ্ঠা
পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । আর বিদ্যালয়ের কার্যের সময় যে সকল বালক
অন্য বালকগণের আগে অঙ্ক কসিবে, তাহারা বসিয়া না থাকিয়া এই বাম পৃষ্ঠায় নিজের
হুছাসত চিত্রাদি আঁকিবে । বাড়ীতে কোন কঠিন অঙ্ক কসিতে না পারিলে খানিকটা
স্থান বাস রাখিবে । পরে শিক্ষক বুঝাইয়া দিলে সেইখানে তাহা লিখিয়া রাখিবে । কিন্তু
বালক সেই কঠিন অঙ্ক কসিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, ক্রমের পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয়

৪৯৪

(খাতাব বাগ পূর্ণিম আদর্শ ।)

৩০৬৭
৪৮
২৪৫৩৬
১২২৬৮
১৪৭২ ৬

১৩৩২
৬৭৭
৫৫৫

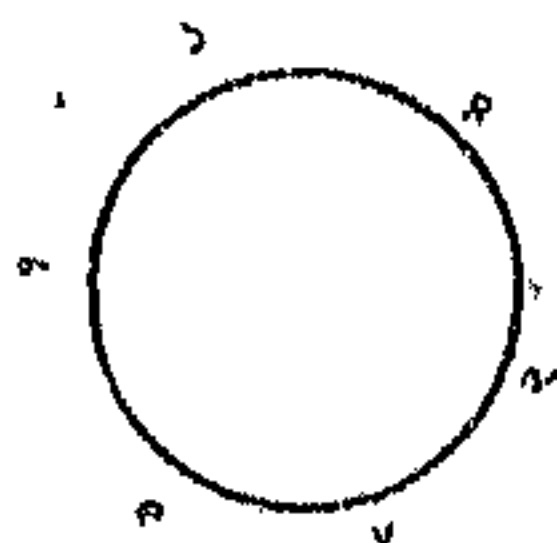
৩৩৩

R
১৩৩২
৫৫৫

৪৫
৪৭৫
৪৪৪৪
৪৪৪

৬) ২, ৮ ৬ (৮ ৩

২০
৪৯
৪৮
৪৮

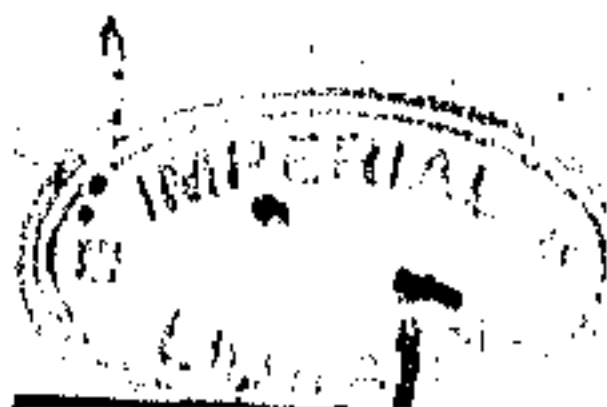
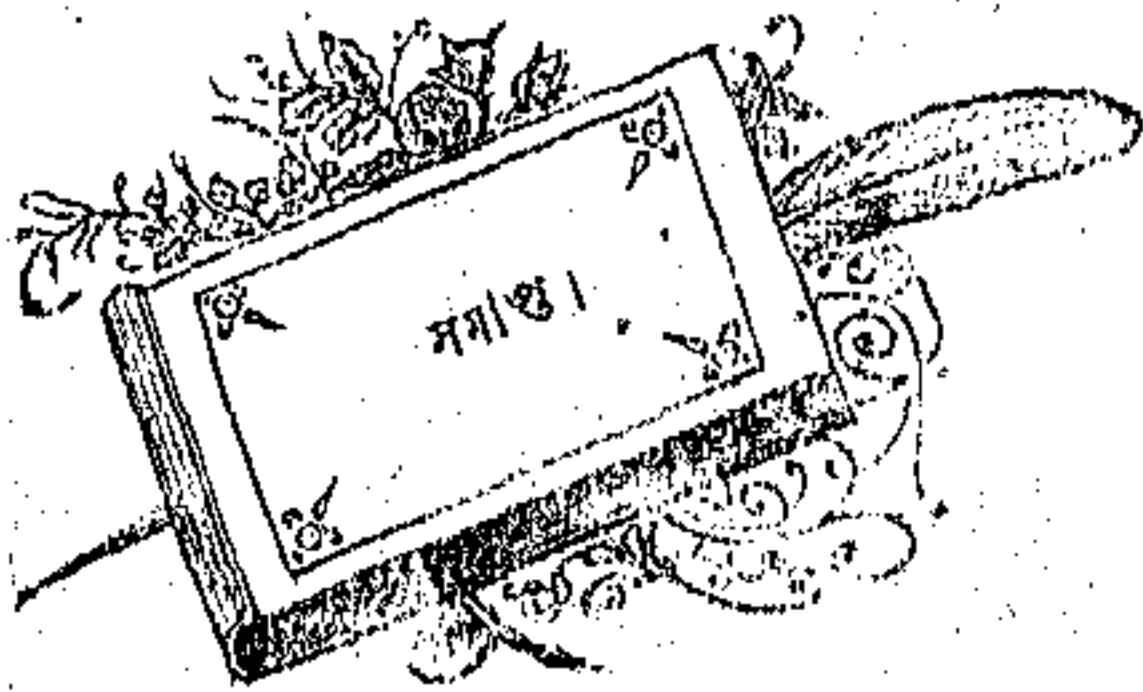


১ = ১৪২৮৫৭
২ = ২৮৫৭১৪
৩ = ৪২৮৫৭১

[যে বালকজন খাতা, সে সকলের পূর্বেই অঙ্ক করিয়া শেষ করিয়াছে আর অবশিষ্ট সময়ে এই হাতের চিত্র অঙ্কিয়াছে]

থাকিবে। যেখানে ভুল করিবে সেখানে শিক্ষক $\times$ এইরূপ চিহ্ন দিয়া ভুল দেখাইয়া দিবে। (৪৮ অঙ্কের উত্তরে দেখ)। খাতার পাতায় পাতায় পৃষ্ঠার সংখ্যা লিখিবে। কখনও কাগজ ছিড়িবে না। কোন অঙ্ক ভুল হইলে একটান দিয়া কাটিয়া রাখিবে। পরীক্ষার সময় এই সমস্ত খাতা দাখিল করিতে হইবে। বালক সমস্ত বৎসর স্নীতিমত কাজ করিয়াছে কিনা তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। খাতাগুলি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। বামের দিকে দুই আঙ্গুল স্থান বাদ দিয়া একটা কালির কমি টানিয়া রাখিবে। এই স্থানে বাড়ীর অঙ্ক কসার তারিখ ও বিদ্যালয়ে অঙ্ক কসিবার তারিখ লেখা থাকিবে। শিক্ষকও এইস্থানে দস্তখৎ করিবেন। কমি টানিয়া বাড়ীর কার্য ও বিদ্যালয়ের কার্য পৃথক করিয়া রাখিবে। রচনা, অনুবাদ, গ্রন্থলিপির জন্য যে খাতা থাকিবে, তাহাতেও উক্তরূপ বাড়ীর কার্য ও স্কুলের কার্য দুইই থাকিবে।

মানচিত্রের খাতা ও চিত্রাকর্ষনের খাতা ফুলস্কাপ আকার বা ডিসাই কি রম্যেণ কাগজের, ই আকারের হওয়া আবশ্যিক। দলিলাদি নকল করিবার খাতা ফুলস্কাপ আকারের হইবে, কারণ যে সকল স্ট্যাম্পে দলিল লেখা যায় তাহার ফুলস্কাপ আকার। জমা খরচ প্রভৃতি খাতার আকার দোকানদারদের খাতার মত হইবে।



ইতিহাসের কালনিরূপণী পক্ষে প্রস্তুত প্রণালী।—প্রধান প্রধান ঘটনাবলী পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে ঘটনা ভিন্ন দেশে ও প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা প্রথম শ্রেণীর ঘটনা (যুদ্ধদেব), যে ঘটনার প্রভাব দেশ মধ্যে অত্যন্ত প্রবল তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর (অশোক শাসন), যে ঘটনার দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তাহা তৃতীয় শ্রেণীর (পানীপথের যুদ্ধ); যে ঘটনা একটা সাময়িক উদ্বেগ বা আন্দোলনের হেতু করিয়াছে তাহা চতুর্থ শ্রেণীর (মামুদের আক্রমণ)। যে ঘটনা কেবল নিজ দেশে সংঘটিত বা ভূতপূৰ্ব্ব যুদ্ধ তাহা পঞ্চম শ্রেণীর (বজ্রিয়ারের বঙ্গবিজয়)। রেখার দ্বারা এই সকল শ্রেণীর পরিচায়ক। তবে এ বিষয়ে সৰ্ব্বসের মত এক হয় না। যে ঘটনা এক জন এক শ্রেণীর মনে করেন, অন্যে তাহা অন্য শ্রেণীর মনে করিতে পারেন। বালকাম্বিকের উপদেশ অনুসারে শ্রেণী নির্দেশ করিলে। এই কালনির্দেশক-তালিকায় বহু ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিলে না। কেবল বিশেষ আবশ্যকীয় ঘটনাগুলিই লিখিয়া রাখিলে। অনেক লিখিলে কিছুই মনে থাকিলে না। মামুদের মাম কাল কালিতে, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, আক্রমণ লাল কালিতে ও অজ্ঞাত বিষয় সবুজ কালিতে লিখিলে। ইহাতে শতাব্দির কোন ভাগে কোন ঘটনা ঘটয়াছিল তাহা সুবিধে পায়া যাইবে।

ভারত ইতিহাসের কালনিরূপণী রেখা।

